তিনটি বই একত্রে



হরর কাহিনি

পিশাচ-চক্র

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

রোমাঞ্চ -হরর কাহিনি

ঈশ্বরী

অপদেবী

তৌফির হাসান উর রাকিব

হরর কাহিনি

তিনটি বই একত্রে

পিশাচ-চক্র/অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

'...আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখতে দেখতে ওদের শরীরের সমস্ত মাংস খসে পড়ল...আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে...' তারপর? তারপর কী হলো জানতে হলে পড়ুন রক্ত হিম করা এ বইয়ের টাইটেল গল্পটি। হরর ও পিশাচ কাহিনির এ এক অপূর্ব সম্ভার।

ঈশ্বরী/তৌফির হাসান উর রাকিব

ঈশ্বর আর শয়তানের রাজত্বে কে এই ঈশ্বরী? কেন এতকাল গোটা মানবজাতির কাছে গোপন রাখা হয়েছে তাঁর কথা? সত্যিই কি তিনি দিতে পারেন অমরত্ব? জানতে হলে পড়তে হবে—ঈশ্বরী! দুটি উপন্যাসিকা সহ সর্বমোট দুই ডজন ছোটবড় লেখা নিয়ে আমাদের এবারের নৈবেদ্য। বইটির প্রতিটি পাতায় রোমাঞ্চ, চমক, ভয়, শিহরণ, আর অসহ্য সাসপেন্স।

অপদেবী/তৌফির হাসান উর রাকিব

যদি জানতে পারেন, আপনার প্রতিবেশী ভদ্রলোক রাতারাতি একখানা কালজয়ী উপন্যাস রচনা করে ফেলেছেন এবং এসবের পিছনে রয়েছে এক অপদেবীর হাত, কেমন লাগবে আপনার? জানতে হলে, পড়তে হবে, সময়ের পাঠকপ্রিয় লেখক, তৌফির হাসান উর রাকিব-এর 'অপদেবী'! তিনটি উপন্যাসিকার অনন্য এক সংকলন।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

হরর কাহিনি

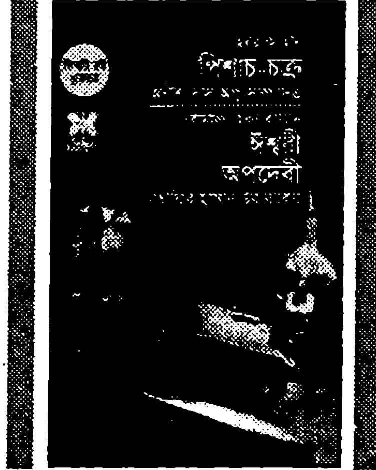
পিশাচ-চক্র

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

ঈশ্বরী

অপদেবী

তৌফির হাসান উর রাকিব





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-0279-2



একশ' পঁয়ত্রিশ টাকা

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

A Collection of Thriller-Horror Stories
PISHACH-CHAKRO
Edited by: Anish Das Apu

ISHWARI
APODEBI
by: Tawfir Hasan Ur Rakib

সূচি

পিশাচ-চক্র

ঈশ্বরী

অপদেবী

পিশাচ-চক্র

প্রথম প্রকাশঃ ২০১২

পিশাচ-চক্র

এক

শ্রাবণ মাস। ভরা বর্ষা। সকাল থেকে মেঘ জমছিল আকাশজুড়ে। সন্ধের মুখে শুরু হলো মুষলধারে বর্ষণ।

শায়লাভাবীর তাগাদায় ওরা আজ রাতের খাবারটা একটু তাড়াতাড়িই সেরে ফেলল। ভাবী বলছিলেন, একটু পরে নাকি চলে যাবে বিদ্যুৎ। রোজ এসময় যায়।

তা, খাওয়ার আয়োজনটা হয়েছে বেশ। ওরা চারবন্ধু বলতে গেলে সারাদিন অভুক্তই ছিল। সবাই খেল যাকে বলে, একেবারে গাণ্ডেপিণ্ডে। অন্যরাও খেয়েছেন মন্দ না। ...বাড়ি থেকে আনা গাওয়া ঘিয়ের ভুনা খিচুড়ি, পদ্মার ইলিশ ভাজা, হাঁসের ভুনা মাংস, মুচমুচে ভাজা আলু, সাথে আমড়ার আচার। সব মিলিয়ে খাওয়াটা হয়েছে জম্পেশ। এমন ধুম বৃষ্টিতে মেনু হিসেবে খিচুড়িটাই ছিল জুৎসই। খেতে খেতে ভাবীর রান্নার প্রশংসা করেছে সবাই।

ওরা চারবন্ধু। শফিক, সবুজ, সাইফুল, রফিক। বেড়াতে এসেছে, সবুজের চাচাতো ভাই রেজাউলের বাসায়। নিছক বেড়াতেই এসেছে ওরা, তা নয়। পেছনে উদ্দেশ্য আছে। কী উদ্দেশ্য? না, ওরা চারবন্ধু মিলে একটা ক্লাব করেছে। অদ্ভুত কাহিনি সংগ্রহ ক্লাব। সংক্ষেপে 'অকাস' ক্লাব। যত অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য কাহিনি সংগ্রহ এ ক্লাবের কাজ। রেজাউল– রেজাভাইয়ের বন্ধু শ্রীকান্ত ওদের আজ একটা ঘটনা শোনাবেন। তাই শুনতে ওদের রেজাভাইয়ের বাসায় আসা।

ওদের ক্লাব 'অকাস' সম্পর্কে যা জানে, জানে ওদের গ্রামের লোকেরাই। বাইরের কেউ জানলেও, বড়জোর, আশপাশের গ্রামের দু'একজন। তাও ওদের চারজনের সাথে পরিচয়ের সুবাদে। চারবন্ধুর অনেক আত্মীয়-স্বজনই জানে না ওদের ক্লাবের বিষয়ে। জানতেন না রেজাভাইও। লতায় পাতায় কার কাছে যেন শুনে, মোবাইল করেছেন সবুজের কাছে।

'কীরে, সবুজ। শুনলাম তোরা চারবন্ধুতে মিলে নাকি কীসব অদ্ভুত কাহিনি সংগ্রহে নেমেছিস। ক্লাবও না কী যেন আছে তোদের?'

'হ্যাঁ। ক্লাবের নাম "অকাস"। তুমি জানলে কোত্থেকে? জানাল কে?'

'যেই জানাক, জেনেছি। তা তোরা অ্যাদ্দিনেও আমার কাছে এলি না? বড্ড

মিস করেছিসরে!'

'ভাইয়া, তোমারও তেমন কোন অভিজ্ঞতা আছে নাকি? কই, শুনিনি তো কখনও!'

'শুনবি কোত্থেকে? কোন দিন জিজ্ঞেস করেছিলি? তা, আমার না, আমার এক বন্ধুর এমন অভিজ্ঞতা আছে। শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে! ও তাই বলল। অবশ্য, আমি নিজেও শুনিনি। তোরা এলে একসাথে...'

কথা শেষ করতে দেয় না সবুজ। 'ভাইয়া, আমরা চারবন্ধু আগামী শুক্রবার আসছি।' বলে লাইন কেটে দেয়।

সেই কাহিনি শুনতে ওদের আসা।

মফস্বলের শান্ত পরিবেশে রেজাভাইয়ের বাড়িটা বেশ ছিমছাম। ইটের দেয়াল, টিনের চাল। বাড়ির চারপাশে এন্তার গাছপালা। দেখে সবারই বেশ পছন্দ হয়েছে বাড়িটা। রেজাভাই আর শায়লাভাবীর ব্যবহারও অমায়িক। চট্ করে আপন করে নিয়েছেন সবাইকে।

দুই

শায়লাভাবী ড্রইংরুমের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে দিয়েছেন। সবুজরা চারবন্ধু তাতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। রেজাভাই, ওঁর বন্ধু আর শায়লাভাবী বসেছেন সোফায়।

সাইফুল ব্যাটারি-ট্যাটারি ভরে টেপ রেকর্ডার ঠিকঠাক করে নিল। ...সাইফুলের বাংলায় বেশ দখল আছে। সেজন্য সংগৃহীত কাহিনি লিখে রাখার দায়িত্ব ও নিয়েছে। প্রথম প্রথম সাইফুল কারও কাছ থেকে কোন কাহিনি প্রথমে শুনে, পরে বাড়ি গিয়ে গুছিয়ে লিখে নিত। কিন্তু স্মৃতি প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাই এখন রেকর্ড করে নেয়। এতে লিখতে বেশ সুবিধা হয়।

বৃষ্টি থামার বিরাম নেই। বরং আরও বেগবান হয়েছে ধারাপাত। ...ওরা ড্রইংরুমে বসেছে মিনিট দুয়েকও হয়নি, কারেন্ট চলে গেল।

'নাও, গেল কারেন্ট। যাই, মোম নিয়ে আসি।' শায়লা উঠলেন। 'যেমন আবহাওয়া, বাকি রাত আর বিদ্যুৎ আসে কি না...'

মিনিটখানেকের মধ্যে শায়লা মোম নিয়ে ফিরলেন।

বিশাল ড্রইংরুমের জমাট আঁধারে আলো নিয়ে মোমের শিখা কাঁপছে মৃদুমৃদু। রেজাভাই বললেন, 'নাও, শ্রীকান্ত, শুরু করো তোমার গল্প। অবশ্য, তুমি তো বললে, ঠিক গল্প নয়, নাকি তোমার নিজেরই অভিজ্ঞতা।'

'হ্যাঁ, শুনে তোমাদের অবিশ্বাস্য মনে হোক, কিন্তু যা বলব তা একতিলও কল্পনা নয়। সত্য ঘটনা।' বলে, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন শ্রীকান্ত।

পুরো ড্রইংরুম চুপ। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম। সবার দৃষ্টি শ্রীকান্তর মুখে।

'সাইফুল, তোমার রেকর্ডার অন করো,' শ্রীকান্ত শুরু করলেন। 'একটা কথা, যা বলব প্রথমে শুনতে হবে। মাঝে নো কোয়েশ্চেন। যদি কোন প্রশ্ন থাকে শেষে করতে হবে।

'প্রথমে, নিজের সম্পর্কে একটু বলি। ঘটনা বুঝতে সুবিধা হবে। নাম তো জেনেছ সবাই। আমি ধর্মে হিন্দু। বাড়ি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে। ...ছোটবেলা থেকে বেশ সাহসী আমি। বলতে কী ডাকাবুকো বলে গ্রামে বদনামই আছে। গ্রামে লিটন, পরিমল আর আমি যাকে বলে হরিহর আত্মা ছিলাম। মজা হলো তিনজন তিন ধর্মের। লিটন খ্রিস্টান। পরিমল বৌদ্ধ। তবে, বন্ধুত্বে ধর্ম কোন বাধা হয়নি।

'নয় বছর আগের কথা। তখন আমি পড়ি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে। হলে থাকি। ...রোজার বন্ধে বাড়ি যাচ্ছিলাম। পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়াতে মেলা গাড়ি ভাংচুর হলো। আমাদের গাড়ির চালক ভয়ে এগুচ্ছে না। সামনে সার সার গাড়ি থেমে আছে। ...পরিস্থিতি পুরো শান্ত হলে ফের গাড়িতে স্টার্ট দিল চালক।

'স্বাভাবিকভাবে পৌঁছতে দেরি হলো। বেশ রাতে পৌঁছলাম। বাস থেকে পাকা সড়কে নেমে অনেকটা দূরে আমাদের গ্রাম। গ্রামে যাওয়ার কাঁচা রাস্তা আছে। সাধারণত রিকশায়ই যাই বাড়ি। গ্রাম এলাকা। অতরাতে রিকশা না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তায় শীতকাল। তবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। যদি কপালগুণে পেয়ে যাই কোন রিকশা। কেউ কেউ বেশি ভাড়ার লোভে অনেক রাত পর্যন্ত রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ...দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মশার কামড় খেলাম। ...নাহ্, গুড়েবালি। অগত্যা চরণই ভরসা। শুরু করলাম হাঁটা।

'তখন ছিল মাঘ মাস। বলে, মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে। এতক্ষণ ঝোপাল একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে অতটা বুঝিনি। খোলা রাস্তায় কুয়াশার মধ্যে হাঁটতে গিয়ে টের পেলাম কথাটার সত্যতা। শীত যেন কামড়ে ধরল সর্বাঙ্গ। কিছুক্ষণ হাঁটতেই হাত-পা কেমন অসাড় হয়ে আসছিল। চারদিক নির্জন। কুয়াশায় মোড়া। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। ঝিঁঝির ডাকের চেয়ে নিজের দাঁতে দাঁত ঠোকার শব্দই বেশি কানে বাজছিল। কপাল ভাল। চাঁদ ছিল আকাশে। তাই ঘন কুয়াশায়ও পথ দেখা যাচ্ছিল। মাথার উপর চাঁদ, কাঁধে ব্যাগ, সড়ক ধরে হাঁটছি। হাঁটছি। ...হাঁটছি। পথ যেন ফুরায় না। গ্রামের সীমানায় পৌঁছতে রাত তিনটা বেজে গেল। কী মনে করে ঘড়ি দেখেছিলাম। তাই ঠিক সময়টা বলতে পারছি। তা, হাঁটতে হয়েছিল প্রায় মাইল পাঁচেকের মত।

'গ্রামে ঢোকার পথ দুটো। একটা সোজা। সড়ক ধরে। অন্যটা আড়াআড়ি। শ্মশানের ধার ঘেঁষে। সড়ক ধরে গেলে বেশ দেরি হবে। অতটা পথ হেঁটে ক্লান্ত লাগছিল। শীতে তো কাঁপছিই। তাড়াতাড়ি হবে ভেবে সড়ক ছেড়ে আড়াআড়ি পথটাই ধরলাম।

'আর সব শ্মশানের মত আমাদের গ্রামের শ্মশানটারও নানা রটনা ছিল। আগেই বলেছি, স্বভাবে বেশ ডাকাবুকো ছিলাম। তাই শ্মশানটা আমার মনে কোন ভয় জাগাতে পারল না। বলতে কী, বাজি ধরে লিটন, পরিমল, আমি শ্মশানে যে ভাঙা মন্দির আছে তাতে রাতও কাটিয়েছি অনেকদিন।

'যাহোক, হাঁটছি। যতটা জোরে হাঁটা সম্ভব। শ্মশানটার কাছাকাছি হতে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি কী, পথের ধারের বড় তেঁতুল গাছটার তলে...'

'উঃ, মাগো, শ্মশান, তেঁতুল গাছ, তায় অতরাত! কী দেখলেন, দাদা?' শায়লা রেজাউলের কাছটায় একটু সরে আসেন।

বাধা পেয়ে থামলেন শ্রীকান্ত। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। 'তেঁতুল গাছটার কাছাকাছি হতে দেখি,' ফের বলতে শুরু করলেন শ্রীকান্ত, 'কী একটা ঠেস দেয়া গাছটাতে। কিছুটা মানুষের মত মনে হচ্ছিল। তেঁতুলতলাটা ছায়া ছায়া হওয়াতে ঠিক কী ওটা ঠাওর করতে পারছিলাম না। তবে, অভিজ্ঞতায় জানি, অনেকসময় আলো-আঁধারিতে গাছের ডাল বা ওই ধরনের কিছু মানুষের আদল পেয়ে যায়। হয়তো সেরকম কিছু একটা হবে। যে স্থান আর কাল তাতে যেকোন মানুষেরই ভয় পাবার কথা। অমন যে আমি, আমারও একটু একটু ভয় করছিল। অন্যসময় যতবারই শ্মশানে এসেছি, দলবেঁধে এসেছি। আজ তো একা, কিন্তু, তাই বলে এমন ভয়ও পাইনি যে নড়ার শক্তি ছিল না। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে পা বাড়ালাম।

'দু'পা যেতেই তেঁতুলতলাটা যেন একটু নড়ে উঠল।

'"কীরে, শ্রীকান্ত নাকি?" কথা বলে উঠল স্পষ্ট গলায় কেউ। গলা শুনে, মুহূর্তেই উবে গেল সব ভয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'"পরিমল!"

'পরিমলের এই এক বিদঘুটে অভ্যেস। রাত বিরাতে ঘুরতে বের হওয়া। বিশেষত চাঁদনী রাত হলে তো কথাই নেই। সারারাত গ্রামময় ঘুরে বেড়াবে। একারণে গ্রামের অনেকেই ওকে পাগল বলে। তা আমিও মাঝে মাঝে রাতে বেড়িয়েছি ওর সাথে। গ্রামে থাকতে।

'"হ্যাঁরে। আমিই।" আমি সাড়া দিই। "পরিমল না?"

'পরিমল বেরিয়ে এল চাঁদের আলোয়। বলল, "তুই এতরাতে আসছিস কোত্থেকে?"

'"আর বলিস না। পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়াতে দেরি হয়ে গেল। ...তা, তুই ঘুরতে বেরিয়েছিস বুঝি?"

'"দেখছিস না, কেমন থইথই করছে জোছনা। ঘরে বসে থাকা যায়! তুই তো দেখি কাঁপছিস ঠকঠক করে।"

'"কাঁপব না! এতটা পথ হেঁটে এলাম কুয়াশার মধ্যে। যে শীতটা পড়েছে! ...তুই কি এখন বাড়ি যাবি? না আরও ঘুরবি?"

'"বাড়ির কথা ভুলে যা। রাত তো শেষ হয়ে এল প্রায়। একেবারে সকালে গিয়ে নাশতা খেয়ে ঘুম দিস। এখন চল তো আমার সাথে।"

'"কোথায়!" আমি অবাক। "এইরাতে! তুই যাচ্ছিলি, যা। আমি বাড়ি যাব। জমে যাচ্ছি শীতে।"

'"আরে, আয় তো। গেলে শীত পালাবে।"

'পরিমলকে জানি। কোন অজুহাতই খাটবে না। একবার যখন বলেছে, তখন

নেবেই। অগত্যা পিছু নিই ওর।

'আমাকে সাথে নিয়ে পরিমল শ্মশানের ভাঙা মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ায়। মন্দিরের চাতালটা বেশ আলোকিত দেখাচ্ছিল। আলোটা ঠিক চাঁদের না। আরেকটু জোরাল। চাতালে উঠতেই মন্দিরের ভিতরে চোখ গেল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে মন্দিরের ভিতরে। বুঝলাম, তার আলোই এসে পড়েছে বাইরে।

'"আমিই জ্বেলেছি আগুন। পোয়াবি চল।" পরিমল আমার হাত ধরল। চমকে উঠলাম। কুয়াশার মধ্যে হেঁটে এসেছি, আমার হাত-পা তাতে বরফ হয়ে গেছে। পরিমল আমার হাত ধরাতে যেন ঠাণ্ডায় কামড়ে ধরল আমার হাত। না জানি কতক্ষণ ধরে ঘুরছে ও!

'"খামোকা গ্রামের লোক তোকে পাগল বলে। এতরাতে শ্মশানের মন্দিরে আগুন জ্বেলেছিস, পোয়াবি বলে। পারিসও তুই, পরিমল!"

'"অত ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না তো। আয়, ভেতরে আয়।" পরিমল আমাকে টানে।

'মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে অবাক আমি। আগুনটাকে ঘিরে আরও দু'জন লোক বসে আছে। একজনের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। অপরিচিত। অন্যজনকে দেখা যাচ্ছে না। আমার দিকে পেছন ফেরা। বুঝলাম, পরিমল ছাড়াও দুনিয়াতে মেলা পাগল আছে।

'"আয়, বোস। ও হলো সাজ্জাদ। চিনতে পারছিস না বোধহয়। ওকে কিন্তু আমার সাথে দেখেছিস দু'এক দিন।"

'আমি আগুনের কাছে বসে কিছুটা আরাম বোধ করলাম। পরিমল যার মুখ দেখা যাচ্ছিল, তার পরিচয় দিল। অন্যজন আমার পাশে বসা। আলো-আঁধারিতে মুখ দেখা যাচ্ছিল না ভালমত। তবুও, পাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চিনি চিনি। কী জানি হয়তো পরিমলের সাথেই কখনও দেখেছি। একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আগুনে কাঠ বা খড়কুটো কিছু ছিল না। অথচ দাউদাউ করে জ্বলছে। জ্বলছে কীভাবে আগুনটা? তেল জাতীয় কিছু কী...

'"আমাকে কিন্তু তুই চিনিস।"

'পাশের লোকের কণ্ঠ শুনেই আঁতকে উঠেছিলাম। ঘুরে বসতেই চেহারা দেখে ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। শপথ করে বলতে পারি, এর আগে অমন ভয় পাইনি জীবনে। ভয়ে আমার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গেল!

'"লিটন!"

'"হ্যাঁরে, আমি।" লিটন যেন একটু হাসে।

'"তু-তু-তুই!" ভয়ে আমার গলা তখন কাঠ।

'লিটন মারা গেছে বছর দুই আগে। বাসের চাপায়। আমি আর পরিমল দু'জনেই ওর থেঁতলানো শরীর দেখেছি। ...কিন্তু এ কাকে দেখছি এখন আমি! আমি পরিমলের দিকে তাকালাম একবার। মনে পড়ল, ও যখন হাত ধরেছিল আমার, ঠাণ্ডা যেন দাঁত বসিয়েছিল হাতে। কোন জীবিত মানুষের হাত অমন ঠাণ্ডা

হতে পারে! ...আমি চকিতে তিনজনের পেছনে তাকালাম। আগুনে বাধা পেয়ে কারও ছায়াই পড়েনি পেছনে। "পরিমল, তুইও কি...তোরা...তোরা..." আতংকে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল আমার।

'"ঠিকই ধরেছিস," লিটন বলে। "পরিমল আর তোদের জগতে নেই। আমাদের জগতে চলে এসেছে। বেশ কিছুদিন আগে। অনেকদিন বাড়ি আসিস না বলে জানিস না। পরিমলকে সাপে কেটেছিল। ...কিন্তু কী আক্কেল তোর, পরিমল। আর কাউকে পেলি না। খুঁজে শেষে ওকেই নিয়ে এলি। শত হলেও, ও আমাদের বন্ধু ছিল। বেচারা মায়ের একমাত্র সন্তান।" লিটনের গলায় খানিকটা অসন্তোষ।

'আমার মাথা ঠিকমত কাজ করছিল না। দু'জন মৃত মানুষ আমার সামনে কথা বলছে। আমি ওদের দেখতেও পাচ্ছি। কী ব্যাখ্যা এসবের!

'"তোর যেমন কথা। এসময় যেন গণ্ডায় গণ্ডায় লোক আসছে যাচ্ছে। ওকে পেয়েছি সেই কপাল। আর ওকে এনে তো ভালই করেছি। আবার তিনবন্ধু একসাথে," পরিমল বলে।

'"যাকগে। এনেছিস যখন। আবার কবে মাঘী পূর্ণিমা আসবে। এক বছর সময়। ...শোন, শ্রীকান্ত, তোকে সব খুলেই বলি। আমাদের দু'জনের ব্যাপার তো জানিসই। আর ওই সাজ্জাদ, পানিতে ডুবে মরেছে। একা একা নৌকা বাইতে গিয়ে পড়ে যায় নদীতে। সাঁতার জানত না। ...তারমানে দাঁড়াল এই, আমরা তিনজনই পৃথিবীর চোখে মৃত। খেয়াল কর, তিনজনের মৃত্যুই অপঘাতে।"

'"কিন্তু তোদের আমি দেখতে পাচ্ছি কীভাবে?" যেন আমি না, অন্য কেউ কথা বলছে আমার মুখ দিয়ে। "তোরা কথা বলছিস, নড়ছিস..."

'"আমরা দেখা দিয়েছি বলেই দেখছিস," লিটন জবাব দিল। "দেখা দিয়েছি, কারণ তোকে আমাদের দরকার। এই, পরিমল, বাকিটা তুই বল না।"

'"শুরু যখন করেছিস, শেষ কর তুই-ই।"

'"শ্রীকান্ত, নাম শুনেই তো বুঝেছিস, সাজ্জাদ মুসলমান," লিটন বলতে লাগল। "পরিমল বৌদ্ধ, আমি খ্রিস্টান, জানাই তোর। এখন, আমাদের এমন একজনকে দরকার, যার ধর্ম হিন্দু। তা না হলে চক্র হচ্ছিল না।"

'"চক্র।" আমার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল।

'"হ্যাঁ, চক্র। পরিমলের ঠাকুরদা যে শ্রমণ ছিলেন জানিসই তো। বুড়ো মেলা শাস্ত্র পড়েছিলেন জীবনে। আমরা তো এখন তাঁরই জগতে। সবাই-ই। একদিন ঠাকুরদার সাথে দেখা আমার। না, এমনি এমনি দেখা হয়নি। কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বিস্তর। মৃতরা ইচ্ছে করলেই যে একজন আরেকজনের সাথে দেখা করতে পারে তা কিন্তু নয়। আমাদেরও অনেক নিয়ম-নিষেধ আছে। যাকগে, ওসব জেনে তোর কাজ নেই। আসল কথা বলি। ঠাকুরদা বললেন, কোন প্রাচীন শাস্ত্র ঘেঁটে নাকি এমন এক মন্ত্র পেয়েছিলেন, মরার পরেও যা পড়ে ফের মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ফেরা যাবে। মন্ত্রটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারেননি। বয়স ছিল না বলে। নাকি মন্ত্রের নিয়মমতে তারাই ফের ফিরে যেতে পারবে পৃথিবীতে, যারা

জীবনটা ভোগ করেনি। যারা পঁচিশ বছর হওয়ার আগেই মারা গেছে। ঠাকুরদা মন্ত্রটা বলেছেন আমাকে। মন্ত্রটা পড়ার উপযুক্ত আমরা সবাই। আমরা তো পঁচিশের আগেই মারা গেছি। তোরও এখনও পঁচিশ বছর হয়নি। ...মজা কি জানিস, পৃথিবীর আর দশটা মানুষের মতই দেখাবে তোকে। সবার সাথে হাঁটবি, চলবি। কেউ আলাদা করে চিনতে পারবে না তোকে। আর বাড়তি কিছু ক্ষমতাও পেয়ে যাবি তুই। যেমন ধর, মানুষের মনের কথা বুঝতে পারবি। যখন ইচ্ছা অদৃশ্য হতে পারবি, যেকোন প্রাণীর রূপ ধরতে পারবি, বাতাসের গতিতে চলতে পারবি, আরও অনেক কিছু। তবে, হ্যাঁ, অমর যে হবি তা নয়। আবার ঠাকুরদার জগতে ফিরতে হবে তোকে। পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পার করে। সে সময়টা বেশ লম্বা। বে-শ।"

'"সাতকাহন বাদ দিয়ে আসল কথা বল," সাজ্জাদ বলে। "রাত তো শেষ হয়ে এল। সকাল হলে শক্তি হারাব আমরা।"

'"হ্যাঁ, বলছি।" লিটন আমার দিকে তাকায়। "তা বিশেষ একটা পূর্ণিমা ছাড়া চক্রটা সম্পূর্ণ হবে না। মন্ত্রটাও পড়া যাবে না। আজ সেই পূর্ণিমা। সন্ধে থেকে পঁচিশের নীচে বয়স এমন কাউকে খুঁজছি। সৌভাগ্যই বলতে হয় আমাদের। তোকে পেলাম। ঠাকুরদা বলেছেন, মন্ত্রটা পড়তে হবে চার ধর্মের চারজন মিলে। তিন ধর্ম তো ছিলই। হিন্দু ছাড়া। তা তোকে পেয়ে সে সমস্যা মিটল। এখন সবাই মিলে ওই মন্ত্রটা পড়লেই কেল্লা ফতে। ...তবে কোন জীবিত মানুষের পক্ষে এই চক্রে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। এদিকে আবার মৃতদেরও মরতে হবে অপঘাতে। ...আমরা তিনজন তো আছিই। এখন তোকে হলেই..."

'স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কী বলতে চাচ্ছে লিটন। বলতে চাইলাম, আমি তো জীবিত। কিন্তু শব্দ বেরুল না গলা দিয়ে।

'"সেটা কোন সমস্যা নয়," ও বলল। বুঝলাম, মনে মনে ভাবলেই ও আমার কথা বুঝতে পারছে।

'"এই যে আগুন দেখছিস," লিটন আগুনের দিকে ইশারা করে। "এ আগুন তোদের জগতের কাঠখড়ে পোড়ানো আগুন নয়। আমাদের জগতের আগুন। এর ভেতর পৃথিবীর কোন জীবিত প্রাণী পড়লে সরাসরি আমাদের জগতে চলে আসবে। মুহূর্তেই।"

'বুঝতে পারছি ভয়ে সাদা হয়ে গেছি আমি। বার বার মায়ের মুখটা মনে পড়ছিল। ওদের দিকে তাকালাম একবার। তিনজনে বেশ দূরে দূরে বসে আছে। আমার পেছনেই মন্দিরের দরজা। ঘুরে দৌড় দেব, ভাবলাম একবার।

'"কোন লাভ হবে না।" লিটন হাসে। "পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ। একটা বৃত্তের মধ্যে আছিস তুই।"

'লিটনের কথায় পায়ের দিকে তাকাই। সত্যি, হাড়গোড় দিয়ে বানানো একটা বৃত্তের মধ্যে রয়েছি আমি। প্রথমে তো বৃত্তটা চোখে পড়েনি। নাকি ছিলই না? নাহ্, মাথাটা ঠিক কাজ করছে না। কোন পথ না পেয়ে অনুনয় করলাম। অবশ্য মনে মনেই। তখন ঠোঁট নাড়ানোর শক্তিও নেই আমার। তোদের পায়ে পড়ি,

লিটন। ছেড়ে দে আমাকে। মায়ের আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

'"পাগল! তা কি আর হয়! ছাড়লে আর এত কথা বলি তোকে। তবে, ভাবিস না। তোর মা তো আর জানে না যে, আজ ফিরছিস তুই। চক্রের কাজটা হয়ে গেলে তুই তোর মায়ের কাছে ফিরে যাস। মাত্র তিনটা দিন লাগবে চক্র শেষ হতে। তোর মা বুঝতেই পারবে না যে, তুই আর তুই নেই। ...একটাই আফসোস, তোর মত আমরা স্বাভাবিক ভাবে পরিচিতদের মাঝে ফিরতে পারব না।"

'"দূর। কত বকবক করছিস। লগ্ন যায়।" বলতে বলতে সাজ্জাদ উঠে দাঁড়ায়। দেখাদেখি অন্য দু'জনও ওঠে। তারপর তিনজনে হাত ধরাধরি করে আমাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।'

থামলেন শ্রীকান্ত। একটানা অনেকক্ষণ বলে।

বিদ্যুৎ এল এই সময়। মোম কখন গলে নিঃশেষ হয়েছে। বাইরে বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে। আলোতে ঘর ভরে উঠতেই সবাই নড়েচড়ে বসে। প্রথম কথা বলেন শ্রীকান্তই।

'একটু চা হলে ভাল হত, ভাবী। চা খেয়ে ব্যকিটা বলি। সাইফুল, কিছুক্ষণ তোমার রেকর্ডার বন্ধ রাখো।'

'বাব্বা, কী গল্প শোনাচ্ছেন, ভাই।' শায়লা উঠলেন। 'একা একা রান্নাঘরে যেতে তো ভয়ই লাগছে। ...এই, সবুজ, একটু সাথে এসো না, ভাই।'

শ্রীকান্ত মৃদু হাসলেন।

সবুজ ভাবীর সাথে গেল।

'ভাবী, অন্ধকারেই গল্পটা ভাল লাগছিল। আলোটা অফ করে দিলে হয় না?' সাইফুল বলে, চা শেষ করে।

'তা, মন্দ বলেনি সাইফুল। অন্ধকারে আমরাও যেন শ্রীকান্তর সাথে মন্দিরে ছিলাম,' রেজাভাই বলেন। 'শায়লা, আলোটা বরং নিভিয়েই দাও। ...তোমার কোন আপত্তি নেই তো, শ্রীকান্ত?'

'বিন্দুমাত্র না।'

শায়লা লাইট অফ করলেন।

সাইফুল রেকর্ডার অন করল।

তিন

'ওরা তিনজন ঘুরছে, হাত ধরাধরি করে। আমাকে আর আগুনকে ঘিরে।' শ্রীকান্ত সবাইকে ফের শ্মশানের ভাঙা মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

'ধীরে ধীরে ওরা আমাকে ঠেলছে আগুনের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আগুনে ফেলে দেয়া হবে আমাকে। আমাকে ঘিরে ওদের বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হচ্ছে... ছোট হচ্ছে। অমন মাঘের শীতেও দরদর করে ঘামছি আমি। ওদের বৃত্ত

আরও ছোট হলো। ...আরও। আমার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগছে। ...হঠাৎ সমস্ত চরাচরের স্তব্ধতা খানখান করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল তিনজনে। সমস্ত শ্মশান কেঁপে উঠল ওদের হাসিতে। পাখিদের চিৎকার শুনে বুঝলাম ওরা নীড় ছেড়ে পালাচ্ছে। ...কিছুক্ষণ পর দেখি ওদের শরীর থেকে মাংস খসে খসে পড়ছে। ভয় পাবার বোধ আমার অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। ...আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখতে দেখতে ওদের শরীরের সমস্ত মাংস খসে পড়ল। ...সাদা, ঝকঝকে কঙ্কাল হয়ে গেল তিনজনে। ওদের মাংসহীন চোয়ালে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। বিকট হাসির শব্দ পাচ্ছি তখনও। ...আমার শরীর বিবশ হয়ে আসছে। ...আচমকা হাসতে হাসতে তিনটা কঙ্কাল আমাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনে।'

'আগুনে!' হঠাৎ চাপাস্বরে চিৎকার করে উঠল রফিক। 'তারমানে আপনি এখন ...আপনি এখন...'

'না, না, ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি আগুনে পুড়ে মরিনি। সবটা আগে শোনো। ...প্রথমেই কিন্তু বলেছিলাম, সবটা না শুনে কোন কথা বলবে না। ...তিন কঙ্কাল মিলে যখন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঠিক তখনই শুনতে পেলাম গ্রামের মসজিদে ফজরের আযান হচ্ছে। সাজ্জাদ ঠিকই তাড়া দিয়েছিল। সময় যায়। ...তেমন কিছু হয়নি আমার। কপালটা একটু কেটে গিয়েছিল, এই যা। ...জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আতংকে না আঘাতে ঠিক মনে নেই।

'জ্ঞান ফিরতে দেখি, বেশ সকাল হয়ে গেছে। গাছের ডালে পাখি ডাকছে কিচিরমিচির। কোথায় পরিমলরা, কোথায় আগুন, কোথায়ই বা হাড়ের বৃত্ত। ধুলো মলিন মন্দিরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। সন্দেহ হলো, যা ঘটল বাস্তব? নাকি স্বপ্ন? কপালে হাত ঠেকাতে রক্ত লাগল হাতে। নাহ্, নিশ্চিত হলাম। যা ঘটেছে, সত্যই।'

থামলেন শ্রীকান্ত।

চার

'ও, তাই বলুন।' শায়লা অন্ধকারে হাতড়ে লাইট জ্বাললেন। 'শীতের হাত থেকে বাঁচতে আপনি মন্দিরে ঢুকেছিলেন। ...ওসব নিশ্চয়ই ঘুমের মাঝে স্বপ্নে ঘটেছে। বাব্বা, দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় তো বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম।'

'আগেই তো বলেছি, বিশ্বাস করা না করা... তবে যা বলেছি সত্যিই বলেছি। কারণ আরও একবার ওরা...' কথা শেষ করলেন না শ্রীকান্ত। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। 'যাকগে, বড্ড ঘুম পেয়েছে, ভাবী। কোথায় শোব, দেখিয়ে দিন। ...কারও কিছু জানার থাকলে সকালে জেনো।'

সাঈদ আজাদ

আমাদের ভূগোল বইতে আফ্রিকা

আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হত 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ'। আঁধার মহাদেশ।

ডার্ক কন্টিনেন্ট।

পড়ার বইয়ে মজার কিছু থাকে না। চিরকালই এটাই নিয়ম। তারপরও, স্কুলের পাঠ্যবইয়েই প্রথম আমি চিনি আফ্রিকা মহাদেশকে। এবং প্রেমে পড়ে যাই। আমাদের একঘেয়ে, চাঞ্চল্যহীন জীবনে আফ্রিকা জায়গাটা আমার পাঠ্যবইয়ের ভূগোল পাঠ কিংবা মানচিত্রেই আটকে না থেকে এক লাফে আমার মাথায় চেপে বসে।

ইস! কী অ্যাডভেঞ্চারঅলা জায়গা!

গহীন অরণ্য।

শ্বাপদ-সঙ্কুল।

সিংহ।

বিষধর ব্ল্যাক মাম্বা।

কিলিমানযারো পর্বত।

কঙ্গো।

পিগমি।

বাদুড়ের গুহা।

ওহ!

মনে আছে–আমাদের স্যার যেদিন আফ্রিকা অধ্যায়টি পড়াতে শুরু করলেন ক্লাসে, সেদিন যথারীতি আমি বন্ধু ফরিদের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে কাটা-গোল্লা খেলছিলাম। স্যার বোর্ডে বড় করে লিখলেন, 'আফ্রিকা'। আমি আড়চোখে চাইলাম ওদিকে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা টেলিভিশনে টারজান দেখেছ?' বিরক্তিকর স্যারের কথায় আমরা নড়েচড়ে বসলাম। সবাই হইচই করে বললাম, 'দেখেছি, স্যার, দেখেছি।' টারজানের কথায় আমরা উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম কারণ তখন সাদা-কালো টেলিভিশনে টারজান দেখানো হয়। ওই টারজান কী সাহসী। কী লড়াইটাই না করে সিংহের সাথে, কুমিরের সাথে। কত মজার কাণ্ডই না করে পোষা বানর 'চিতা'র সাথে। পানির গভীরে ডুব দিয়ে থাকতে পারে বহুক্ষণ। বুকে হাত মেরে চিৎকার করে ডাকে: আ-আ-আ-আ। টারজানের বান্ধবী জেন-কে দেখে ওই বালক বয়সেও ঈর্ষাকাতর হতাম আমরা। কী ভীষণ সুন্দরী একটা মেয়ে। আমাদের ওই ছোট্ট জগতে টারজানের অ্যাডভেঞ্চার, হিংস্র কুমির, আর জেনের উদোম উরু ছিল রীতিমত রোমাঞ্চকর। তাই স্যারের মুখে টারজানের

নাম শুনে নড়েচড়ে বসেছিলাম আমরা সবাই। ফরিদকে ফিস্ফিসিয়ে বলেছিলাম: 'কাটা-গোল্লা পরে খেলব। স্যর কী বলেন, শুনি একটু।' স্যর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেউ টারজান অ্যাণ্ড দ্য এপম্যান সিনেমাটা দেখেছ?' আমি দেখিনি—তবে ক্লাসের দু'জন হাত তুলল। আমি ভাবছিলাম—টারজানের সাথে আফ্রিকার সম্পর্ক কী? স্যরই বললেন, 'আমি টারজানের কথা তুললাম কারণ টারজানের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে আফ্রিকার অরণ্যকে কেন্দ্র করে।' আমরা সবাই বুঝলাম টারজানের প্রসঙ্গটি স্যর টেনে এনেছেন যেন আমরা পড়ায় মনোযোগী হই। এটা বুঝতে পেরে প্রায় সবাই একটু হতাশ হলো, তবে আমি—কেন জানি না, আগ্রহ ধরে রেখে স্যরের কথা শুনতে লাগলাম।

জানলাম, এশিয়ার পর আফ্রিকাই দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।

এখানেই আছে দুনিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ নীল নদ।

আছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মরুভূমি—সাহারা।

লেক ভিক্টোরিয়া সবচেয়ে বড় হ্রদ—যার আয়তন প্রায় সাতাশ হাজার বর্গমাইল; অর্থাৎ এমন দুটি হ্রদ মেলালেই সেটা হয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশের সমান।

এই মহাদেশে আছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি।

আছে গহন অরণ্য।

আছে বিশাল তৃণভূমি—সাভানা।

এত বিচিত্র জীবজন্তু আর কোথাও নেই এই দুনিয়ায়। জেব্রা, সিংহ, অ্যান্টিলোপ, জিরাফ, জলহস্তী, গরিলা—কী নেই এখানে?

ব্যস, আমি প্রেমে পড়ে গেলাম আফ্রিকার।

আমি খুব কষ্ট করে ভিসিআর ভাড়া করে টারজানের সিনেমাগুলোর ভিডিও জোগাড় করলাম। বালক বয়সে বিষয়টা যথেষ্ট জটিল ছিল আমার জন্য। স্টেডিয়াম মার্কেটের দোতলায় অনেক খুঁজে সন্ধান পেলাম টারজানের পাঁচটি সিনেমা। দীর্ঘদিন টিফিনের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে, ঈদের সেলামি জোগাড় করে কিনেছিলাম সিনেমাগুলো।

টারজান অ্যাণ্ড দ্য এপম্যান।

টারজান'স সিক্রেট ট্রেজার।

টারজান অ্যাণ্ড দ্য হান্টার্স।

টারজান অ্যাণ্ড দ্য অ্যামাজনস্।

টারজান অ্যাণ্ড হিজ্ মেট।

সিনেমাগুলো কোহিনূর হীরার চেয়ে কম মূল্যবান ছিল না আমার জন্য। বাবা যখন বাসায় থাকত না তখন মা-কে পাঠিয়ে ভিসিআর ভাড়া করে এনে সিনেমাগুলো যে কতবার দেখেছিলাম আমি—তার ইয়ত্তা নেই।

ইংরেজি বুঝতাম না বেশিরভাগই।

তবে সহজ-সরল গল্পগুলো বুঝতে অসুবিধা হত না। যেটুকু বুঝতাম না সেটুকু নিজের মত করে কল্পনা করে নিতাম।

তবে সিনেমার গল্পের চে' আমাকে বেশি টানত সিনেমায় দেখানো আফ্রিকা।
উঁচু, খুব উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে জঙ্গল।
তার মাঝে বাঁকা নদী।
নদীর শেষ প্রান্তে বিপজ্জনক বাঁক।
হিংস্র নরখাদক জংলী।
গহীন অরণ্যের গুহায় লুকানো গুপ্তধন।
বিশাল কুমিরের লেজের ঝটকানি।
লতা ছড়ানো অনেক উঁচু সব গাছ।
সাভানা জুড়ে দৌড়ে বেড়ানো জিরাফ-দল।
শহর থেকে আসা নিষ্ঠুর শিকারি দল।
অর্ধ-উলঙ্গ জংলী মেয়ে।
জংলীদের মাতাল করা একঘেয়ে সুর।

এইসব, এইসব রোমাঞ্চ, এইসব আদিমতা আমাকে কেমন যেন মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল। আমাকে টারজান যতটুকু টানত, তার চেয়ে বেশি টানত আফ্রিকা।

আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের বিষণ্ন, একঘেয়ে, ঘুপচি ঘরের এককোণে আমার জন্য বরাদ্দ ছোট্ট একখানা খাট আর লাগোয়া টেবিলের মাঝে যখন হাঁফ ধরত আমার, তখন মন খারাপ করা ছুটির দিনের দুপুরগুলোয় আমি বেড়াতে যেতাম আফ্রিকায়—মনে মনে।

কখনও নিজেকে মনে হত শিকারি।
কখনও হতাম জংলী দলের নেতা।
কখনও জঙ্গলের ওঝা।
কখনও বা খোদ টারজান।

আফ্রিকা নামটা আমার জানালাবিহীন ঘরটার জন্য হয়ে উঠেছিল একটা ছোট্ট খোলা জানালা।

এমন এক আফ্রিকাময়-কালে স্কুলের সামনের 'সবুজ লাইব্রেরি'তে পেলাম ইন্দ্রজাল কমিকস্। বিদেশি ফ্যান্টম সিরিজের বাংলা বেরোত ওই সিরিজে। ফ্যান্টম-এর বাংলা নাম ছিল 'বেতাল' কিংবা 'অরণ্যদেব'। আফ্রিকার বাঙ্গালা অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত এক গহন অরণ্যে বাস করা বেগুনি পোশাক আর মুখোশ আঁটা অরণ্যদেবের গা শিউরানো কমিকস্গুলোয় আমি রীতিমত ঢুকে যেতাম। মনে আছে বেতাল সিরিজে আমার পড়া প্রথম কমিকস্-এর শুরুটা:

'পশ্চিম উপকূলের ময়িতান আর
পুবদিকে রহস্যঘেরা পাহাড়ের
মাঝখানে সভ্যতার আড়ালে ১০০০
মাইল জুড়ে জঙ্গল...পৃথিবীর শেষ
অনাবিষ্কৃত জায়গা...মাঝখানে...

এক নিষিদ্ধ এলাকা...প্যাগুরদের
বাসভূমি...বিষাক্ত তীরধারী পিগমি...
আর বেতাল...চলমান অশরীরীর স্থান।'

আহ! আমার আফ্রিকার কী অসামান্য বর্ণনাই ছিল ওই কমিকস্গুলো। বেতালের শক্তি, রহস্যময়তা, বেতালের প্রেমিক ডায়না পামারের সংক্ষিপ্ত বিকিনি, আর চারদিকে ঘন-নিবিড়-গহন অরণ্য আমাকে মাতাল করে দিত রীতিমত।

শুধু কি আফ্রিকার অরণ্য? আফ্রিকার শহরগুলোর প্রাণ, উত্তাপ আমি টের পাই হঠাৎ করেই। হঠাৎ করে একদিন হাতে আসে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'ঘনাদা' সিরিজ। ঘনাদা বিস্ময়কর চরিত্র। ঘনাদা থাকতেন মেসে, আর বলতেন তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য সব গল্প। সেই সব গল্পে হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি। তাঁর 'ছুঁচ' গল্পের আফ্রিকার ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবার অবিশ্বাস্য সুন্দর মায়াবী বর্ণনাটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন:

'শহরের সবচেয়ে যা আমার ভাল লাগে, তা সেখানকার গন্ধ। পৃথিবীর ছোট বড় আর কোনও শহরের অমন অপরূপ গন্ধ আছে বলে জানি না। গন্ধটা পোড়া ইউক্যালিপটাস কাঠের। সমস্ত হাবশি জাতিদের যিনি এক রাজছত্রতলে মিলিয়েছিলেন, সেই নেগুস নাগাস্তি দ্বিতীয় মেনেলিক সর্বত্র ইউক্যালিপটাস গাছ পুঁতেছিলেন। সে গাছ এত বেড়েছে যে, লোকেরা ইউক্যালিপটাস জ্বালানি কাঠ হিসেবে পোড়ায়। শহরের হাওয়ায় তাই একটা মিষ্টি পরীদের গায়ের মত সুবাস সারাক্ষণ ভাসছে। রাতে সে গন্ধটা আরও মন মাতানো।'

ঘনাদার গল্পের অবিশ্বাস্য সুন্দর এই বর্ণনাটা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ওই তেল চিটচিটে বালিশের গন্ধটা ছাপিয়ে চারদিক ভরে উঠেছিল আমার কখনও না-শোঁকা ইউক্যালিপটাসের পোড়া গন্ধ।

ইউক্যালিপটাসের গন্ধের ভীষণ মায়াবী বর্ণনাটার পরই ছিল ভয় ধরানো ক'টা লাইন। ওতে বলা ছিল আদ্দিস আবাবায় শুধু ইউক্যালিপটাসের সুবাসই ছিল না, শহরটা ছিল ভয়ঙ্করও:

'...পথে-ঘাটে সারারাত হায়েনারা চরে বেড়ায়। আশপাশের পাহাড় থেকে তারা নেমে আসে, আবার ভোর হতে-না-হতে ফিরে যায়। জ্যান্ত মানুষকে সাধারণত তারা এড়িয়ে চলে, তবে দুনিয়ায় অমন ছিঁচকে শয়তান জানোয়ার আর দুটি নেই। বেকায়দায় পেলে তারা সব করতে পারে। কোনওরকমে জখম অসহায় পেলে জ্যান্ত মানুষের মাংস তারা খুবলে খেতে পারে।'

ওহ! আমার আফ্রিকা!
কী ভয়ঙ্কর! কী সুন্দর!

ওই সময়ই হাতে এসেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়। কী যে

অবিশ্বাস্য সুন্দর বই! কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে বেরোনো সত্যজিৎ রায়-এর প্রচ্ছদ শ্যামলকৃষ্ণ বসুর ছবিতে কী জীবন্তই না হয়ে উঠেছিল বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় গল্প। আমারই মত সাধারণ এক ছেলে শংকর কেমন করে পূর্ব-আফ্রিকার উগাণ্ডায় নতুন রেলওয়ে লাইন তৈরির কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে পাড়ি জমাল ভয়ঙ্কর আফ্রিকায় তার নিপুণ ছবিটা আমার মনে গাঁথা হয়ে যায়। উপন্যাসের নায়ক শংকর যেমন জার্মান পর্যটক অ্যান্টন হাউপ্টম্যানের মত করে 'চাঁদের পাহাড়' মাউন্টেন অভ দ্য মুন জয় করতে যাবার স্বপ্ন দেখেছিল, তেমন স্বপ্ন দেখতাম আমিও।

বইতে শংকরের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল। শংকরের অভিজ্ঞতার কী অসামান্য বর্ণনা করেছিলেন বিভূতিভূষণ:

'রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে-প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক একদিন গভীর রাতে দূরে কোথাও সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়–অদ্ভুত জীবন! ...এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা–এই তো জীবন।'

ভয়ঙ্কর সুন্দরের আরও সব অবিশ্বাস্য বিবরণী ছিল ওই বইতে। আমি মুগ্ধ হয়ে, মোহাবিষ্ট হয়ে, একচিলতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন ভুলে শংকরের সাথে চলে গিয়েছিলাম দূর আফ্রিকায়:

'ওখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে–সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে–বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার উপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়েই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা। বাতাস বইবে তারও শব্দ নেই, পাখির কূজন নেই সে বনে–মানুষের গলার সুর নেই, কোনও জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোনও অন্ধকার নরকে দীর্ঘ শ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা!'

তখনও, অর্থাৎ আমার বালকবেলা থেকে কিশোরবেলা পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক কিছুই ছিল অজানা, অধরা। তখনও ইন্টারনেট আসেনি। আসেনি কেবল টেলিভিশনের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারির মত, চ্যানেল। দৈনিক পত্রিকাগুলোও নিতান্ত সাদাকালো খবরে পরিপূর্ণ, তাতে আজকের মত নানান বিচিত্র ফিচার তখনও অনুপস্থিত। পরিচিতজনেরা বিদেশে যায় কালেভদ্রে–বিদেশগামীদের তখনও ধরা হয় বিশেষ সৌভাগ্যবান।

তো, ওই সময়, সব অদেখা-অধরার মতই আফ্রিকা আমার কাছে হাজির হয়েছিল অনেক বেশি রহস্যময় আর আকর্ষণীয় হয়ে।

একটু বড় হলে আস্তে আস্তে বুঝতে শিখি যে আফ্রিকার যে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' এবং 'ভয়ঙ্কর' ইমেজ—তার অনেকটাই কল্পনাপ্রসূত। বিশেষত ইউরোপিয়ানদের দ্বারা অনুন্নত আফ্রিকানদের শোষণ করবার জন্য এমন নানারকম অলীক গল্প ছড়ানো হয়েছিল। এই জ্ঞান আমার ফ্যান্টাসি—স্বপ্নকে খানিকটা ফিকে করে দেয় সত্যি, কিন্তু বালকবেলার সেই ফ্যান্টাসি আমাকে ছাড়ে না। চাঁদের পাহাড় উপন্যাসের নায়ক শংকরের মত আফ্রিকা যাবার কোনও সুযোগ ঘটে না আমার পরবর্তী জীবনেও। আর দশটা মধ্যবিত্ত যুবকের মত ন'টা-পাঁচটা অফিস জীবনেই বন্দি হতে হয়। তারপরও, অফিসের চাপ আর ভিড় বাসের মাঝে এখনও আফ্রিকা মাঝে-মধ্যেই আমাকে হাতছানি দেয়।

সেই ডোরাকাটা জেব্রা।

নরমাংসভোজী জংলী।

গহীন-নিঃশব্দ অরণ্য।

হীরের খনির অভিযান।

পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি চাদর।

হিংস্র সিংহ।

অসভ্য-উলঙ্গ রমণী।

চিতাবাঘ।

শিকার।

এইসব মিলিয়ে-মিশিয়ে, আমার অবচেতনে থাকে আফ্রিকা।

আমার আফ্রিকা।

আমার একান্ত-আপন, নিজস্ব আফ্রিকা।

আমাদের এই ক্লান্ত বিষণ্ণ নগরীর ধোঁয়া, একঘেয়ে-কমবেতনের চাকরি, বাস যাত্রীদের ঘামের দুর্গন্ধ, ছোট্ট ঘুপচি রুম, বাসায় লেগে থাকা ঝগড়াঝাঁটি—এইসব মিলিয়ে আমার জীবন থেকে আফ্রিকা হারিয়েই যাচ্ছিল, যদি না হঠাৎ করে হাজির হত তামান্না খান।

তা-মা-ন্না খা-ন।

আহ্!

তামান্না খান আমাদের অফিসে যোগ দেয় মে মাসে। পয়লা মে সরকারি ছুটি ছিল বলে ও অফিসে প্রথম আসে দোসরা মে। ওকে দেখামাত্র ভেবেছিলাম আমি—কেন যে পয়লা মে ছুটি থাকে? ছুটি না থাকলে অন্তত একদিন আগে দেখা পেতাম ওর!

আমার চে' কমবয়সী হয়েও আমার চে' সিনিয়র পদে যোগ দেয়ায় কোথায় ঈর্ষাকাতর হব আমি—তা না, ভাবি, মেয়েটার উচিত ছিল আমাদের কোম্পানির ম্যানেজার হওয়া।

কাঁচের দরজাটা ঠেলে যেদিন প্রথম অফিসে আসে তামান্না, সেদিন হঠাৎ করে, হঠাৎ দীর্ঘদিন পর আমাদের অফিসটার রুক্ষতা আর ধূসরের মাঝে যেন

প্রবেশ করে একটুকরো আফ্রিকা।
বন্য আফ্রিকা।
সবুজ আফ্রিকা।
অন্ধকার আফ্রিকা।
মাতাল আফ্রিকা।
তখনও ওর নাম জানতাম না আমি। শুধু দেখেছিলাম–
তামা-তামা গায়ের রং।
পিঠ পর্যন্ত খোলা চুল।
বড় বড় একজোড়া গাঢ় করে কাজল দেয়া গভীর চোখ।
লম্বা।
কোমরে বিপজ্জনক খাদ।
বুকের তুলনায় ভারি নিতম্ব।
গোল গলার কামিজে বুকের কাছে জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম।
খাটো সালোয়ারের কারণে বেরিয়ে থাকা একটু পা। গোড়ালির নীচে ঝুলে থাকা রুপোর নূপুর।
হাতে মোটা বালা।
কানে ঝুলে থাকা ত্রিভুজাকৃতি দুল।
লম্বা আঙুলের একটিতে চকচকে লাল আংটি।
মোটা ঠোঁটে ধূসর লিপস্টিক।
হাত আর পায়ের নখে ধূসর নেইলপলিশ। আর?
আর, সবুজ, ঘন সবুজ রঙের চাপা সালোয়ার কামিজের সাথে হাতে জেব্রা ডোরাকাটা একটা হাতব্যাগ।
যেন আফ্রিকার বনভূমিতে একটা জেব্রা!
আহ্!
তখনও যেহেতু ওর নাম জানতাম না আমি–তাই মনে মনে ওর নাম দিয়ে ফেললাম আমি–আফ্রিকা কন্যা!
আমার বিবর্ণ অফিস জীবনে আফ্রিকা এল।
আমার মনেও এল আফ্রিকা।
আফ্রিকা কন্যা।
পরে, আমাদের ডিএমডি স্যার সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তামান্নার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স শেষে জার্মানীতে এমবিএ করে একবছর চাকরি করে জয়েন করেছে এখানে। ওর বাবা ঢাকার বড় ব্যবসায়ী।
আমাদের অফিসের অন্য অবিবাহিত ছেলেগুলোর মুখ দেখেই বুঝে গেলাম–ওরা হতাশ। কারণ ওরা বুঝে গেছে যে ওদের তুলনায় মেয়েটার অবস্থান অনেক উঁচুতে। অর্থাৎ ক্ষুধা মেটানোর কোনও পথ নেই! কে না জানে, আজকাল বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার স্বপ্ন শুধু রূপকথা আর সিনেমাতেই থাকে, বাস্তবে নয়।

আমিও তেমনটা ভাবছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ পরিচয় পর্ব শেষে আমার কম্পিউটারের স্ক্রিনে ওয়ালপেপারের ছবিটা দেখে তামান্না বলে উঠল–বাহ্, কী সুন্দর একটা পাহাড়। কোথায় ওটা? রাঙ্গামাটি?

কী গভীর কণ্ঠস্বর!

কী গভীর!

আমি কোনওমতে জবাব দিলাম, 'না, ওটা আফ্রিকার ছবি।'

'গেছেন আপনি ওখানে?'

থতমত খেয়ে বললাম আমি, 'না না, ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছি।'

'ও, খুব সুন্দর ছবিটা।'

'তুমিও,' মনে মনে বলি আমি।

'আমাকে ছবিটা দেবেন, প্লিজ, আমার ওয়ালপেপারের ছবির কালেকশনে রাখব?'

'অবশ্যই দেব,' মুখে মুখে বলি আমি। আর মনে মনে বলি, 'এটা কেন, যা চাও–তাই দেব।'

এমন করে আর কোনও মেয়ে কখনও টানেনি আমাকে।

যাদেরকে ভাল লেগেছিল–তারা অনেক দূরের মানুষ; সিনেমার নায়িকা; অন্তর্বাসের মডেল; টিভির অভিনেত্রী।

এই প্রথম একজন, এত কাছে!

এত কাছে আফ্রিকা, এই প্রথম।

দিন যায়।

আমি টের পাই অফিসের ক্ষুধার্ত পুরুষেরা তামান্নাকে নিয়ে নানান সরস ফ্যান্টাসির চর্চা করে। অন্য সময় হলে হয়তো ওখানে যোগ দিতাম আমিও, কিন্তু এবার, আমি কোনওমতেই ওই আলোচনায় থাকতে পারি না। বরঞ্চ, ওই আলোচনা বিরক্তি ধরায় আমার মধ্যে।

তামান্নাকে নিয়ে ভাবব আমি।

ওকে নিয়ে আফ্রিকার স্বপ্ন দেখব–আমি একা।

অন্যরা সেখানে নাক গলাবে কেন?

মনে মনে যাই ভাবি না কেন, আসলে তামান্না আর আমি দূরে দূরেই থাকতাম। বয়সে আমার চে' কম হলেও পদে আমার চে' বড়–তাই স্বভাবতই, ওকে ডাকতাম 'আপনি' এবং 'ম্যাডাম' বলে। কেউ জানত না, ওকে নিয়ে আমি ভাবি। কেউ জানত না, আমার কাছে তামান্না মানেই ছিল আমার বন্য আফ্রিকা। আমার স্বপ্ন।

একদিন একটা কাজে আমার ডেস্কে এসেছিল তামান্না। বলল, 'ভাল আছেন?'

'জী,' কোনওমতে বলেছিলাম আমি।

'আপনার কম্পিউটারে কি প্রাইম ইন্সুরেন্সের কনট্রাক্টটা আছে?'

'আছে। প্রিন্ট দেব একটা?'

'না, প্রিন্টের দরকার নেই। আপনি ওটা খুলুন–আমি শুধু একটা ইনফরমেশন দেখব।'

আমি ফাইলটা যখন খুলছি তখন তামান্না আমার চেয়ারের পিছে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে কম্পিউটারের দিকে মুখ করে।

কী অবিশ্বাস্য মাদকতা ওর গন্ধে!

কী রকম গাছ-গাছ, গভীর সুগন্ধ!

ওর খোলা চুলের একটা গোছা ওর অজান্তেই আমার ঘাড়ের কাছে নেমে আসে। কেন যেন মনে হয়, আফ্রিকার খুব উঁচু কোনও গাছের লতা নেমে এসেছে আমার শরীরে। শিরশিরিয়ে ওঠে গা।

আচ্ছা, আলতো করে, খুব আলতো করে ওর বুকটা কি লাগল না আমার মাথার পেছনে?

অবিশ্বাস্য!

আমারই মনের ভুল নাকি?

নাকি সত্যি?

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার। এমনও হয়? এত ভালও লাগে মানুষের? লাগতে পারে?

টারজানের জেন, অ্যামাজনের যোদ্ধা নারী, লুকাণ্ডু গোত্রের রানী–সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেন হাজির হয় তামান্না।

আমার তামান্না।

আমার আফ্রিকা।

ওকে মনে হয় ভারতীয় টিভি চ্যানেলে ছেলেদের বডিস্প্রের বিজ্ঞাপনে দেখানো কামুক-বন্য নারী।

যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

ওর চিতাবাঘের মত নখের আঁচড়ে বিক্ষত করবে আমার বুক।

আমার গলায় আলতো করে বসাবে ওর হায়েনার মত দাঁত।

ওর বুকের মাংসপিণ্ড জোড়া লেপ্টে যাবে আমার গায়ে।

ওর জংলী রমণীর মত ঠোঁটে কামড়ে ধরবে আমার অনভ্যস্ত ঠোঁট।

ওর রমণের শীৎকার শোনাবে বিষধর সাপের হিস্‌হিসানির মত।

আমার ঘোরের মধ্যেই ওর ফাইল দেখা শেষ হয়।

চলে যায়।

আর, আমাকে ফেলে রেখে যায় আফ্রিকার গহীন অরণ্যে। অবিশ্বাস্য এক মোহ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে আমাকে। আমি বুঝি, তামান্নাকে আমার চাই, চাই-ই চাই।

কিন্তু, কিন্তু যেমন হয় বরাবর–তেমনই হয় এবারও।

কিছুই বলা হয় না তামান্নাকে।

আমার না বলা কথাগুলো শুধু রাতে আসে স্বপ্ন হয়ে।

আমি স্বপ্নে দেখি আফ্রিকার অরণ্যে আমার তামান্না। ওর তামাটে গাত্রবর্ণ দৃশ্যমান। ওর পরনে খুব ছোট একটা বক্ষবন্ধনী আর কোমরের কাছে একখণ্ড কাপড়–দুটোই তৈরি চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে। দৃশ্যমান ওর সুঠাম চকচকে উরু। নাভি। নাভির চারপাশে উল্কি আঁকা। ওইখানে দেখা যাচ্ছে একটা সাপ ঘিরে রেখেছে তামান্নার মাদকতাময় নাভিকে। ওর মাথায় বুনোফুলের মালা। চোখে মোটা করে লাগানো কাঠ-পোড়ানো কাজল।

কিন্তু পরদিন দিনের বেলায় আবারও আমাদের সেই দৈনন্দিন কাজ। অফিস। দেখা হয় রোজ। কিন্তু বলা হয় না। আমি জানি, বলা যায় না একথা–ওর সাথে আমার বিস্তর ফারাক। ও ধনী, সুন্দরী, যোগ্যতমা। ওর আছে আফ্রিকা, আমার আছে ঘুপচি-দুর্গন্ধ এক গৃহকোণ।

তাও জীবন কাটে।

ঠিক যেমন করে বলেছিলেন কোনও এক গল্পকার, তাঁর এক গল্পে:

'...চেয়ার ছেড়ে উঠি।

ফাইলগুলো গোছাই দুর্বল হাতে।

তারপর, আস্তে আস্তে বেরোই অফিস থেকে।

ক্লান্ত, অবসন্ন।

পরাজিত।

ধীর পায়ে আমি ফিরে চলি আমার প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতায়।' ঠিক যেন আমার কথাই লিখেছিলেন ওই গল্পকার।

আমার খুব কষ্ট হয়।

খুব মন খারাপ হয়।

আমি বুঝি, আমার অদেখা আফ্রিকা, অচেনা আফ্রিকা, অজানা আফ্রিকা–আমার জন্য চিরকালই রয়ে যাবে অদেখা, অচেনা, আর অজানা।

তামান্না রয়ে যাবে সেই দূরের আফ্রিকাতেই।

কখনও আসবে না আমার এই ঘুপচি অন্ধকার গৃহকোণে।

কখনও আসবে না।

কখনও না।

যেদিন বিকেলে তামান্না ওর বিয়ের কার্ড দিয়ে হাসি-হাসি, সলজ্জ মুখে দাওয়াত করল আমাকে, সেদিন, সেই রাতে, কোনওমতেই ঘুম আসে না আমার।

রাত গভীর হয়।

আমি ছটফট করি।

আমার মন ছটফট করে।

যুদ্ধে পরাজয় কি এর চে'ও বেদনার?

রাত একটা বাজে।

দুটো বাজে।

সোয়া দুটো বাজে।

আড়াইটা বাজে।

দুটো একত্রিশ।

দুটো বত্রিশ।

কী অসহ্য লম্বা, স্থির সময়!

আমার হঠাৎ করে মনে পড়ে কোথায় যেন পড়েছিলাম আফ্রিকার জারোয়া গোষ্ঠীর পুরুষেরা প্রেমে পরাজিত হলে বিশেষ এক রীতি পালন করে মন্ত্রবলে ফিরিয়ে আনে প্রেয়সীকে।

হ্যাঁ, তাই করব আমি।

দুটো উনপঞ্চাশ মিনিটে আমি রান্নাঘরে গিয়ে ছুরিটা আনি। ঘরের দরজাটা ভাল মত বন্ধ করি।

ওহ্! কী অসহ্য গুমট গরম!

•

রাত তিনটা পাঁচ মিনিটে আমি ফোন করি তামান্নার মোবাইলে। রাতের ফোন পেয়ে ঘাবড়ে যায় তামান্না; ঘুম থেকে উঠে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'কী হয়েছে? এত রাতে?'

আমি কোনওমতে বলি, 'তুমি আর কখনও ছেড়ে যেতে পারবে না আমাকে। তোমাকে ফিরে আসতেই হবে আমার কাছে। এই একটু আগেই নিজ হাতে আমার বাম চোখ উৎসর্গ করেছি ভালবাসার দেবতা এগুর কাছে—মন্ত্র পড়ে, তোমার নামে।'

চোখ দিয়ে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

জ্ঞান হারাবার আগে কোনওমতে বলি আমি, 'এবার তোমায় আমার কাছে আসতেই হবে, প্রিয়তমা। বলো, কখন ফিরছ তুমি আমার কাছে? কখন ফিরছ, আমার আফ্রিকা কন্যা?'

আসমার ওসমান

[টারজান, চাঁদের পাহাড়, অরণ্যদেবের কাহিনিতে শৈশবে এই গল্পের কথকের মত আমি নিজেও খানিকটা আফ্রিকা-মোহে পড়ে যাই। তার অনেক বছর পর, হঠাৎ করে হাতে এসেছে মজনু শাহ-এর লেখা কবিতার বই 'জেব্রামাস্টার' এবং 'ভোগ' পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণের এপ্রিল ২০১১ সংখ্যাটি। জেব্রামাস্টারের কিছু মায়াবী লাইন এবং ভোগের প্রচ্ছদকাহিনিতে মডেল আশিকা প্র্যাট-এর আফ্রিকান ফটো-শ্যুটের পরোক্ষ প্রেরণাতে এই গল্পটির জন্ম। —আসমার ওসমান/মে ২০১১/ইস্কাটন, ঢাকা।]

বিদ্যা

তিনটে জানালাই খুলে দিলাম ভাল করে। আষাঢ় মাস। আজ সারাটা দিনই আকাশ মুখ ভার করে আছে। তবে বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। মেঘগুলো অনেক ওপরে। কোথায় ভেসে চলেছে মেঘের রাশি। কোথায় ওদের বাড়ি? নিজের চিন্তায় হাসলাম মনে মনে। কী অদ্ভুত সব চিন্তা যে দোলা দেয় মাঝে মাঝে। তবে প্রত্যেক ঘটনার পেছনেই যেমন কারণ থাকে, তেমনি চিন্তাও অযথা আসে না। এই পৃথিবীর আসলে কতটুকু আমরা জানি? অনেকটাই জানি বলে কেবল অনুভব করি বাস্তবতাহীন এক তৃপ্তি। অনেক দিন আগে যে-ঘটনাটা ঘটে গেছে আমার জীবনে, সেটাই কি কম অদ্ভুত? কে বিশ্বাস করবে সেই ঘটনা? কী ব্যাখ্যা আছে তার? তবে ঘটনাটা ঘটেছে, এটাই বাস্তব। কাউকে বিশ্বাস করানোর দায় আমার নেই।

আজকের বিখ্যাত ডাক্তার অনন্ত চৌধুরী তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র...পারিবারিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না আমাদের, নুন আনতে পান্তা না ফুরালেও প্রায় কাছাকাছি। খুব কষ্টে আমাদের পড়াশোনা চালিয়েছেন বাবা, কিন্তু পঞ্চম বর্ষের মাঝামাঝি এসে একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন। আমাকে খরচ দেয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়।

দুটো টিউশনি নিয়ে তাৎক্ষণিক পড়া বন্ধ হওয়াটা রোধ করলাম কোনওমতে। একদিন 'বর্ণালী' মেসের মালিক এসে ভীষণ অপরাধী মুখ করে বললেন, 'আপনাদের মত মেধাবী ছাত্রদের সবসময় সাহায্য করেই এসেছি, কিন্তু কী করব বলেন, এই মেসটার টাকাতেই পরিবার চলে।'

দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল। উনি তার সঙ্গে আর এক মাস সময় দিয়ে বললেন, এর মধ্যে আমি যেন কোনও জায়গা ঠিক করে নিই। আর, টাকাটা এখন দিতে হবে না, সময় করে ধীরে ধীরে শোধ করলেই চলবে। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হলো, যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছেন উনি।

টিউশনি সেরে এসে পড়তে বসি প্রত্যেক রাতে। কিন্তু পড়ায় খুব একটা মন বসাতে পারি না। ঘড়ির কাঁটার মত চলে যাচ্ছে দিন। উনত্রিশ, আটাশ, সাতাশ, ছাব্বিশ...

ইমরান অবশ্য ওর সঙ্গে থাকতে বলছে ওদের পুরানা পল্টনের বাড়িতে, আমি রাজি হইনি। অনেকগুলো ভাইবোন ওরা, নিজেদের থাকাই কঠিন। ওর বাবাও মানুষ সুবিধের নন। গালাগাল ছাড়া মুখে ভাল কথা নেই, আমার সামনেই

ইমরানকে দু'বার মারতে পর্যন্ত উঠেছিলেন।

দিন বিশেক পর হঠাৎ বগুড়া থেকে লেখা বাবার চিঠি পেয়ে হাতে যেন চাঁদ পেলাম। তাঁর কোনও এক ছাত্র বহু দিন বিদেশ থাকার পর স্থায়ীভাবে বাস করার জন্যে চলে এসেছেন ঢাকায়। বিরাট বড়লোক। ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছে জয়পুরহাটে, তিনি নাকি তখন যাচ্ছিলেন দিনাজপুরের স্বপ্নপুরী দেখতে। নানা আলোচনার পর বাবা আমার কথা তুলেছেন, যদি দয়া করে তিনি আমাকে থাকতে দেন তাঁর বাসায়। ভদ্রলোক নাকি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। চিঠির নীচে ধানমণ্ডির একটা ঠিকানা দিয়েছেন বাবা।

পরদিন সকালেই গেলাম। ড্রয়িং-রুমে বসার মিনিট দশেক পর ওপরতলা থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ। পরনে চমৎকার ধপধপে বুশ শার্ট আর ফুলপ্যান্ট, হাতে সোনার ঘড়ি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। বাইরের আবরণ ছাড়া অন্তর্ভেদী চোখজোড়াও বলছে, আর দশজন মানুষের চেয়ে তিনি অনেকটাই আলাদা।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, ইঙ্গিতে বসতে বলে তিনি বললেন, 'আপনিই রাজ্জাক স্যারের ছেলে?'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

'নাম কী আপনার?'

'অনন্ত চৌধুরী। আমাকে "তুমি" করেই বলুন।'

'হুঁ,' ডুবে গেলেন ভদ্রলোক নিজের মধ্যে। প্রায় মিনিট তিনেক পর মাথা তুলে বললেন, 'আর কেউ এই প্রস্তাব দিলে রাজি হতাম না, কিন্তু শুধু রাজ্জাক স্যার...তাঁর প্রতি আমার অন্যরকম একটা...সে যাক গে। থাকতে পারো তুমি এখানে, কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে।'

'আপনার যে-কোনও শর্তে আমি রাজি,' মনে মনে বলে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

'কোনও বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন এখানে আসতে পারবে না। কোনও আড্ডা নয়। আমি প্রাইভেসি পছন্দ করি।'

মিন মিন করে বললাম, 'কিন্তু ইমরান...'

'খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু বুঝি?'

'মানে, পড়াশোনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়।'

'সেসব আলোচনা তো কলেজে করলেও চলে...আচ্ছা, তা হলে শুধু ওই ইমরানই, সঙ্গে যেন আবার কোনও জাভেদ মিয়াঁদাদকে টানার চেষ্টা কোরো না।'

স্বস্তির একটা শ্বাস গোপন করলাম আমি, ভীষণ গম্ভীর এই মানুষটার আড়ালে তা হলে রসিক একটা মনও আছে।

'কবে আসতে চাও?' জানতে চাইলেন তিনি।

'কাল পরশু।'

'আজও আসতে পারো,' সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন ভদ্রলোক। 'আমার নাম হাসান জয়েনউদ্দীন।'

মেসে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, হাসান সাহেবের আচরণ বেশ অদ্ভুত, নাম বললেন একেবারে শেষে। তারপর দূর করে দিলাম এসব চিন্তা। আমার আবার ভাবাভাবি কী, জায়গা পেয়েছি, এ-ই ঢের।

হাসান সাহেবের বাসায় আসার পর এক মাস কেটে গেছে। দোতলা প্রকাণ্ড বাসা। মানুষ মাত্র চারজন। ওপরতলায় তিনি থাকেন তাঁর বন্ধু আবদুর রবকে নিয়ে। নীচে আমি আর আফাজ বুড়ো। বাইরে যাবার প্রয়োজন ছাড়া তিনি নীচে নামেন না বললেই চলে। সত্যিই অদ্ভুত মানুষ। কী করেন ওখানে এত? জানার জন্যে খুব কৌতূহল হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই সতর্কবাণী শোনার ফলে সে-কৌতূহল দমন করে রেখেছি।

ইমরান প্রায়ই আসে। একদিন আসতে বললাম, 'বিস্কুট খাবি?'

'থাক, টুটাফাটা নবাবের আর খরচ করতে হবে না। পড়াশোনা কেমন চলছে তোর?'

'ভাল।'

মাথা ঝাঁকাতে লাগল ইমরান, কী যেন ভাবছে। 'তোর ওপরতলার লোক দু'জন কেমন রে?'

'কথা তো তেমন হয় না। এই আপনি কেমন আছেন, ভাল আছি-ব্যস।'

'কথা বেশি না হওয়াই ভাল। এখনও সংবাদ খুব একটা সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে লোক সুবিধের নয় ওরা। অবশ্য পাতলাটা মোটামুটি ভালই।'

'রব সাহেব?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে হাসান সাহেব জুটলেই মুশকিল।'

'কী ব্যাপার, বল্ তো?'

'লোকটাকে দেখলেই কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে আমার। মনে হয়, কোনও সরীসৃপের দিকে তাকিয়ে আছি। খুব জ্ঞানী, কিন্তু জ্ঞানীদের মত ভোলাভালা নয়। অনেক দিন নাকি ছিল মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা আর আফ্রিকাতে। আরবী, ফারসী ছাড়াও নিখুঁত হিব্রু আর কপটিক বলতে পারে।'

'কপটিক কী?'

'মিশরীয় খ্রিস্টানদের ভাষা।'

'মিশরেও ছিলেন নাকি?'

'মিশরেই বেশি। আরেকটা সংবাদ জানিস?'

'কী?'

'রব সাহেবের বোন নাজের সঙ্গে তাঁর এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। নিউমার্কেটে দু'জনকে দেখেছিও একদিন। দেখে মনে হলো, পাশাপাশি যেন হেঁটে চলেছে ব্যাঙ আর গোলাপ ফুল।'

এবার আমার সত্যিই অবাক হবার পালা। 'আমি এখানে থেকে কিচ্ছু জানি না, আর তুই এতসব জানলি কী করে রে? এমনি কি আর কলেজে সবাই তোকে রেডিও সেন্টার বলে!'

'হুঁ, কিন্তু যারা বলে তাদের সবারই আবার রেডিও সেন্টার না হলে চলে না।'

ওর কথা শুনতে শুনতে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। তাই বললাম, 'রব সাহেবেরা শুনেছি বেশ অবস্থাপন্ন। অথচ দেখ, নিজেদের বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকে।'

'ওই তো হলো কথা। তোকে বললাম না, ওরা লোক সুবিধের নয়? তবে চিন্তার কিছু নেই। রসুন বুনেছি, বন্ধু, আর ক'টা দিন মাত্র সবুর কর।'

এরপর চুপ মেরে গেলাম দু'জনেই। মিনিট তিনেক পর উঠে পড়ল ইমরান। 'যাই রে।'

'বোস না আর কিছুক্ষণ।'

'না। তোর খুলিটা দে তো কয়েক দিনের জন্যে, আর কানের ওই হাড়গুলো। রাশেদ একদিনের কথা বলে আমারগুলো নিয়ে গেছে এক মাস আগে। পলিথিনের ব্যাগ আছে? থ্যাঙ্ক ইউ।'

ইমরান চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পড়াশোনায় মন বসাতে পারলাম না। বার বার মনে হতে লাগল ওর কথাগুলো। সত্যিই কি আমার এত কাছে কিছু একটা ঘটে চলেছে?

রাত এগারোটার দিকে চিন্তা দূর হয়ে গেল। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছি, এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। সাড়ে বারোটায় হঠাৎ যেন জোরে শ্বাস নিল কেউ, কানের একেবারে কাছে। চমকে উঠলাম আমি। তাকালাম চারপাশে। না, কোথাও কেউ নেই। যথেষ্ট সাহসী আমি, পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে লড়তে লড়তে সে-সাহস আরও বেড়েছে, তবু কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। কোত্থেকে এল শব্দটা? উৎকর্ণ হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই।

মাথা নামালাম বইয়ে। মনোযোগ আসতেও দেরি হলো না। পিপ পিপ করে উঠল ঘড়ি। রাত একটা। মনে মনে কেবল ভাবছি, আর রাত না করাই ভাল, এমন সময় নীরবতা খান খান করে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল ওপরতলা থেকে। এত তীক্ষ্ণ সে-চিৎকার, লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার ছেড়ে। বুঝতে পারলাম না, এখন আমার কী করা উচিত। ওপরতলায় দৌড়ে যাব, নাকি এখানে অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে? রাতের এই সময়ে ওই চিৎকারের অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। দ্বিধায় দুলতে দুলতেই সিঁড়িতে শুনতে পেলাম পদশব্দ। গেঞ্জি গায়ে ছুটে নেমে এলেন রব সাহেব, মুখ কাগজের মত সাদা।

'এখনই চলো!' হাঁপাতে লাগলেন তিনি। 'হাসান অসুস্থ হয়ে পড়েছে!

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আবার ছুটলেন তিনি সিঁড়ির দিকে, পেছনে পেছনে আমি। ওপরতলায় গিয়ে যে-ঘরটায় ঢুকলাম রব সাহেবের সঙ্গে, সেটাকে স্টাডিরুম না বলে জাদুঘর বলাই ভাল। হাজার রকম প্রাচীন নিদর্শনে দেয়ালের তাকগুলো ভর্তি। নানা আকারের বোঝা কিংবা অস্ত্র কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ষাঁড়, সারস, বিড়াল, প্যাঁচা, সাপের মাথাঅলা অদ্ভুত সব মূর্তি। এগুলোর পাশাপাশি রয়েছে নীল পাথরের বাদামি-চোখো রাজা আর মিশরীয় দেব-দেবী।

ছাত থেকে দড়িতে ঝুলছে নীলনদের এক প্রকৃত সন্তান–দু'সারি তীক্ষ্ণ দাঁত বের করা প্রকাণ্ড এক কুমির।

ঘরটার মাঝখানে গ্লাস-টপ বিরাট একটা টেবিল। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজ, বিভিন্ন আকারের শিশি, বোতল, পামগাছের পাতার মত শুকনো পাতা। টেবিলের ডান পাশে দেয়াল ঘেঁষে একটা মমি শুয়ে আছে কফিনে। ওটার দিকে তাকাতেই গায়ের ভেতরটা কেমন রি রি করে উঠল। কফিনের সামনে পড়ে আছে হলুদ প্যাপিরাসের কয়েকটা পাতা। টেবিলের পেছনে গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসে আছেন হাসান সাহেব, মাথা পেছনদিকে হেলানো, ভীষণ আতঙ্কিত দু'চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কুমিরটার ওপর।

'হায়, আল্লাহ, হাসান মারা যাচ্ছে!' আঁতকে উঠলেন রব সাহেব।

'না,' নাড়ি ধরে বললাম আমি, 'অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন তো। চলুন, ওই সোফাটায় শুয়ে দিই ওঁকে। শার্টের বোতামগুলো খুলে দিন, চোখে-মুখে পানি দিন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ এরকম, ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'বলতে পারব না। ওর দু'ঘর পরে আমি থাকি। কেবল শুয়েছি, এমন সময় চিৎকার। ডাক্তার ডাকতে চাইছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল তোমার কথা।'

'মুখে পানি ঢেলে দিন,' বুকে হাত রেখে বললাম আমি। 'যে-কারণেই হোক, ভীষণ ভয় পেয়েছেন। এত ভয় পেলে অনেক সময় শকে মারা যায় মানুষ। তা এখানে ভয় পাবার মত কী আছে?'

'মমি।'

'মমি? কী আবোল-তাবোল বকছেন, মমি আবার ভয় দেখাবে কীভাবে?'

'জানি না। জিনিসটা এতই বিশ্রী, দেখলেই শরীর কেমন শিরশির করে। কতবার বলেছি ওটাকে ফেলে দিতে, কিন্তু আমার কথা শোনে কে! গত বছর ম্যানহাটানেও ঠিক এভাবেই চিৎকার করে উঠেছিল ও, তারপরেই অজ্ঞান।'

'অনেকদিন একসঙ্গে আছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, বারো বছর। আমেরিকা, মিশর, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে।'

'যে-দেশেই গেছেন উনি, মমিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'হাসান এক বাতিকগ্রস্ত মানুষ। এগুলো ওর শখ। দেখছ না, সারা ঘরে কিম্ভূত সব মূর্তি, লতাপাতা। মিশরীয় প্রাচীন কী সব বিদ্যার চর্চা করে ও, তবে না করলেই ভাল ছিল। হায়, আল্লাহ্! ওর জ্ঞান বোধহয় ফিরছে।'

ধীরে ধীরে রক্ত ফুটে উঠল হাসান সাহেবের ফ্যাকাসে মুখে, চোখের পাতা পিটপিট করল কয়েকবার, হাতের মুঠো খুলল আর বন্ধ হলো, নিঃশ্বাস পড়ল লম্বা একটা, তারপরই লাফিয়ে উঠে বসলেন তিনি। মমিটার দিকে তাকালেন একবার, মেঝে থেকে প্যাপিরাসের পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে তালা লাগালেন, শেষে সোফায় হেলান দিলেন আরাম করে কিন্তু আমাদের দেখতেই চোখ কুঁচকে

গেল।

'কী ব্যাপার, তোমরা এত রাতে?' শার্টের বোতামগুলো লাগানো শুরু করলেন তিনি।

'যে-চিৎকার দিয়ে উঠেছিলে,' বললেন রব সাহেব, 'আমার তো মাথা খারাপ হবার জোগাড়। এত রাতে কোথায় যাব ডাক্তার ডাকতে। হঠাৎ মনে পড়ল, আমাদের নিচতলাতেই মেডিক্যালের এক ছাত্র আছে।'

'ও, অনন্ত,' এবার তাকালেন হাসান সাহেব আমার দিকে। 'তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হলাম। কিন্তু–কী বোকা আমি। সত্যিই আমি একটা গাধা!'

দু'হাতে মাথা গুঁজে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি, সারা শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে।

'থামুন,' কাঁধে হাত রাখলাম আমি। 'বন্ধ করুন এসব।'

'কীসব?' আবার হাসতে লাগলেন তিনি।

'ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন আপনি। এরকম ভয়ে মানুষের মৃত্যুও ঘটে। তাই বলছিলাম, বন্ধ করুন মধ্যরাতের বিদ্যাচর্চা।'

একদম গম্ভীর হয়ে গেলেন হাসান সাহেব। 'বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন আছে। আর, ডাক্তারিই একমাত্র বিদ্যা নয়। পৃথিবীতে আরও অনেক রকম বিদ্যা আছে,' বেশ রূঢ় শোনাল তাঁর গলা।

রাগ লাগল খুব, কিন্তু আর কথা বাড়ানো রোকামি হবে। আমি তাঁরই আশ্রয়ে আছি।

'ভাবছি,' বললেন হাসান সাহেব, 'তোমরা আমার মত শান্ত থাকতে পারবে কিনা, যদি দেখো–'

'কী?'

'না, না, কিছু না। মানে আমি বলতে চাইছি, রাতের পর রাত তোমরা এভাবে একটা মমির পাশে একা বসে থাকতে পারবে কিনা। আমি ঠিক হয়ে গেছি, তবু এখনই যেয়ো না তোমরা। আরেকটু সুস্থির হই।'

'হাড়, কঙ্কাল নিয়ে আমাদের কারবার, মমি দেখে ভয় পাবার প্রশ্ন ওঠে না,' বলতে চেয়েও সংযত করলাম নিজেকে।

'ঘরটা একেবারে গুমট,' উঠে গিয়ে জানালার পাল্লাগুলো খুলে দিলেন রব সাহেব।

'এটা বালসামিক রেযিন,' টেবিলের ওপর থেকে শুকনো একটা পাতা তুলে নিয়ে ঘরের কোণে গেলেন হাসান সাহেব, তারপর হিটার জ্বালিয়ে তাতে ফেলে দিলেন পাতাটা। কয়েক মুহূর্তেই সারা ঘর ভরে গেল তীব্র একটা গন্ধে। 'এটা পবিত্র পাতা,' বললেন তিনি, 'পুরোহিতরা যুগের পর যুগ ব্যবহার করেছে এটাকে। ভাল কথা, ফারসী, হিব্রু, কপটিক, হায়ারোগ্লিফিক–এসব ভাষা কি তুমি জানো, অনন্ত?'

'না। এক বর্ণও না।'

'আরবী, উর্দু?'

'না।'

'খুব খারাপ কথা। মুসলমানের ছেলের অন্তত আরবী, উর্দু জানা উচিত,' হাসলেন হাসান সাহেব। 'সে যাক গে, তোমরা আসার কতক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরল?'

'বেশি না। চার পাঁচ মিনিট।'

'আমারও ধারণা, খুব বেশি সময় হয়নি,' বড় একটা শ্বাস টানলেন হাসান সাহেব। 'কিন্তু কী অদ্ভুত এই অচেতন অবস্থা! এর যেন কোনও মাপজোখ নেই। আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে, কতক্ষণ কেটে গেছে এই অবস্থায়-কয়েক মিনিট নাকি কয়েক সপ্তাহ। এই যে ইলেভেন্‌থ্‌ ডায়ানাস্টির ভদ্রলোকটি, চার হাজার বছরেরও আগে থেকে শুয়ে আছে কফিনে, এ যদি হঠাৎ কথা বলার শক্তি ফিরে পায়, তা হলে আমাদের বলবে যে, সুদীর্ঘ এই কাল তার কাছে মনে হয়েছে চোখ বন্ধ করে পরমুহূর্তেই খোলার মত। তবে যা-ই বলো, অনন্ত, মমিটা কিন্তু সুন্দর।'

উঠে মমিটার একেবারে কাছে গেলাম আমি। রঙ নষ্ট হয়ে গেলেও প্রায় অবিকৃতই আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো। শূন্য কোটরের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে খুদে খুদে দুই চোখ, চামড়া নিখুঁতভাবে লেগে আছে হাড়ের সঙ্গে, কানের ওপরে লেপটে আছে এক গোছা চুল। ইঁদুরের মত তীক্ষ্ণ দুটো দাঁত নীচের ঠোঁটের দু'পাশে। পার্চমেন্টের মত মোড়কে ঢাকা পাতলা পাতলা পাঁজরের হাড়, সীসে রঙের তলপেটের ওপর লম্বা একটা কাটা দাগ-অর্থাৎ, এই পথেই কাজ সেরেছে এমবামার। পা দুটো ঢাকা হলুদ ব্যাণ্ডেজে। মমিটার গায়ে আর কফিনে ছড়িয়ে আছে মস্তকি আর দারুচিনির ছোট ছোট টুকরো।

'আমি এর নাম জানি না,' মমিটার মাথায় হাত রাখলেন হাসান সাহেব। 'কফিনের গায়ের খোদাই করা অক্ষরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। একটা নম্বর আছে শুধু-১৩১৩, নম্বরটা দেয়া হয়েছে নিলামের সময়।'

'দেখতে লোকটা বোধহয় সুন্দরই ছিল,' বললাম আমি।

'দৈত্য ছিল একটা। মমির উচ্চতাই ছ'ফুট সাত ইঞ্চি। একাদশ রাজবংশের মানুষদের শরীর এরকম হালকা-পাতলা হলেও পেশিতে ছিল ইস্পাতের শক্তি। হাতের গাঁটগুলো দেখো, এই হাতের সঙ্গে লড়াই করা সহজ নয়।'

'হয়তো এই হাত পিরামিডের পাথর গাঁথতে সাহায্য করেছে,' ঘৃণায় মমিটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মেঝের দিকে তাকালেন রব সাহেব।

'না। একে সংরক্ষিত করা হয়েছিল ন্যাট্রনে। তখন মজুরদের এত ভালভাবে সংরক্ষণ করা হত না। তাদের জন্যে লবণ কিংবা বিটুমিনই ছিল যথেষ্ট। যেরকম যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছে একে, তাতে আজকের হিসেবে কমপক্ষে সাড়ে চার লাখ টাকা লেগেছে। সুতরাং ভদ্রলোকটি যে রাজবংশীয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পায়ের কাছের ছোট্ট খোদাইটা দেখে কী বুঝলে, অনন্ত?'

'আপনাকে তো বলেছি, আমি ওসব ভাষা বুঝি না।'

'আমার ধারণা, ওটা এমবামারের নাম। কাজে নিশ্চয় খুব পাকা ছিল

লোকটা। আজকের কোনও কাজ কি চার হাজার বছর টিকবে?'

পায়চারি করতে করতে নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন হাসান সাহেব। চেহারা স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সত্যি, কিন্তু আতঙ্ক এখনও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। মৃদু মৃদু কাঁপছে হাত, পদক্ষেপও দৃঢ় নয়। তবে তাঁর চালচলনে রয়েছে একটা বিজয়ীর ভাব।

আমি চেয়ার থেকে উঠতেই প্রায় আঁতকে উঠলেন তিনি, 'তুমি চলে যাবে এখনই?'

'হ্যাঁ, সামান্য পড়া বাকি আছে। আপনিও এখন সুস্থ। তবে বরাবর সুস্থ থাকার জন্যে এসব বিদ্যাচর্চা বাদ দেয়াই ভাল।'

'বিদ্যা, বিদ্যা,' আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি, 'সাধারণ বিদ্যার পেছনে সময় নষ্ট করে কী লাভ!' তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমি ভীতু মানুষ নই, এর আগেও অনেক মমির ব্যাণ্ডেজ খুলেছি।'

'কিন্তু গত বছরও তুমি একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে,' বললেন রব সাহেব।

'তা হয়েছিলাম। তবে একটা নার্ভ টনিক খেলেই এসব সেরে যায়। তুমিও যাচ্ছ নাকি, রব?'

'যেতেই চাইছিলাম, কিন্তু আজ না হয় থাকব তোমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ। আমার বোকামির জন্যেই তোমাদের অযথা কষ্ট পেতে হলো।'

দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমি।

সেরাতের পর থেকে হাসান সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বরফ গলল। মাঝেসাঝে তিনি এখন আসেন আমার ঘরে, আমিও যাই। আলোচনা হয় বিভিন্ন বিষয়ে। মানুষটার আর যা-ই হোক, জ্ঞানের কোনও সীমা নেই। স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। কিন্তু বাজে কিছু স্বভাব আছে তাঁর। একবার কথা বলা শুরু করলে গড়গড় করে বলতেই থাকেন, যা তাঁর মত গম্ভীর মানুষকে মোটেই মানায় না।

ভীষণ অস্বস্তিকর কথাও বলেন মাঝে মাঝে। যেমন একদিন বললেন, 'শক্তি সে শুভই হোক কিংবা অশুভ, সে-শক্তিকে নির্দেশ পালনে বাধ্য করার চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই।' একটু থেমে বন্ধু সম্বন্ধে বললেন, 'রব মানুষ খুব ভাল, সৎ, কিন্তু কোনও শক্তি বা উচ্চাশা নেই। যে-মানুষ শক্তির পূজারী নয়, সে কি মানুষ? ছেলেবেলা থেকেই ও আমার বন্ধু, কিন্তু সবসময় পাশাপাশি থাকার পক্ষে উপযুক্ত নয়।'

আরেকটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে হাসান সাহেবের। গভীর রাতে একা একা কথা বলা। উচ্চৈঃস্বরে। একদিন খুব বিনয়ের সঙ্গে জানালাম যে এরকম করলে আমার পড়াশোনার অসুবিধে হয়। ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, কখনোই তিনি একা একা কথা বলেননি।

যেভাবে তিনি অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন, তাতে নিজের ওপর সন্দেহ হলো। মমি দেখে এসে আমিও কি নার্ভাস হয়ে পড়লাম, নাকি ভুলভাল শুনছি? কিন্তু একদিন সে-সন্দেহ দূর হয়ে গেল বুড়ো আফাজের কথায়।

এই বাসার যাবতীয় গোছগাছ, রান্নাবান্নার দায়িত্ব তার। একরাতে আমার ঘর

গোছাতে গোছাতে বুড়ো বলল, 'আপনার কি মনে হয়, স্যর, হাসান সাহেব ঠিকঠাক আছেন?'

'ঠিকঠাক! তুমি কী বলতে চাও, আফাজ?'

'মানে, স্যর, উনার মাথা কি ঠিক আছে?'

'মাথা ঠিক থাকবে না কেন? পাগলামির কী দেখলে তাঁর মধ্যে?'

'ঠিক জানি না। দিন দিন তিনি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। সময়মত খাওয়া-দাওয়া করেন না, গভীর রাতে একা একা কথা বলেন।'

'বললে বলেন, তাতে তোমার কী?'

'ঠিকই বলেছেন। আমি চাকর-বাকর মানুষ, মালিকের ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয়। কিন্তু না ঘামিয়ে পারি না। আপনি কী লক্ষ করেছেন, স্যর, দরজায় তালা লাগিয়ে তিনি বাইরে চলে যাবার পরেও কে যেন তাঁর ঘরে হেঁটে বেড়ায়?'

'হেঁটে বেড়ায়? বাজে বোকো না তো!'

'শব্দটা কিন্তু আমি বেশ ক'বার নিজের কানে শুনেছি।'

এবার না হেসে পারলাম না। 'বুড়ো, যাও তো এখান থেকে। আমার পড়া আছে। বয়স হলে সবার ভীমরতি ধরে।'

'ভীমরতি! হবে হয়তো,' মাথা ঝাঁকাল আফাজ। 'তবে যদি প্রয়োজন মনে করেন, যে-কোনও সময়ে আমাকে ডাকবেন, স্যর।'

বুড়ো চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভাবলাম তার কথাগুলো। শেষমেশ ভাবলাম, একজন বুড়ো মানুষের কথায় এত গুরুত্ব দিলে চলে না। কিন্তু কয়েক দিন পর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে বুড়োর কথাই সবচেয়ে আগে মনে এল জোরেশোরে।

সেদিন রাত এগারোটায় হাসান সাহেব নেমে এসে গল্প জুড়ে দিলেন আমার সঙ্গে। মিশরের উচ্চভূমি অঞ্চলের আশ্চর্য সব কাহিনি। শুনতে ভালই লাগছিল। হঠাৎ মনে হলো, ওপরতলায় যেন একটা দরজা খুলে গেল।

'কে যেন আপনার ঘরে ঢুকল, কিংবা বেরল,' বললাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে গল্প থামিয়ে লাফিয়ে উঠলেন হাসান সাহেব, মুখের আমুদে ভাব দূর হয়ে গেছে মুহূর্তে। 'এ কী করে সম্ভব! তালা দিয়েছিলাম, আমি তো তালা দিয়েছিলাম,' তোতলাতে লাগলেন তিনি।

'ঢোকেনি, কে যেন বেরিয়েছে আপনার ঘর থেকে,' বললাম এবার। 'হ্যাঁ, ওই তো সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।'

দড়াম করে আমার দরজাটা বন্ধ করে ছুটে গেলেন হাসান সাহেব। কান খাড়া করলাম। সিঁড়ির মাঝপথে গিয়ে থেমে গেছেন তিনি, ফিসফিস করে কথা বলছেন কারও সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর আবার উঠতে লাগলেন, দরজা বন্ধ হলো ঘরের, তারপর ভেসে এল তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ।

মিনিট দুই পর নেমে এসে ফ্যাকাসে মুখে ঢুকলেন তিনি আমার ঘরে। 'যা ভেবেছিলাম তা-ই, কুকুরটা। কেমন করে যেন তালা বন্ধ করতে ভুলে গেছি, ব্যাটা খুলেছে ভেতর থেকে।'

'আপনি কুকুর পোষেণ, জানতাম না তো,' বললাম অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ, দিন তিনেক আগে এনেছি শখ করে। কিন্তু খুব বিরক্ত করছে। ওটাকে বিদায় করতে হবে।'

'বেশি ঝামেলা করলে সেটাই ভাল। কিন্তু কুকুরকে আবার তালা কেন, দরজা লাগিয়ে দিলেই তো হয়।'

'আমি চাইনি, আমার অনুপস্থিতিতে আফাজ বুড়ো মনের ভুলে ওটাকে বের হবার সুযোগ করে দিক। জাত ডোবারম্যান, বেশ মূল্যবান এগুলো।'

'ডোবারম্যান?' কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি। 'এতদিন শুধু ছবি দেখেছি, কুকুরটাকে দেখাবেন একনজর?'

'নিশ্চয়, আমার কুকুর দেখবে এ আর এমন কী? কিন্তু আজ রাতে নয়,' ঘড়ি দেখলেন হাসান সাহেব। 'অত্যন্ত জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এয়ারপোর্টে। ইতোমধ্যেই আধঘণ্টা দেরি করে ফেলেছি।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন তিনি। কিন্তু বাইরে নয়। ওপরতলায়।

ভীষণ রাগ লাগল। ইমরান বলেছিল, লোকটাকে দেখলেই তার নাকি সরীসৃপের কথা মনে পড়ে। এখন আর ওকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হাসান সাহেবের চালচলনে ক্রমেই কোথায় যেন একটা রহস্য গাঢ় হচ্ছে। বিশেষ করে আজ এমন একটা মিথ্যে বলবেন, ভাবতেও পারিনি। কুকুর তিনি পোষেণ না। কিন্তু কেউ একজন দরজা খুলেছে এটাও ঠিক। কে? কোনও অপরাধী লুকিয়ে থাকে তাঁর ঘরে? হাসান সাহেব কি কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত? অপরাধ করান কাউকে দিয়ে?

তাঁর জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলেও আমার জরুরী একটা পড়া বাকি আছে এখনও। মন বসতে চাইছিল না পড়ায়, তবু জোর খাটালাম। কিন্তু পড়া সেরাতে কপালে ছিল না। মন যখন কেবল বসব বসব করছে, হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলো ইমরান।

'কী ব্যাপার রে, এত রাতে!'

'তুই এখনও পড়াশোনা করছিস! তোর রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে, ভূমিকম্পে ঢাকার সব বাড়িঘর ভেঙে পড়লেও তুই বোধহয় বই নিয়ে ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে থাকবি। সত্যি তুই কিছু একটা ঘটাবি পরীক্ষায়।'

'ঘটাতেই হবে,' গম্ভীর হয়ে গেলাম, 'তুই তো আমাদের অবস্থা সবই জানিস।'

'তোকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে আসিনি। বিস্কুট থাকলে দে, গোটাকতক খেয়ে চলে যাই।'

'ব্যাপার কী বল্ তো? এত রাতে তুই তো আর শুধু বিস্কুট খেতে আসিসনি!'

'তেমন কিছু নয়। তোকে বলেছিলাম না, চূড়ান্ত একাদশ ঘোষণার আগে জুলফিকার ছোঁড়াটাকে টেস্ট করতে হবে-আজ ৬০ রান করেছে। বলও মন্দ করেনি, মাঝে মাঝে লং হপ ছাড়ে, যদিও হাতে ভাল ইয়র্কার আর আউট-সুইঙ্গার আছে। চারটে উইকেট নিল। যাকগে, মওলানা সাহেবের সংবাদ শুনেছিস?'

'কী সংবাদ?'
'তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে।'
'আক্রমণ?'
'হ্যাঁ। ভূতের গলিতে, তাঁর বাড়ির প্রায় সামনে।'
'কিন্তু এমন ভাল মানুষ, কে আক্রমণ করল–'
'ওই তো হলো কথা। "কে" আক্রমণ করল না বলে তুই যদি বলিস "কী" আক্রমণ করল, তা হলেই ঠিক বলা হবে। কারণ, মওলানা সাহেব বললেন, আক্রমণ কোনও মানুষে করেনি। গলার জখমগুলো দেখে আমারও তা-ই মনে হলো।'
'তা হলে? একজন মেডিক্যালের ছাত্র হয়ে তুই আমাকে ভূতে বিশ্বাস করার কথা বলতে পারিস না।'
'না। প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এর সমাধান কী? যদি শুনতে পেতাম, কোনও সার্কাস দল থেকে বড় একটা বানর পালিয়েছে, তা হলেও হয়তো সমাধান খুঁজে পাওয়া যেত। মওলানা সাহেব প্রত্যেক রাতে মসজিদের কাজ সেরে ওই সময়েই বাড়ি যান। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, তাই রাস্তায় লোক ছিল না কাল। বাড়ির গজ পঞ্চাশেক সামনে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। আল্লাহর নাম নিয়ে বললেন, ওটা কোনও মানুষ ছিল না, তবে ভালভাবে তিনি দেখতেও পাননি। ইস্পাতের মত আঙুল নাকি চেপে বসেছিল গলায়। প্রাণভয়ে চিৎকার শুরু করেছিলেন, চিৎকার শুনে বাড়ি থেকে তাঁর বড় ছেলে বেরিয়ে আসতেই একলাফে পাশের প্রাচীর পার হয়ে পালিয়ে গেছে জিনিসটা।'
'তবে কি...'
'তোর হাসান সাহেব কিন্তু এ-সংবাদ শুনলে খুশি হবেন। ক'দিন আগে মওলানা সাহেবের সঙ্গে তাঁর একটা ঝগড়া হয়েছে। গর্বিত ভঙ্গিতে নিজেকে তিনি নাস্তিক বলে জাহির করাতে মওলানা সাহেব তাঁকে অপমান করেছিলেন। এবার সত্যি করে বল্ তো, দোস্ত, সব শুনে তোর কী মনে হলো?'
'কিচ্ছু না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।
উঠে দাঁড়াল ইমরান। 'সাবধানে থাকিস, তোর জন্য খুব ভাবনা হচ্ছে আমার। যতই সোনার ঘড়ি আর সোনার চশমা পরে থাকুক, লোকটা সুবিধের নয়। রব সাহেবের মুখে শুনলাম, হাসান সাহেবের সঙ্গে তোর আবার নাকি ইদানীং খুব দহরম-মহরম।'
'ঠিক তা নয়। তবে আজকাল উনি সপ্তাহে দু'একবার আমার ঘরে আসেন, গল্প করেন নানান বিষয়ে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর, ভীষণ জ্ঞানী মানুষ।'
'হুঁ। দেখ, জ্ঞানী মানুষ ভাল, কিন্তু ওই ভীষণ জ্ঞানী হলেই বিপদ। তুই নিজেই বুঝতে পারবি ক'দিন পর। দুটো বাজল, চলি রে। শুক্রবার কিন্তু ফাইনাল ম্যাচটা দেখতে ভুলিস না। জানিস তো, তুই মাঠে থাকলে আমি কতখানি জোর পাই।'
ইমরান চলে যাবার পর পড়াতে মন বসাতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম পুরোপুরি। বার

বার মনে পড়তে লাগল হাসান সাহেব আর মওলানা সাহেবের শত্রুতার কথা, তাঁর আক্রান্ত হবার কথা। ওপরতলা ঘিরে সত্যিই দানা বাঁধছে রহস্য। কোথায় যেন মিলে যেতে চাইছে দুইয়ে দুইয়ে চার, কিন্তু সে-অঙ্ক এতই সূক্ষ্ম যে ধরতে চাইলেও ধরতে পারছি না।

'দূর!' বইটা ছুঁড়ে মারলাম টেবিলে। রাগটা হাসান সাহেবের ওপর, তাঁর জন্যেই আজ পড়তে পারলাম না।

তিনটে দিন কেটে গেল। আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। হাসান সাহেব গল্প করতে না আসায় আমি খুব খুশি। তরতর করে এগিয়ে চলেছে পড়াশোনা। পরদিন বিকেলে টিউশনি করার জন্যে তৈরি হয়ে কেবল বেরতে যাব, এমন সময় ওপর থেকে ভেসে এল উত্তেজিত কথাবার্তা। দরজা সামান্য ফাঁক করলাম। হাসান সাহেবের স্টাডিরুমের বাইরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন রব সাহেব। রাগে সারা মুখ থমথম করছে।

'বোকামি কোরো না!' বললেন হাসান সাহেব। 'সারা জীবন কিন্তু আপসোস করতে হবে।'

'হলে হবে,' চেঁচিয়ে উঠলেন রব সাহেব, 'কিন্তু আমার কথার আর নড়চড় হবে না। তোমাদের এনগেজমেন্ট শেষ!'

'তুমি কিন্তু একটা শপথ করেছ।'

'হ্যাঁ, সে-শপথ আমি রাখব। বলব না কাউকে। কিন্তু নাজের সঙ্গে তোমার এনগেজমেন্ট আজ থেকেই শেষ। যা বলার ওকে বুঝিয়ে বলব আমি।'

ভাবছিলাম, এনগেজমেন্টটা ভাঙল কেন। নিশ্চয় ভীষণ কিছু একটা ঘটিয়েছেন হাসান সাহেব। তাঁর পাশে নাজকে দেখে ইমরানের নাকি মনে হয়েছিল ব্যাঙ আর গোলাপ ফুল। অবশ্য এনগেজমেন্ট থাকুক আর ভাঙুক আমার কোনও যায় আসে না, তবু সংবাদটা জানার পর কেমন যেন একটা আনন্দই হলো।

শুক্রবার। ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে এসেছি। ইমরানের চিরশত্রু কালামের দল করেছে ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৫। ইমরানের দল এখন ৩০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬২। ইমরান নিজে ৭১ রান নিয়ে ক্রীজে আছে। নিশ্চিত জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। ভাবছিলাম, চলে যাব নাকি দেখেই যাব শেষ পর্যন্ত। হঠাৎ কে যেন হাত রাখল কাঁধে। পাশ ফিরতে দেখি, রব সাহেব।

'ক্রিকেটের ভক্ত নাকি আপনি?' বললাম আমি।

'দেখতেই পাচ্ছ। তা চলো না, নীলক্ষেতে আমার বাসা। চা খাব, সেইসঙ্গে বাসাটাও দেখা হবে তোমার। নাকি খেলার শেষ পর্যন্ত থাকবে?'

'না। কিন্তু আপনার বাসায় তো যেতে পারব না। জরুরী কাজ আছে। এখানেই আসতাম না, কিন্তু ইমরান বলে কথা। আমি না আসলে বেচারি খুব দুঃখ পেত।'

'ছেলেটাকে আমারও খুব ভাল লাগে। খেলেও চমৎকার। ওর ব্যাক ফুটে

ড্রাইভটা দেখবার মত। চলো যাই এবার।'

'কিন্তু সত্যিই জরুরী...'

'তার চেয়ে আমার কাজটা অনেক বেশি জরুরী,' আমাকে থামিয়ে দিলেন রব সাহেব।

'বেশিক্ষণ থাকতে পারব না কিন্তু।'

'পনেরো মিনিট থাকলেই হবে।'

রব সাহেবের সুন্দর বাসাটা লাল ইটে তৈরি। ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে অবাক হলাম। শুনেছিলাম, তাঁর বেশ ক'টা ভাইবোন। কথাটা জিজ্ঞেস করতে হেসে রব সাহেব বললেন, 'আমাদের বাসা তো মহাখালী। আসলে বাংলাদেশে আসার পর হাসানের সঙ্গে থেকেছি বলে এখন সরাসরি ওখানে যেতে কেমন যেন লজ্জা লাগছে, তাই মাঝপথে এই লজ্জা তাড়ানোর ব্যবস্থা। এখানে অবশ্য একা থাকি না, সঙ্গে মতিন সাহেব আছেন। বাইরে গেছেন উনি।'

অটোমেটিক কেতলি বসিয়ে বাসাটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন রব সাহেব। কিচেন, ডাইনিং, ড্রয়িং-রুম বাদেও চারখানা ঘর, সামনে প্রকাণ্ড লন। একপাশে একটা পুকুর। অজান্তেই বোধহয় প্রশংসা ঝরে পড়েছিল চোখে, সেটা লক্ষ করে রব সাহেব বললেন, ঢাকার মত জায়গায় বাসার মধ্যে আস্ত একখানা পুকুর, ভাবা যায়? একটু আগেই তোমাকে বলছিলাম মহাখালী চলে যাবার কথা, কিন্তু এ ক'দিনেই এত মায়া পড়ে গেছে বাসাটার ওপর, শেষমেশ যেতে পারব কিনা জানি না।'

ফোঁসফোঁস করে উঠল কেতলি। রব সাহেবের পেছন পেছন ছুটলাম রান্নাঘরে।

দুটো পেয়ালায় চা ঢেলে আমাকে নিয়ে ড্রয়িং-রুমে এলেন তিনি। 'আজ তোমাকে এখানে ডেকেছি এ-কথা বলার জন্যে যে, আমার মত তোমারও উচিত ওই বাসা ছেড়ে চলে আসা।'

'তাই?' সোফায় হেলান দিলাম আমি।

'হ্যাঁ। ভেবে হয়তো অবাক হচ্ছ, এমন কথা বলছি কেন। মুশকিল হলো, কারণটা আমি বলতে পারব না। এ-কথা কখনও কাউকে বলব না, শপথ করেছি আমি। এ-শপথ ভাঙা সম্ভব নয়। তোমাকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, একসঙ্গে বসবাস করার পক্ষে হাসান নিরাপদ মানুষ নয়।'

'নিরাপদ নয়! আপনি কী বলতে চান?'

'সে আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার কথা শোনো, ওখান থেকে চলে যাও অন্য কোথাও। চলে আসার আগে হাসানের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে আমার, জানো নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

'সেজন্যেই তো এতদিন একসঙ্গে থাকার পরেও চলে আসতে হলো। হাসান ভয়ঙ্কর মানুষ, অনন্ত। সত্যিই ভয়ঙ্কর। এ ছাড়া আর অন্য কোনওভাবে ওর বর্ণনা দিতে পারছি না। যেরাতে ও চিৎকার দিয়ে ওঠে, সেরাতেই একটা সন্দেহ

হয়েছিল। শেষমেশ সেদিন চেপে ধরেছিলাম ওকে। আমার প্রশ্নের উত্তরে এমন সব কথা বলল ও, বিশ্বাস করো, মাথার সব চুল দাঁড়িয়ে গেল আমার। তুমি কিংবা আমি যতটুকু ধারণা করতে পারি, তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, অনেক দেরিতে হলেও ওর কুৎসিত রূপটা প্রকাশ হয়ে গেছে আমার কাছে। বেঁচে গেল আমার আদরের বোনটা।'

'এনগেজমেন্ট ভেঙে যাবার কথা বলছেন? সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছুতেই আপনি সব খুলে বলতে রাজি নন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

'সত্যিই যদি সাবধান করার মত কিছু থাকে, তা হলে কোনও শপথই আপনাকে বেঁধে রাখতে পারে না। কোনও উন্মাদ যদি বড় একটা বিল্ডিং উড়িয়ে দিতে চায়, শপথের দোহাই দিয়ে আপনি চুপ করে থাকতে পারেন না।'

'অনন্ত, তুমি যে-যুক্তিই দেখাও না কেন, সাবধান করে দেয়া ছাড়া আমার করার আর কিছুই নেই।'

'কার থেকে আপনি সাবধান করে দিতে চান আমাকে?'

'হাসান।'

'তাঁকে আমি ভয় করতে যাব কেন?'

'সে-কথা আমি বলতে পারব না,' নিজের অপারগতায় হাত মোচড়াতে লাগলেন রব সাহেব। 'এটাও বলতে পারি না যে হাসান তোমাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু ওর সঙ্গে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক।'

'আপনি যা বলতে চাইছেন না, আমি হয়তো তা ধারণা করতে পারছি। কেউ একজন থাকে হাসান সাহেবের সঙ্গে।'

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন রব সাহেব। 'জানো? তুমি জানো?'

'কোনও অপরাধী?'

হতাশায় ধপাস করে আবার বসে পড়লেন রব সাহেব। 'আমার মুখ বন্ধ। ওহ্, বলতে পারব না, কিছুতেই বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'কর্তব্য মনে করে আমাকে সাবধান করে দিলেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি তো আমাদের পারিবারিক অবস্থা জানেন, ইচ্ছে করলেই আমি হুট করে ওখান থেকে চলে আসতে পারি না।'

'আমার এখানে থাকতে পারো, কোনও অসুবিধে হবে না।'

'আমাকে নিয়ে আপনি এতটা ভাবছেন, সত্যিই খুব ভাল লাগছে। আমাদের নিয়ে কেউ তো ভাবে না সহজে। কিন্তু ভূত-প্রেতের ভয় করলে আমার চলে না। আমি মেডিক্যালের ছাত্র, কথাটা আশা করি বোঝার চেষ্টা করবেন।'

জবাব দিলেন না রব সাহেব, কী যেন ভাবছেন। বিদায় জানাতে রাস্তা পর্যন্ত এলেন পেছনে পেছনে।

সন্ধে নামছে। যত ব্যস্তই থাকি না কেন, শুক্রবার একটা জায়গায় যেতেই হয়

আমাকে। না গিয়ে পারি না আসলে। সামসুজ্জামান স্যারের বাড়িতে। মানুষটা খুব ভালবাসেন আমাকে। আজ দেরি হয়ে গেছে, তবু বাসায় গিয়ে একটু ফ্রেশ হওয়া দরকার। সারদিন ক্রিকেটের মাঠে থেকে একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছি।

বাসায় ফিরে গোসল করলাম। তারপর তৈরি হয়ে যখন বেরিয়ে আসতে যাব, চোখ পড়ল বিছানায় রাখা একটা বইয়ের ওপর। পনেরো দিনেরও বেশি হলো বইটা নিয়ে এসেছি হাসান সাহেবের কাছ থেকে। মিশরের ফারাওদের নিয়ে লেখা বই। ইন্টারেস্টিং। তবে পুরোটা পড়তে পারিনি। ভাবলাম, বইটা হয়তো তাঁর প্রয়োজন, দিয়েই যাই।

দ্রুত উঠলাম ওপরে। হাত দিতেই খুলে গেল দরজা। হাসান সাহেব নেই। মনে মনে খুশিই হলাম, তাঁর সঙ্গে কথা বলে আর সময় নষ্ট করতে হবে না। স্যারের বাড়ি অনেক দূর, টিপু সুলতান রোডে।

ঘরটা ঠিক আগের মতই আছে। জীবজন্তুর মাথাঅলা সারি সারি অদ্ভুত চেহারার সব মূর্তি, মিশরীয় দেব-দেবী, ছাত থেকে ঝুলন্ত কুমীর। কিন্তু কফিনের দিকে তাকাতেই ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। মমিটা নেই! পাথরের মত মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, তারপর হাসলাম নিজের বোকামিতে। স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অর্থ কত বদলে যায়। হাসান সাহেব হয়তো ওটাকে সরিয়ে রেখেছেন কোথাও। দ্রুত তাঁর কথা ভাবলাম গোড়া থেকে। মনে হলো, উল্টোপাল্টা ভেবে তাঁর প্রতি আসলে অন্যায়ই করেছি আমি। সত্যিই যদি তাঁর লুকানোর মত কোনও অপরাধ থাকত, তা হলে এভাবে দরজা খুলে রেখে তিনি বাইরে যেতে পারতেন না।

আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়িতে পা দিলাম। চার পাঁচ ধাপ নামতেই কারেন্ট চলে গেল। থেমে গাঢ় অন্ধকারেই চোখ সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় মনে হলো, পাশ দিয়ে কেউ যেন উঠে গেল ওপরে। প্রায় বাতাসের মত। আমি কি ভুল শুনলাম? কিন্তু স্পষ্ট যেন চলে গেল কেউ পাশ দিয়ে।

'আফাজ,' ডাকলাম আমি।

কোনও জবাব নেই। নামতে লাগলাম।

'অনন্ত, অনন্ত,' ইমরান ডাকছে আমাকে।

'কী রে, শয়তান?'

'তাড়াতাড়ি আয়। রব সাহেব ডুবে গেছেন। ৭ উইকেটে আমাদের জেতার সংবাদ দিতে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় মতিন সাহেবের সঙ্গে দেখা। তাড়াতাড়ি চল্, এখনও হয়তো বেঁচে আছেন উনি।'

বাকি সিঁড়ি ক'টা প্রায় লাফিয়ে নেমে যেতে চাইলাম, কিন্তু অন্ধকারে সেটা সম্ভব নয়। কেবল গালি দিতে যাব, তার আগেই ভদ্রলোকের মত চলে এল কারেন্ট।

'এখানে বরফ আছে? উনি নাকি বেশ জখমও হয়েছেন।'

'না,' বলেই মনে পড়ল স্টাডিরুমের ফ্রিজটার কথা।

একেক বারে তিনটে করে সিঁড়ি টপকালাম আমি। টান দিয়ে খুললাম স্টাডির

দরজা। টিউবলাইটের আলোয় ঝলমল করছে ঘরের ভেতরটা। সেই আলোয় যে-দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, তাতে দরজার কাছেই জমে গেলাম পাথরের মত। কফিনে যথাস্থানে শুয়ে আছে মমিটা! কুতকুতে দুই চোখে এখনও যেন রয়ে গেছে জীবনের আলো, দেখতে দেখতেই নিভে গেল সেটা। নীচ থেকে বার বার ইমরান ডাকছে, কিন্তু আমার পায়ে যেন শেকড় গজিয়েছে।

'অনন্ত!' এবার ইমরানের ডাক ভেসে এল চাবুকের মত। 'দেরি করছিস কেন, এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন!'

নিজেকে ফিরে পেয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুলে ফ্লাস্কে কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে দৌড়ে নামলাম নীচতলায়।

নীলক্ষেতে পৌঁছুতে দেখলাম, সোফায় পড়ে আছেন রব সাহেব। সারা শরীর চুপচুপে ভেজা। ঠোঁটের পাশ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন মতিন সাহেব।

'ডাক্তার ডাকেননি?' ধমকে উঠল ইমরান।

'ভাবলাম, উনার কাছে একজন থাকা দরকার,' বললেন মতিন সাহেব মিনমিন করে।

'বেঁচে আছেন বোধহয়,' বুকের দু'পাশে চাপ দিতে লাগলাম আমি।

মিনিট পাঁচেক পর কেঁপে উঠল রব সাহেবের সারা শরীর, ঠোঁট কাঁপতে লাগল থরথর করে, চোখ মেললেন তিনি। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম আমরা তিনজনে।

'যা ভয় পেয়েছিলাম!' বললেন মতিন সাহেব। 'বসে বসে পত্রিকা পড়ছিলাম, উনি পায়চারি করছিলেন পুকুরের পাশে। এরকম উনি প্রায়ই করেন। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম, তারপরেই ঝপাস করে পানিতে পড়ার শব্দ। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে, তোলার পর এনে সোফায় শুইয়ে দিতে মনে হলো, উনি আর বেঁচে নেই। আবদুল ছোঁড়াটাও অসুস্থ মাকে দেখতে ফেনীতে গেছে। রাস্তায় দৌড়ে বেরুতেই ইমরান সাহেবের সঙ্গে দেখা। উনি যাবার পর ডাক্তার ডাকতে চেয়ে আবার ভাবলাম, এ-অবস্থায় রব সাহেবকে একা ফেলে যাওয়াটা উচিত হবে না। অথচ আশপাশ থেকে কাউকে ডাকলেই হত। আসলে, একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম।'

ধীরে ধীরে উঠে বসে শূন্য দৃষ্টিতে এপাশ-ওপাশ তাকালেন রব সাহেব। তারপর ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার? ও, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে!' আতঙ্কে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি।

'আপনি পানিতে পড়ে গিয়েছিলেন।' বলল ইমরান।

'পড়ে যাইনি,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি।

'তা হলে?'

'আমাকে ধাক্কা দেয়া হয়েছিল। পায়চারি করছিলাম পুকুরটার পাশে, হঠাৎ শক্ত একটা হাত জোরে ধাক্কা মারল আমাকে। দেখতে পাইনি কিছুই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কে মেরেছিল ধাক্কা।'

'মনে হয় আমিও বুঝতে পারছি,' বললাম ফিসফিস করে।

চমকে উঠে রব সাহেব তাকালেন আমার দিকে। 'জেনে গেছ, জানতে পেরেছ তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী অদ্ভুত আলাপ শুরু করলেন আপনারা।' রব সাহেবের দিকে তাকাল বিরক্ত ইমরান। 'মতিন সাহেব, চলুন তো শুইয়ে দিই, উনার আজ বেশি কথা না বলাই ভাল। আর, অনন্ত, চল্ যাই আমরা। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

মতিন সাহেবকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে উঠে পড়লাম আমি।

কথা অবশ্য তেমন হলো না আমাদের। অদ্ভুত সব ঘটনা আলোড়ন তুলছিল মনে। মমির অনুপস্থিতি, অন্ধকার সিঁড়িতে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পদশব্দ, মমির প্রত্যাবর্তন–ব্যাখ্যা নেই, কোনও ব্যাখ্যা নেই এসবের, তবু রব সাহেব বা মওলানা সাহেবের ওপর আক্রমণের সঙ্গে যোগাযোগও যেন রয়েছে কোথায়। এতদিন যা ছিল কেবলই সন্দেহ, আজ যেন তা আকার ধরে আসতে চাইছে সামনে। কিন্তু এও কি সম্ভব! পৃথিবীতে এমন ঘটনার কথা শুনেছে কেউ এর আগে! আমার ভেতরের যুক্তি-বিশ্লেষণকারী সত্তাটা আমাকে বোঝাতে চাইছে–ভুল, তোমার ধারণা ভুল, মমিটা সব সময় যথাস্থানেই ছিল, রব সাহেব হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন পুকুরে; মওলানা সাহেবের অন্য কোনও শত্রু নেই, সে-কথা তোমাকে কে বলেছে–কিন্তু আমার গভীর বিশ্বাস বিশ্লেষণকারী সত্তার কোনও যুক্তি মানতে রাজি নয়। সে বলছে–হাসান সাহেব নিঃসন্দেহে একজন হত্যাকারী, আর হত্যার জন্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এমন একটা অস্ত্র, অপরাধের ইতিহাসে যে-অস্ত্রের কথা আজ পর্যন্ত কেউ কখনও শোনেনি।

বাসা পর্যন্ত এসেও কী ভেবে ভেতরে না ঢুকেই ফিরে গেল ইমরান। ঘরে এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ভাবলাম, যে-পরিস্থিতির মুখোমুখিই হতে হোক না কেন, এই বাসা আমাকে ছাড়তেই হবে। এখানে থাকলে আমি পাসও করতে পারব না। যেখানে সবসময় উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হবে রহস্যময় কোনও পদশব্দ শোনার জন্যে, সেখানে আর যা-ই করা যাক, পড়াশোনা করা সম্ভব নয়।

মুখ-হাত ধুয়ে গেলাম ওপরতলায়। টেবিলের পাশে বসে আছেন হাসান সাহেব, ঠিক যেন নিখুঁতভাবে জাল বোনা শেষ করার পর পরিতৃপ্ত এক বিষাক্ত মাকড়সা।

'ভেতরে আসবে, নাকি দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে?' বললেন তিনি।

'না,' অজান্তেই গলা চড়ে গেল আমার।

'না! খুব ব্যস্ত বুঝি? সবসময় অত ব্যস্ত থাকতে নেই। ভাল কথা, কী নাকি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে রবের। সত্যি, শোনার পর থেকে খুব খারাপ লাগছে।'

মুখ তাঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর। কিন্তু আমার মনে হলো, ভীষণ অশুভ, কুৎসিত একটা হাসি যেন লুকিয়ে আছে ওই গাম্ভীর্যের আড়ালে। রক্ত টগবগ করে উঠল আমার। মনে হলো, ছুটে গিয়ে একটা ঘুষি মারি। অনেক কষ্টে সামলালাম নিজেকে।

চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, 'এ-কথা শুনলে আপনার আরও খারাপ লাগবে যে, রব সাহেব মরেননি। মরবেনও না। তিনি ইতোমধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনার নোংরা অস্ত্র কোনও কাজে লাগেনি। উঁহুঁ, অস্বীকার করার চেষ্টা করবেন না। চোখে অনেক ধুলো দিয়েছেন এতদিন ধরে।'

'পাগল!' রেগে গেলেন তিনি। 'কী বলতে চাও, রবের দুর্ঘটনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ। আপনি আর আপনার পেছনের ওই হাড়ের বস্তাই এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। এখন আমি সব জানি। পুলিশে দেব আমরা আপনাকে। পুলিশের হাত থেকে যদি বেঁচেও যান, মনে রাখবেন, আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না।'

'উন্মাদ, সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছ তুমি!' হাঁপাতে লাগলেন হাসান সাহেব।

'উন্মাদ হয়ে গেছি, তাই না? বেশ করেছি। আজ থেকে এই উন্মাদের হাত থেকে সাবধান!' জোরে একটা লাথি দিয়ে লাগিয়ে দিলাম দরজাটা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টের পেলাম, ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিলেন হাসান সাহেব।

পরদিন বিকেল পর্যন্ত তাঁর আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সন্ধেয় মতিন সাহেব এসে সংবাদ দিয়ে গেলেন, রব সাহেব এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি যাবার পর এল ইমরান। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। ওকে বিদায় করে গেলাম ডাইনিং-রুমে। গতকাল থেকে আফাজ বুড়োর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ঢুলছিল। বেচারিকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে খারাপই লাগল আমার। দ্রুত খাওয়া সারলাম।

ঘরে ফিরে এই বাসাতে আসার পর এই প্রথম ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম দরজা। তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত বসলাম বই নিয়ে। কিন্তু ওই বসা পর্যন্তই, এক বর্ণও মাথায় ঢোকাতে পারলাম না। হঠাৎ একটা কথা ভেবে চমকে উঠলাম। দরজা লাগিয়েও আমি আর এখানে নিরাপদ নই, কারণ, দু'জন রয়েছে আমার বিপক্ষে। আজ সারা দিন যে-আশঙ্কা করেছি, তা সত্যি হয়নি। কোনও অ্যাকশন নেয়া তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে নেমে পর্যন্ত আসেননি হাসান সাহেব। দিনের বেলা না বুঝলেও এখন এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে বুঝতে পারছি, এটা মোটেই কোনও শুভ লক্ষণ নয়। এসব ক্ষেত্রে সরবতার চেয়ে নীরবতা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। কোনও সন্দেহ নেই, পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছেন তিনি ঠাণ্ডা মাথায়।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। বাড়তি আর একটা মুহূর্তের মাশুলও আমার জন্যে ভয়াবহ হতে পারে। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে বারোটা বাজে। আজ রাতের মত সামসুজ্জামান স্যারের ওখানে যাব। কিন্তু এত রাতে! পরমুহূর্তেই দ্বিধা ঝেড়ে ফেললাম, এখন উচিত অনুচিত বিবেচনা করার সময় নয়। বইগুলো? কাল এসে নিয়ে গেলেই হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দ্রুত পা চালালাম। নবাবপুর পৌঁছুতে স্বস্তি ফিরে এল অনেকখানি। মানুষজন আশপাশে নেই বললেই চলে। টিপু সুলতান রোডে ঢুকতে

কমিয়ে দিলাম হাঁটার গতি। গন্তব্য সামনে। হঠাৎ কানে এল একটা পদশব্দ। চমকে উঠে পেছন ফিরলাম। পাতলা, অত্যন্ত লম্বা একটা মূর্তি ছুটে আসছে আমার দিকে, আগুন ঝরছে যেন কুতকুতে দুই চোখে।

চিৎকার দিয়ে উঠেই ছুটলাম প্রাণপণে। খটখটে সেই শব্দ এগিয়ে আসছে কাছে–আরও কাছে। কখন গিয়ে স্যারের দরজার ওপর আছড়ে পড়লাম, বলতে পারব না।

স্যর গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। শব্দ পেয়ে দরজা খুলেই আঁতকে উঠলেন তিনি, 'আরে, অনন্ত, এত রাতে! কী ব্যাপার?'

'কফি! আমাকে এক কাপ কফি দিন, স্যর।' বলতে পারলাম কোনওমতে।

স্যর নিজেই ছুটলেন কফি আনতে। তাঁর ফ্লাস্কে মজুতই থাকে সবসময়।

কফিটুকু শেষ না করা পর্যন্ত চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কী ব্যাপার, অনন্ত, তোমার মুখ যে একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে।'

কাপটা নামিয়ে রেখে বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। 'জীবনে এত ভয় আমি কখনও পাইনি, স্যর। আজ রাতটা কিন্তু আমি এখানেই থাকব। দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত আমি আর রাস্তায় বের হতে পারব না।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে সামসুজ্জামান স্যর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, ইচ্ছে করলে আজ থাকবে তুমি এখানে।'

'স্যর, আমার সঙ্গে ওই জানালার কাছে একটু চলুন। কী দেখে আজ ভয় পেয়েছি এত, দেখাব আপনাকে।'

জানালার কাছে গিয়ে স্যর দাঁড়ালেন আমার পাশে। 'তোমাকে এতদিন খুব সাহসী বলেই জেনেছি। আজ এমন কী ঘটল, যাতে এরকম ভয় পেয়েছ তুমি?'

'বলব, সব বলব আপনাকে। কিন্তু জিনিসটা গেল কোথায়? ওই যে দেখুন, আপনার গেটের বাইরে। দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। দেখলাম। পাতলা একটা লোক। লম্বা, খুব লম্বা। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? তুমি যে এখনও বাঁশপাতার মত কাঁপছ।'

'স্যর, শয়তান স্বয়ং আজ আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। চলুন, ঘটনাটা বলি আপনাকে।'

সামনাসামনি বসে ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করলাম আমি। হাসান সাহেবের অজ্ঞান হওয়া, তাঁর অদ্ভুত আচরণ, সিঁড়িতে পদশব্দ, রব সাহেব আর মওলানা সাহেবের ওপর আক্রমণ–কিছুই বাদ দিলাম না। শেষে বললাম, 'অবিশ্বাস্য, দারুণ অবিশ্বাস্য, তাই না, স্যর? কিন্তু সত্যি।'

হতভম্ব মুখ করে বসে রইলেন ডা. সামসুজ্জামান চৌধুরী। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'এরকম ঘটনা আমি জীবনে কখনও শুনিনি। যাক, তথ্যগুলো সব শুনলাম, এবার তোমার সিদ্ধান্ত বলো।'

'সিদ্ধান্ত, স্যর, আপনি নিজেই নিতে পারবেন।'

'কিন্তু আমি তোমারটাই শুনতে চাই। ঘটনাটা নিয়ে তুমি গভীরভাবে চিন্তা করেছ, আমি নই।'

'বেশ, বলছি,' শুরু করলাম আমি। 'বছরের পর বছর মিশরে থেকে গোপন এক বিদ্যার মাধ্যমে শক্তি আয়ত্ত করেছেন হাসান সাহেব। সেই শক্তিতে তিনি কোনও মমিকে কিংবা এই বিশেষ মমিটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই; যে-রাতে হাসান সাহেব অজ্ঞান হয়ে যান, সেরাতেই তিনি সিদ্ধি অর্জন করেন। যদিও অনেকদিন থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন, তবু জীবন ফিরে পেয়ে চোখের সামনে মমিটাকে নড়ে উঠতে দেখে নিজেকে তিনি আর সামলাতে পারেননি। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর বুঝতে পেরেছিলেন, সব জানা সত্ত্বেও অজ্ঞান হওয়াটা তাঁর উচিত হয়নি। তাই বলেছিলেন—কী বোকা আমি! সত্যিই আমি একটা গাধা!–তবে এই ঘটনার পর মমিটার নড়াচড়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি, ফলে আর কখনও অজ্ঞান হননি। অবশ্য সবসময় তিনি মমিটাকে সচল রাখতে পারেন না, বেশির ভাগ সময়েই আমি ওটাকে কাঠের মত শুয়ে থাকতে দেখেছি। স্যর, সৃষ্টির আদি থেকে গোপন শক্তিই সম্ভবত মানুষকে অপরাধের পথে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের হাসান সাহেবও তার ব্যতিক্রম নন। শক্তি অর্জন করার পর তিনি ভাবলেন, ইচ্ছে করলে এই শক্তিটাকে তিনি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু রব সাহেবকে তিনি দলে টানার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। শক্তির স্বরূপ দেখে রব সাহেব তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেলেন বাসা ছেড়ে। এই আচরণ হাসান সাহেবের পছন্দ হলো না। শক্তিমান মানুষেরা সামান্যেই অন্যের আচরণকে ঔদ্ধত্য বলে মনে করেন। হাসান সাহেবও তা-ই মনে করলেন। ফলে মমিটাকে তিনি লেলিয়ে দিলেন রব সাহেবের পেছনে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন রব সাহেব। এর আগে মওলানা সাহেবও বেঁচে গেছেন অল্পের জন্যে। নেহাতই ভাগ্য, নইলে হাসান সাহেবের এখন দুটো খুনের চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত হবার কথা। গোপন রহস্য জেনে ফেলার কারণে তিনি আমাকেও আজ সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে। আমি সাহসী, স্যর, খুবই সাহসী। কিন্তু আমাকেও যে কোনওদিন প্রাণভয়ে ছুটতে হবে, ধারণাও করতে পারিনি।'

'বাবা, অনন্ত, শান্ত হও,' বললেন ডা. শামসুজ্জামান চৌধুরী। 'আজ তোমার স্নায়ু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে। ভেবে দেখো, এরকম একটা ঘটনা ঢাকার বুকে কীভাবে ঘটতে পারে।'

'কীভাবে ঘটতে পারে জানি না, স্যর, কিন্তু ঘটেছে এটাই হলো সত্য।'

'সব ঘটনারই একটা ব্যাখ্যা আছে, বাবা।'

'ব্যাখ্যা?'

'হ্যাঁ। আজ তুমি এখানে রওনাই দিয়েছ উত্তেজিত স্নায়ু নিয়ে। নির্জন পথে লম্বা একজন পথচারী এসেছে তোমার পেছনে পেছনে। বাদবাকি কাজটুকু সেরেছে তোমার আতঙ্ক আর কল্পনা।'

'কল্পনা! এটা কল্পনা নয়, স্যর। বিশ্বাস করুন, এই ঘটনায় কল্পনার কোনও স্থান নেই।'

'মমির কথাটাই ধরো। প্রথমে তুমি দেখলে মমিটা কফিনে নেই, আবার

কয়েক মিনিট পরেই দেখলে যে আছে। অর্থাৎ, প্রথম বার মমিটা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।'

'না। প্রশ্নই ওঠে না।'

'মাথা ঘুরে কিংবা পা পিছলেও পুকুরে পড়ে যেতে পারেন রব সাহেব। মওলানা সাহেবের গলা টিপে ধরতে পারে তাঁর অন্য কোনও শত্রু। অবশ্য হাসান সাহেব এখন সত্যিই শত্রু তোমার। কিন্তু যে-ঘটনা তুমি আমাকে বললে, তা কোনও থানায় গিয়ে বললে ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে, অন্য কিছু ভাবাও বিচিত্র নয়।'

'হ্যাঁ, অন্য কী ভাবতে পারে তা বুঝতে পারছি আমি। তাই এর একটা হেস্তনেস্ত নিজের হাতেই করব বলে ঠিক করেছি।'

'নিজের হাতে?'

'জী, স্যর। কারণ, নিজের নিরাপত্তাই শুধু এর সঙ্গে জড়িত নয়। রব সাহেব, মওলানা সাহেব বা আমি নিজে ঘটনাচক্রে বেঁচে গেছি বলে এরপরে যারা আক্রান্ত হবে, তারাও যে বেঁচে যাবে, এমন কোনও কথা নেই। স্যর, এখন দয়া করে কলম আর সাদা একটা প্যাড দেবেন?'

'নিশ্চয়। টেবিলের ওপরেই সব আছে, নাও তুমি।'

কাগজ আর কলম টেনে নিয়ে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে খসখস করে লিখে গেলাম আমি। অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে রইলেন ডা. সামসুজ্জামান চৌধুরী। লেখা শেষে কাগজগুলো গুছিয়ে শেষ পাতাটা আমি এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে।

'সাক্ষী হিসেবে দয়া করে এখানে একটা সাইন করুন, স্যর।'

'সাক্ষী! কীসের সাক্ষী?'

'এই লেখাগুলোর, বিশেষ করে আমি নীচে যে-তারিখ বসিয়েছি—তার। আপনার এই সাক্ষ্য হয়তো আমাকে রক্ষা করবে।'

'অনন্ত, পাগলের মত কথা বোলো না। রাত প্রায় শেষ হতে চলল। যাও, শুয়ে পড়ো। সকালে উঠে দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'আপনি সাইন না করলে আমি যাব না। আর পাগলের মত নয়, আমি যা বলছি, একদম ঠাণ্ডা মাথায় বলছি।'

'কিন্তু কী এটা?'

'আজ রাতে আপনাকে যে-ঘটনা খুলে বললাম, তারই বিবৃতি। আমি চাই, আপনি এটার সাক্ষী হন।'

আমার স্টেটমেন্টের নীচে স্যর লিখলেন—এই স্টেটমেণ্ট আমার প্রিয় ছাত্র অনন্ত চৌধুরী আমার সামনে বসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তারপর তারিখ বসিয়ে বললেন, 'নাও, সাক্ষী হলাম। কিন্তু এটা তোমার কী উপকারে আসবে?'

'বিবৃতিটা আপনার কাছেই থাকবে। যদি আমি অ্যারেস্ট হই, এই বিবৃতিটা আপনি কোর্টে দাখিল করবেন।'

'অ্যারেস্ট!' চমকে উঠলেন স্যর। 'আরেস্ট হবে কেন?'

'হত্যার দায়ে। হত্যাকাণ্ড যে ঘটবেই তা নিশ্চিত করে বলা আমার পক্ষে

সম্ভব নয়। তবে ঘটতে পারে। পা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, স্যর, এর শেষ না দেখে আর পিছ-পা হব না।'

'আল্লাহর দোহাই, যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, আর পাগলামি কোরো না।'

'পাগলামি নয়। অবশ্য আপনাকে এর সঙ্গে না জড়ালেই খুশি হতাম। তবে বিবৃতিটা আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। এখন আমি আপনার আদেশ পালন করব, স্যর। ঘুমাতে যাব এই মুহূর্তে। আগামীকাল যা ঘটবে, তার জন্যে ঘুম আমার একান্ত প্রয়োজন।'

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে নিজেকে খুব শান্ত অনুভব করলাম। তীব্র ঝড়ের আগে প্রকৃতি এমন শান্ত হয়েই থাকে। কলেজে যাব না আজ। টিউশনিও বাদ।

নাস্তা করার পর স্যরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা গেলাম ইমরানের বাড়ি। নাস্তা সেরে ও তখন কেবল 'ভোরের কাগজ' নিয়ে বসেছে। আমাকে দেখে বলল, 'কীরে, এত সকালে? আজ বুঝি নবাবের চা জোটেনি? থাম, নিয়ে আসি।'

'না। উঠবি না। চা খাব না আমি। আজ আমি যা যা বলব, সব শুনবি তুই। সারাদিন আজ তোর এখানেই থাকব। কাজ শুরু হবে সন্ধের পর।'

'কিন্তু মোহসীন স্যরের ক্লাসটা...'

'রাখ, তোর ক্লাস! ক্লাসের চেয়ে এটা অনেক বেশি জরুরী।'

এবার নড়েচড়ে বসল ইমরান। 'কী করতে হবে বল।'

'রাতে তোকে নিয়ে যাব হাসান সাহেবের বাসায়। সঙ্গে শক্ত একটা লাঠি নিবি।'

'বাবার লাঠিটা তো দেখেছিস তুই, একটা বাড়ি কাউকে দিলে আর দেখতে হবে না।'

'আর তোর অ্যামপুটেটিং নাইফগুলোর সবচেয়ে বড়টা আমাকে দিবি।'

'ওরে, বাবা, লড়াইয়ের তীব্র গন্ধ পাচ্ছি। মনে কর, দিলাম ছুরিটা। আর কিছু?'

'না। শোন্, ইমরান, আমাদের দু'জনের কেউই ভীতু নই। কাজটা একাই করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু একজনের চেয়ে দু'জন সবসময়েই ভাল। আর জানিসই তো, প্রতিপক্ষ মোটেই সুবিধের নয়।'

আরেকটু ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর দিনটা কাটল নানা আলোচনায়। রাত ঠিক ন'টায় রওনা দিলাম আমরা। সাড়ে ন'টায় পৌঁছে ফিসফিস করে ইমরানকে বললাম, 'স্টাডিরুমে আমি একাই যাব। তুই নীচে অপেক্ষা করবি। যদি আমার চিৎকার শুনতে পাস, ছুটে যেতে এক মুহূর্তও দেরি করিস না।'

'যা। চিৎকার শুনলে পৌঁছে যাব পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে।'

আস্তে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে গিয়ে ঢুকলাম স্টাডিরুমে। টেবিলে বসে হাসান সাহেব লিখছিলেন। দরজাটা ভিড়িয়ে দিলাম আমি, তারপর পাশ দিয়ে গিয়ে, হিটার জ্বেলে দিয়ে এসে বসলাম মুখোমুখি।

হাসান সাহেবের মুখ দেখে মনে হলো, তিনি যেন এসব লক্ষ্যই করেননি।

হেসে বললেন, 'কোথায় ছিলে সারাটা দিন? আমি আবার ভাবলাম, পরীক্ষার আগে ছেলেটা চলেই গেল বুঝি।'

ছুরিটা বের করে রাখলাম টেবিলের ওপর। 'এবার উঠুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে টুকরো টুকরো করে কাটুন মমিটাকে। তবে এই ছুরি দিয়ে নয়, আপনার ছুরি দিয়ে।'

হাসি উবে গেল হাসান সাহেবের। 'তুমি বুঝি ভেবেছ, যা বলবে তা-ই করব আমি?'

'হ্যাঁ। আজ রাতে আমি যা বলব তা-ই করবেন আপনি। আমার এক শ্রদ্ধেয় মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তিনি বললেন, আইন আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আইন না পারলেও আমি পারব।'

ড্রয়ারের দিকে হাত নিয়ে যাচ্ছিলেন হাসান সাহেব, থাবা দিলাম টেবিলে। 'উঁহুঁ, কোনও চালাকি নয়। চালাকি করলে মমিটাকে আমার কাটতে হবে, আর সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে আপনার কাটা মুণ্ডু।'

আমার স্বরে এমন শীতল একটা ভাব ছিল, মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ। 'তুমি আমাকে হত্যা করবে?'

'হ্যাঁ। প্রয়োজন পড়লে,' বললাম কেটে কেটে।

'কেন?'

'আপনার দুষ্কর্মের জন্যে। এক মিনিট গেল।'

'কিন্তু কী করেছি আমি?'

'এটা আমি যেমন জানি, তার চেয়ে ভাল জানেন আপনি।'

'এসব বকবকানির কোনও মানে হয় না।'

'দু'মিনিট গেল।'

'তুমি একটা ভয়ঙ্কর উন্মাদ, এই মুহূর্তে তোমাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো উচিত। মমিটাকে আমি কাটব কেন? এটা একটা মূল্যবান সম্পত্তি।'

'মহামূল্যবান সম্পত্তি হলেও এটাকে আপনি কাটবেন।'

'না। আমি কাটব না।'

'চার মিনিট গেল,' ছুরিটা তুলে নিলাম হাতে।

'বেশ, কাটছি।' চেয়ার থেকে উঠে ওপরের তাক থেকে লম্বা একটা ভারী ছুরি পাড়লেন তিনি, তারপর কফিনের কাঁচের ঢাকনা খুলে কোপাতে লাগলেন পাগলের মত। হলুদ ধুলোর রাশি, মশলা আর শুকনো সুগন্ধী ঝরে পড়ল মেঝেতে। মিনিট তিনেকের মধ্যে হাড়ের একটা স্তূপে পরিণত হলো মমিটা।

'এবার নিশ্চয় খুশি হয়েছ!' ছুরিটা আবার তিনি রেখে দিলেন তাকের ওপর।

'না। এখন আপনি এই শুকনো লতাপাতাগুলো পোড়াবেন।'

বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলো হিটারের ওপর ফেলে দিলেন তিনি, তীব্র গন্ধে ভরে গেল ঘর।

'এবার যাও, রেহাই দাও আমাকে!' চেয়ারে এসে বসে হাঁপাতে লাগলেন হাসান সাহেব।

'আর ছোট্ট একটা কাজ। এটাই শেষ। পুড়িয়ে ফেলুন প্যাপিরাসগুলো।'

'না, না, এ-কাজ কোরো না!' একদম যেন ভেঙে পড়লেন হাসান সাহেব। 'তুমি বুঝতে পারছ না, কী অমূল্য বিদ্যা লুকিয়ে আছে এই প্যাপিরাসের পাতায়! পৃথিবীতে আমি—একমাত্র আমিই এই বিদ্যা অর্জন করেছি!'

'বের করুন। ডানপাশের ড্রয়ারে আছে, তাই না?'

'অনন্ত, এর মূল্য তুমি জানো না। যদি চাও, তোমাকে শেখাব আমি। তবু পোড়াতে বোলো না!'

ড্রয়ারটা খুলে ফেললাম আমি। 'বিদ্যা অর্জন প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু অশুভ বিদ্যা নয়।'

হলুদ প্যাপিরাসের পাতা ক'টা ফেলে দিলাম হিটারের ওপর। দেখতে দেখতে সেগুলো ছাই হয়ে গেল।

গুলি খাওয়া মুমূর্ষু মানুষের মত বসে রইলেন হাসান সাহেব।

নীচে নেমে বইপত্র নিয়ে চলে গেলাম ইমরানের বাসায়। পরদিন বাকি জিনিসগুলো আনতে গিয়ে শুনলাম, ভোর হতেই একটা সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন হাসান সাহেব। যাবার সময় দশ হাজার টাকা দিয়েছেন আফাজ বুড়োকে। বলেছেন, বিদেশ চলে যাচ্ছেন তিনি, আর কোনওদিনই ফিরবেন না বাংলাদেশে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন বলে যাননি।

ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠতে কেটে গেল চিন্তাসূত্র। রিসিভার তুলতেই ধমকে উঠল রুনি, 'ক'টা বাজে খেয়াল আছে? আব্বা-আম্মাসহ আমরা সবাই বসে আছি। না, তোমার কাণ্ডজ্ঞান আর কোনওদিনও হবে না। রুহি, রুচি আর এমনি বলে না যে, গরমের চেয়ে ঠাণ্ডা খাবারই দুলাভাইয়ের বেশি পছন্দ!'

'আসছি, এক্ষুণি আসছি,' নামিয়ে রাখলাম রিসিভার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। সারাদিন আকাশের মাথায় থাকা মেঘ এতক্ষণে নেমে এসেছে পায়ে। গ্যারাজ পর্যন্ত যাওয়া যাবে না, কারটাকে আনতে হবে দরজার মুখে। ড্রাইভারকে ডাকলাম আমি, 'জামাল, জামাল...'

খসরু চৌধুরী

[বিদেশী কাহিনির ছায়া অবলম্বনে]

তৃতীয় রাত্রি

পাহাড়ি নদীটা ভীষণ খরস্রোতা। ছোট স্টিমার কিংবা ইয়ট দ্বীপের গায়ে ভেড়ানো খুবই কঠিন। আটলান্টিকে গিয়ে পড়া নদীটার মোহনাও অনেক চওড়া। এপার থেকে ওপারের কিছুই দেখা যায় না। আর যা ঘূর্ণি, দেখলে ভয়ে হিম হয়ে আসে রক্ত।

উজানে চলেছি আমরা। খুব সাবধানে না এগুলে যে কোনও মুহূর্তে ভয়ানক বিপদ ঘটে যেতে পারে। মাঝে মাঝে ডুবো চরাও আছে। স্টিমার আটকে যাবার ষোলোআনা সম্ভাবনা। নকশা দেখে অত্যন্ত সাবধানে বাঁ তীর ঘেঁষে এগোতে লাগলাম আমরা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও দ্বীপ থেকে প্রায় দু'শো গজ দূরে থাকতেই ওরকম এক চরায় আটকে গেল স্টিমার। ভাবছি কী করে পৌঁছানো যায় দ্বীপটাতে। এমন সময় শালতি চালিয়ে একজন নিগ্রো ছেলে এগিয়ে এল আমাদের কাছে।

ছেলেটাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, দ্বীপটাতে তা হলে মানুষ আছে!

আশপাশটা খুব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম। নীল সমুদ্রের পানি খাঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে বাদামি হয়ে গেছে। বিশাল সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে দ্বীপের গায়ে। বিস্তীর্ণ নদী মোহনায় ভাসছে বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি। দূরে সবুজ গভীর জঙ্গল। চারপাশে কেমন যেন থমথমে বিষণ্ণ আর গুমট। বাতাস এত স্যাঁতসেঁতে, মনে হচ্ছে শরীর ভিজিয়ে দেবে। পুরো পরিবেশটাই আমার কাছে মনে হলো অশুভ। তবু নামতে হবে ওই দ্বীপটাতে। খাবার পানি না মিলে সেন্ট পল দ্য লোয়ান্দায় পৌঁছুতে পারব না।

আমার একমাত্র সঙ্গী বুড়ো নাবিক প্যাটারসনকে নোঙর ফেলতে বললাম। স্টিমারের গায়ে শালতি ভিড়তেই বড় কাঠের একটা পিপে নিয়ে উঠে পড়লাম তাতে। মিনিট দশেক বাদেই ওটা দ্বীপে এসে পৌঁছল। খাড়া ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতেই চোখে পড়ল 'আর্মিটেজ অ্যাণ্ড উইলসন' কোম্পানির সাইনবোর্ড। সাদা চুনকাম করা টানা বারান্দাঅলা নিচু ঘর। বড় বড় কাঠের পিপেয় বারান্দাটা ভর্তি। সৈকত জুড়ে সাজানো তালের ডিঙি আর শালতি। ছোট্ট একটা জেটিও রয়েছে। সাদা পোশাক পরা দু'জন ইংরেজ এগিয়ে এলেন। দশাসই চেহারার একজন অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। অদ্ভুত ধূসর তাঁর দাড়ি। অন্যজন লম্বা ছিপছিপে, গোমড়ামুখো। ব্যাঙের ছাতা আকৃতির বিরাট টুপিতে মুখের অর্ধেকটাই ঢাকা

পড়েছে।

'আপনাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হলাম,' টুপি পরা ভদ্রলোক আগে কথা বললেন। 'আমি ওয়ালকার। আর্মিটেজ অ্যাণ্ড উইলসন কোম্পানির কর্মচারী। আর ইনি এই কোম্পানির ডাক্তার। মিস্টার সেভারাল। ওরকম কোনও ইয়ট আমরা বহুদিন চোখেও দেখিনি।'

'আমি মেলড্রাম,' হাসিমুখে বললাম। 'জাহাজটার মালিক। ওটার নাম গেমকক।'

'শখের ভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি?' ওয়ালকারই জিজ্ঞেস করলেন।

'তা বলতে পারেন। প্রজাপতি সংগ্রহ আমার নেশা। সেনেগালের পশ্চিম উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করেছি।'

'জায়গা বাছাই আপনার ঠিকই হয়েছে,' মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার সেভারাল।

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, এরই মধ্যে প্রায় চল্লিশটা বাক্স ভরে গেছে। আপনাদের এই দ্বীপে নেমেছি খাবার পানি নিতে। তবে খাবার পানির সঙ্গে যদি নতুন কোনও প্রজাপতির খবর পাই...'

'অবশ্যই পাবেন। ওগোওয়াই নদীর মুখে প্রচুর প্রজাপতি আছে। সবে গুটি কেটে বেরিয়েছে ওগুলো। থাকুন না দু'চারদিন আমাদের এই দ্বীপে। আপনি যে দয়া করে এখানে এসেছেন তাতে আমরা সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আসলে কি জানেন, গল্প-গুজব করা তো দূরের কথা, সাদা চামড়ার সভ্য মানুষ দেখার ভাগ্যটাও হয় না।'

কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চললাম। জেটিতে শালতি বেঁধে নিগ্রো ছেলেটাও যোগ দিল আমাদের সাথে।

'এখানে তা হলে আপনারা খুবই নিঃসঙ্গ?' ডাক্তারকে বললাম।

'হ্যাঁ। আগে খুবই অসহ্য লাগত। এখন অবশ্য সয়ে গেছে। কাজে ব্যস্ত থাকি সারাদিনই। সন্ধের পরপরই অবসর তো, সময়টা কাটতেই চায় না।'

'ওই সময়টা তা হলে কী করেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সাধারণত দু'জনে গল্পগুজব করি কিংবা মদ খাই। ওয়ালকারের আবার রাজনীতিতে দারুণ ঝোঁক। এসবের ওপর লেখাপড়াও করে প্রচুর।'

দ্বীপ সম্পর্কেও অনেক কিছু জেনে নিলাম। এখানকার আবহাওয়া সারা বছর প্রায় একই রকম থাকে। দিনে অসম্ভব গরম। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামে যখন-তখন। হঠাৎ করে হাড়-কাঁপানো জ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলে। সিয়েরা লিয়োন থেকে উপকূল ধরে যতই সামনে এগিয়েছি, ততই দেখেছি এই জ্বরের প্রকোপ।

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই রেডি হয়ে যাবে রাতের খাবার,' বললেন ডাক্তার সেভারাল। 'এসপ্তাহে খাবার-দাবার তদারকির ভার পড়েছে ওয়ালকারের ওপর। চলুন না, আমরা ততক্ষণে ঘুরে দেখি দ্বীপটা।'

ডাক্তারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিমের আকাশ তখনও রাঙা হয়ে আছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন তুলল সারি সারি পাম গাছের পাতায়। সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। অনবরত কথা বলে চলেছেন ডাক্তার।

'এখানে খুবই নিঃসঙ্গ আমরা। তবে জীবনটা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। রোমাঞ্চও আছে যথেষ্ট। অজানা যত রহস্যের মধ্যে বাস করছি বলতে পারেন। ওই যে দূরে গভীর বনটা দেখছেন না?' উত্তর-পুব দিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি। 'ওটা হলো দু'চাইলুর বন। গরিলা আছে অনেক। গ্যাবুন, ভালুক আর বনমানুষও আছে। আর এ পাশের এই বন,' দক্ষিণ-পুব দিকে দেখালেন তিনি, 'এই বনের ভেতর দিয়েই বয়ে এসেছে নদীটা। গভীর রহস্য ঢাকা বন। এখন পর্যন্ত কোনও সভ্য মানুষ যেতে পারেনি ওখানে। নদী মোহনাতে যেসব কাঠের গুঁড়ি ভাসতে দেখেছেন, ওগুলো এসেছে ওই বন থেকেই। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর আমার একটু পড়াশোনা আছে—মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত ধরনের অর্কিড গাছপালা ভেসে আসে, যার কোনও নাম-নিশানাই আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বইয়ে দেখিনি। সভ্য মানুষের কাছে যা কল্পনারও অতীত।' বলতে বলতে রহস্যঘন হয়ে ওঠে ডা. সেভারালের চোখ আর কণ্ঠস্বর। ফিসফিস করে বললেন, 'অজানা ওই বনটাই টিকিয়ে রেখেছে আমাদের ব্যবসা। ভেসে আসা ওই বনের শক্ত গুঁড়ি দিয়েই পিপে তৈরি করি আমরা।'

'কী গাছ ওগুলো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অনেক রকমের গাছ আছে। সেগুনই বেশি। এই যে এসে গেছি।'

তাকাতেই দেখি সামনে সাদা ঘরটা। কথা বলতে বলতে কখন যে ফিরে এসেছি লক্ষই করিনি।

'এটাই আমাদের পিপে তৈরির কারখানা,' একটু ইতস্তত করে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আচ্ছা, এই ঘরটা দেখে কি কিছু মনে হচ্ছে আপনার? এই, মানে—অশুভ কিছু?'

ঝট্ করে ঘরটার দিকে তাকালাম। সাদা রঙ করা কাঠের বেড়া। উঁচু টিনের চালা আর মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা মেঝে। ঘরের এক কোণে মেঝেতে মাদুর পেতে কম্বল বিছিয়ে বিছানা করা। পাশে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার ছাড়া পুরো ঘরটাই খালি। বললাম, 'কই না তো। তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, আর দশটা ঘরের মত খুবই সাধারণ দেখতে এই ঘরটা; কিন্তু তবু অসাধারণ। আজ আমি একা এই ঘরে থাকব। ওই বিছানায় ঘুমাব। ভাবতেই ভয় লাগছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভীতু নই।'

'এমন করে বলছেন কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছুদিন ধরে এখানটাতে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে। আপনি ভেবেছেন এখানকার জীবন একঘেয়ে। কিছুদিন দ্বীপটায় কাটালেই বুঝতে পারবেন, উত্তেজনা আর রহস্যের কোনও অন্ত নেই এখানে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে আজব কুয়াশায় ঢেকে যায় পুরো দ্বীপ। এখানকার লোকে একে বলে জ্বর-কুয়াশা। নদীর ওপারের জলাটা দেখুন।'

ছোট ছোট ঘন ঝোপ-ঝাড় থেকে উঠে আসছে চাপ চাপ বাষ্প; চওড়া নদী পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকে। বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে।

'চলুন, রাতের খাবারের ঘণ্টা পড়েছে। আর হ্যাঁ, এই ঘরটা সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে পরে না হয় শুনবেন।'

'আগ্রহ বলছেন কী? আমি তো শোনার জন্য রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছি।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন তিনি। খালি ঘরটার দিকে ওঁর মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকা, রাত কাটানোর কথাতে তাঁর ভয় আর সতর্কতার অভিব্যক্তি আমাকে প্রচণ্ড আগ্রহী করে তুলেছে।

'কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম,' বললাম আমি।

'বলুন না।'

'শ্রমিকদের থাকার যে কুঁড়েঘরগুলো দেখালেন, সেখানে যে কাউকে দেখলাম না?'

'ওরা রাতে ঘুমানোর জন্য ওই জাহাজটায় চলে গেছে।'

তাকিয়ে দেখি নদীর পারের খাঁড়িতে একটা ভাঙা জাহাজ পড়ে রয়েছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই ভাঙা জাহাজে থাকে? কেন? তা হলে ওদের থাকার জন্য এই কুঁড়েগুলো বানানোর দরকার ছিল কী?'

'কয়েকদিন আগেও ওরা এখানেই থাকত। প্রাণের ভয়ে এখন আর থাকে না। রাতে এই দ্বীপে এখন ওয়ালকার আর আমি ছাড়া কেউ থাকে না।'

'কীসের ভয়?'

'চলুন, খেতে যাই। খাওয়া-দাওয়ার পর সবই বলব আপনাকে।'

খাবার আয়োজনটা বেশ যত্ন সহকারেই করা হয়েছে। বন তিতিরের ঝাল মাংস আর লাল আলুর চাটনি। বেশ সুস্বাদু। খাবার পরিবেশন করল সিয়েরা লিয়োনের একটি ছেলে। এ ছেলেটি ভয়ে আর সবার মত পালায়নি দেখে অবাকই হলাম। খাওয়া শেষ হলো। মদ ঢেলে দিল সে। তারপর নিজের মাথার পাগড়িটা ঠিক করে বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, আপনাদের কি আর কিছু লাগবে?'

'না, মাউসা, আমাদের আর কিছুই লাগবে না,' বললেন ওয়ালকার। 'আমার শরীরটা ভাল না। আজ রাতটা কি তুমি আমার কাছে থাকবে?'

মুহূর্তে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ছেলেটির মুখ। 'না-না, স্যর! আমাকে মাপ করুন।' ককিয়ে উঠল সে 'আপনি বরং আমাদের জাহাজটাতে চলুন। সারারাত জেগে আমি আপনার সেবা করব।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আর শোনো, ভয় পেয়ে কর্তব্যে অবহেলা কোনও ইংরেজ করে না।'

'আজকে আমাকে মাপ করবেন, স্যর। গতকাল কিংবা আগামীকাল হলেও না হয় কিছু একটা করতাম। কিন্তু আজ যে তৃতীয় দিন। আজ আমি কোনও

কিছুর বিনিময়েই এই দ্বীপে থাকতে পারব না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়ালকার। 'তুমি না থাকলে তো আর আমরা জোর করতে পারি না। তুমি রেডি থেকো, ফার্স্ট মেল-বোট এলেই তোমাকে সিয়েরা লিয়োনে চলে যেতে হবে। বিপদের সময় যাকে দিয়ে সামান্যতম উপকার হয় না, তেমন কর্মচারীর দরকার নেই আমাদের।'

চাকরি যাবার ভয় দেখিয়েও কোনও লাভ হলো না। কিছুতেই রাজি হলো না সে।

'সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত, দেখলেন তো? আপনি নিশ্চয়ই ডাক্তারের কাছ থেকে সব শুনেছেন?'

'না, ওয়ালকার। ওঁকে এখনও কিছুই বলিনি,' বললেন ডাক্তার। 'পিপে তৈরির কারখানাটা শুধু দেখিয়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখে তো মোটেও সুস্থ মনে হচ্ছে না। আবার জাঁকিয়ে জ্বর আসছে নাকি, হে?'

'হ্যাঁ। সারাটা দিনই কেমন খারাপ লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যেন হাজারটা কামানের গোলা ফাটছে। প্রায় দশ গ্রাম কুইনিন খেয়েছি। কানের মধ্যেও ভোঁ ভোঁ করছে,' ম্লান হেসে বললেন তিনি। 'তুমি চিন্তা কোরো না। অসুস্থ হলেও তোমার সঙ্গে কারখানায় থাকব আমি।'

'না-না, ওয়ালকার,' বাধা দিলেন ডাক্তার। 'খারাপ শরীর নিয়ে তোমাকে ওখানে ঘুমোতে যেতে হবে না। তুমি বরং এখনই তোমার বিছানায় শুয়ে পড়। আমি একাই থাকব কারখানায়।'

মি. ওয়ালকারের ফোলা ফোলা মুখ, টকটকে লাল চোখ আর অতিরিক্ত কাঁপুনিতে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে দেখে বুঝলাম, এই সেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের ম্যালেরিয়া। যা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলে।

ডাক্তার আর আমি ওয়ালকারকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। একটা কড়া ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে দিলেন ডাক্তার, যাতে রাতে ঘুম ভেঙে কষ্ট না পান।

'চলুন, ক্যাপ্টেন, আমরা খাবার ঘরে বসে আরেকটু কথা-টথা বলি।'

গ্লাসে নতুন করে মদ ঢেলে মুখোমুখি বসলাম আমরা।

'সারা বছরই আমাদের দু'জনের এই একই পালা চলে আসছে,' বললেন ডাক্তার। 'ওর শেষ হলেই ধরবে আমাকে। তবে ভাগ্য ভাল যে এক সঙ্গে দু'জনে কখনও পড়িনি। আজ রাতে বেচারাকে একাই থাকতে হবে। খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু কোনও উপায় নেই, আজ ভয়ঙ্কর এক রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। ওই কারখানা ঘরে বসে রাত জেগে পাহারা দেব। আজ আমাকে জানতেই হবে, কুলিদের মনে কেন এত ভয়। কেন তারা সূর্য ডোবার সাথে সাথে দ্বীপ ছেড়ে পালায়।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি শুনতে থাকলাম ডাক্তারের কথা। তিনি বললেন, 'পিপে-টিপে যাতে চুরি না হয়, তাই কারখানা পাহারা দেয়া হয়। আজ থেকে ছয়

দিন আগে একজন আফ্রিকান রাতে পাহারায় ছিল। সকালে আর তার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কোনও শালতি কিংবা ডিঙিও খোয়া যায়নি যে ভাবব সে পালিয়েছে। আর সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করা তো আত্মহত্যার সামিল। কারণ কুমিরে গিজগিজ করছে নদী। জলজ্যান্ত মানুষটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এ-ঘটনার ঠিক তিন দিন পর অর্থাৎ আজ থেকে তিন দিন আগে আবারও একজন গার্ড গায়েব হয়ে গেল। সেই একই অবস্থা। কোনও পাত্তা নেই। ওয়ালকার আর আমি এই ঘটনাটা যেভাবেই দেখি না কেন, স্থানীয় কর্মচারীরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। ওদের ধারণা, এটা কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার।'

'তা কী করে সম্ভব?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সেটাই তো রহস্য। কোনও যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। সবারই বিশ্বাস, দৈত্য-দানবের কাজ। তিন দিন পর-পর তার জ্যান্ত মানুষ প্রয়োজন। এটা মাথায় ঢোকার পর থেকে আর কোনও মতেই ওরা দ্বীপে থাকতে রাজি নয়। এই মাউসা ছেলেটার কথাই ধরুন, খুবই বিশ্বাসী আর অনুগত দেখলেনই তো, সেও কোনও মতেই রাজি হলো না। ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হয়ে উঠেছে। এ রহস্যের সমাধান তাই করতেই হবে আমাকে। আজকে এসেছে সুযোগ। আরেকটা তৃতীয় রাত। নিজেই আজ টোপ হতে যাচ্ছি। তা ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখি না।'

'কোনও সূত্রও কি পাননি? যেমন—ধস্তাধস্তি, পায়ের দাগ অথবা রক্ত-টক্ত?'

'নাহ্! কিচ্ছু পাইনি।'

'আশ্চর্য! যা বুঝলাম, আপনার একার জন্যে খুব কঠিন হবে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'সত্যি করবেন? উফ্, বাঁচালেন!' ডাক্তার যেন পরম স্বস্তি পেলেন।

'যাই, জাহাজে গিয়ে জানিয়ে আসি, আজ রাতে আমি দ্বীপেই থাকব।'

'চলুন, আমিও আপনার সাথে যাই।'

ফেরার পথেই পশ্চিম আকাশে ঘনিয়ে এল ঘন কালো মেঘ। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া শুরু হলো। প্রচণ্ড গর্জনে ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল সৈকতে। থেকে থেকে গরম বাতাসের ঝাপটা মারতে লাগল মুখে।

'ঝড়ের গতিক দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে না,' বিড়বিড় করে বললেন ডাক্তার।

'কেন?' অবাক হলাম আমি।

'যে গরম বাতাস, বোঝাই যাচ্ছে নদীর ওপারের জঙ্গলে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ওই বৃষ্টির পানিতে ঢল নামবে নদীতে। তার ওপর আসছে জোয়ার। এমন পরিস্থিতিতে সমুদ্র যেভাবে ফুঁসে ওঠে, মনে হয়, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি দ্বীপটা।'

'কারখানায় যাবার আগে ওয়ালকারকে দেখে আসি।'

গাঢ় ঘুমে মরার মত পড়ে আছেন ওয়ালকার। তাঁর খাটের পাশের টেবিলে

এক গ্লাস লেবুর শরবত করে রাখলেন ডাক্তার। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কারখানার পথ ধরলাম। কারখানায় পৌঁছে লণ্ঠন জ্বাললেন ডাক্তার। তারপর সলজ্জ হেসে বললেন, 'বই, তামাক সবই আছে। খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

লণ্ঠনের আলোয় এতবড় ঘরটা আলোকিত হলো না, বরং কেমন যেন বিষণ্ন আর ম্লান মনে হলো। পাশাপাশি চেয়ার পেতে রাত জাগার জন্যে প্রস্তুত হলাম আমরা। আমার জন্য একটা রিভলভার আর নিজের জন্য একটা শক্তিশালী দোনলা বন্দুক বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন ডাক্তার। যাতে দরকার পড়লেই দ্রুত ব্যবহার করা যায় ওগুলো।

দেয়ালে কালো বড় বড় দুই ছায়া পড়েছে আমাদের দু'জনের। হালকা আলোয় ভৌতিক মনে হচ্ছে। আলো এত কম! শিরশির করে উঠল গা। ডাক্তারও বোধহয় ভয় পাচ্ছিলেন, তাই উঠে গিয়ে আরও দুটি মোমবাতি জ্বাললেন। আমার চেয়ে তিনি অনেক বেশি সাহসী। কোনও সন্দেহ নেই। তবু তাঁর মধ্যে অস্থিরতা লক্ষ করলাম। একটা বই খুলে পড়তে বসলেন। কিন্তু এক পাতাও পড়তে পারলেন না। অস্থিরভাবে তিনি বারবার তাকাতে লাগলেন এদিক-সেদিক। কাঠ হয়ে বসে আছি। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা যেন দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে আছে আমার বুকের ওপর। অশুভ রহস্যটা কল্পনার নানান রঙে রাঙিয়ে ভীত বিহ্বল করে তুলল আমাকে। যেন মৃত্যু দূতের প্রতীক্ষায় অনন্তকাল বসে আছি দু'জনে। কেমন তার চেহারা, কীভাবে সে আসবে কিছুই জানি না। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

ডাক্তারকে দুঃসাহসী মনে হলো। কী সাংঘাতিক! তিনি একাই থাকতে চেয়েছিলেন এই ঘরে! ওরে, বাপরে, পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদের বিনিময়েও এই ঘরে আমি একা রাত কাটাতে রাজি হতাম না।

অনন্ত যেন এই ভয়াবহ রাত। পানির স্রোতের ক্রুদ্ধ গর্জন। খেপা হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। ঝপাৎ ঝপাৎ করে ভেঙে পড়ছে মাটির চাঁই। একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে ঝিঁঝি পোকা। এত বিকট শব্দের মাঝে বসে আছি তবু মনে হচ্ছে নিদারুণ নিস্তব্ধ সব। হঠাৎ ডাক্তারের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল বইটা। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন থেমে গেল। সমস্ত রক্তস্রোত ছলকে উঠল বুকের মধ্যে।

চেয়ারে বসা থেকে ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন জানালার দিকে।

'কী-কি হয়েছে? ওদিকে কী দেখছেন?' এটুকুই কোনও মতে বলতে পারলাম।

'আপনি কি কিছুই দেখতে পাননি?' উল্টে আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কই, না তো। কিছুই দেখিনি। আপনি দেখেছেন? কী দেখেছেন?'

'স্পষ্ট কিছু দেখিনি। মনে হলো বাইরে কিছু একটা দ্রুত সরে গেল!'

দোনলা বন্দুকটা তাক করে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। আশপাশটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'কই, কিছুই তো দেখছি না!'

'হয়তো গাছের পাতা-টাতা নড়তে দেখেছেন। বাইরে যা ঝড়ের দাপট, এ

অবস্থায় ভূতেরাও বেরুতে সাহস পাবে না।' গুমট পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম আমি।

'তা হতে পারে,' বলে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মেঝে থেকে বইটা তুলে নিয়ে ফের পড়াতে মন দিতে চাইলেন। তা আর হলো না। থেকে থেকে অকারণেই তাঁর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে জানালার দিকে। আমিও তাকিয়ে আছি ওদিকেই।

প্রকৃতির তাণ্ডব আরও বেড়ে গেল। ঝড়ের প্রচণ্ড গতি দেখে মনে হলো, উড়িয়ে নিয়ে যাবে বুঝি এই ঘরটাও। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেই সঙ্গে মেঘের গর্জন। কান ফাটানো শব্দে আশপাশে কোথাও বাজ পড়ল। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে ঝলসে গেল চোখ। পরমুহূর্তে শুরু হলো বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। সমানে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়ের প্রলয়ংকর তাণ্ডব চলল কয়েক ঘণ্টা ধরে।

'ঈশ্বর! দ্বীপটা বুঝি ভেসেই গেল এবার,' আপন মনেই বললেন ডাক্তার। 'এমন বৃষ্টি হতে কোনওদিন দেখিনি। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অভিশপ্ত তৃতীয় রাতটা তো কেটে গেছে। ক্যাপ্টেন, দেখুন ভোর হয়ে গেছে।' উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন তিনি, 'যাক, বোকা লোকগুলোকে তো বলতে পারব, দেখো বেঁচে আছি আমরা!'

বাইরে তাকালাম। সত্যি সকাল হয়ে গেছে। থেমে গেছে বৃষ্টি। পরিষ্কার আকাশ। কলকল শব্দে গড়িয়ে চলেছে বৃষ্টির পানি। নদীতে গিয়ে পড়বে।

এতক্ষণ পর মনে পড়ল গেমককের কথা। সারারাত ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় একটুও মনে পড়েনি ওটার কথা। এই বৃষ্টিতে ভেসে যায়নি তো জাহাজটা!

আমার শুকনো মুখ দেখে তিনি বললেন, 'কফি খাওয়া যাক। যা ধকল গেছে রাতভর।'

কারখানা ছেড়ে খাবার ঘরে এসে ডাক্তার বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ওয়ালকারকে দেখে আসি।'

ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম কফি বানানোর জন্যে। চারপাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি। ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। দেখি তাঁর চোখের কোণে চকচক করছে পানি।

কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

ডুকরে উঠলেন ডাক্তার, 'ও আর নেই!'

ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। 'কী বলছেন আপনি? মি. ওয়ালকার মারা গেছেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'হ্যাঁ। মারা গেছে ওয়ালকার।'

ডাক্তারকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে ঢুকলাম শোবার ঘরে। আবছা অন্ধকার। বিছানায় শুয়ে রয়েছেন ওয়ালকার। মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছেন।

'সত্যি মারা গেছেন!' বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি।

'কয়েক ঘণ্টা আগেই,' শুকনো খসখসে কণ্ঠস্বর তার।

'কীসে? জ্বরে?'
'না!'
'তা হলে?'
'ওর বুকে চাপ দিয়ে দেখুন।'
বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দ্বিধা করলাম একবার। মি. ওয়ালকারের বুকে হাত রেখে আলতো চাপ দিলাম। চমকে গেলাম। এ-কী! তুলতুলে নরম! যেন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটা পুতুল!
'ব্যাপার কী?' অবাক হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
চুপ করে রইলেন তিনি।
'কী, কিছু বুঝতে পেরেছেন?'
ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার। 'বোধহয় পারছি। আসুন আমার সঙ্গে,' বলে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।
দরজার বাইরে বেরিয়ে মাটির দিকে তাকালেন। মোটেও খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। হাত তুলে দেখালেন তিনি। দরজার কাছ থেকে চলে গেছে মোটা একটা দাগ। যেন অনেক মোটা দমকলের পাইপ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভেজা নরম মাটির ওপর দিয়ে।
আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। 'কীসের দাগ?'
আমার কথা যেন কানেই যায়নি ডাক্তারের। তাকিয়ে রয়েছেন বনের দিকে। দাগটা সেদিকেই চলে গেছে। জ্বলে উঠল তাঁর চোখ। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এক মিনিট, আসছি।' বলে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বেরিয়ে এলেন হাতে বন্দুক নিয়ে। বললেন, 'আসুন।'
নীরবে তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। দাগটা অনুসরণ করে চললেন তিনি। এঁকে বেঁকে চলে গেছে চিহ্ন। অনুসরণ করতে কোনও অসুবিধে হলো না।
বেশি দূর যেতেও হলো না। বনের ভেতর শ'খানেক গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার। গাছপালা এখানে বেশ ঘন আর বড় বড়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে এবার শুধু চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওই দেখুন।'
দেখলাম। ধক্ করে উঠল বুক। মোটা একটা ডালে জড়িয়ে রয়েছে বিশাল কালো চকচকে একটা শরীর। মাথাটা বিরাট। গলার কাছটা ধূসর। ভয়ঙ্কর কুতকুতে দুটো চোখ। এত বড় সাপ আমি জীবনে দেখিনি।
আমাদের দেখেই পাক খুলতে শুরু করল সাপটা। মাথাটা ঝুলে পড়তে লাগল নীচের দিকে। শিকার দেখতে পেয়েছে। পুরোপুরি মানুষখেকো হয়ে গেছে ওটা।
দেরি করলেন না ডাক্তার। সোজা মাথাটা সই করে ট্রিগার টিপে দিলেন। ঝট্কা দিয়ে দোলনার মত দুলে উঠল একবার মাথাটা। তারপর পেণ্ডুলামের মত দুলতে লাগল এপাশ ওপাশ। মৃত্যু যন্ত্রণায় মোচড় খেতে গিয়ে আপনাআপনি খুলে গেল পাক। তারপর ঝুপ করে পড়ল মাটিতে।

'মরতে এত দেরি করছে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মরে গেছে। তবে আরও অনেকক্ষণ এরকম করবে। সাপ এমনই করে।'

'এটাই তা হলে সেই অশরীরী দানব? যার ভয়ে কাতর হয়ে আছে আদিবাসীরা?'

'হ্যাঁ। এবং ওয়ালকারের হত্যাকারী। তাঁকে পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে।'

'নিয়ে গেল না কেন তা হলে?'

'এসেছিল নেয়ার জন্যেই। শুরুতে কারখানার জানালায় উঁকি দিয়েছিল। আলো দেখে আর ঢোকেনি। ঢুকেছিল ওয়ালকারের ঘরে, মেরেওছিল তাকে। কিন্তু গেলার আগেই কোনও কারণে ঘাবড়ে গিয়ে পালায়। সম্ভবত বাজ পড়ার শব্দেই।'

'এই যে তৃতীয় রাত তৃতীয় রাত করলেন, ব্যাপারটা কী? ভূত-প্রেত তো আর নয়, ঠিক তিন দিন পর-পর নিয়ম করে আসত কেন?'

'সহজ ব্যাখ্যা। তিন দিনে হজম হয়ে যেত মানুষটা, যাকে শিকার করে নিয়ে যেত। খিদে লাগত, তখন আবার আসত নতুন শিকারের সন্ধানে।'

'তার মানে এলাকাটা এখন বিপদমুক্ত?' সাপটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এখনও নড়ছে ওটা। 'আরও তো সাপ থাকতে পারে?'

'না। এখানে এরকম সাপ নেই। ওটা এসেছে ওই ওদিক থেকে। বড় বড় দ্বীপ আছে, তাতে গভীর জঙ্গল। ওসব জায়গায় এরকম সাপ আছে বলে শুনেছি। নিশ্চয়ই খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে কোনও এক দ্বীপে। খোঁজ করতে করতে শেষে আটলান্টিক পেরিয়ে চলে এসেছিল এটা এখানে। চলুন, এক কাপ চায়ের এখন বড় দরকার। আর লোকজনকে ডেকে বলতে হবে, বিপদ কেটে গেছে। এবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে ওরা। ইস্, কী আতঙ্কই না ছড়িয়ে রেখেছিল শয়তানটা এতদিন!'

মূল: স্যর আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তর: ফারহানা নাতাশা

সম্মোহন

বছর তিনেক হলো সম্মোহনবিদ্যা বলতে গেলে সম্মোহিত করে রেখেছে আমাকে। কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়, মুমূর্ষু মানুষকে সম্মোহিত করা সম্ভব? সম্ভব হলে তাতে ভাল-মন্দ কোনও প্রতিক্রিয়া হয়? সম্মোহিত করে মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু পিছানো যায়? গেলে কতটা সময়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার জন্যে উতলা হয়ে উঠলাম আমি।

মনে পড়ে গেল বন্ধু এম. আর্নেস্ট ভ্যালডেমারের কথা। ভ্যালডেমার একাধারে সঙ্কলক, অনুবাদক এবং দার্শনিক। মানুষটা বেজায় রোগাটে। ডাক্তাররা ওকে যক্ষ্মারোগী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ মৃত্যু নিয়ে কোনও বিকার নেই ভ্যালডেমারের। একবারও এ নিয়ে আক্ষেপ করে না ও। কী হবে আক্ষেপ করে? এই একটি ঘটনা এড়ানোর ক্ষমতা মানুষকে দেননি ঈশ্বর।

ভ্যালডেমারকে যখন বললাম ওর ওপর সম্মোহনবিদ্যা খাটাতে চাই, আপত্তি তুলল না ও। আমেরিকায় ওর কোনও আত্মীয়ও নেই যে আপত্তি তুলতে পারে। ...শেষমেশ ঠিক হলো, ডাক্তার যেদিন বলবেন, ভ্যালডেমার আর চব্বিশ ঘণ্টা টিকবে, ভ্যালডেমার তখন ডেকে পাঠাবে আমাকে।

এসেও গেল সেই দিন।

ভ্যালডেমার আমাকে যে চিরকুটটা পাঠাল সেটা এরকম—

ডিয়ার পি,

আসতে পারিস। 'ডি' ও 'এফ' দু'জনেই নিশ্চিত—কাল মাঝরাতে মারা যাব আমি। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

ভ্যালডেমারের কাছে ছুটে গেলাম আমি।

মাত্র দিন দশেক দেখিনি ওকে, এই ক'দিনেই ওর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তা দেখে ভয়ই পেলাম। চেহারা সীসের রঙ ধরেছে, চোখজোড়া জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে বলতে গেলে আর দেহটা হয়ে গেছে পাটকাঠির মত। গলায়, বুকে প্রচুর কফ জমেছে বেচারার। এরপরও মানসিক ও শারীরিক শক্তি বজায় আছে ওর। আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন বালিশে হেলান দিয়ে নোটবুকে স্মৃতিকথা লিখছে ও। ডি ও এফ—দুই ডাক্তারই আছেন ভ্যালডেমারের সঙ্গে।

ভ্যালডেমারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে ডাক্তারকে দূরে নিয়ে গেলাম আমি। জানতে চাইলাম রোগীর অবস্থা। ওঁরা জানালেন বছর দেড়েক হলো ভ্যালডেমারের ফুসফুসের বাঁ দিকটা শক্ত হয়ে গেছে, ওটা এখন প্রায় অকেজো। ফুসফুসের ডান

দিকটাও আংশিক শক্ত হয়ে এসেছে। আর তার নীচের দিকটা? ভরে উঠেছে পুঁজ ও ছোট ছোট ঘায়ে; একটা জায়গা আবার জুড়ে গেছে পাঁজরের সঙ্গে। মাস তিনেক আগেও ফুসফুসের ডান দিকটায় এসব সমস্যা ছিল না। আসলে থাইসিস তো বটেই, অ্যানুরিজমও হানা দিয়েছে ওর ফুসফুসে।

দুই ডাক্তার চলে যেতে চাইলেন। তাঁদের নাকি করার মত আর কিছু নেই। তারপরও আমার অনুরোধে কথা দিলেন কাল রাত দশটার দিকে আরেকবার রোগীর কাছে আসবেন।

আজ সেই রাত।

পরীক্ষা চালাব আমি ভ্যালডেমারের ওপর।

এক পুরুষ ও এক মহিলা নার্স সবসময় আছে রোগীর কামরায়। তারপরও সাক্ষী হিসেবে নির্ভরযোগ্য কাউকে সঙ্গে রাখাটা জরুরী মনে হলো আমার। ...থিওডোর নামের এক মেডিক্যাল স্টুডেন্ট সঙ্গ দিতে রাজি হলো আমাকে।

ভেবেছিলাম, দুই ডাক্তার এসে পৌঁছলে কাজ শুরু করব। কিন্তু ভ্যালডেমারের তাগিদে আটটার দিকেই শুরু করতে হলো কাজ।

থিওডোরকে বললাম, আমি যা যা করব সে যেন লিখে রাখে। ...পরের প্যারা থেকে যা পড়বেন আপনারা, তা ওরই লেখা থেকে নেয়া।

রাত দশটার আগে বলতে গেলে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারলাম না আমি ভ্যালডেমারের ওপর।

দুই ডাক্তার এসে পড়েছেন ইতোমধ্যে।

একসময় দেখা গেল, শ্বাস-প্রশ্বাসের রেট স্বাভাবিক হয়ে এসেছে রোগীর। কিছুক্ষণ আগেও নাক ডাকার শব্দের মত শব্দ করছিল ওর হৃৎপিণ্ড, সেটাও থেমে গেল। ধীরে ধীরে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল ওর।

এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে সম্মোহনের চিহ্ন ফুটে উঠল ভ্যালডেমারের চেহারায়। ওর চোখের দৃষ্টি হয়ে এল স্বপ্নচারীর মত। আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। আরেকটু পর ঠোঁটে কাঁপ ধরল ওর। এই কাঁপুনি ঘুমের লক্ষণ। সামান্য পর সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল ভ্যালডেমার।

রাত বারোটা বাজল।

সবাইকে বললাম, রোগী সম্মোহিত হয়েছে কি না দেখতে।

দেখে শুনে ওঁরা বললেন, সম্পূর্ণ সম্মোহিত এখন ভ্যালডেমার।

কৌতূহলের সীমা রইল না দুই ডাক্তারের। ড. ডি ঠিক করলেন সারারাত থাকবেন রোগীর সঙ্গে। থিওডোর ও নার্সরাও রয়ে গেল। শুধু ড. এফ চলে গেলেন কাল ভোরে আসবেন বলে।

রাত তিনটের দিকেও দেখা গেল একইভাবে শুয়ে আছে ভ্যালডেমার। নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর। দু'চোখ বন্ধ। সারা অঙ্গ শক্ত এবং মার্বেল পাথরের মত ঠাণ্ডা। ...কিন্তু মোটের ওপর ওকে মৃত বলা যাচ্ছে না।

'ভ্যালডেমার, ঘুমোচ্ছিস?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কোনও জবাব এল না, তবে দেখলাম ওর ঠোঁট নড়ছে।

প্রশ্নটা আবার করলাম আমি। তারপর আরও একবার। একসময় সারা শরীরে কাঁপুনি দেখা দিল ওর। দু'চোখের পাতা খুলে গেল; দেখা গেল চোখের সাদা অংশ। অনেকটা ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছি। জাগাসনে। আমাকে এভাবেই মরতে দে।'

'বুকে ব্যথা আছে এখন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না...আমি মারা যাচ্ছি।'

ওকে আর বিরক্ত করলাম না।

ভোরে ড. এফ এলেন।

রোগী এখনও বেঁচে আছে দেখে হতবাক তিনি।

ভ্যালডেমারের কাছে এসে তিনি জানতে চাইলেন, 'ভ্যালডেমার, এখনও ঘুমোচ্ছেন?'

জবাব এল না ভ্যালডেমারের তরফ থেকে।

একই প্রশ্ন আমি যখন চতুর্থবার করলাম তখন জবাব দিল সে, 'হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছি...মারা যাচ্ছি আমি।'

ডাক্তাররা বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে ভ্যালডেমার, ওকে আর বিরক্ত না করাই ভাল।

কিছুক্ষণ বাদে লক্ষণীয় বেশ কিছু পরিবর্তন দ্রুত দেখা দিল ভ্যালডেমারের মধ্যে, চোখ খুলে গেল ওর। ওপরদিকে উঠে গেল মণি। মড়ার রং ধরল চামড়া। গালের গোল গোল দাগগুলো অস্বাভাবিক দ্রুত মিলিয়ে গেল। হাঁ হয়ে গেল মুখ। বেরিয়ে এল দাঁতের ওপরের পাটি, আর কালো জিভ। ...ক্রমে আমরা যারা উপস্থিত আছি, তারা সবাই মৃত্যুপথযাত্রীর আতঙ্কের সঙ্গে পরিচিত, তারপরও ভ্যালডেমারের এহেন চেহারা দেখে পিটটান দেবার প্রবণতা দেখা দিল সবার মধ্যে।

মনে হলো, ভ্যালডেমার আর বেঁচে নেই। কিন্তু হঠাৎই জিভ নড়ে উঠল ওর।

আমি ওকে শেষবার প্রশ্ন করেছিলাম, ঘুমাচ্ছে কি না। জবাব দেয়নি সে।

এখন দিল। ওর কণ্ঠস্বর মনে হলো বহুদূর থেকে ভেসে এল। এই কণ্ঠস্বরকে কিছুতেই পার্থিব বলে মেনে নিতে পারলাম না আমি। যেন কোনও কণ্ঠস্বর শুনিনি—চটচটে, ঠাণ্ডা কিছু ছুঁয়েছি।

ভ্যালডেমার অপার্থিব কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ...না...ঘুমাচ্ছিলাম...এখন...আমি মৃত।'

কথা ক'টা কতটা ভয়ঙ্কর জানি না, থিওডোর তৎক্ষণাৎ মূর্ছা গেল। নার্সরা আর এক সেকেণ্ডও দেরি না করে কেটে পড়ল, কিছুতেই ফিরিয়ে আনা গেল না ওদের।

প্রায় ঘণ্টা খানেক চেষ্টা করে থিওডোরের সংজ্ঞা ফেরালাম আমি। দু'জনে মনোযোগ দিলাম সম্মোহিত রোগীর দিকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে না ওর। হাত-পা নাড়াতে পারলাম না কিছুতেই। হাত থেকে রক্ত বের করতে গিয়েও ব্যর্থ হলাম। ওর ওপর সম্মোহনের একমাত্র যে

লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তা স্রেফ জিভের কাঁপনেই সীমাবদ্ধ। কোনও প্রশ্নের জবাব দিল না ও আর, মনে হচ্ছে চেষ্টা করেও পারছে না।

অনেক বুঝিয়ে নার্সদের ফিরিয়ে আনা হলো।

সকাল দশটার দিকে দুই ডাক্তার ও থিওডোরকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি।

বিকেলে আবার রোগীকে দেখতে গেলাম আমরা। আলাপ-আলোচনা শেষে ঠিক করলাম, ওকে জাগাব না। সম্মোহনের জোরে এখনও বেঁচে আছে ও, জাগালেই নির্ঘাত মারা যাবে।

এরপর টানা সাত মাস সম্মোহিত অবস্থায় রেখে দিলাম আমরা ভ্যালডেমোরকে। প্রতিদিন দেখে এলাম ওকে। নার্সরাও তাদের দায়িত্ব পালন করল ঠিকমত।

শেষমেশ গত শুক্রবার ভ্যালডেমারকে জাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। এভাবে একটা মানুষকে আর কত ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়?

দীর্ঘ সময় ধরে সম্মোহিত ভ্যালডেমারের ঘুম ভাঙাতে বেগ পেতে হলো। চোখের মণি স্বাভাবিক জায়গায় নেমে এল ওর। বোঝা গেল সম্মোহন কাটতে শুরু করেছে। এসময় ওর চোখের ভেতর থেকে হলদে একটা তরল বেরিয়ে এল; ভয়ানক দুর্গন্ধ সেই তরলের।

'কেমন আছিস এখন, ভ্যালডেমার?' ড. এফের পরামর্শে প্রশ্ন করলাম আমি। 'কিছু লাগবে?'

সাত মাস আগের গোল গোল দাগগুলো আবার ফুটে উঠল ওর গালে। দ্রুত জিভ নড়তে লাগল মুখের ভেতর; কিন্তু ঠোঁট দুটো আগের মতই অনড়।

আচমকা ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর বেরোল ভ্যালডেমারের গলা দিয়ে, 'ঈশ্বরের দোহাই...আমাকে জাগিয়ে তোলো...নয়তো ঘুম পাড়াও...জলদি...জলদি...বলেছি তো আমি মারা গেছি...'

স্নায়ুর ওপর দখল হারিয়ে ফেললাম আমি। প্রথমে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করলাম ওকে, কিন্তু মানসিক বিক্ষিপ্ততার কারণে তা আর সম্ভব হলো না। অগত্যা ওকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করলাম দ্রুত।

'মারা গেছি', 'মারা গেছি' বারবার বলে চলেছে ভ্যালডেমার। কিন্তু ঠোঁট নড়ছে না ওর।

একটু পরই দেখতে দেখতে ভ্যালডেমারের দেহটা কুঁকড়ে, পচে-গলে একতাল থলথলে পদার্থে পরিণত হলো আমাদের চোখের সামনে।

মূলঃ এডগার অ্যালান পো
রূপান্তরঃ শামীম হোসেন

মৃত্যু

অন্ধ বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। বহুকাল আগের পচে যাওয়া রক্তের গন্ধ।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম।

মেহগনি কাঠের পুরানো সিঁড়িটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে কালো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। বাতাস ভারি হয়ে আছে অসহনীয় নোন্‌তা গন্ধে। কীসের গন্ধ বলতে পারব না, শুধু এটুকু বুঝতে পারছি বুড়োটার মত আমারও স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছে। ভয় নামের আদিম অনুভূতিটাকে সবে জানতে শুরু করেছি। জানি না এর শেষ কোথায়।

অনেকে বলে সিঁড়ির মাথায় যে ঘরটা আছে সেটা নাকি কিমিয়া বিদ্যার গুপ্তঘর। গুপ্ত, কারণ এর মালিক কাউকে কখনও বলেননি ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে। অথবা বলতে চাননি বলা ভাল। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক কুয়াশায় ঘেরা–তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করবে এমন ইচ্ছা কারও মনে জাগেনি কখনও। এখনও জাগে কি না জানি না।

'লোকটা কি বেঁচে আছে?' জানতে চাইলাম।

'বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ওর সাড়াশব্দ পেতাম, গলার আওয়াজ শুনতাম।'

'ও তা হলে আত্মহত্যা করেছে। ঘরের ভেতর ঢুকলেই দেখবেন ওর পচে গলে যাওয়া শবদেহ কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে–জিভ উল্টিয়ে পড়ে আছে।'

'এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু আশঙ্কা করছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো আমার আশঙ্কা যেন সত্যি না হয়,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল বুড়ো।

আমি হাসার চেষ্টা বললাম, 'প্রার্থনায় কিছু হবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে গেছে, এখন শুধু অপেক্ষা।'

'আমরা কি উপরে উঠব?' হঠাৎ জানতে চাইল বুড়ো। বুড়োর গলার স্বর আগের চেয়ে ক্ষীণ হয়েছে। বুঝতে পারলাম ওর আত্মবিশ্বাস দ্রুত কমে আসছে। চোখে যারা দেখে না তাদের মনের জোর কমে গেলে বিপদ।

'আমাদের ওখানেই গন্তব্য, ওখানেই নিয়তি,' তর্জনী উঁচিয়ে সিঁড়ির শেষ মাথা ইঙ্গিত করে বললাম। 'নিয়তিতে যদিও খুব একটা ভরসা নেই, তবু আমি যাব। দেখব বন্ধ ঘরের রহস্যটা কী।'

'রহস্যটা কী তা কি তুমি জানো না?'

'না।'

'তিন সত্যি?'

'তিন সত্যি।'

বুড়ো চিন্তিত স্বরে বলল, 'এত রাতে কেন এখানে জমায়েত হয়েছি তার কারণ আমরা দু'জনেই জানি। অথচ মুখ ফুটে কথাটা কেউই বলছি না। আমরা কি তা হলে ভয় পাচ্ছি?'

'হয়তো।'

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। আমি নিশ্চিত ওর মাথায় কোনও একটা প্রশ্ন ঘুরছে।

'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে সিঁড়ির মাথার ওই ঘরটায় মৃত্যুকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে?'

'হয়তো।' আমি হাসলাম।

আমার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো। খানিকটা শিউরে উঠল যেন। আমি সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলাম। বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর একটা হাত আমার বাহু শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়বে না কিছুতেই।

'সিঁড়ির অবস্থা ভাল না। ভেঙে গেলে বিপদ হবে।'

'কুছ পরোয়া নেহি। আমি তো আপনার সাথে আছি। মৃত্যু রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত আপনার পিছু ছাড়ছি না।'

অন্ধ বুড়ো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কি না বোঝা গেল না। ধীর পদক্ষেপে আমার সাথে সিঁড়ি বাইতে লাগল। এই বুড়ো এককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিল; বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যাপারে রীতিমত পণ্ডিত। বেশ কয়েক বছর ধরেই কিমিয়া বিদ্যা সংক্রান্ত কী একটা গোপন গবেষণা করছিল—উদ্দেশ্য মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন। মৃত্যু কী জিনিস, এটার অস্তিত্ব ভৌত না অভৌত, এর সম্পর্কে মানুষ কতটুকু জ্ঞানই বা লাভ করতে পারে—এসব নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালাচ্ছিল। সঙ্গী ছিল একজন মধ্যবয়স্ক অ্যালকেমিস্ট। এ লোকটা ছিল তুখোড়। একবার আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় বুড়ো চোখ দুটো খোয়ালে দু'জনের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর অ্যালকেমিস্ট নিজেই গবেষণা চালিয়ে যায়। তার ফল কী হয়েছে সত্যিই আমরা কেউ জানি না। বুড়োও না, আমিও না। শুধু জানি সিঁড়ির মাথার ওই ঘরটাতে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

'এবার কী?' চাপা উত্তেজনায় আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল বুড়ো।

আমাদের সিঁড়ি বাওয়া শেষ হয়েছে। একটা প্রকাণ্ড কালো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি দু'জন। দরজার রঙটা এতই কালো যে মাঝে মাঝে মনে হয় দরজার বদলে ওখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে, হাত বাড়ালে ঠিক স্পর্শ করা যাবে। আমরা আলো স্পর্শ করতে পারি কিন্তু অন্ধকার পারি না। আলো এবং অন্ধকার—দুটো কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়?

'এটাই তা হলে অ্যালকেমিস্টের গুপ্তঘর। আপনি এখানে আগে এসেছিলেন নাকি?' বুড়োর কাছে জানতে চাইলাম।

'না। এটাই আমার প্রথম আসা। তবে একটা চিঠিতে বলেছিল গুপ্তঘরে সে নাকি একটা বড় কাঁচের বাক্স জোগাড় করেছে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ ফুটের মত।'

'বা! বা! এত বড় বাক্স দিয়ে কী হবে?'

'জানি না।'

'হুম, বুঝেছি। আপনি বলতে চাচ্ছেন না। রাতের বেলা ভূতের নাম নিতে ভয় পাচ্ছেন।'

'কী বুঝেছ?'

'বাক্সটায় মৃত্যুকে ভরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুদ্ধি ভালই তবে বড্ড সেকেলে।'

বুড়ো তীব্র কৌতূহলে ফেটে পড়ে বলল, 'আমার আর তর সইছে না। চলো ভেতরে ঢুকি।'

'চলুন।' আমি দরজার হাতল ধরে টান দিলাম। মৃদু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীব্র কটু গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। কালো পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল বিষণ্ন এই কামরা। অদৃশ্য হলো আকাশের চাঁদ, তারা আর নির্জন পথ।

'অ্যালকেমিস্টের লাশটা দেখতে পাচ্ছ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো।

আমি ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'এ ঘরে কোনও মৃতদেহ নেই, তবে যা আছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কেমন যেন সব ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'বাস্তব অবাস্তব কেমন অদ্ভুত ছায়া যেন খেলে বেড়াচ্ছে চারধারে। বন্ধ আবহাওয়া। দম আটকানো একটা অনুভূতি। উদ্বেগ। স্নায়ুতন্ত্রের তারে যেন বিশাল পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। লাল রঙের সুদৃশ্য পানপাত্র দেখছি কয়েকটা ছড়িয়ে আছে এদিক সেদিক। চতুর্দিকে দেখছি কেবল বই আর বই। কয়েকটা লোহার প্রদীপ জ্বলছে টেবিলের ওপর। আর আর...' কথা শেষ হলো না। ঠিক তখনি একটা শব্দ আরম্ভ হলো। শক্ত জমিতে মৃদু ঠক ঠকালে যেমন শব্দ হয়, সেরকম।

'একটা শব্দ কানে আসছে না?'

'আমি একটা বাক্সের মত কী যেন সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালো চাদরে ঢাকা,' প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললাম।

'বলো কী?'

'আওয়াজটা সম্ভবত সেখান থেকেই আসছে।'

উত্তেজনায় ফেটে পড়ল বুড়ো। দুই হাত মাথার উপর তুলে সোজা বসে পড়ল। আমি লক্ষ করলাম বুড়োর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে গায়ের জামা। 'কাপড়টা সরিয়ে দেখ তো ওর ভেতর কী আছে,' গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলার চেষ্টা করল।

কাপড়টা সরিয়ে দিতে সময় লাগল না।

'কী দেখছ শিগ্‌গির বলো,' চিৎকার করে বলল বুড়ো।

ঠক ঠক শব্দ এখন থেমে গেছে। কাঁচের বাক্সের ভিতরটা এখন নিশ্চুপ।

'ড্যাম ইট। চুপ করে আছ কেন, বলো কী দেখতে পাচ্ছ?'

'এ কী দেখছি? এ-ও কি সম্ভব?'

চারদিকে বাতাস যেন পড়ে গেল। হঠাৎ করেই ঘরে নেমে এল কবরের নীরবতা। অন্ধ বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'তু-তুমি মৃত্যুকে দেখছ। সে দেখতে কেমন, রঙ কী, কী করছে–আমাকে বলো, সব খুলে বলো।'

'মৃত্যুর ছায়া চাঁদের মত। চাঁদ যখন দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে ঠিক সেই রকম। এ ছায়ার তুলনা কোনও মানুষের সাথে হতে পারে না। ছায়াটি অস্বচ্ছ, আকৃতিবিহীন এবং অনিশ্চিত। তার দেহের কী আদল সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তবে আমি নিশ্চিত, এই-ই মৃত্যু। এই ছায়া মৃত্যু ছাড়া আর কারও হতে পারে না। একটা অন্ধকার...' আমার কথা শেষ হলো না। অট্টহাসির শব্দে চমকে উঠলাম।

হেসে উঠেছে বুড়ো। তাকে দেখতে হঠাৎ বদ্ধ উন্মাদের মত মনে হলো। উষ্কখুষ্ক চুলে আঙুল বুলাতে বুলাতে হো হো করে হাসছে। হাসি যেন আর শেষ হতেই চায় না।

'হলো কী আপনার?'

'মৃত্যুকে সশরীরে বন্দি করতে পেরেছি এর চেয়ে আনন্দ আর আছে কী? আর কেউ আমাদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না জীবনের আনন্দ থেকে। মৃত্যু, তোমার খেল শেষ। এখন এ দুনিয়া শুধু মানুষের। অনন্তকাল রাজত্ব করব আমরা। অনন্তকাল। হা হা হা।'

বুড়োর হাসি আবার আরম্ভ হলো। এর মধ্যেই কাশতে কাশতে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলে বলো। মৃত্যুর বর্ণনা শুনি। ওকে নিয়ে কত কাজ আছে, কত গবেষণা পড়ে আছে। সে কি কথা বলতে পারে? যদি বলে সেই ভাষা কী? ওর গায়ের রঙটাই বা কেমন? হ্যাঁ, বলো, ছেলে, তুমি সব খুলে বলো, আমি শুনছি।'

'ভাষা কী সেটা তো বলতে পারব না। এর জন্যে কাঁচের বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে।'

মুহূর্তের মধ্যেই গম্ভীর হয়ে গেল বুড়ো। 'ও কথা ভুলেও বলবে না। মৃত্যুকে বহুকষ্টে বন্দি করা গেছে। ওকে মুক্ত করার কথা স্বপ্নেও আনবে না। খবরদার।' পরমুহূর্তেই আবার হাসিখুশি হয়ে গেল বুড়ো। আবারও ঠক ঠক শব্দ আরম্ভ হয়েছে। তবে এবারের ঠক ঠক শব্দটা আগের মত এলোমেলো নয়। অনেকটাই ছন্দোবদ্ধ।

মৃত্যুর শব্দ!

'মৃত্যু আমাদের কিছু বলতে চায়,' ফিসফিস করে বলল বুড়ো। 'আমরা অবশ্যই ওর কথা শুনব।'

শব্দের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে লাগল। আমি চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। শব্দটার একটা সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। ঠিক যেন কোনও গুপ্ত সংকেত। মোর্স কোড!

'বাহ! মৃত্যু দেখি মানুষের সংকেত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখে। কী বলছে কিছু বুঝতে পারছেন?' লক্ষ করলাম বুড়োর মুখের অভিব্যক্তি হঠাৎ করেই যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। হাতের ইশারা করে আমাকে থামিয়ে দিল।

'মৃত্যু আমাদের একটা কিছু বলতে চাচ্ছে। আমি ঠিক ধরতে পারছি না। প্রত্যেকটা "ঠক" কোনও একটা সুনির্দিষ্ট বর্ণ অনুসরণ করছে। বুঝতে পারছি না ঠিক কোন্ ভাষাটা ব্যবহার করব।'

'আমাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করুন না। চেষ্টা করে দেখি।'

'তার আগে তুমি সত্যি করে বলো মৃত্যু দেখতে কেমন? ভণিতা করবে না।'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'আপনাকে তো বলেইছি যে ওর বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। শুধু বলতে পারি ওর রঙ বলে যদি কিছু থেকে থাকে, সেটা অসম্ভব কালো। কুচকুচে কালো বলতে পারেন। আর তার ছায়া শরীরের গঠনের সাথে মানবদেহের সামান্য সাদৃশ্য আছে, যদিও তার ভাবভঙ্গি দেখে অনেকটা সরীসৃপের মত লাগছে। নাহ, ঠিক বুঝছি না।'

'আমার যদি চোখটা ঠিক থাকত!'–বিড়বিড় করে বলল বুড়ো; পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। 'যাই হোক, আমাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। নিজের ভাষা দিয়েই শুরু করি কি বলো?

'নিশ্চয়ই।'

বুড়ো খুব মনোযোগের সঙ্গে কিছুক্ষণ শোনার পর বলল, 'কয়েকটা বর্ণ ধরতে পারছি। আ, গ আর ম। আগম। এর আবার কী অর্থ হতে পারে?'

'আগম, আগম। নাহ, কিচ্ছু মনে হচ্ছে না। আপনি বরং আরেকটু ভাল করে শুনে দেখুন।'

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহুঁ, কাগজ কলম ছাড়া চলবে না। শব্দগুলো আগে পরে হয়ে যাচ্ছে।'

আমি টেবিলের উপর রাখা একটা বই থেকে পাতা ছিঁড়ে নিলাম। পেন্সিলও টেবিলেই পেলাম।

'আমি একটা একটা করে বর্ণ বলছি। তুমি চট করে লিখে ফেলো।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ণগুলো পাওয়া গেল। এলোমেলো কিছু উচ্চারণের মত সেগুলো শোনাল। আ, ম, র, ত, উ।

'এতে আবার কী হতে পারে? আ ম র ত উ–আমৃত্যু?'

বুড়ো হঠাৎ তার নিষ্প্রাণ দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকাল। যেহেতু অন্ধের চোখে মনের ছায়া পড়ে না তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ওর মনের ভেতর কী চলছে। তবে খুব ভাল কিছু যে নয় সেটা তার পরের কথাতেই বুঝতে পারলাম।

'এই শব্দ ওই বাক্সের ভেতর থেকে আসছে না। শব্দটা করছ তুমি, ওই কাঁচের বাক্সে টোকা দিয়ে।'

'আপনি কী বলতে চান?'

'বাজে বোকো না। ঠিক করে বলো।'

'এরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনার সাথে রসিকতা করব?' হাসার চেষ্টা করলাম।

'অন্ধদের কান খুব তীক্ষ্ণ হয়। এতক্ষণ উত্তেজনায় ব্যাপারটা মাথায় আসেনি, নইলে অনেক আগেই তোমার চালাকি ধরে ফেলতাম। আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'আপনি প্রাতঃস্মরণীয়,' আবার হাসার চেষ্টা করলাম।

'এত হিম্মত হলো কী করে আমার সাথে রসিকতা করার? তুমি কোন্ শয়তান?' হিসিয়ে উঠল বুড়ো।

'বলব?' আমি নিচু স্বরে খুব দ্রুত একটা কথা বললাম।

'কী...কী...?'

আমি বুড়োকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে তুলে পরম আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর কিছুক্ষণ হাঁসফাঁস, কিছুক্ষণ আর্তনাদ আর কিছুক্ষণ ধড়ফড়ানি চলল। এরকমটা অবশ্য আমার কাছে নতুন নয়। আগেও দেখেছি লোকে শেষ সময়ে এসে হাঁচড়েপাঁচড়ে আমার কাছ থেকে ছুটে যেতে চায়। আমার চেয়ে বড় আন্তরিকতা কে কবে দেখাতে পেরেছে বলুন তো?

'এটাই মৃত্যুর আলিঙ্গন, তাই না?'–ক্লান্ত হয়ে একসময় আমার কানে ফিসফিস করে বলল বুড়ো।

'মৃত্যু–আমৃত্যু–আমিই মৃত্যু, হা হা হা হা!'

আমি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাসতে লাগলাম।

আবদুল্লাহ্ ওমর সাইফ

এক বৃষ্টির রাতে

রাত দশটা। মোটর-বাইকে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ করে ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাইকটা বন্ধ করে রাস্তার একপাশে বৃষ্টির মধ্যে একটা বন্ধ কনফেকশনারি দোকানের বারান্দায় ছাদের নীচে দাঁড়ালাম। দেখলাম একটি যুবতী মেয়ে ভিজতে ভিজতে এসে বারান্দায় উঠল। বৃষ্টিতে যুবতীর সালোয়ার-কামিজ, ওড়না সব ভিজে গেছে। পিঠের মাঝ বরাবর খোলা চুল ভিজে গেছে। ওড়না দিয়ে মেয়েটি তার মুখ ও মাথার চুল মুছল। মেয়েটির লম্বাটে ফর্সা শরীর। ভেজা কামিজ মাংসল শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ভেজা শরীরে মেয়েটিকে দারুণ দেখাচ্ছিল। শরীর থেকে দামি পারফিউমের মিষ্টি সুবাস নাকে আসছিল। বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। থামার কোনও লক্ষণ নেই। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। বৃষ্টির ধরন দেখে মনে হলো সারা রাত ধরেই বৃষ্টি ঝরবে। মেয়েটা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। বেশ চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো তাকে। সে হয়তো ভাবছে বৃষ্টি যদি না থামে।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। একটা সিগারেট বের করে একটু নম্রতার ভঙ্গিতে বললাম, 'এক্সকিউজ মি, আমি একটা সিগারেট ধরাব। আপনার আপত্তি নেই তো?'

মেয়েটি হ্যাঁ বা না কিছু বলল না। সিগারেট খাওয়ার নেশাটা দমন করতে পারছিলাম না কিছুতেই। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি কিছু বলল না।

সিগারেট টানতে টানতে মেয়েটিকে বললাম, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'মহিষ বাথান,' মেয়েটি জানাল।

আমি বললাম, 'আমি যাব কোর্ট স্টেশনের দিকে। কিন্তু যদি বৃষ্টি না থামে, তা হলে কী করবেন?' কোনও রিকশাও চলছে না।

কয়েক মিনিট পর একটি হুড ফেলা রিকশা দেখে 'এই খালি,' বলে ডাকলাম।

রিকশাটি থামল না। লক্ষ করলাম রিকশাটি খালি নয়। একজন যাত্রী জবুথুবু হয়ে বসে আছে রিকশাতে। এরপর একটি খালি রিকশা দেখলাম। রিকশাওয়ালা পলিথিন গায়ে জড়িয়ে মাথায় ক্যাপ পরে রিকশা চালিয়ে যাচ্ছিল।

'এই খালি—মহিষ বাথান যাবে?'

রিকশাওয়ালা কিছু না বলে চলে গেল। রিকশাওয়ালারা আজকাল ওইরকম।

ওদের মেজাজ মর্জি বোঝা দায়। মেয়েটার জন্য একটা রিকশার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি। রাত ঘনিয়ে আসছে।

মেয়েটিকে ভীষণ চিন্তিত মনে হলো। মহিষ বাথান বেশ কয়েক কিলোমিটার। শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি কিছুটা কমল। মনে করলাম নেমে যাই রাস্তায়। বাইকে খুব জোরে টান দিয়ে চলে যাব। কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি কী করবে। এই বৃষ্টির রাতে কীভাবে এতদূর যাবে? অথচ সে মুখ ফুটে কিছু বলছে না।

নিজেই অযাচিত হয়ে বললাম, 'এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? কোনও যানবাহন নেই। কীভাবে যাবেন?'

মেয়েটি বলল, 'সেই তো, কী যে করি।'

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এরই মধ্যে নেমে পড়ব। আমার বাড়ি যেতে যেতে সবকিছু ভিজে যাবে। যাক। এভাবে তো সারারাত দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

মেয়েটিকে বললাম, 'আপনাকে আমি লিফট দিলে আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

মেয়েটির মুখে এক চিলতে হাসি ফুটল। বলল, 'আমাকে পৌঁছে দিলে তো খুব উপকার হয়।' সে আমার মুখের দিকে তাকাল। হয়তো বুঝতে পারল আমি যাই হই, গুণ্ডা-বদমাশ নই।

'ঠিক আছে, এবার নেমে পড়া যাক,' বললাম আমি।

পা দুটো বাম দিকে করে আমার বাইকের পিছনে বসল মেয়েটি। মোটর-বাইকে স্টার্ট দিয়ে জোরে ছুটলাম। কিছুদূর যেতেই আরও ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো।

ভিজে গেছি, যেখানে-সেখানে থামার দরকার নেই। মেয়েটিকে বললাম, 'কোথাও দাঁড়াব নাকি?'

মেয়েটি বলল, 'না, আপনি চালিয়ে যান।'

বাইক চালাতে চালাতে মেয়েটিকে বললাম, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

সে বলল, 'রানি বাজারে মামার বাসায় গিয়েছিলাম। বাসা থেকে বের হয়ে রিকশা নিয়ে মহিষ বাথান চলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোনও খালি রিকশা পেলাম না। তারপর হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারপর তো বুঝতেই পারছেন কী বিপদে পড়লাম। আপনি না থাকলে কী যে হত!'

'কী করা হয়?'

'মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি।'

'কোন্ সাবজেক্ট?'

'কেমিস্ট্রি। আপনি কী করেন?'

'এম.এ পাশ করে একটা বেসরকারি কলেজে ঢুকেছি। বাংলা পড়াই।'

'ভালই তো। কোন্ কলেজে আছেন?'

'নওহাটা কলেজে।'

ইতিমধ্যে মহিষ বাথান এসে গেছি। মেয়েটিকে বললাম, 'আপনাকে কোন্ জায়গাতে নামাব?' মেয়েটি একটি ফাঁকা জায়গার উপর একটি একতলা বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে বলল। বাড়িটার সামনে মেইন গেটের কাছে বাইক থামালাম। বাড়িটা হলুদ রঙের। বাড়ির চারদিকে সীমানা প্রাচীর।

মেইন গেটের দরজা খুলল মেয়েটি।

'আমি এবার আসি,' বলে ফিরে যাচ্ছিলাম।

মেয়েটি বলল, 'আপনি এত কষ্ট করে বৃষ্টির মধ্যে আমাকে নিয়ে আসলেন, একটু আসুন না আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে তেমন কেউ নেই, একমাত্র আমার মা ছাড়া।'

বৃষ্টি ততক্ষণে পুরোপুরি থেমে গেছে। আমি বাইকটা বাড়ির প্রাঙ্গণে রাখলাম।

মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'বাড়িতে আপনি আর মা ছাড়া কেউ থাকেন না মানে? বাবা নেই?'

মেয়েটি বলল, 'বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর হলো। আমরা দু'বোন। আমার কোনও ভাই নেই। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ঢাকায় থাকেন।'

'সংসার চলে কীভাবে?' বললাম আমি।

'বাবার পেনশন আর গ্রামের বাড়িতে কিছু জমিজমা আছে। এতে বেশ চলে যায় আমাদের।'

আমি চলে যাচ্ছিলাম। মেয়েটি বারবার অনুরোধ করল আমাকে বাড়ির ভিতরে যেতে। বলল, 'বৃষ্টিতে আপনি সম্পূর্ণ ভিজে গেছেন। শুকনো টাওয়েল দিয়ে একটু মাথা মুছবেন তো? তা না হলে শরীর খারাপ হবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে।'

'চুল না হয় মুছলাম। শার্ট-প্যান্ট তো ভিজে জবজবে। তার চেয়ে বরং তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল,' বললাম আমি।

মেয়েটি বলল, 'না না, তা কী করে হয়? আপনি আমাকে লিফট না দিলে কী যে হত! আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।'

বাইকটাকে বাড়ির লনে দাঁড় করালাম।

মেয়েটির সঙ্গে বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। মেয়েটি কলিং বেল টিপল। প্রায় ষাট বছরের এক মহিলা দরজা খুললেন। মহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে মেয়েটিকে বললেন, 'বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেছিস যে, শাহানা? তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পাল্টে নে।' এরপর ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কে, বাবা?'

আমি মহিলাকে সালাম জানালাম। তারপর বললাম, 'আমি কোর্ট স্টেশনের পাশেই থাকি।' শাহানার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ওকে একটু পৌছে দিতে এসেছিলাম।'

মহিলা বললেন, 'আমি তো, বাবা, চিন্তায় অস্থির। এত বৃষ্টিতে মেয়েটা কীভাবে বাড়ি ফিরবে।'

সে সময় মোবাইল ছিল না। অনেক আগের কথা। মহিলার উদ্বিগ্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শাহানা তাড়াতাড়ি একটি পরিষ্কার তোয়ালে এনে দিল আমাকে। আমি আমার চুল, মুখমণ্ডল ও ভেজা হাত মুছলাম।

শাহানা ভিতরে গিয়ে কাপড় পাল্টে এল। বলল, 'বাড়িতে ছেলেদের কোনও পোশাক নেই যে আপনাকে পরতে দেব। একটু বসুন, তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আসছি।'

আমি বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমাকে এক কাপ ধূমায়িত চা এনে দিল। কড়া লিকারের চা।

চা শেষ হলে শাহানা বলল, 'রাতে একটু ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন।'

আমি বললাম, 'না, এই যথেষ্ট। আমি এখনই উঠব। বাড়িতে সবাই চিন্তা করবেন।'

'বাড়িতে কে কে আছে আপনার?' বলল শাহানা।

আমি বললাম, 'মা-বাবা, ছোট দু'ভাই আর এক বোন। এবার আসি,' বলে আমি ঘর থেকে বের হতে উদ্যত হলাম।

শাহানা মেইন গেট পর্যন্ত এল। বলল, 'কাছেই যখন থাকেন, তা হলে মাঝেমধ্যে আসবেন। এলে খুব খুশি হব। আশা করি বাড়ি চিনতে অসুবিধা হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আসব। তবে সন্ধ্যার পর। বিকেলে একটা কোচিং সেন্টারে পড়াই।'

শাহানাকে বিদায় জানিয়ে বাইকে স্টার্ট দিয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ির দিকে ছুটলাম।

বাড়িতে পৌঁছলাম। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। ছোট বোন রিমা দরজা খুলল। আমার জামা-কাপড় ভেজা দেখে তাড়াতাড়ি লুঙ্গি ও টি-শার্ট এনে দিল।

নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় পাল্টে নিলাম। ভেজা শার্ট-প্যান্ট বাথরুমে রেখে চোখ-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম।

ডাইনিং টেবিলে খাবার রাখা ছিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পার্থিব' উপন্যাস নিয়ে পড়তে বসলাম। উপন্যাসটাতে মন বসাতে পারছিলাম না। বারবার শাহানার কথা মনে হতে লাগল। মেয়েটি বেশ ভদ্র। কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স পড়ে। মেধাবী মেয়ে। ছোট্ট পরিবার। মা আর মেয়ে।

বইটা পড়া হলো না। রেখে দিলাম। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম তাকে নিয়ে।

মেয়েটি কি কাউকে ভালবাসে?

মেয়েটিকে দিব্যি ভালবাসা যেতে পারে। লম্বা ফর্সা চেহারা, টিকালো নাক, ছোট চিবুক। নরম সুরে কথা বলে। এরকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।

মনে মনে স্থির করলাম, আগামীকালই সন্ধ্যার পর যাব তাদের বাড়ি।

আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে তো?

সকালে কলেজে গেলাম। বিকেলে কোচিং ক্লাস নিয়ে নিউ মার্কেটে একটু আড্ডা দিয়ে সাতটার দিকে রওনা দিলাম শাহানাদের বাড়ির উদ্দেশে।

মহিষ বাথানের গতরাতের সেই বাড়িটার. গেটের সামনে মোটর-বাইক থামালাম। মেইন গেটের দরজা খুললাম। গাড়িটাকে ভিতরে ঢোকালাম।

দরজার কাছে দাঁড়ালাম। বাড়িতে কোনও আলো জ্বলতে দেখলাম না। বাড়ির বাইরেও কোনও আলো ছিল না। শুক্লপক্ষের রাত। বৃষ্টি নেই। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কলিং বেল টিপলাম। ভিতরে কোনও শব্দ হলো কিনা জানতে পারলাম না। কী ব্যাপার! বাড়িতে কি ওরা নেই? হঠাৎ দরজার কড়ার দিকে তাকালাম। দরজায় তালা। তবে কি তারা কোথাও বেড়াতে গেছে? বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইক নিয়ে বের হলাম। ফিরে গেলাম আবার নিউ মার্কেটে।

রাত দশটার সময় আবার গেলাম সেই বাড়িতে। দেখলাম দরজায় তালা ঝুলছে।

বাড়ির সীমানা প্রাচীরের ভিতরে বাতাবি গাছের নীচে দেখলাম কয়েকজন যুবক সিগারেট টানছে। সিগারেটের গন্ধ আমার জানা। মনে হলো ওরা গাঁজা টানছে।

আমাকে দেখে যুবকদের মধ্যে একজন বলল, 'কে ওখানে? কী চাই?'

আমি বললাম, 'এটা শাহানাদের বাড়ি না? এখানে তো শাহানা ও তার মা থাকেন।'

হাসতে লাগল যুবকগুলো।

'কী যে বলেন আপনি? এই বাড়িতে কেউ থাকে না।'

'কেউ থাকে না মানে?'

'হ্যাঁ, কেউ থাকে না। বাড়িটা বহুদিন থেকে তালাবদ্ধ।'

আমি একটু এগিয়ে গেলাম তাদের কাছে। একজন যুবক আমার মুখের উপর গাঁজার ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এখানে অনেকদিন হলো কেউ থাকে না।'

'কী বলছেন আপনারা! গতরাতেই আমি এ বাড়িতে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ ছিলাম। চা খেয়ে গেছি।'

হাসতে লাগল ছেলেগুলো।

ওদের মধ্যে একজন বলল, 'আপনি দেখছি আমাদের চেয়েও বেশি মাল টেনেছেন। আপনার মাথা ঠিক নাই। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য ব্যাপার! গতকাল আমি ঠিকই এসেছিলাম, সত্যিই বলছি। তারপরও আপনারা আমাকে নিয়ে মশকরা করছেন?'

ঘন গোঁফওয়ালা লম্বা চুলের একজন যুবক বলল, 'বাড়িটা এক বিধবা বয়স্কা মহিলার ছিল শুনেছি। বছর চারেক আগে ইলেকট্রিক শর্টসার্কিটে আগুন লেগে বয়স্কা মহিলা ও তাঁর এক যুবতী মেয়ে মারা যান। তারপর ওই মহিলার এক ভাতিজা কিছুদিন ওই বাড়িতে থাকে। কয়েক মাস পর ওই ছেলেটাও মারা যায়। ছেলেটিকে তার বেডরুম থেকে মৃত্যুর কয়েকদিন পর উদ্ধার করা হয়।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। কিন্তু এটা রহস্যাবৃত, কারণ ছেলেটির বয়স ছিল বিশ বছরের মত।

'এরপর এক সরকারি কর্মকর্তা ভাড়া নেন বাড়িটা। কয়েক মাস পর রহস্যজনকভাবে ভাড়াটে ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র পাঁচ বছরের পুত্র সন্তান অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুবরণ করেন। ঘরের বিছানাপত্র, আসবাবপত্র সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিদগ্ধ ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল। থানা পুলিশ হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তদন্ত করেছিল, কিন্তু কীভাবে আগুন লেগেছিল, তার কোনও ক্লু কেউ বের করতে পারেনি। এই এলাকায় যাকেই জিজ্ঞেস করবেন তারা সবাই বলবে এই ঘটনা। এটা একটি অভিশপ্ত বাড়ি। বাড়ির মূল মালিক অর্থাৎ বিধবা মহিলার মেয়েটি নাকি ভার্সিটিতে পড়ত। ওই মহিলার ছোট ভাই মাঝেমধ্যে দিনের বেলায় বাড়িতে আসেন কিন্তু রাতে থাকেন না। বাড়িতে টু-লেট লেখা দেখে অনেকেই ভাড়া নিতে আসে। কিন্তু আশপাশের লোকজনের মুখে এসব ঘটনা শুনে আর ভাড়া নেয় না।'

কথাগুলো একটানা বলে দম নিল যুবকটা। তারপর বলল, 'আমরা নেশাটেশা করি। ভূত-পেত্নীর ভয় করি না। নেশা করা হয়ে গেলে চলে যাই। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ আসে না।'

তবুও আমার বিশ্বাস হলো না কথা শুনে।

বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন শুক্রবার সকাল দশটার দিকে সেই বাড়িতে আবার গেলাম। দেখলাম দরজায় সেই ঢাউস তালাটা ঝুলছে। দরজায় টিনের পাতে লেখা: টু-লেট। টিনটা কাঁটা দিয়ে দরজায় লাগানো। টিনের প্লেটে টু-লেটের নীচে যোগাযোগের ঠিকানা লেখা।

বাড়ির লনে বাতাবি লেবুর গাছটা দেখলাম। একটা কাঁঠাল গাছ ও একটি বরই গাছও দেখলাম। চারদিকে অনেক আগাছা জন্মেছে পরিচর্যার অভাবে। কেমন ভুতুড়ে পরিবেশ মনে হলো।

তাড়াতাড়ি বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে বের হচ্ছি এমন সময় দেখলাম একটি কালো বিড়াল জঙ্গলের মধ্য থেকে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল। দেখলাম বিড়ালটি আমার দিকে বাঘের মত জ্বলজ্বল চোখে চাইল।

আশরাফুর রহমান

রহস্যময় ছবি

রাজেন কুমার বিশ্বাসের আজ যত সহায়-সম্পত্তি, বাড়ি-গাড়ি তার কিছুই আসলে তিনি নিজে রোজগার করেননি। সবই তাঁর এক দূর সম্পর্কের মামার। তিনি ছিলেন চিরকুমার। রাজেনবাবুর ছেলেবেলায় যখন তাঁর মা-বাবা মারা যান তখন তিনি তাঁর সেই মামার কাছেই আশ্রয় পান। মামাও তাঁর একার জীবনে একজন বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে রাজেনবাবুকে গ্রহণ করেছিলেন। মামার ছিল জুয়েলারী আর তেজারতির ব্যবসা। মামার সঙ্গে রাজেনবাবুকেও এই দুটো ব্যবসার দেখাশোনা করতে হত।

হঠাৎ একদিন মামা মারা গেলেন। তখন সমস্ত ব্যবসার ভার এসে পড়ে রাজেনবাবুর ঘাড়ে। কিছুদিন একা একা ব্যবসার ঘানি টানার পর রাজেনবাবু বুঝতে পারেন এ কম্ম তাঁর নয়। তাই মামার যা কিছু ছিল তার সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিলেন। তাতে করে যা টাকা-পয়সা পেলেন তা দিয়ে তাঁর মত চিরকুমার-হিসেবি লোকে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তিনি শহরের অভিজাত পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট কিনলেন, একটি নতুন গাড়ি কিনলেন আর কিনলেন একটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সব। তার পরও যে অঢেল টাকা রইল তা তিনি ব্যাংকে রাখলেন। প্রতি মাসে তিনি ব্যাংক থেকে যে টাকা সুদ পান তার পুরোটাও তাঁকে তুলতে হয় না।

রাজেনবাবু প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন। এমনি এক পাঁচ তারিখে তিনি ব্যাংকে গিয়েছিলেন টাকা তুলতে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে, ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে বেরিয়ে পড়লেন। আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন আজ সিনেমা দেখবেন আর বাইরে খাবেন। তাই কাছের থিয়েটারে গিয়ে নতুন হলিউডি ফিল্ম থ্রী-হাণ্ড্রেড দেখে, রেস্টুরেণ্টে গিয়ে থাইফুড খেয়ে যখন গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন তখন রাত প্রায় আটটা। এখনকার নতুন নিয়ম অনুযায়ী আটটার মধ্যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে ফেলতে হয় তাই দু-একটা পানের দোকান ছাড়া সমস্তই বন্ধ। রাস্তায় মানুষজনও নেই। ফাঁকা রাস্তায় রাজেনবাবু বেশ আয়েশ করে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছেন এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন লোক ফুটপাতে বেশকিছু ছবি সাজিয়ে বসে আছে বিক্রি করার জন্য। রাজেনবাবুর যদিও ছবি-টবির ব্যাপারে খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই তবুও মাঝে মাঝে সস্তায় পেলে দু-একটা ছবি কেনেন। বাড়ির দেয়ালে ছবি টাঙানো থাকলে অভিজাত মহলে বেশ দাম পাওয়া যায় বলে

রাজেনবাবুর বিশ্বাস।

রাজেনবাবু রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়ালেন। ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। দেখতে বেশ সুন্দর ছবিগুলো। একটা ছবি রাজেনবাবুর বেশ পছন্দ হলো–ছবিটা দুই ইঞ্চি সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো। লম্বায় তিন ফুট, চওড়ায় দুই ফুট। পাহাড়ঘেরা ঝরনা ও নদীসমেত একটি মনোরম পরিবেশে ঘাড় অবধি লম্বা চুল, চাপদাড়ি–ঝুলোগোঁফওয়ালা একজন উপজাতীয় মানুষ একটি ছোট্ট গর্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গর্তটা পানিভর্তি, সেই পানিতে লোকটার হাঁটু ডুবে আছে। লোকটির উর্ধ্বাঙ্গ বস্ত্রহীন, নিম্নাঙ্গে সবুজ লতায় বাঁধা হরিণের চামড়া। লোকটির বুকে একটি বড়সড় মাকড়সার উল্কি আঁকা আর নাভির ঠিক উপরেই রয়েছে একটি ভীমরুলের উল্কি। লোকটির পা ঘেঁষে পানিতে ভেসে আছে একটি জীবন্ত ইঁদুর। মোটামুটি এই হলো ছবিটি।

বিক্রেতার কথা অনুযায়ী ছবিটি এসেছে মঙ্গোলিয়া থেকে। এর বয়স কম করে হলেও তিনশো বছর। ছবির লোকটি হলো মগ উপজাতিদের পৌরাণিক দেবতা 'সান-জু'। পানিতে ভেসে থাকা ইঁদুরটি হচ্ছে এর বাহন।

তা যাই হোক না কেন, রাজেনবাবুর ছবিটা পছন্দ হয়েছে। তাই তিনি দাম জিজ্ঞেস করলেন। অবিশ্বাস্য কম দাম ছবিটার! কথা না বাড়িয়ে রাজেনবাবু তাই কিনে ফেললেন ছবিটা। ছবিটা গাড়িতে তুলে গাড়ি স্টার্ট করে কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেন অমনি তাঁর পেটের ভেতরকার তরলটুকু যেন বাইরে বেরোবার জন্য বিদ্রোহ শুরু করে দিল। তাই রাজেনবাবু একটি মসজিদের পাশে গাড়ি থামিয়ে বাথরুমে গিয়ে হালকা হয়ে এসে আবার গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবেন এমন সময় ঝামেলা হিসেবে একটি বছর পনেরোর উপজাতীয় ছেলে এসে হাজির। পরনে ছেঁড়া সাদা টি-শার্ট আর বহু পুরানো একটি জিনস্ প্যান্ট। গাড়ির পাশে এসে সাইকেল দাঁড় করিয়েছে। ওর সাইকেলের সামনের ঝুড়িতে এক বাণ্ডিল রোল করা কাগজ। সেগুলোরই একটা টেনে খুলে মেলে ধরেছে রাজেনবাবুর গাড়ির জানালায়।

'ছবি নিন, স্যর। লাক ভাল হওয়ার ছবি। অপদেবতার প্রভাব থেকে বাঁচবার ছবি।'

ছবিটা বেশ ভালই দেখতে। একজন উপজাতীয় সন্ন্যাসী সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে এক হাত তুলে আশীর্বাদ দেয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে। ছবিটায় রঙের ব্যবহারও বেশ সুন্দর। রাজেনবাবুর যদিও এই ছবিটা কেনার কোনও ইচ্ছেই ছিল না তবুও অপদেবতার কথাটা তাঁর মনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন–'তা এই অপদেবতাটি কে শুনি?'

'সান-জু,' ছেলেটি উত্তর দেয়। 'যার ছবি আপনার গাড়িতে আছে। ও ছবি ঘরে রাখলে আপনার ক্ষতি হবেই। তবে আমার ছবিটা সাথে নিয়ে রাখলে আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

'ও–তাই নাকি,' রাজেনবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'তা হলে তোর ছবিটা না নিয়েই দেখা যাক সান-জু আমার কী ক্ষতি করতে পারে।' এই বলে রাজেনবাবু

গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কিন্তু ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। 'মাত্র পাঁচ টাকা দাম, স্যর, একটা ছবি নিয়ে যান, স্যর,' বলতে বলতে গাড়ির পাশে পাশে দৌড়াতে শুরু করল। এমনকী গাড়ির স্পিড বাড়ার সাথে সাথে ছেলেটিও গাড়ির জানালা ধরে আরও জোরে দৌড়াতে শুরু করল। এবার রাজেনবাবু বেশ বিরক্ত বোধ করলেন। রাজেনবাবু এতই রেগে গিয়েছেন যে, চলন্ত অবস্থাতেই ডান হাতে স্টিয়ারিংটা ধরে ঝুঁকে পড়ে বাঁ দিকের দরজাটা দুড়ুম করে খুলে দিলেন। তাই গাড়ি একটু ব্যালেন্স হারিয়ে রাস্তার পাশের ডোবার কাছে চলে গেল। ছেলেটি টাল সামলাতে না পেরে ঝপাং করে সেই ডোবার জলে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস সামনে পেছনে কোনও গাড়ি ছিল না! ধাক্কা দেয়ার সময় গাড়ির স্পিড ছিল প্রায় বিশ। ধাক্কা দেয়ার পর রাজেনবাবু সেটাকে তুলে ফেললেন প্রায় আশিতে। তাঁর ধারণা তিনি ছেলেটিকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

ছবিটা নিজের শোবার ঘরেই টাঙালেন রাজেনবাবু। ঠিক করেছেন, একটা ছুটির দিন দেখে কয়েকজন প্রতিবেশী ও বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে ছবিটা দেখাবেন। খোদ মঙ্গোলিয়া থেকে ছবিটা আনা হয়েছে এমনটিই সবাইকে বলবেন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তিনি নিজেই জানেন না যে ছবিটা আসল না নকল! তবে এটা ঠিক যে ছবিটা নকল হলেও ছবিটাতে একটা অ্যান্টিক-অ্যান্টিক ভাব আছে। ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। মনে হয় ছবিটা যেন জীবন্ত।

কিন্তু কথায় আছে, হরি মারে তো রাখে কে। এমনটাই হলো রাজেন কুমার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে।

সেদিনই রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ টিভি দেখে সবে চোখ বুজেছেন, এমন সময় বোঁওও-বোঁওও একটা অস্বস্তিকর আওয়াজ শুনে তাঁর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল। কী একটা এসে নাভির ঠিক উপরে বসতেই তাঁর সারা শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। তিনি বাঁ হাতের এক আঘাতে সেটিকে নাভির উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে, ডান হাতে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে হুড়মুড় করে উঠে বিছানায় বসলেন।

কী সর্বনাশ। ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা বড় কালো ভীমরুল। জুন মাস তাই প্রচণ্ড গরম পড়েছে। শুধু ফ্যানের বাতাসে হয় না। তাই প্রাকৃতিক হাওয়ার আশায় রাজেনবাবু জানালাটা খুলে শুয়েছিলেন। ভীমরুলটি সেপথেই এসেছে। আলো জ্বালতে সে যেন আবার বিপদ টের পেল। তাই আবার উড়তে উড়তে রাজেনবাবুর ঘরটিকে কয়েকটি চক্কর দিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথেই বেরিয়ে গেল। রাজেনবাবুও তখনই বিছানা থেকে নেমে জানালাটা দড়াম করে লাগিয়ে দিলেন। তারপর নিশ্চিন্তে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না।

দ্বিতীয় রাতেও রাজেনবাবুকে একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হলো। ঘণ্টা তিনেক হলো ঘুমিয়েছেন। তখন রাত প্রায় দুটো। রাজেনবাবুর বুকের উপর লোমওয়ালা হাল্কা কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। অস্বস্তিতে রাজেনবাবু জেগে

উঠলেন। হ্যাঁ, জিনিসটা তাঁর বুকের উপরই আছে। রাজেনবাবু বাঁ হাতের এক আঘাতে সেটিকে বুকের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর দ্রুতহাতে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বিঘতখানেক বড় ভয়ঙ্কর দর্শন একটা লোমশ মাকড়সা পড়ে আছে তাঁর বিছানার পাশে। রাজেনবাবু আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলেন সেটির দিকে। আজও তিনি ঠাণ্ডা বাতাসের আশায় জানালা খুলে শুয়েছিলেন। হঠাৎই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মাকড়সাটির যেন রাজেনবাবুর উপর দয়া হলো। তাই লম্বা লম্বা লোমশ পায়ে দৌড়ে গেল জানালার দিকে। তারপর জানালা থেকে নীচের দিকে চলে গেল। রাজেনবাবু হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ খেয়াল হতেই দ্রুত বিছানা থেকে নেমে দড়াম করে জানালাটা লাগিয়ে দিলেন। তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন ব্যাপারটা নিয়ে–এধরনের লোমশ মাকড়সা তো শহরে থাকবার কথা নয়। তা হলে এটি কী করে এল? ওটার কি সত্যিই লোম ছিল নাকি তিনি ভুল দেখেছেন? এসব ভাবতে ভাবতেই রাজেনবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিনটা রাজেনবাবুর বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই কাটল। কারণ পর পর দু'রাতের ঘটনা তাঁর কাছে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। কিন্তু একেবারে অস্বাভাবিকও মনে করতে পারছেন না। তাই সন্ধে বেলাতেই তিনি গরমের তোয়াক্কা না করে জানালা লাগিয়ে দিয়েছেন। সবে খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছেন, এমন সময় চোখ গেল দেয়ালে টাঙানো মঙ্গোলীয় ছবিটার উপর।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! এ কী করে হয়? এও কি সম্ভব? ভ্রম নয়তো? উঁহুঁ, একদম নয়। উনি ঠিক দেখছেন। রাজেনবাবু টের পেলেন একটি অত্যন্ত শীতল স্রোত তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

'সান-জু'-এর বুকের মাকড়সার উল্কি এবং নাভির উপরের ভীমরুলের উল্কির একটাও এখন আর নেই। ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো যেন ওখানে ছিলই না। কিন্তু রাজেনবাবু তো নিশ্চিত, যে দুটো প্রাণীর উল্কি নেই সে দুটো প্রাণী তাঁর ঘরে এসেছিল এবং তাঁর শরীরে বসেছিল। সে দুটি বাস্তবরূপে এসেছিল বলেই কি ছবিতে এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না? তবে কি ছবিটা সত্যিই অপদেবতার? এই ছবি কি সত্যিই তাঁর ক্ষতি করবে? যদি করে তবে কী ক্ষতি করবে?

ধুর, এসব কী ভাবছেন তিনি! আসলে ছবিটা তাঁর উপর একটু বেশি প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এসব নিয়ে আপাতত আর কিছু ভাবতে চান না তিনি। তাই হাতের খবরের কাগজটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ ঘরের ভিতর কিছু একটা ছুটো-ছুটির শব্দ শুনতে পেলেন। তাই দেখার জন্য রাজেনবাবু বিছানায় উঠে বসলেন।

দেখতে পেলেন একটি ইঁদুর তাঁর ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়াচ্ছে। উনি বেশ অবাক হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে পড়ে গেল মঙ্গোলীয় ছবিটায় সান-জুর পাশে পানিতে ভেসে থাকা ইঁদুরের কথা। উনি ঝট্ করে ছবিটার দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য! ছবিটায় তো কোনও ইঁদুর দেখা যাচ্ছে না। উনি আবার তাকালেন ইঁদুরটার দিকে। ইঁদুরটি তাঁর দরজার সামনে চুপচাপ বসে

আছে। আরে! এ কী কাণ্ড! দরজার নীচ দিয়ে যে জল ঢুকছে। এও কি ছবিতে ছিল নাকি?

ছিল না। ছবিতে অনেক কিছুই ছিল না। কিন্তু নতুন করে দেখা যাচ্ছে! রাজেনবাবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, মঙ্গোলীয় ছবিটির দেবতা সান-জু যে পানি ভর্তি গর্তটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল সেই গর্তটি অনেক বড় হয়ে গেছে। দেবতার দাড়ি-গোঁফ সব হাওয়া। মুখটা কচি-কচি লাগছে এখন। যেন কোনও চোদ্দ-পনেরো বছরের বালকের মুখ। ছেলেটি হাসছে। রাজেনবাবুর এমন অবস্থা দেখে সে যেন মজা পাচ্ছে।

রাজেনবাবুর চিৎকার করতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। তাঁর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল।

এ মুখ যে তাঁর চেনা! ছয় তারিখের খবরের কাগজে একটি উপজাতীয় ছেলের ছবি ছাপা হয়েছিল। ছেলেটি নাকি ভাল ছবি আঁকত। কীভাবে যেন সে রাস্তার ধারের ডোবায় পড়ে যায়। সাঁতার না জানায় জলে ডুবে মারা যায় ছেলেটি। এ হলো সেই ছেলেটির মুখ। আর সবচেয়ে বড় কথা একেই তিনি দু'দিন আগে ধাক্কা মেরেছিলেন...

উফ্! আর ভাবতে পারছেন না তিনি। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে তিনি এখন একটা পাথরের মূর্তির মতন বিছানায় বসে আছেন। সমস্ত ঘর জুড়ে জল বেড়েই চলেছে। বিছানা পর্যন্ত উঠে এসেছে জল। তাঁর শরীর থেকে গজখানেক দূরে ভেসে আছে ইঁদুরটি। আর ভাবতে পারলেন না রাজেনবাবু। প্রচণ্ড আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে জলে ডুবে যাওয়া বিছানার উপর পড়ে গেলেন।

রাজেনবাবুর জ্ঞান আর ফেরেনি!

পরের দিন দুপুরবেলা রাজেনবাবুর কয়েকজন বন্ধু এসে হাজির হলেন তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে। তিনিই তাঁদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। বলেছিলেন–একটি তিনশো বছরের পুরানো মঙ্গোলিয়ান ছবি দেখাবেন। কিন্তু ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজনদের খবর দেয়া হয়। তারপর সবাই মিলে ডাকাডাকির পরও যখন কোনও ফল হলো না তখন পুলিশ ডাকা হলো। পুলিশ দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আবিষ্কার করে রাজেনবাবু নিজের ফ্ল্যাটের শোবার ঘরে মৃত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। হৃদ্‌রোগে মারা গেছেন বলে ধরে নিলেও পোস্টমর্টেমে জানা যায় শ্বাসযন্ত্রে মাত্রাতিরিক্ত জল ঢুকে যাওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু নিজের বিছানায় শুয়ে কী করে এমন অস্বাভাবিক কাণ্ডটি সম্ভব, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

এ ছাড়াও আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে, যা পুলিশের পক্ষে কোনওদিনই জানা সম্ভব নয়। তা হলো রাজেনবাবুর ঘরে কোনও মঙ্গোলীয় ছবি পাওয়া যায়নি।

রাজেনবাবুর এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনও কারণই এখনও পর্যন্ত পুলিশ খুঁজে পায়নি!

আরাফ করিম

রহস্যময় আংটি

মিস্টার জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ, এফ.আর.এস, থাকেন ১৪৭ গাউয়ার স্ট্রিটে। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা আর কর্মশক্তি তাঁকে প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকদের দলে স্থান করে দিতে পারত। কিন্তু তিনি বিশ্বজনীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। যার ফলে কোনও এক বিষয়ে সেরা হবার চাইতে নানা বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল।

প্রথম দিকে প্রাণিবিদ্যা আর উদ্ভিদ বিদ্যার দিকে তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। এই দুই বিষয়ে তিনি এমনভাবে কাজ করেছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দ্বিতীয় ডারউইন ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখন একটি অধ্যাপকের পদ প্রায় তাঁর নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছে, তখনই তিনি এসব বিষয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে রসায়ন শাস্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন। এখানে তিনি ধাতুর বর্ণালীর ওপর গবেষণা করে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ অর্জন করেন।

কিন্তু এবারও তিনি একই কাজ করলেন। ল্যাবরেটরিতে এক বছর অনুপস্থিত থাকার পর মি. স্মিথ ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে যোগ দেন। এলকাব-এর হায়ারোগ্লিফিক এবং ডিমোটিক (Demotic) লিপি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। আর এভাবেই মি. স্মিথ একদিকে যেমন বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিলেন, অন্যদিকে তেমনি দেখালেন তাঁর প্রতিভার অস্থিরতা।

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এক সময় না এক সময় কিছু একটায় থিতু হয়। মি. স্মিথও এর ব্যতিক্রম নন। প্রাচীন মিশরতত্ত্ব মানে ঈজিপ্টোলজির যত গভীরে তিনি প্রবেশ করতে লাগলেন ততই তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। মানব সভ্যতার সূচনা যেখানে হয়েছিল তার ওপর গবেষণার মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কারের কী বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তা তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

মিশরতত্ত্ব স্মিথকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি এক তরুণী মিশরতাত্ত্বিককে বিয়ে করে ফেললেন। এই তরুণী প্রাচীন মিশরের ষষ্ঠ রাজ বংশের ওপর মূল্যবান গবেষণা করেছিল।

গবেষণার ভিত্তি শক্ত করে তৈরি করে; মি. স্মিথ গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রাচীন মিশর নিয়ে এমন কাজ করবেন যার মধ্যে সংযুক্ত হবে Lepsius-এর গবেষণা আর Champollion-এর উদ্ভাবনী দক্ষতা। আর এই বিরাট ঐতিহাসিক কাজের জন্য স্মিথকে প্রায়ই ফ্রান্সে যেতে হত। সেখানকার ল্যুভর জাদুঘরের প্রাচীন মিশরীয় সংগ্রহ খুবই

সমৃদ্ধ। গত অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি শেষবার ল্যুভরে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি অদ্ভুত এক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

ট্রেনটা অনেক আস্তে চলছিল। আর ইংলিশ চ্যানেলের অবস্থাও ছিল খারাপ। তাই মি. স্মিথ প্যারিসে পৌঁছালেন কিছুটা বিভ্রান্ত এবং উত্তেজিত অবস্থায়। প্যারিসে পৌঁছে তিনি উঠলেন Rue Laffitte রাস্তার হোটেল দ্য ফ্রান্স-এ। হোটেলে রুমে ঢুকে তিনি ক্লান্ত দেহটাকে সোফায় এলিয়ে দিলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক শুয়ে থেকেও ঘুম এল না। তাই স্মিথ সিদ্ধান্ত নিলেন এখনই ল্যুভর মিউজিয়ামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বেন। যে কারণে তিনি মিউজিয়ামে যাবেন তাতে বেশি সময় লাগবে না। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে, সন্ধ্যার ট্রেনেই তিনি দিপ্পীতে (Dieppe) ফিরে যাবেন।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি সোফা ছেড়ে উঠে ওভারকোট গায়ে দিলেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। Boulevard des Italiens এবং Avenue de l'Opera পার হয়ে তিনি ল্যুভরে পৌঁছালেন।

ল্যুভর তাঁর খুব পরিচিত জায়গা। মিউজিয়ামে পৌঁছেই তিনি যে ঘরে প্যাপিরাসের সংগ্রহ রয়েছে সেদিকে পা চালালেন।

জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথের খুব ঘনিষ্ঠ জনরা এমন দাবি করতে পারবে না যে তিনি একজন সুদর্শন ব্যক্তি। তাঁর টিয়া পাখির ঠোঁটের মত নাক আর দৃঢ় চিবুক তাঁকে আর দশজন মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। দেহের ওপর মাথাটাকে তিনি পাখির মত কায়দায় ধরে রেখেছেন। আলাপ আলোচনা করার সময় তিনি পাখির ঠোকরানোর মত ভঙ্গি করেন। আর এভাবেই কোনও বিষয়ে আপত্তি জানান, কারও কথার জবাব দেন।

প্যাপিরাসের সংগ্রহশালায় স্মিথ ঢুকলেন। তাঁর ওভারকোটের কলার উঁচু করে কান পর্যন্ত তোলা আছে। সামনের ডিসপ্লে কেসের কাঁচে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভাবলেন, সত্যিই তিনি অন্যরকম। কিন্তু পেছন থেকে ইংরেজি ভাষায় পরিষ্কার করে বলা কথাগুলো শুনে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। পেছন থেকে তীক্ষ্ণ গলায় কেউ বলল, 'লোকটা দেখতে কী অদ্ভুত!'

স্মিথের মাঝে একটু বেশি পরিমাণে অহমিকা বোধ আছে। পেছন থেকে মন্তব্য শুনে তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। তিনি কঠিন দৃষ্টিতে প্যাপিরাসের বাণ্ডিলগুলোর দিকে তাকালেন। সমস্ত ব্রিটিশ ভ্রমণকারীদের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁর মনটা তিক্ত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ,' আরেকটা কণ্ঠ বলল। 'লোকটা সত্যিই অসাধারণ।'

'তুমি জান,' প্রথম বক্তা বলল, 'যে কেউই বিশ্বাস করবে মমির ব্যাপারে ক্রমাগত চিন্তা করতে থাকলে কোনও লোক নিজেই অর্ধেক মমি হয়ে যায়?'

'লোকটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে মিশরীয়,' দ্বিতীয় বক্তা বলল।

জন স্মিথ ঘুরে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য, তাঁর দেশের লোক দুটিকে কড়া কথা বলবেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন। পাশাপাশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। দেখলেন, লোক দুটো তাঁকে নিয়ে মন্তব্য করছে না। বরং তারা তাঁর দিকে পেছন

ফিরে ল্যুভর মিউজিয়ামের এক বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাটেনডেন্ট রুমের অপর প্রান্তে বসে পিতলের তৈরি একটা জিনিস পালি· করছিল।

'কার্টার আমাদের জন্য প্যালেস রয়েল-এ অপেক্ষা করবে,' একজ· অপরজনকে বলল, ঘড়ির দিকে তাকাল। তারা চলে গেল। রুমের মধ্যে শুধু মা· মি. জন স্মিথ আর অপর প্রান্তে সেই অ্যাটেনডেন্ট।

'বুঝলাম না ওরা কেন বলল লোকটা দেখতে মিশরীয়দের মত,' স্মিথ ভাবে· লাগলেন। যে জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে লোকটাকে স্পষ্ট দেখ· যাচ্ছে না। তাই স্মিথ একটু সরে দাঁড়ালেন। অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে তি· চমকে উঠলেন। মিশর নিয়ে গবেষণা করার সময় এধরনের চেহারার সাথে তাঁ· পরিচয় হয়েছে।

লোকটার আকৃতি পাথুরে মূর্তির মত, কপাল চওড়া, গায়ের রং ঈষ· কালচে। এরকম চেহারার অসংখ্য পাথরের মূর্তি, মমি কেস আর ছবি এই বিশা· রুমের দেয়ালগুলোতে সাজানো রয়েছে।

ঘটনাটা কাকতালীয় বলা যায় না। লোকটা অবশ্যই মিশরীয়। কাঁধে· কৌণিক গড়ন এবং সরু নিতম্বে তাকে মিশরীয় বলেই মনে হয়।

অ্যাটেনডেন্টের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন স্মিথ। উদ্দেশ্য লোকটা· সাথে কথা বলা। মানুষের সাথে কথা বলতে তিনি কখনও দ্বিধা বোধ করেন না কিন্তু এক্ষেত্রে একটু অপ্রস্তুত বোধ করছেন। কাছে এসে তিনি অ্যাটেনডেন্টে· মুখের এক পাশ দেখতে পেলেন। কারণ এখনও সে একমনে পালিশ করে যাচ্ছে। স্মিথ স্থির দৃষ্টিতে লোকটার গায়ের চামড়ার রং দেখতে লাগলেন। হঠা· তাঁর মনে হলো ওই চামড়ার মাঝে কেমন যেন এক অমানবীয় এবং অতিপ্রাকৃ· ভাব রয়েছে। কপাল আর দু'চোয়ালের চামড়া এত চকচকে যেন মনে হয় বার্নিশ করা পার্চমেন্ট। সেখানে কোনও লোমকূপের চিহ্ন নেই। এই শুষ্ক চামড়া· একবিন্দু ঘামের কল্পনাও কেউ করতে পারবে না। কপাল থেকে চিবুক পর্য· মুখের বাকি অংশ অসংখ্য সূক্ষ্ম বলি রেখায় ভরা। এগুলো দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন মাউরি (Maori–নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসী) মেজাজে ওই মুখের ওপ· পরীক্ষা করে দেখেছে যে কত জটিল নকশা সৃষ্টি করতে পারে সে।

'মেমফিসের সংগ্রহগুলো কোথায়?' স্মিথ জিজ্ঞেস করলেন। আলাপ শুরু করার জন্যই প্রশ্নটা করেছেন।

'ওইখানে,' লোকটা রূঢ়ভাবে জবাব দিল, মাথা নেড়ে ঘরের অপর প্রান্ত দেখাল।

'তুমি কি মিশরীয়?' স্মিথ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

অ্যাটেনডেন্ট এবার তার অদ্ভুত কালো চোখ তুলে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল তার চোখ দুটো কাঁচের মত চকচকে। তাতে রয়েছে এক কুয়াশাচ্ছন্ন শুকনো ঔজ্জ্বল্য। কোনও মানুষের এরকম চোখ স্মিথ কখনও দেখেননি। অ্যাটেনডেন্টের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে স্মিথ দেখলেন, লোকটার চোখের গভীরে আবেগ

জমে উঠছে। যেটা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে ঘৃণা আর আতঙ্কে রূপ নিল।

'না, মঁশিয়ে, আমি ফরাসী।' একথা বলে লোকটা হঠাৎ ঘুরে বসে আবার পালিশ করার কাজে মন দিল।

স্মিথ অবাক হয়ে লোকটার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর হলের এক কোণে চেয়ারে বসলেন। জায়গাটা একটা দরজার পেছনে। চেয়ারে বসে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্যাপিরাসের পাতা থেকে নোট করতে শুরু করলেন। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারলেন না। বারবার স্ফিংসের মত বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের চেহারা আর পার্চমেন্টের মত তার চামড়ার কথা মনে পড়তে লাগল।

'ওরকম চোখ কোথায় দেখেছি?' স্মিথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন। 'চোখের দৃষ্টি যেন অনেকটা সরীসৃপের মত। সাপের চোখে যে ঝিল্লি আছে, হয়তো বুড়োর চোখেও তাই আছে।' স্মিথ হাসলেন। প্রাণিবিদ্যার কথা তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে। 'ঝিল্লি আছে বলেই হয়তো তার চোখে চকচকে ভাব রয়েছে। কিন্তু ওখানে আরও কিছু রয়েছে। আমি পরিষ্কার দেখেছি শক্তি আর জ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ওই দুই চোখে ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া আরও আছে চরম ক্লান্তি আর প্রচণ্ড হতাশা। হয়তো এসব আমার কল্পনা। কিন্তু প্রথম দর্শনে কোনও লোকই আমার মনে এরকম ছাপ ফেলেনি। ঈশ্বর, লোকটাকে আরেকবার দেখতেই হবে।' স্মিথ চেয়ার থেকে উঠে মিশরীয় সংগ্রহশালায় ঢুকলেন। কিন্তু যে লোক তাঁর কৌতূহল জাগিয়েছে, তাকে দেখতে পেলেন না।

স্মিথ আবারও সেই নির্জন কোনায় বসে নোট করতে শুরু করলেন। যে সমস্ত তথ্য তাঁর দরকার সবগুলোই তিনি প্যাপিরাসগুলোতে পেয়েছেন। মনে থাকতে থাকতে সেগুলো লিখে ফেলা দরকার। কিছুক্ষণ ধরে তাঁর পেন্সিল কাগজের ওপর দ্রুত চলতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই লাইনগুলো আর এক রেখায় রইল না। শব্দগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। অবশেষে পেন্সিলটা মেঝেতে পড়ে গেল। স্মিথের মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তির ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। নির্জন কোণে দরজার পেছনে তাঁর ঘুম এতটাই গভীর হলো যে সিভিল গার্ডের চলাচলের শব্দ, দর্শকদের পদধ্বনি এমনকী মিউজিয়াম বন্ধ হবার তীক্ষ্ণ, কর্কশ ঘণ্টা ধ্বনিও তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারল না।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ় হতে হতে রাতের ঘন অন্ধকারে পরিণত হলো। Rue de Rivoli-র কর্মব্যস্ততার শব্দ বেড়ে উঠে একসময় তাও থেমে গেল। দূরে নটর ডেম গির্জায় মাঝরাতের ঘণ্টা বাজল। এখনও হলঘরের অন্ধকার কোণে স্মিথের ঘুমন্ত দেহটা এক নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে বসে রইল।

রাত একটার দিকে মি. স্মিথের ঘুম ভাঙল। জেগে উঠে তিনি বড় করে শ্বাস নিলেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি মনে করলেন বাসায় স্টাডি রুমের চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে তিনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পর্দাবিহীন জানালা দিয়ে চাঁদের আলো পরিপূর্ণভাবে ঘরে ঢুকছে। সেই আলোয় সারি সারি মমি আর পালিশ করা বাক্স দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তিনি এখন কোথায় আছেন। কীভাবে

এখানে রয়ে গেলেন তা বুঝতেও দেরি হলো না।

কিন্তু মি. স্মিথ আতঙ্কিত হলেন না। নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে সে পরিবেশকে ভালবাসা তাঁর বংশের বৈশিষ্ট্য। তিনিও এর ব্যতিক্রম নন। হাত পায়ের খিল ভাঙাবার জন্য ছড়িয়ে বসে ঘড়ির দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোয় সময় দেখে মুচকি হাসলেন। ভাবলেন, এই ঘটনা তাঁর পরবর্তী গবেষণা বইয়ের জন্য একটি ছোট অথচ চমৎকার কাহিনি হবে। কাটখোট্টা বিষয় পড়তে পড়তে পাঠক কিছুটা স্বস্তি পাবে।

একটু ঠাণ্ডা লাগছে। কিন্তু স্মিথ পুরোপুরি জেগে আছেন। এখন বুঝতে পারছেন গার্ডরা কেন তাঁকে দেখতে পায়নি। যে দরজার আড়ালে তিনি ছিলেন সেটার কালো ছায়ায় তিনি পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন।

চারদিকে এই সুনসান নিস্তব্ধতা খুব চমৎকার। বাইরে বা ভেতরে কোথাও একটু শব্দ, এমনকী একটু মর্মর ধ্বনি পর্যন্ত নেই। এক মৃত সভ্যতার মৃত মানুষদের সাথে তিনি একা রয়েছেন। এই ঘরের বাইরে রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর ভাপসা আবহাওয়া, কিন্তু তাতে কী! এ হলঘরে যে সব প্রাচীন বস্তু রয়েছে—গমের শুকনো মঞ্জরী থেকে চিত্রশিল্পীর রঙের বাক্স পর্যন্ত—সবগুলো সুদীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে মহাকালের সাথে লড়াই করে আজও টিকে রয়েছে। সুদূর অতীতের সাম্রাজ্য থেকে সময়ের স্রোতে ভেসে আসা কত জিনিস এখানে আছে। থিবিস, লুক্সর (Luxor) এমনকী হেলিও পোলিশের বিশাল মন্দিরগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে বিভিন্ন নিদর্শন এখানে এসেছে। তা ছাড়া কয়েকশো সমাধি খনন করে সংগ্রহ করা বিপুল প্রাচীন দ্রব্য এখানে আনা হয়েছে।

স্মিথ নিস্তব্ধ মূর্তিগুলোর দিকে তাকালেন। আলো আঁধারিতে দেখে মনে হচ্ছে মূর্তিগুলো কাঁপছে। একদা ব্যস্ত, কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলো এখন চির বিশ্রামে শায়িত। এসব ভাবতে ভাবতে স্মিথের মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। নিজের যৌবন আর তুচ্ছতা সম্পর্কে এক ভিন্ন ধারণা যেন পেয়ে বসল তাঁকে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে স্বপ্নীল দৃষ্টিতে সংগ্রহশালার দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোতে সব কিছু যেন রূপালী হয়ে উঠেছে। সংগ্রহগুলোর মাঝখানে দর্শক চলাচলের সরু পথটা বিরাট হলের শেষ প্রান্তে চলে গেছে।

হঠাৎ তিনি সেই পথে একটা আলো দেখতে পেলেন। আলোটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

স্মিথ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। উত্তেজনায় স্নায়ু টান টান। আলোটা ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে থেমে থেমে এগুচ্ছে। আলো বহনকারী নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। তারপরও তার পায়ের টিপ-টিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ স্মিথের মনে হলো মিউজিয়ামে হয়তো চোর ঢুকেছে। তাই তিনি আরও অন্ধকার কোণে সরে গেলেন। আলোটা এখনও দুই রুম দূরে। এবার পাশের রুমে এল। এখনও কোনও শব্দ নেই।

হঠাৎ করেই বাতির আলোটার পেছনে একখানা মুখ দেখা গেল। মুখে

অধিকারীর দেহটা ছায়ায় মোড়ানো। আলোটা মুখের ওপর এমনভাবে পড়েছে, মনে হচ্ছে মুখটা যেন বাতাসে ভাসছে। এই মুখের ওপর চকচকে চোখ দুটো আর কর্কশ চামড়া দেখে ভুল হবার কোনও উপায় নেই। গভীর রাতের রহস্যময় আগন্তুক আর কেউ নয়, সেই অ্যাটেনডেন্ট–যাকে মি. স্মিথ কথা বলার জন্য খুঁজেছিলেন।

লোকটাকে দেখে স্মিথ প্রথমে ভাবলেন কথা বলবেন। বলবেন, কীভাবে তিনি এখানে আটকা পড়েছেন আর বেরুবার রাস্তার কথাও জানতে চাইবেন। কিন্তু লোকটা রুমে ঢুকবার পর স্মিথ লক্ষ করলেন ওর চলাফেরার মধ্যে কেমন যেন গোপনীয়তার ভাব ফুটে উঠেছে। ওর চোরের মত ভাব দেখে স্মিথ তাঁর ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হলেন। বুঝতে পারলেন লোকটা অফিশিয়াল ডিউটি দিতে বের হয়নি। তার পায়ে ফেল্ট সোল স্লিপার। উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস নেয়ায় তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। মাঝে মাঝে দ্রুত ডানে আর বামে তাকাচ্ছে। দ্রুত নিঃশ্বাসের ফলে আলোর শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। স্মিথ অন্ধকার কোণ থেকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন, লোকটা গোপনে এখানে এসেছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে।

বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের চলাফেরার মধ্যে কোনও ইতস্তত ভাব নেই। সে হালকা কিন্তু দ্রুত পদক্ষেপে একটা বড় বাক্সের কাছে গেল। পকেট থেকে চাবি বের করে বাক্সের তালা খুলল। স্মিথ দেখলেন বাক্সটার মধ্যে অনেকগুলো তাক। সবচেয়ে ওপরের তাক থেকে লোকটা একটা মমি বের করল। তারপর যথেষ্ট সতর্কতার সাথে সেটা মাটিতে নামাল। বাতিটা মমিটার পাশে রাখল। সে মমির পাশে প্রাচ্যদেশীয় ভঙ্গিতে বসল। এরপর কাঁপা কাঁপা হাতে মমিটাকে ঢেকে রাখা দামী লিনেনের কাপড় খুলতে শুরু করল। কাপড়ের ভাঁজগুলো খুলতেই ঘরটা তীব্র সুগন্ধে ভরে গেল। প্রতিটা ভাঁজ খোলার সাথে সাথে সুগন্ধি কাঠের টুকরো এবং মশলার গুঁড়ো মেঝেতে পড়ছে।

জন স্মিথ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এই মমিটি আগে কখনও খোলা হয়নি। ঘটনাটা তাঁকে প্রচণ্ড কৌতূহলী করে তুলেছে। প্রচণ্ড কৌতূহল তাঁর সমস্ত দেহকে শিহরিত করে তুলল। তাঁর পাখির মত মাথাটা দরজার পেছন থেকে ক্রমশই বেরিয়ে আসতে লাগল। যখন চার হাজার বছরের পুরানো দেহটার মাথা থেকে শেষ ভাঁজটা সরানো হলো তখন বিস্ময়ে তাঁর গলা থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

প্রথমেই বুড়ো লোকটার হাতে একরাশ ঘন কালো চুল ঝরে পড়ল। দ্বিতীয় ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল একখানি ফর্সা কপাল। সেখানে ধনুকের মত বাঁকানো সুন্দর দুটি ভ্রূ। তৃতীয় ভাঁজ খুলতে দেখা গেল দুটি চোখ আর উন্নত নাক। চতুর্থ এবং শেষ ভাঁজ খোলার পর দেখা গেল মিষ্টি একটা মুখ। চিবুকের গড়নটা অপূর্ব। আসলে সমস্ত মুখটা অদ্ভুত সুন্দর। তবে একটুখানি খুঁত রয়েছে। কপালের মাঝখানে কফি রঙের একটা ক্ষত। মেয়েটার চেহারা দেখে প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতদেহ সংরক্ষণের অপূর্ব কলাকৌশল সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। মুখখানা দেখতে দেখতে স্মিথের চোখ দুটো ক্রমশ বিস্ফারিত হয়ে

উঠতে লাগল। তাঁর গলা দিয়ে সন্তুষ্টির শব্দ বেরিয়ে এল।

মেয়েটার চেহারা স্মিথের ওপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করল বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের ওপর প্রভাবের কাছে তা কিছুই নয়। সে উত্তেজিতভাবে শূন্যে হাত ছুঁড়ে কর্কশ কণ্ঠে কী যেন বলল। তারপর মমির পাশে শুয়ে পড়ল। মমিকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁট আর কপালে বারবার চুমু খেতে লাগল। 'Ma petite!' সে ফরাসী ভাষায় গুঙিয়ে বলল। 'Ma pauvre petite!' প্রচণ্ড আবেগে তার কণ্ঠস্বর বুজে গেল। তার মুখের অসংখ্য বলিরেখা তির তির করে কাঁপছে। কিন্তু স্মিথ প্রদীপের আলোয় দেখলেন, বুড়োর চকচকে চোখ দুটো শুকনো। সেগুলোতে এক ফোঁটা পানি নেই।

কয়েক মিনিট মমিটাকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে রইল। সুন্দর চেহারাটার কাছে নিজের মুখ নিয়ে বিলাপ করছে। হঠাৎ সে হেসে উঠল। অজানা কোনও ভাষায় কী যেন বলল। তারপর একলাফে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে নতুন কোনও কাজ করার জন্য প্রচণ্ড শক্তি পেয়েছে।

ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট গোল বাক্স আছে। স্মিথ জানেন, এতে প্রাচীন মিশরের নানারকম আংটি আর মূল্যবান পাথরের এক চমৎকার সংগ্রহ রয়েছে। বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট বাক্সটার কাছে গেল। বাক্সের তালা খুলে ঢাকনা উঁচু করল। পাশের সরু তাকের ওপর বাতিটা রাখল। পকেট থেকে একটা ছোট্ট মাটির পাত্র বের করে বাতির পাশে রাখল। তারপর গোল বাক্সটা থেকে এক মুঠো আংটি বের করল। তারপর গম্ভীর এবং চিন্তিতভাবে এক এক করে প্রতিটি আংটিতে পাত্র থেকে একরকমের তরল পদার্থ লাগাতে শুরু করল। লাগাবার পর প্রতিটি আংটি আলোর সামনে তুলে ধরে দেখতে লাগল। প্রথম দফার আংটিগুলো সম্পর্কে সে আশাহত হয়েছে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ফলে আংটিগুলোকে অধৈর্যের সঙ্গে গোল বাক্সের ভেতর ছুঁড়ে ফেলল। এরপর আরও এক মুঠো আংটি তুলল। এগুলোর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড আংটি, যাতে একটা বড় ক্রিস্টালের পাথর বসানো, তার মনোযোগ কাড়ল। প্রচণ্ড আগ্রহের সাথে পাত্রের তরল পদার্থ দিয়ে সে এটা পরীক্ষা করল। অচিরেই তার গলা দিয়ে আনন্দের চিৎকার বেরিয়ে এল। আনন্দে সে শূন্যে হাত ছুঁড়ল। হাতের ধাক্কায় তাকের ওপরে রাখা মাটির পাত্র উল্টে গেল। তরল পদার্থটুকু মেঝের ওপর পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তার একটা ধারা স্মিথের পায়ের কাছে গড়িয়ে এল।

বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট তাড়াতাড়ি বুকের কাছ থেকে একটা লাল রঙের রুমাল বের করল। মেঝের ধারাটা মুছতে মুছতে ঘরের অন্ধকার কোণে বসে পড়ল। মুছতে গিয়ে এক পর্যায়ে স্মিথের মুখোমুখি হয়ে পড়ল।

'এক্সকিউয মি,' স্মিথ বিনয়ের সাথে বললেন। 'দুর্ভাগ্যবশত আমি এই দরজার পেছনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'আর আমাকে লক্ষ করছিলেন?' বুড়ো পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল। তার মৃত-পাণ্ডুর মুখে তীব্র ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠেছে।

সত্যবাদী হিসেবে স্মিথের খ্যাতি আছে। 'হ্যাঁ,' তিনি বললেন। 'আমি

তামার কাজ দেখেছি। তুমি যা করেছ তা দেখে আমার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জগেছিল।'

লোকটা তার পোশাকের ভেতর থেকে একখানা বিরাট ছুরি বের করল। আপনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন,' সে বলল। 'দশ মিনিট আগেও যদি মাপনাকে দেখতে পেতাম তবে এই ছুরি দিয়ে আপনার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতাম। এখনও যদি আপনি আমাকে স্পর্শ করেন কিংবা আমার কাজে বাধা দেন তা হলে মরা মানুষে পরিণত হবেন।'

'তোমাকে বাধা দেবার কোনও ইচ্ছা আমার নেই,' স্মিথ জবাব দিলেন। এখানে আমার উপস্থিতি নিছকই দুর্ঘটনা। এখন তুমি যদি আমাকে বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও তবে তোমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।' অত্যন্ত ভদ্র এবং নরম গলায় স্মিথ কথাগুলো বললেন। কারণ লোকটা তার নিজের বাম হাতের তালুতে ছুরির ধারাল ডগাটা দিয়ে মৃদু চাপ দিচ্ছিল। বোধহয় ছুরিটার তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চাইছে। তার চেহারায় এখনও ঘৃণার ভাব স্পষ্ট।

'যদি বুঝতে পারতাম...' সে বলল। 'কিন্তু না, হয়তো ভালই হয়েছে। আপনার নাম কী?'

স্মিথ নিজের নাম বললেন।

'জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ,' লোকটা পুনরাবৃত্তি করল। 'আপনি কি সেই লোক যিনি লণ্ডনে এলকাবের ওপর একখানা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন? রিপোর্টটা আমি পড়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার জ্ঞান অতি নগণ্য।'

'স্যর!' দারুণ বিস্ময়ে মিশরতাত্ত্বিক ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ চিৎকার করে উঠলেন।

'তবে অনেকের চেয়ে আপনার গবেষণাপত্রটা অনেক উন্নত মানের। আমাদের প্রাচীন মিশরীয় জীবনের মূল নীতির কথা আপনারা কোনও লিপি অথবা স্মৃতিস্তম্ভে খুঁজে পাবেন না। অথচ আপনারা এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেন।'

'আমাদের প্রাচীন মিশরীয় জীবন!' স্মিথ বিস্ফারিত চোখে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'ঈশ্বর, মমির মুখের দিকে তাকান!'

অদ্ভুত লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে মমির মুখের ওপর আলো ফেলল। তার গলা থেকে বেদনামাখা বিলাপ ধ্বনি বেরিয়ে এল। বাইরের বাতাস মৃতদেহ সংরক্ষণের কলা-কৌশলকে এটুকু সময়ের মধ্যে অনেকখানি নষ্ট করে ফেলেছে। মমির মুখের চামড়া বিবর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, বিবর্ণ ঠোঁট দুটো কুঁচকে যাওয়ায় হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কেবল মাত্র কপালের ওপরকার বাদামী চিহ্নটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ হলো সেই মুখ যেটায় কিছুক্ষণ আগেও ছিল যৌবন আর সৌন্দর্য।

দুঃখে আর আতঙ্কে সে হাতে হাত ঘষল। তারপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে স্মিথের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল।

'এটা কোনও ব্যাপার নয়,' লোকটা কাঁপা কণ্ঠে বলল। 'সত্যিই এটা কোনও ব্যাপার না। আজ রাতে একটা কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। কাজটা হয়ে গেছে। আর সব কিছু আমার কাছে মূল্যহীন। আমি যা খুঁজছিলাম তা

পেয়েছি। পুরানো অভিশাপ দূর হয়েছে। এখন ওর সাথে আমি মিলতে পারব ওর দেহের কী হলো তা কোনও বিষয় নয়। ওর আত্মা আমার জন্য অপেক্ষ করছে।'

'এগুলো পাগলের প্রলাপ,' স্মিথ বললেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল যে তিনি এক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন।

'সময় নেই, আমাকে যেতে হবে,' অ্যাটেনডেন্ট বলল। 'সুদীর্ঘ কাল ধরে যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সেই মুহূর্ত এসে গেছে। কিন্তু প্রথমে আপনাকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দেব। আমার সাথে আসুন।'

বাতি হাতে নিয়ে অ্যাটেনডেন্ট অগোছাল ঘরের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল। স্মিথ তাকে অনুসরণ করলেন। তাঁরা দ্রুত ঈজিপশিয়ান, অসিরিয়ান আর পারসিয়ান সংগ্রহের ঘরগুলো অতিক্রম করলেন। শেষে বুড়ো দেয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজার পাল্লা মৃদু ধাক্কা মেরে খুলল। দেখা গেল একটা ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলেন। স্মিথ কপালে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ অনুভব করলেন। এবার উল্টো পাশে একটা দরজা দেখলেন, যেটা দিয়ে রাস্তায় বেরুনো যায়। তার ডান পাশে আরেকটা দরজা খোলা, যেটা থেকে বাতির হলুদ আলো প্যাসেজের ওপর পড়েছে। 'এ ঘরে আসুন,' অ্যাটেনডেন্ট সংক্ষেপে বলল।

স্মিথ ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে এই অভিযানের সমাপ্তি বুঝি এখানেই ঘটবে। যদিও তাঁর কৌতূহল এখনও প্রবল। এই রহস্যময় ঘটনাটাকে অমীমাংসিত অবস্থায় রেখে যেতে পারছেন না তিনি। তাই অদ্ভুত লোকটার সাথে আলোকিত ঘরটায় ঢুকলেন।

ঘরটা ছোট। সাধারণত দারোয়ানদের এরকম ঘর দেয়া হয়। ভেতরে আগুন রাখার তাওয়ায় আগুন জ্বলছে। এক পাশে একটা চাকাওয়ালা চৌকির ওপর বিছানা পাতা। আরেক পাশে একখানা অমসৃণ কাঠের চেয়ার। মাঝখানে একটা গোল টেবিল রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে রাতের খাবারের অবশিষ্ট পড়ে আছে।

স্মিথ লক্ষ করলেন ঘরের আসবাবপত্রগুলো তৈরির মধ্যে প্রাচীন কারিগরি দক্ষতার ছাপ রয়েছে। মোমবাতি, মোমদানি, চুলো খোঁচাবার শিক, দেয়ালে ঝোলানো নকশা–সবগুলোর মধ্যে সুদূর অতীতের ছাপ রয়েছে।

বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট বিছানার কিনারায় বসে অতিথিকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল। 'হয়তো আমার ভাগ্যে এই ছিল,' বুড়ো চমৎকার ইংরেজিতে বলল। 'ভাগ্য হয়তো আগেই ঠিক করে রেখেছে যে যাবার আগে আমি একটা বিবরণ রেখে যাব। এ বিবরণ হচ্ছে সেই সব লোকদের জন্য যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে চায়। আমি আপনাকে সেই কথা বলতে চাই। চাই আপনার মাধ্যমে সবাই এই কথা জানতে পারুক। পরজগতের দোরগোড়ায় পা রেখে আমি আপনাকে আমার জীবনের গল্প বলছি।

'আপনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন। আমি মিশরীয়। প্রাচীন মিশরে

জন্মেছিলাম আমি। কী, অবাক হচ্ছেন? বিশ্বাস করছেন না? আগে আমার বিচিত্র কাহিনি পুরোটা শুনুন।' বুড়ো একটু থেমে আবার বলল, 'তো যা বলছিলাম, আমি জন্মেছিলাম প্রাচীন মিশরে। আজ যে পদদলিত দাসজাতি নীলনদের তীরে বাস করছে আমি সে গোত্রের কেউ নই। প্রাচীন মিশরে যে বীর্যবান আর পরিশ্রমী জাতি বাস করত, যারা ইহুদিদের বশ করেছিল আর দুর্ধর্ষ ইথিওপিয়ানদের দক্ষিণের মরুভূমিতে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যারা বিশাল বিশাল পিরামিড তৈরি করেছিল, সেই জাতিতে আমার জন্ম।

'যীশুর জন্মের ষোলোশো বছর আগে ফারাও Tuthmosis-এর রাজত্বকালে আমি পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলাম। আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরে বসছেন। ভয় পাচ্ছেন? কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে আমার কাহিনি শুনুন। তা হলে বুঝতে পারবেন, আমি যতটা না ভয়ের তার চেয়ে অনেক বেশি করুণার পাত্র।

'আমার নাম সোসরা। আমার বাবা ছিলেন আবরিস-এর ওসাইরিস দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মন্দিরটা ছিল নীলনদের বুবাস্তিক শাখার তীরে। এই মন্দিরেই আমি পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে সব রকমের অতীন্দ্রিয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। এই বিদ্যা সম্পর্কে আপনাদের বাইবেলেও লেখা আছে। আমি মেধাবী ছাত্র ছিলাম। দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরোহিত আমাকে যা শেখাতে পারতেন না, ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই আমি তা শিখে ফেললাম। ওই সময় থেকে আমি নিজেই প্রকৃতির গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলাম। আমার এই জ্ঞানের কথা আমি কাউকে জানাইনি।

'সমস্ত প্রশ্নের থেকে একটা প্রশ্ন আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল। প্রশ্নটা হলো জীবনের প্রকৃতি কী? এই বিষয়ে আমি অনেক গবেষণা করতে শুরু করলাম। এর মূলনীতির গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলাম। ওষুধের লক্ষ্য হলো রোগ হলে দেহ থেকে রোগকে তাড়িয়ে দেয়া। আমার মনে হলো এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় যাতে দেহে কোনওদিন দুর্বলতা কিংবা মৃত্যু বাসা বাঁধতে না পারে। আমার গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অর্থহীন। করলেও আপনি বুঝতে পারবেন না। এ গবেষণার জন্য আমাকে দীর্ঘকাল অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। এ পরীক্ষার কিছু অংশ পশুর ওপর, কিছু অংশ ক্রীতদাসদের ওপর আর কিছু অংশ আমার নিজের ওপর চালিয়েছিলাম। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকুই বলছি, দীর্ঘ গবেষণার ফলে আমি এমন একটা তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছিলাম যেটা ইনজেকশন দিয়ে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করালে মানব দেহ সময়, হিংস্রতা অথবা রোগের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এর ফলে মানুষ অমর হবে না কিন্তু ওষুধের কার্যকারিতা থাকবে হাজার হাজার বছর ধরে। ফলে সে বেঁচে থাকবে হাজার হাজার বছর। প্রথমে একটা বিড়ালের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করলাম। তারপর তার শরীরে মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু তীব্র বিষেও বিড়ালটি মরল না। আজও লোয়ার ঈজিপ্টে ওটি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে কোনও রহস্য বা জাদু নেই। এটা নিছকই এক রাসায়নিক আবিষ্কার। যেটা আবারও তৈরি করা যেতে পারে।

'যৌবনে যে কেউ জীবনকে ভালবাসে। আমার মনে হলো জীবনের সমস্ত দুশ্চিন্তার বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়েছি আমি। কারণ মৃত্যুকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারব বহু দূরে। অত্যন্ত হালকা মনে আমি আমার আবিষ্কৃত সেই অভিশপ্ত জিনিসটি আমার শিরায় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর এমন এক লোকের খোঁজ করতে লাগলাম যাকে আমি আমার দীর্ঘ জীবনের সঙ্গী করতে পারি।

'মহান দেবতা থোথ-এর মন্দিরে এক তরুণ পুরোহিত ছিল। তার নাম পারমেস। সে প্রকৃতি আর পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিল। এ জন্য ওকে আমি খুব পছন্দ করতাম। আমার এই গোপন আবিষ্কারের ব্যাপারে ওকে সব খুলে বললাম। ও উৎসাহিত হয়ে আমাকে অনুরোধ করায় ওর শরীরে ওই ওষুধ ঢুকিয়ে দিলাম। ভাবলাম, এই সুদীর্ঘ জীবনে একজন সাথী পেলাম।

'এই বিরাট আবিষ্কারের পর আমার গবেষণায় কিছুটা ঢিল পড়ল। কিন্তু পারমেস দ্বিগুণ উদ্যমে গবেষণা শুরু করল। প্রতিদিন তাকে থোথের মন্দিরে গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করতে দেখেছি। কিন্তু ওর কাজ সম্পর্কে খুব কম কথাই আমাকে বলত। আমি শহরের পথে পথে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতাম। আনন্দের দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে ভাবতাম এ সবই চলে যাবে শুধু আমি টিকে থাকব। পথচারীরা মাথা নুইয়ে আমাকে সম্মান জানাত। কারণ পণ্ডিত হিসেবে বিদেশেও আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

'এ সময় দেশে যুদ্ধ শুরু হলো। হেক্সোমদের তাড়িয়ে দেবার জন্য মহান ফারাও পূর্ব সীমান্তে একদল সৈন্য পাঠালেন। আবরিসে একজন গভর্নর পাঠালেন যাতে ফারাওয়ের শাসন কায়েম করতে পারেন। শুনেছিলাম গভর্নরের মেয়ে নাকি খুব সুন্দরী। একদিন পারমেসকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে তার সঙ্গে দেখা হলো। চারজন ক্রীতদাস একটা পালকিতে করে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম দেখাতেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। আমি আর আমার মাঝে রইলাম না। ভাবলাম, এই আমার জীবনের সেই কাঙ্ক্ষিত নারী। ওকে ছাড়া আমার জীবন ধারণ করা অসম্ভব। মহান দেবতা হোরাস-এর নামে শপথ করলাম, ওকে নিজের করে পাব। আমার মনের কথা পারমেসকে জানালাম, কিন্তু ও আমার কাছ থেকে চলে গেল। দেখলাম ওর মুখটা মাঝরাতের অন্ধকারের মত কালো হয়ে গেছে।

'সেই মেয়ের সাথে আমার ভালবাসার কাহিনি আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এতটুকুই বলব, আমি যেমন তাকে ভালবাসতাম, সেও আমাকে তেমনি গভীরভাবে ভালবাসত। শুনেছিলাম, আমার সাথে দেখা হবার আগেই নাকি পারমেসের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। পারমেস তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। কিন্তু এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। কারণ আমি জানতাম ওর হৃদয় আমার।

'এ সময় এক দুর্যোগ দেখা দিল। আমাদের শহরে হোয়াইট প্লেগের আক্রমণ হলো। অনেকেই মারা যেতে লাগল। কিন্তু আমি অসুস্থ লোকদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কারণ আমার কোনও ক্ষতির আশংকা ছিল না। আমার সাহস দেখে গভর্নরের মেয়ে মানে আমার প্রেমিকা বিস্মিত হলো। আমি তাকে আমার গোপন আবিষ্কারের কথা বললাম। অনুরোধ করলাম আমার এই চমৎকার আবিষ্কার

ব্যবহারের জন্য।

"'আমার ওষুধ তোমার ওপর প্রয়োগ করতে দাও, আতমা (Atma)," আমি বললাম। "তা হলে ফুলের মত তোমার এই সুন্দর শরীর কখনও শুকিয়ে যাবে না। হাজার হাজার বছর চলে যাবে কিন্তু আমরা এবং আমাদের ভালবাসা চিরকাল রয়ে যাবে। ফারাও শেফ্রুর বিরাট পিরামিড ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরও আমরা রয়ে যাব।"

'কিন্তু ওর মনে সংশয় ছিল। "এটা কি ঠিক হবে?" আমাকে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। "এর ফলে কি দেবতার ইচ্ছাকে বাধা দেয়া হবে না? মহান দেবতা ওসাইরিস যদি আমাদের দীর্ঘ জীবন চাইতেন, তবে তিনি নিজেই কি ব্যবস্থা করতেন না?"

'ভালবাসার কথা বলে আমি ওর সন্দেহ দূর করলাম। যদিও ও ইতস্তত করছিল। ও বলেছিল, এটা একটু বড় প্রশ্ন। ভেবে দেখার জন্য আমার কাছে এক রাত সময় চাইল। বলল যে আগামীকাল সকালে ওর উত্তর জানতে পারব। যদিও এক রাত বেশি সময় নয়। আমাকে বলেছিল, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আইসিসের কাছে সাহায্য চাইবার জন্য প্রার্থনা করবে।

'একবুক সংশয় আর মনের মধ্যে অমঙ্গলের চিন্তা নিয়ে ওর কাছ থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে মন্দিরের প্রথম বলিদান শেষ হবার পরেই আমি আতমাদের প্রাসাদের উদ্দেশে ছুটে গেলাম। প্রাসাদে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় এক ক্রীতদাসীর সাথে দেখা হলো। সে বলল, তার মনিব কন্যা খুব অসুস্থ। একথা শুনে পাগলের মত ছুটে আমি ওর ঘরে চলে গেলাম। দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছে ও। মাথাটা বালিশের ওপর। মুখটা বিবর্ণ, চোখ দুটো চকচক করছে। ওর কপালের মাঝ বরাবর একটা বেগুনি রঙের ক্ষত জ্বলজ্বল করছে। ক্ষতটা দেখেই বুঝতে পারলাম কী হয়েছে ওর। এ হলো হোয়াইট প্লেগের চিহ্ন। একে অনিবার্য মৃত্যুর চিহ্নও বলা যায়।

'আতমা বাঁচল না।

'সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা কী বলব! মাসের পর মাস আমি পাগলের মত আচরণ করতে লাগলাম। জ্বরে আক্রান্ত শরীরে ভুল বকতে লাগলাম। কিন্তু আমি মরতে পারলাম না। মৃত্যুকে আমি যেমন করে কামনা করছিলাম, মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত কোনও আরবও বুঝি তেমনভাবে পানির খোঁজ করে না। যদি বিষ অথবা অস্ত্রের আঘাতে মরতে পারতাম তবে পরজগতে আমার ভালবাসার সাথে মিলিত হবার জন্য একটুও দেরি করতাম না। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সেই অভিশপ্ত ওষুধ আমার দেহে শক্ত প্রভাব বিস্তার করে বসেছে।

'এক রাতে দুর্বল শরীরে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ পারমেস আমার ঘরে প্রবেশ করল। ও বাতির আলোর বৃত্তের মাঝে দাঁড়াল। ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখলাম ওর চোখে বিজয়ীর দৃষ্টি।

"'তুমি আতমাকে মরতে দিলে কেন?" পারমেস আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে যেমন দীর্ঘায়ু করেছ, ওকে কেন করলে না?"

"'দেরি করে ফেলেছিলাম," আমি জবাব দিলাম। "কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম তুমিও তো ওকে ভালবাসতে। তুমি আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী। একদিন পরজগতে ওকে আমরা ঠিকই দেখতে পাব। কিন্তু এর জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। চিন্তাটা কত ভয়ঙ্কর, তাই না? মূর্খ, আমরা মূর্খ। মৃত্যুকে আমরা শত্রু বলে গণ্য করেছিলাম।"

"'একথা তুমি বলতে পার," উন্মাদের মত হেসে পারমেস বলল। "তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কথা বেরুতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এসব অর্থহীন।"

"'কী বলতে চাও তুমি?" আমি চিৎকার করে বললাম, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলাম। "শোকে নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

'পারমেসের চেহারায় আনন্দের ছাপ। ওর সারা শরীর এমন ভাবে কাঁপছে যেন এতে শয়তান ভর করেছে।

"'জান, আমি কোথায় যাচ্ছি?" ও জিজ্ঞেস করল।

"'না," আমি জবাব দিলাম। "বলতে পারব না।"

"'আমি আতমার কাছে যাচ্ছি," পারমেস বলল। "শহরের প্রাচীরের বাইরে জোড়া খেজুর গাছের পাশের সমাধিতে শুয়ে আছে ও।"

"'ওখানে কেন যাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"'মরতে!" পারমেস চিৎকার করে বলল। "মরতে যাচ্ছি! পৃথিবীর আর কোনও কিছু আমাকে আটকাতে পারবে না।"

"'কিন্তু তুমি মরতে পারবে না," আমি চিৎকার করে বললাম। "তোমার রক্তে এখনও ওই অভিশপ্ত ওষুধের প্রভাব রয়েছে।"

"'আমি ওটাকে অগ্রাহ্য করতে পারব," পারমেস বলল। "এমন একটা শক্তিশালী ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি যেটা তোমার ওষুধের প্রভাব নষ্ট করে ফেলতে পারবে। আমার শরীরে এখন ওটা কাজ করছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি মারা যাচ্ছি। আমি আতমার সাথে মিলিত হব। কিন্তু তুমি এই জীবনে বোঝা বইবার জন্য পড়ে থাকবে।"

'পারমেসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ও সত্যি কথাই বলছে। ওর চোখের আলো সেই কথাই বলছে।

"'তুমি আমাকে শেখাও!" আমি বললাম।

"'কখনও না!" পারমেস জবাব দিল।

"'মহান দেবতা থোথ আর আনুবিসের নামে তোমার কাছে অনুরোধ করছি!"

"'কোনও লাভ হবে না," পারমেস শীতল কণ্ঠে বলল।

"'তা হলে আমি নিজেই খুঁজে নেব," আমি চিৎকার করে বললাম।

"'পারবে না," পারমেস বলল। "আমি দৈবক্রমে এটা আবিষ্কার করেছি। ওষুধের মধ্যে এমন একটা উপাদান আছে, যা তুমি কখনও সংগ্রহ করতে পারবে না। থোথের আংটির মধ্যে যেটুকু ওষুধ আমি রেখেছি, তার বাইরে এক ফোঁটা ওষুধও কেউ কোনওদিন তৈরি করতে পারবে না।"

'"থোথের আংটির মধ্যে?" আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। "আংটিটা কোথায়?"

'"তুমি একথা কখনও জানতে পারবে না," পারমেস বলল। "তুমি আতমার ভালবাসা পেয়েছিলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে জিতল? তোমাকে আমি এই নোংরা পৃথিবীতে রেখে আতমার কাছে চলে যাব।" পারমেস পাগলের মত ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন সকালে খবর পেলাম থোথের তরুণ পুরোহিত মারা গেছে।

'এরপর আমার দিনগুলো গবেষণার মধ্যে কাটতে লাগল। সেই বিষের সন্ধান আমাকে অবশ্যই পেতে হবে। যেটা আমার ওষুধের প্রভাব নষ্ট করে আমাকে মৃত্যু দান করবে। ভোর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত আমি টেস্টটিউব আর ফার্নেস নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। থোথের মন্দির থেকে পারমেসের ব্যবহৃত প্যাপিরাস আর ফ্লাস্কগুলো সংগ্রহ করলাম। কিন্তু হায়! ওগুলো থেকে কিছুই জানলাম না। প্যাপিরাসগুলোতে লেখা কিছু ইঙ্গিত আমার মনে আশা জাগিয়ে তুলত। কিন্তু কোনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলাম না। মাসের পর মাস আমি কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন জোড়া খেজুর গাছের পাশে আতমার সমাধিতে হাজির হতাম। সেখানে আতমার উপস্থিতি অনুভব করতাম। ওর উদ্দেশে ফিসফিস করে বলতাম, ওর কাছে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

'পারমেস বলেছিল ওর আবিষ্কারের সাথে থোথের আংটির সম্পর্ক রয়েছে। আংটিটার কথা আমার মনে আছে। ওটা একটা বিরাট আর ভারী আংটি। আংটিটা সোনা দিয়ে তৈরি নয়। এক ধরনের ভারী আর দুর্লভ ধাতু দিয়ে তৈরি, যেটা হারবাল পর্বত থেকে আনা হয়েছিল। আপনারা ধাতুটাকে প্লাটিনাম বলেন। মনে পড়ল, বিরাট ওই আংটিটায় একখণ্ড ফাঁপা স্ফটিক বসানো রয়েছে। হয়তো ওটার মধ্যেই পারমেসের আবিষ্কৃত ওষুধের কয়েক ফোঁটা থাকতে পারে। পারমেসের গোপন আবিষ্কার ধাতুর সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ প্লাটিনামের তৈরি অনেকগুলো আংটি থোথের মন্দিরে আছে। তা হলে কি পারমেস তার আবিষ্কৃত ওষুধ ফাঁপা স্ফটিকের মধ্যে জমা রেখেছে? এ সিদ্ধান্তে আসার পর আমি তন্নতন্ন করে পারমেসের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে লাগলাম। একখানা কাগজ থেকে জানলাম আমার ধারণাই ঠিক। স্ফটিক খণ্ডের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই বিষ। সেই বিষের কয়েক ফোঁটা তখনও ব্যবহার করা হয়নি।

'কিন্তু আংটিটা খুঁজে পাব কীভাবে? আংটিটা পারমেসের সাথে ছিল না। ওর মৃতদেহটা মমিতে পরিণত করার সময় তা পাওয়া যায়নি। তার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাঝেও আংটিটা পাওয়া যায়নি। যে সব জায়গায় ও যেত সেখানেও খুঁজে দেখেছি। কিন্তু পাইনি। এ সময় নতুন এক দুর্ভাগ্য না এলে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার পরিশ্রম সার্থক হত।

'হিকসোসদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। ফারাও-এর সেনাবাহিনী সেই যুদ্ধে পরাজিত হলো। এই মেষ পালক জাতি আমাদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আমাদের সবকিছু লুটপাট করতে লাগল। এই এলাকায় দিনের বেলায়

বইতে লাগল রক্ত স্রোত আর রাতের বেলায় জ্বলতে লাগল আগুন। আমাদের আবরিস ছিল মিশরের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু ওই বর্বরদের আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। নগরীর পতন হলো। গভর্নর এবং সৈন্যদের হত্যা করা হলো। আর অন্যদের সাথে আমি বন্দি হলাম।

'বছরের পর বছর ধরে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে আমি পশু চরাতে লাগলাম। আমার প্রভু মারা গেল। তার ছেলেও বুড়ো হলো। কিন্তু মৃত্যু থেকে তখনও আমি বহু দূরে। অবশেষে একদিন একটা দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে আমি পালালাম। এগিয়ে চললাম মিশরের দিকে। হিকসোসরা মিশরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের রাজা দেশটা শাসন করছে। আবরিস নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে। শহরটাকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বিরাট বিরাট মন্দিরগুলোর জায়গায় এখন শুধুই ধ্বংস স্তূপ। প্রতিটা কবর লুট করা হয়েছে। প্রত্যেকটা স্মৃতি সৌধ ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমার আতমার সমাধির কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মরুভূমির বালির তলায় হারিয়ে গেছে সেই সমাধি। যে পোড়া খেজুর গাছ সমাধিটাকে চিহ্নিত করত তার কোনও চিহ্ন নেই। পারমেসের কাগজপত্র এবং থোথের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হয় ধ্বংস হয়েছে, নয়তো ছড়িয়ে পড়েছে সিরিয়া মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অনেক খুঁজলাম। কিন্তু সব পরিশ্রম ব্যর্থ হলো।

'তখন থেকেই থোথের আংটি এবং তার মধ্যে লুকানো পারমেসের ওষুধ খুঁজে পাবার আশা আমি ত্যাগ করেছি। মনস্থির করলাম যতদিন ওষুধের প্রভাব কেটে না যায় ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। সময় যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা আপনি কীভাবে বুঝবেন? কালস্রোত অসীম, অনন্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কালের এই সীমিত গণ্ডির মাঝেই আপনাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমি জানি। যুগ-যুগ ধরে কালের অসীম স্রোতে ভেসে চলেছি আমি। ইতিহাসের উত্থান পতন আমি নিজের চোখে দেখেছি। ট্রয় নগরীর পতন যখন হয় তখন আমি বৃদ্ধ। হেরোগেটাস যখন মেমফিস নগরীতে আসে, আমি তখন অতি বৃদ্ধ। যীশু খ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে তাঁর নতুন বাণী প্রচার করলেন, আমি তখন বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েছি।

'কিন্তু আজও আপনি আমাকে জীবিত মানুষ হিসেবেই দেখছেন। কারণ আমার রক্তে ওই অভিশপ্ত পদার্থ এখনও ক্রিয়াশীল। তবে এবার আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।

'এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি সব দেশে ঘুরেছি, সব জাতির সাথে বসবাস করেছি। পৃথিবীর সব ভাষাই আমার কাছে একই রকম। ক্লান্তিকর সময় কাটানোর জন্য আমি সব ভাষা শিখেছি। সময় যে কীভাবে ধীরে চলে তা আপনাকে কীভাবে বোঝাব? বর্বরতার মধ্যযুগ আর আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ আমার নিজের চোখে দেখা। এসবই আমি পেছনে ফেলে এসেছি। অন্য কোনও নারীর দিকে কখনও আমি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাইনি। আতমা জানে আমি তাকে প্রচণ্ড ভালবাসি।

'প্রাচীন মিশর সম্পর্কে গবেষকরা যা লিখতেন তা পড়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এই দীর্ঘ জীবনে অনেক কাজ করেছি। কখনও প্রাচুর্যের মধ্যে

থেকেছি, কখনওবা দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু যে অবস্থায়ই থাকি না কেন প্রাচীন মিশর সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা সব সময় কিনেছি। নয় মাস আগে আমি সানফ্রান্সিস্কোতে ছিলাম। সেখানে এক পত্রিকায় পড়লাম, প্রাচীন আবরিস নগরীর কাছাকাছি এলাকার বালির তলা থেকে কিছু প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। খবরটা পড়ে মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে মুখের মধ্যে চলে এসেছে। ওখানে আরও লেখা ছিল, যিনি খননের দায়িত্বে আছেন, বর্তমানে তিনি সদ্য আবিস্কৃত কিছু সমাধি পরীক্ষায় ব্যস্ত। এরকম এক সমাধির ভেতরে একটি মমি পাওয়া গেছে। মমিটির কফিন এখনও খোলা হয়নি। কফিনের ওপর একটা চিত্রলিপি আছে। তাতে লেখা—"ফারাও টুথমোসিসের আমলের গভর্নরের কন্যা এখানে শুয়ে আছেন।"

'পত্রিকায় আরও লেখা আছে, কফিনের ঢাকনা সরাবার পর মমিটার বুকে একটা প্লাটিনামের বড় আংটি পাওয়া গেছে। তাতে বিরাট একখণ্ড স্ফটিক বসানো। বুঝতে পারলাম, পারমেস এখানেই থোখের আংটি লুকিয়ে রেখেছিল। আর এজন্য ও বলেছিল, অতি নিরাপদ জায়গায় আংটিটা লুকিয়ে রেখেছে। কারণ কোনও মিশরীয়ই মমির অভিশাপ নেবার জন্য কফিনের ঢাকনা খুলবে না।

'ওই রাতেই আমি সানফ্রান্সিস্কো ত্যাগ করলাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আবরিসে পৌছে গেলাম। অতীতের সেই সমৃদ্ধ নগরীর জায়গায় বর্তমানে কয়েকটা বালুর স্তূপ আর ভাঙাচোরা কয়েকটা প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নেই। কয়েকজন ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক এখানে খনন করছিল। তাদের কাছে গিয়ে আংটিটার কথা জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল যে আংটি আর মমিটা কায়রোর বুলাক জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি বুলাক জাদুঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, ম্যারিয়েট বে নামে এক লোক আংটি আর মমির মালিকানা দাবি করেছে। তাই ওগুলো তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে শুনলাম তিনি দুটি জিনিসই ল্যুভর মিউজিয়ামের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ওগুলোকে অনুসরণ করে অবশেষে আমি ল্যুভরে হাজির হলাম। সুদীর্ঘ চার হাজার বছর পর আমার আতমার দেহাবশেষ খুঁজে পেলাম আমি। খুঁজে পেলাম সেই আংটিটি, যেটাকে এতকাল তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

'কিন্তু ওগুলো হাতে পাব কীভাবে? কেমন করে ওই মূল্যবান বস্তু দুটি আমি একান্ত করে পাব? এবার ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হলো। মিউজিয়ামের মিশরীয় সংগ্রহশালার অ্যাটেনডেন্টের পদ খালি হলো। আমি সোজা ডিরেক্টরের কাছে চলে গেলাম। তাঁকে বোঝাতে পারলাম যে প্রাচীন মিশর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি। অতি আগ্রহে হয়তো একটু বেশিই বলে ফেললাম। আমার কথা শুনে ডিরেক্টর মন্তব্য করলেন, "তোমাকে তো দেখছি সামান্য অ্যাটেনডেন্টের পদের চেয়ে অধ্যাপকের পদেই বেশি মানায়।" তারপরও তিনি আমাকে চাকরি দিলেন। আর এভাবেই আমি এই চাকরিটা পেলাম। এখানে আজকেই আমার প্রথম এবং শেষ রাত।

'মি. ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ, এই হলো আমার কাহিনি। আপনার মত বিদ্বান ব্যক্তির

কাছে এর বেশি কিছু আমার বলার নেই। আজ রাতে দৈবক্রমে আপনি সেই নারীর মুখ দেখলেন যাকে সুদূর অতীতে আমি ভালবেসেছিলাম। বাক্সের মধ্যে স্ফটিক বসানো অনেকগুলো আংটি রয়েছে। কিন্তু আমার সেই প্লাটিনামের আংটিটি খুঁজে পাবার জন্য আমাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। আংটিটার স্ফটিক খণ্ডের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছি ওটার ভেতরে পারমেসের আবিষ্কৃত ওষুধের কয়েক ফোঁটা রয়ে গেছে। অবশেষে আমার এই সুদীর্ঘ অভিশপ্ত জীবনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।

'মি. স্মিথ, আপনার কাছে আমার আর কিছু বলার নেই। এ কাহিনি এতকাল আমার মনের মধ্যে ছিল। আজকে আপনার কাছে বলে মুক্তি পেলাম। ইচ্ছে করলে আমার জীবনের ইতিহাস আপনি অন্য লোকদের কাছে বলতে পারেন আবার না-ও বলতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রইল।

'আজ রাতে আপনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোনও বাধাই আমি সহ্য করতাম না। আমার কাজ শেষ হবার আগে যদি আপনাকে দেখতে পেতাম তা হলে আমাকে বাধা দেবার বা কোনও রকম বিপদ সংকেত জানাবার সুযোগটুকু পর্যন্ত আপনাকে দিতাম না। এবার আপনাকে বাইরে বেরুবার রাস্তা দেখিয়ে দিই। এই দরজা দিয়ে বেরুলে আপনি Rue de Rivoli রাস্তায় যেতে পারবেন। শুভ রাত্রি, মি. স্মিথ।'

মি. জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ যেতে যেতে পেছনে ফিরে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য সোসরার কৃশ দেহটা সরু দরজা পথে দেখতে পেলেন। পরমুহূর্তে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। খিল আটকানোর গুরু গম্ভীর শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল।

লণ্ডনে ফিরে আসার দু'দিন পরে মি. জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ 'দি টাইমস' পত্রিকায় একটি খবর পড়লেন। খবরটি পাঠিয়েছে সংবাদপত্রের প্যারিস সংবাদ দাতা। সংবাদটি হচ্ছে:

"ল্যুভর মিউজিয়ামে অস্বাভাবিক ঘটনা

গতকাল সকালে মিউজিয়ামের বড় ঈজিপশিয়ান চেম্বারে এক অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে। সকালে ঝাড়ুদারেরা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে ঈজিপশিয়ান চেম্বারের নবনিযুক্ত বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মৃত ব্যক্তি দু'হাত দিয়ে একটি সদ্য সংগৃহীত মমি জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। মৃত ব্যক্তি এত দৃঢ়ভাবে মমিটাকে আলিঙ্গন করে রেখেছিল যে অনেক কষ্টে তাদেরকে আলাদা করা গেছে। একটা বড় বাক্সে অনেকগুলো মূল্যবান আংটি ছিল। বাক্সটা খুলে সেগুলো এলোমেলো করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ধারণা লোকটা মমি চুরি করে ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু মমি নিয়ে যাবার সময় হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। লোকটার বয়স কত বা দেশ কোথায় কিছুই জানা যায়নি। তার এই অস্বাভাবিক ও নাটকীয় মৃত্যুতে শোক করবার জন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন কিংবা

বন্ধু-বান্ধব খুঁজে পাওয়া যায়নি।”

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখলেন স্মিথ। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ল্যুভর মিউজিয়াম। মনে পড়ল সেই রাতের কথা...সেই রহস্যময় মানুষটির কথা।

মূলঃ স্যর আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তরঃ তারক রায়

হ্যালোইনের রাতে

হ্যালোইনের জঙ্গল পার্টিতে অংশগ্রহণ করতে এসেছে ওরা তিন বোন। অ্যাঞ্জেলা, নিনা আর মিশেল। নিনা আর মিশেল বয়সে বড়, অ্যাঞ্জেলা ওদের অনেক ছোট। ষোলো বছরে পড়ল এবার। বাইরের জগৎ সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন। দুই বোনের সাথে এবার প্রথমবারের মত যোগ দিচ্ছে হ্যালোইন জঙ্গল পার্টিতে।

পার্টিতে যারা অংশগ্রহণ করবে সবাই এসে গেছে। কিছু বয়স্ক দম্পতি, কয়েকজন ইয়াং ছেলেমেয়ে, বাচ্চাকাচ্চা আর অ্যাঞ্জেলারা তিন বোন–সব মিলে মোটের উপর ৩৫-৪০ জন হবে। ঠিক রাত ১০-৩০ মিনিটে বাস ছেড়ে দেবে। অ্যাঞ্জেলারা তিন আসনের একটা বেঞ্চ দখল করে বসে গেল। বাসের মধ্যে বাচ্চাদের হৈ চৈ আর অন্যান্যদের উল্লাস চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে আসছে। অনেকেই ভ্যাম্পায়ার আর ওয়্যারউল্ফের মুখোশ পরে একে অন্যকে হাস্যকরভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাঞ্জেলা বসেছে সিটের করিডর সাইডে। লাল একটা হুডওয়ালা গাউন তার পরনে। চুপচাপ বসে আছে ও। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না নিনার।

'কী হয়েছে তোমার?' নিনা জিজ্ঞেস করল।

অ্যাঞ্জেলা ইশারায় পিছনে বসা ভ্যাম্পায়ারের মুখোশ পরা এক লোককে দেখাল, যে একদৃষ্টিতে অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকানোর ভঙ্গিটা কেমন যেন রহস্যময়, কিছুটা ভয়ঙ্করও।

নিনা অ্যাঞ্জেলাকে লোকটার দিকে তাকাতে মানা করল। ছোট বোনটা সুন্দরী, বেশ সুন্দরী। লোকজন একটু লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতেই পারে। এতে ওদের যায় আসে না। আজ হ্যালোইনের রাত। ওরা তিন বোন আজ খুব এনজয় করবে, শুধু ওরা তিনজন।

রাত ১২-০৪ মিনিটে বাস এসে পৌঁছল শহরের বাইরে অবস্থিত 'উল্ফ ফরেস্ট' নামে জঙ্গলের সামনে। নেকড়ে আর ভালুকের অভয়ারণ্য এই বন। তবে ওরা বেশ ভিতরের দিকে থাকে। জঙ্গলের এই দিকটাতে আসে না বললেই চলে। হৈ চৈ করতে-করতে সবাই বাস থেকে নেমে পড়ল। আগে থেকেই চারজন লোক পাঠানো হয়েছিল। তারা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেই রেখেছে। বয়স্ক লোকেরা ক্যাম্প ফায়ারের ধার ঘেঁষে বসল, বাচ্চারা এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। যুবক-যুবতীরা যুগলভাবে ঘুরতে লাগল এদিক সেদিক। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের মুখোশ পরা রহস্যময় লোকটাকে কোথাও দেখা গেল না।

নিনা ওর ছোট দুই বোনকে নিয়ে বনের ভিতর দিকে ঘুরতে বের হলো। বিশাল এক পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। এত সুন্দর দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি অ্যাঞ্জেলা। আকাশ আর পূর্ণিমার আলোয় স্নান করা জঙ্গল দেখতে-দেখতে দুই বোনের পিছন-পিছন যেতে লাগল ও। সৌন্দর্য দেখতে এতই ব্যস্ত ছিল যে কখন বোনদের ছেড়ে পথ হারিয়েছে বুঝতে পারেনি অ্যাঞ্জেলা। যখন বুঝতে পারল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। চারদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অ্যাঞ্জেলা। আশপাশে কেউ নেই। একদম নিশ্চুপ বনভূমি। বোনদের কাছে শোনা গল্পগুলো মনে পড়ে গেল অ্যাঞ্জেলার। হ্যালোইনের এই রাতে জেগে ওঠে সব দানবেরা। ভ্যাম্পায়ার আর ওয়্যারউল্ফরা মেতে ওঠে রক্তখেলায়।

শরীরটা একটু ছমছম করে উঠল অ্যাঞ্জেলার। পিছনে একটা শব্দ হতেই ঘুরে তাকাল ও। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। ভাল করে খেয়াল করতেই দেখল মুখোশ পরা সেই লোকটা একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখোশের ভিতর থেকে লোলুপ চোখ দুটো অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসছে যেন। প্রচণ্ড ভয় পেল অ্যাঞ্জেলা। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ডভাবে লাফাচ্ছে। লোকটা ধীরে-ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। অ্যাঞ্জেলা পিছাতে শুরু করল। হঠাৎ ঘুরে দৌড় দিল। মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফেলল লোকটা। তারপর পিছু নিল অ্যাঞ্জেলার।

হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর এসে খেয়াল হলো অ্যাঞ্জেলা নেই ওদের সঙ্গে। চমকে উঠল ওরা দুই বোন। চারদিকে খোঁজ করতে লাগল অ্যাঞ্জেলার। কিন্তু কোথাও নেই। ভয় পেয়ে গেল মিশেল।

'কোথায় যেতে পারে অ্যাঞ্জেলা?' ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

'জানি না, বনের মধ্যে পথ হারানো অস্বাভাবিক কিছু না,' অনিশ্চিত কণ্ঠ নিনার, 'চলো আরও ভাল করে খুঁজে দেখি।'

খুঁজতে-খুঁজতে বনের আরও গভীরে চলে এল ওরা। হঠাৎ একটা কিছুতে পা বেধে পড়ে গেল নিনা। উঠে দাঁড়িয়েই তাকাল জিনিসটার দিকে। মানুষের আকৃতির কিছু একটা পড়ে আছে। এগিয়ে গেল ওটার দিকে। ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারল জিনিসটা। অ্যাঞ্জেলার গাউন। হুড দিয়ে মুখটা ঢাকা। ততক্ষণে মিশেলও চলে এসেছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। পড়ে থাকা দেহটার মুখ থেকে খুব ধীরে হুডটা সরাল নিনা। তাকাল দেহটার মুখের দিকে।

না, অ্যাঞ্জেলা নয়। একজন যুবক ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলার গাউনের ভিতর থেকে।

'আমাকে বাঁচাও,' ফিসফিস করে বলে উঠল যুবকটা।

'কে তুমি, কী হয়েছে তোমার?' নিনা জিজ্ঞেস করল।

'ও, ওই মেয়েটা...' বলে পিছন দিকে আঙুল তুলল লোকটা।

ঘুরে তাকাল নিনা আর মিশেল। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। একটা হালকা নীল রঙের টি-শার্ট আর সাদা স্কার্ট ওর পরনে। গাউনের ভিতরে এগুলো পরে ছিল সে, যেটা এখন লোকটার গায়ে জড়ানো।

অ্যাঞ্জেলার দিকে এগিয়ে গেল নিনা।

'তোমাকে বলেছিলাম না আমাদের সাথে সাথেই থাকতে?'

'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।' ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলল অ্যাঞ্জেলা, 'আর ওই লোকটা...'

'ভালই তো,' লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল নিনা, 'দারুণ সুদর্শন এক যুবককে পেয়েছ তুমি। দারুণ ভাগ্য তোমার।'

'কিন্তু আমি যে কিছুই পারি না, কোনও অভিজ্ঞতাই নেই আমার।' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'তাতে কী? আমরা সবাই-ই নতুন ছিলাম কোনও না কোনও সময়। ওর কাছে যাও, অ্যাঞ্জেলা। তোমার উষ্ণ ছোঁয়া দাও ওকে।'

একটু ভাবল অ্যাঞ্জেলা। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। যুবকটা তাকিয়ে থাকল রূপসীর দিকে। অ্যাঞ্জেলা সরাসরি লোকটার শরীরের উপর উঠে বসল। সামান্য ভয় কাজ করছে ওর মধ্যে। কিন্তু ভয়টা কাটিয়ে উঠল ও। একটানে নিজের টি-শার্টটা খুলে ফেলল। যুবকের মধ্যে আবার সেই লোলুপতা ফিরে এল। লোভাতুর চোখে তাকাল অ্যাঞ্জেলার অন্তর্বাস পরা শরীরের দিকে।

কিন্তু একী! হঠাৎ করেই যেন অ্যাঞ্জেলার শরীরে গজাতে লাগল ঘন কালো লোম। ঘন-ঘন শ্বাস নিতে থাকল সে। চোখের নীল মণি হঠাৎ পরিণত হলো হলুদ বর্ণে। ফাঁক হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলার মুখটা, চোয়ালের কোনার দুই দাঁত প্রথমে সরু আকার ধারণ করল, তারপর লম্বা হয়ে গেল, অনেকটা শ্বাপদ প্রাণীর দাঁতের মত। চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল দাঁতদুটো। মুহূর্তে বদলে গেল তার সুন্দর মুখখানা। নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর এক পিশাচীতে পরিণত হলো সে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কুৎসিত ভয়ঙ্কর কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল পিশাচী। তারপর মুখটা নামিয়ে আনল যুবকের ঘাড়ের কাছে। সুচালো দাঁতদুটো ফুটিয়ে দিল যুবকের দপদপ করতে থাকা ঘাড়ের রগে। তারপর অভুক্তের মত পান করতে লাগল যুবকের গরম তরল রক্ত, যেন অনন্তকাল ধরে ভীষণ ভীষণ পিপাসার্ত সে।

ভোর হয়ে আসছে। পার্টির লোকজন ফেরার জন্য বাসে উঠে পড়েছে। অ্যাঞ্জেলারা তিন বোন নিজেদের আগের সেই সিটেই বসে নিজেদের মধ্যে আড্ডায় জমে উঠেছে। বাচ্চা আর যুবক-যুবতীদের কোলাহলে মুখর হয়ে আছে বাসের ভিতরটা।

কিন্তু কেউ খেয়াল করল না, আসার সময় বাসটার সবগুলো আসন একেবারে পরিপূর্ণ থাকলেও, যাওয়ার সময় একটা আসন যাচ্ছে একদম ফাঁকা।

বাসটা রওনা হতেই জঙ্গলের ভিতর থেকে করুণ কণ্ঠে বিলাপ করে উঠল একটা নেকড়ে, যেন বিদায় জানাল হ্যালোইনের ভয়ঙ্কর রাতটাকে।

এস. শাহারিয়ার আহমেদ সাগর
[বিদেশী কাহিনির ছায়া অবলম্বনে]

কালীপূজা

কালীপূজার রাত এলেই স্বপ্নার আচরণ বদলে যায়। নম্র-ভদ্র, হাসিখুশি মেয়েটা হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ করেই ওর জীবনের গতিপথ বদলে গেছে। ঘটনাটা ওর জবানীতেই বলছি।

'বরাবরই আমি ভীষণ দুরন্ত। কোনকিছু মানি না। সেই কালীপূজার রাতে সবাই যখন দীপ জ্বালতে ব্যস্ত আমি তখন পা টিপে টিপে গেলাম কালীমন্দিরে। গেলাম ভাল কথা। কিন্তু মাথায় চাপল বদমতলব। মা'র জিভটা ভেঙে দিয়ে এলাম। আমার কাছে জিভ বের করা কালীমূর্তি দেখলেই কেমন যেন লাগে। এরপর এটা নিয়ে অনেক হইচই হলো। কিন্তু কেউ জানল না এই অপকর্মের হোতা কে। পরের বছর কালীপূজার রাতে অন্ধকার হতেই আমার কেমন অস্থির অস্থির লাগতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে আসছে, হাতে-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। দরদর করে ঘামছি। এত গরম লাগছে যে মনে হচ্ছে গরম চুল্লীর মধ্যে কেউ আমাকে বসিয়ে রেখেছে। একসময় আর থাকতে না পেরে গায়ের জামা-কাপড় টেনে টেনে খুলতে লাগলাম। তবু গরম কমল না। কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁফাতে লাগলাম, তারপর একছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ নগ্ন ষোড়শী কোন মেয়ে যদি জিভ বের করে ছুটে যায় তবে প্রথমেই মানুষের মনে যে চিন্তা আসে তা হলো—পাগলী। সবাই সরে গিয়ে পথ করে দিল। আমি ছুটে যেতে লাগলাম। একটা ছোট শিশু হঠাৎ কোথা থেকে এসে পায়ের তলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিলাম। তারপর মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেললাম। শিশুটির মুখ থেকে ছুটে আসা রক্তের ফিনকি আমাকে ভিজিয়ে দিল। অদ্ভুত এক তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ল আমার শরীরে-মনে। আমি শান্ত হয়ে হেঁটে বাড়ি গেলাম। কাপড় পরলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জানতে পারলাম শিশুটি মারা গেছে। প্রচণ্ড অপরাধবোধে আমার মানসিক শান্তি সম্পূর্ণ টুটে গেল। আমি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। রাতে গ্রামের অনেকেই আমাকে দেখেছিল, কিন্তু ওই বিকৃত চেহারার ষোড়শী যে আমি সেটা বুঝতে পারেনি। এ যাত্রা তাই বেঁচে গেলাম। কিন্তু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আমার জীবনে কোন স্বস্তি থাকল না। একদিন মাকে সব খুলে বললাম। মা আমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলেন। সাইকিয়াট্রিস্ট সব শুনে বললেন কালীমূর্তির জিভ ভেঙে ফেলায় আমার মধ্যে যে অপরাধবোধ কাজ করেছে তার ফলেই আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। ডাক্তারের পরামর্শ মত কিছুদিন চলার পর

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। গত কালীপূজার রাতে মাকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে দরজা বন্ধ করে রাখতে। মা রেখেছিলেনও। কিন্তু আবারও সেই একই রকম অনুভূতি। এবার আমি পোষা বিড়ালটার জিভ টেনে ছিঁড়লাম। অথচ বিড়ালটাকে কত ভালবাসতাম...' এটুকু বলেই স্বপ্না হু-হু করে কাঁদতে লাগল। ওর কাঁধে হাত রাখতেই ও আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'অনু, আজ রাতে আবার সেই ঘটনা ঘটবে। আমি জানি ঘটবেই। তুই, প্লিজ, বল, আমি কী করব।'

আমি বললাম, 'বেশ তো। আজ রাতে আমি তোর সাথে থাকব।'

'না, না,' স্বপ্না আঁতকে ওঠে। 'ওই সময় আমার কোন জ্ঞান থাকে না। তুই থাকলে কী না কী ঘটিয়ে বসব।'

'আরে দূর,' আমি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলি, 'এটা তোর মানসিক সমস্যা, ডাক্তার তো বলেছেই।'

'ঠিক আছে, তুই থাকিস। কিন্তু একসাথে নয়, আমার পাশের রুমে।' স্বপ্না নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

রাত এগারোটা পর্যন্ত গল্প করে, খেয়ে ঘুমাতে গেলাম প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে। শোয়ার সাথে সাথেই ঘুম। ঘুম ভাঙল কতক্ষণ পর কে জানে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মৃদু হাসলাম। স্বপ্না হয়তো ঘুমাচ্ছে। বেচারী অকারণেই ভয় পেয়েছে। একবার দেখে আসব নাকি? দরজা খুলতেই একটা পচা দুর্গন্ধ পেলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সতর্ক করে দিল—'খবরদার, যেয়ো না।' সেই অনুভূতিকে পাত্তা না দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম স্বপ্নার বিছানার দিকে। বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই ধক করে উঠল বুক। স্বপ্না! স্বপ্না সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বিছানায় বসে আছে। আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি পিছাতে চাইলাম, মনে হলো কেউ বুঝি পেরেক ঠুকে আমার পা মেঝের সাথে আটকে দিয়েছে। নড়তে পারলাম না। স্বপ্না লাফ দিয়ে এসে আমার গলা চেপে ধরার জন্য হাত বাড়াল। আমি যেন শেষ মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেলাম। দৌড়ে গেলাম দরজার দিকে। পাল্লাটা ধরতে না ধরতেই স্বপ্নার হাত আমার গলা চেপে ধরল, আমি চিৎকার করে উঠতে গেলাম, এক ধরনের গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দই বের হলো না। ওকে ধাক্কা দিতে লাগলাম কিন্তু ওর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ওর গায়ে পৈশাচিক শক্তি যেন ভর করেছে। আমার চোখের সামনে অনেকগুলো আলোর ফুটকি নেচে উঠে ক্রমশ আঁধার হতে লাগল। একটু অক্সিজেনের জন্য আকুলি বিকুলি করছে ফুসফুস। জিভটা বের হয়ে আসছে। আর কোন আশা নেই। হঠাৎই মনে হলো গলার চাপটা একটু হালকা হয়েছে। কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি পড়ে গেলাম আমার বিছানায়। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দরজা বন্ধ করার সময় কানে এল স্বপ্নার করুণ কণ্ঠ—'কেন এসেছিলি?' বাকি রাতটুকু জেগে না ঘুমিয়ে, জ্ঞানে না অচেতনে কাটিয়েছি জানি না। ভোরের আলো খোলা জানালা দিয়ে প্রবেশ করার পর রাতের আঁধারে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা অবাস্তব মনে হলো। মনে হলো বুঝি বা দুঃস্বপ্ন। দরজা খুলে

স্বপ্নার রুমে তাকাতেই মাথাটা ঘুরে উঠল। স্বপ্না, আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী পড়ে আছে নগ্ন দেহে। মুখ হাঁ হয়ে আছে। জিভ নেই, গলগল করে একসময় রক্ত পড়েছিল। এখন জমাট বেঁধে গেছে। ভাল করে তাকাতেই দেখলাম স্বপ্নার বাম হাতে মুঠো করে ধরা একটা রক্তমাখা জিভ!

শামসাদ পারভীন অনু

আব্বার একতারা

কমলাপুর গ্রামের মানুষদের আড্ডা দেয়ার জায়গা এই একটাই। তেমাথার দোকান। ভাঙা ইঁটের রাস্তার সাথে মাটির একটা পথ এসে মেলে তেমাথায়। সব সময় দু'চারজন লোক আছেই এখানে।

বিকেলের দিকে নিঃসঙ্গতা বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। এ সময় প্রায়ই তেমাথায় বেঞ্চটার কোণে গিয়ে বসি। আমার সাথে কেউ কথা বলতে আসে না। তবে আমাকে নিয়ে ওদের দু'একটা মন্তব্য কানে আসে।

'কাজী সা'বের নাতি ইডা বলদাই রয়া গেল,' অন্য দিকে ফিরে এভাবে বলবে, যাতে আমি শুনতে পাই।

আমি কিছু বলি না। ইচ্ছেও করে না। তবু আমি ওদের কথাবার্তা শুনি। আমার ধারণা গ্রামের মানুষ সহজ সরল নয়। বরং উল্টোটাই বোধহয় সত্যি।

আজ খুব মেতে আছে ওরা। একের পর এক অশ্লীল রসিকতা করে যাচ্ছে একজন। শুনে হাসিতে ফেটে পড়ছে সবাই। খুব উৎসাহ পেয়ে গেছে বক্তা। বাহাদুরির সাথে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। মনে হয়, হাসানোর নতুন কোনও ফন্দি খুঁজছে।

'এই যে, নারার ফকির! আসো-আসো। তুমার জন্যিই হগোলে বসে রইছি। এক্কান্ গাহান শুনাও।' উঠে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল সে বৃদ্ধ পথচারীর।

'না-না, বাবা। আইজ আর পারতিছিনে।' পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল লোকটা।

'কয় কী! গাহান না শুনে যাতি দিয়া যায় নাকি?' লোকটাকে টানল সে।

'ছাড়ো! গাহান গাতি পারব না এহন!'

'উদ্দেহ! আবার রাগ করে।' টান মেরে কেড়ে নিল সে বৃদ্ধের একতারা।

হৈ হৈ করে উঠল সবাই। 'হ, হ। ধরো এক্কান্ দেহতত্ত্ব।'

এবার বড় অসহায় দেখাল লোকটাকে। মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা চুল। মাঝখানে সিঁথি। মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি। এই বয়েসী একজন মানুষকে নিয়ে ফাজলামি করা সাজে না। খুব খারাপ লাগছে আমার। এক নজরেই বোঝা যায় ভীষণ পরিশ্রান্ত সে। নগ্ন পায়ে শুকনো কাদা লেগে আছে। সমস্ত দিন পায়ে হেঁটে গান গেয়ে ফিরেছে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে। যা কিছু পেয়েছে তা নিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছে। ক্লান্তিতে অবশ পা। পিপাসায় গলা কাঠ। এই অবস্থায় গান গাওয়ার জন্য টানাটানি।

'আইজ মাপ করতি হবি, বাবারা!' আকুতি জানায় বৃদ্ধ।

'ইডা কী কয় বুড়ো! পয়সা দেব নানে?'

আরও দু'জন গিয়ে ধরল তাকে। টেনে নিয়ে চলল। নিজেকে ছেড়ে দিল অসহায় মানুষটা। দোকানের সামনে এসে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

'সুক টান দিয়ে নেও। গলায় জোর পাবা।' পোড়া বিড়ির গোড়াটা বাড়িয়ে ধরল একজন। হাতে ধরিয়ে দিল একতারাটা।

শুকনো ফ্যাসফেঁসে গলায় গান ধরল বৃদ্ধ বাউল। কোনও আদিম গুহাবাসী যেন কী এক অজানা ভাষায় বিলাপ করে চলেছে। তার একটি শব্দও বুঝতে পারলাম না আমি। শুধু অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। বুকের মধ্যে অব্যক্ত এক ব্যথা গুমরে গুমরে উঠছে।

'জমল না! বালো করে আরেক্কান ধরো দিন।'

'না!' আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। মাটি থেকে টেনে ওঠালাম লোকটিকে। 'আপনি চলে যান!'

ছেঁড়া থলিটা তুলে বুকের সাথে চেপে ধরল সে। সামান্য কিছু চাল ওর মধ্যে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

অনেক রাতে তেমাথার আড্ডা ভাঙে। খুশি মনে ঘরে ফেরে মানুষগুলো। এগুলোই ওদের নিত্যদিনের বিনোদনের বিষয়।

এ গ্রাম আমার ভাল লাগে না। কোনও সঙ্গী নেই আমার। স্কুলেও না। নানী একা। স্কুলে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে মাথা নিচু করে বসে থাকি। স্যর এসেই আমাকে খোঁজ করেন। সবাই উৎসাহের সাথে দেখিয়ে দেয়। আমাকে প্রশ্ন, অপমান এবং সবার আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ক্লাস। এরকম অবস্থায় স্কুল ভাল লাগার কথা নয়। তবু যেতে হয়।

কালা আসে বিকেলের দিকে। ওকে অক্ষর চেনাই আমি। নাম লেখা শেখাই। জিয়া সরকারের গণশিক্ষার আইন। পড়ানো শেষ করে ওকে সাথে নিয়ে প্রায়ই নদীর ধারে ঘুরতে যাই। আজ এল না ও। একা হাঁটতে হাঁটতে তেমাথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ দোকানের ঝাঁপের বাঁশ নামিয়ে নিয়ে ছুটল মোসলেম। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। 'গেল, গেল! মার, মার!'

দু'টি কুকুর জোড়া লাগা অবস্থায় রাস্তায় উঠে পড়েছে। ধপাস্ ধপাস্ করে ওদের পিটিয়ে চলল মোসলেম। টানাটানি করে নিজেদের ছাড়ানোর চেষ্টা করছে অসহায় প্রাণী দুটো। হেসে লুটিয়ে পড়ছে ছোট বড় সবাই; উৎসাহ দিচ্ছে নিষ্ঠুর মানুষটাকে।

একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল কুকুর দুটো। একদিকে হয়ে পালাতে চাইল ওরা। তাই দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল মানুষগুলো। পালাতে পারল না। ঠন্ করে বাড়ি পড়ল একটির মাথায়। চোখ বুজে ফেললাম আমি। মুখ ভর্তি পানি এসে গেল। পাক খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে প্রাণীটা। তার টানে অন্যটাও পড়ল খাদের জঙ্গলে—দোপায়া জীবগুলোর দৃষ্টির আড়ালে।

অসুস্থ লাগছে আমার। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলাম। 'ছার, গাঙ্গের দিক্ যাবা না?' কালা ডাকল, 'গোয়ালে সাঁজাল দিতি দেরি হয়া গেল। পড়তি যাতি...'

'যাব না! যাও!' বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমার ব্যবহারে খুব অবাক হলো ছেলেটি।

আর তেমাথায় যাই না। কেন যেন ওদের মাঝে যেতে খুব সঙ্কোচ বোধ করি।

সারাদিন বাড়ি বসে পড়তে চেষ্টা করি। খুব ভাল করে অঙ্ক শিখে নিলাম। যাতে স্যর অপমান করতে না পারেন। সাহস করে সামনের বেঞ্চে বসলাম। আমাকে সামনে দেখে হাসলেন স্যর। কোনও অঙ্ক ধরলেন না। বানান জিজ্ঞেস করলেন, 'সূক্ষ্মকোণ' বোঝাতে পারলাম না। গলা শুকিয়ে গেল। জ্যামিতি আঁকার বড় কাঠের কম্পাসটা দিয়ে মারলেন ঘাড়ের উপর। খুব লাগল। আবার ওটা তুলতেই ধরে ফেললাম। একটানে কেড়ে নিলাম স্যরের হাত থেকে। রাগ বেড়ে গেল স্যরের। টেনে বের করে আনলেন আমাকে। উল্টা পাল্টা মারের চোটে অস্থির হয়ে পড়লাম আমি। শুয়ে গেলাম একেবারে। তবু থামলেন না স্যর। এক পর্যায়ে ছুটে বের হয়ে এলাম আমি।

আর স্কুলে যাই না। পড়াশোনাও করি না। নানীকে বোঝালাম, স্কুল বন্ধ দিয়েছে। তার সামনে জামা খুলি না। পিঠের দাগ যাতে দেখতে না পান। সারাদিন গল্পের বই নিয়ে পড়ে থাকি।

'ভরাপড়ারা! আল্লা তো-রে বিচার করবি। দিলে দয়ামায়া নেই! আহা রে, ছোট্ট মেয়েডারে নিয়ে ফকিরের বউডা এহন কোনে যাবি...!'

সাদেকের বউ এত চেঁচাতে পারে! সাধারণ কথা বললেও মনে হয় যেন ঝগড়া করছে। কোনও চোরকে মেরে নদীর ধারে ফেলে রেখেছে, চেঁচিয়ে নানীর কাছে তার ধারা বর্ণনা দিয়ে চলেছে।

বিকেলের দিকে বের হলাম। নদী পর্যন্ত যেতে হলো না। পথটা ক্রমশ ঢালু হয়ে খালের মত নদীতে মিশেছে। তার মধ্যিখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি মানুষ। মারা গেছে বোঝাই যায়। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। লম্বা দাড়িতে কাদা লেগে আছে। মাথার সামনে টাকের মাঝখানে দেড় ইঞ্চি মত কাটা ফাঁকটা ওর ঠোঁটের মতই সাদা—ফ্যাকাসে। রক্ত ধুয়ে চলে গেছে বৃষ্টির পানিতে। ভেজা ঘাস ও কাদার মধ্যে পড়ে আছে একজন মানুষের লাশ। হাত-পায়ের আঙুলগুলো পর্যন্ত থেঁতলা বিকৃত! মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল আমার। মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন?

আকাশ মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যা নামার আগেই কেমন আবছা হয়ে আছে চারপাশ। মুখ থুবড়ে পড়া এই মানুষটিকে পিটিয়ে খুন করেছে আরও কতগুলো মানুষ। মরে পড়ে আছে। কারও কোনও আগ্রহ নেই।

'আহা রে! সারা রাত ধরে মারেছে, হাত-পা'র লোগে খাজুরির কাঁটা ঢুকাইছে।' কখন যেন কালা এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেন মারল—এভাবে?'

'ধান কাইটে, গামছায় বাইন্দে নিয়ে পলাচ্ছিল। মোসলেমরা দাবড়া গাঙ্গে নামা নিয়ে ধরেছে!'

'চুপ করো!' অনেক আগেই কাঁদতে ভুলে গেছি আমি। শুধু গলার কাছে কেমন শক্ত হয়ে থাকে। কথা বলতে পারি না। নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছি নদীর দিকে। পেছন পেছন কালা আসছে।

বিশাল চর জুড়ে ধানের জমি। সরকারী খাস জমি। সব অছিরদ্দির দখলে। মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝে লোকটি। এই জমি থেকে কিছু ধান কেটে গামছায় বেঁধেছিল অভাবী মানুষটা।

পানির ধার ঘেঁষে পেতলের কলসের মত কী যেন পড়ে আছে। একতারা! চমকে উঠলাম আমি। লাশটা চেনা চেনা লাগছিল। সেই বাউল! চিৎকার করে কাঁদতে পারলাম না। হাঁটু গেড়ে তুলতে গেলাম একতারাটা।

'নিয়ো না! আমার আব্বার তা।' বাচ্চা মেয়ের গলা। ডানা মণি যেন! আমার ভাইঝি, গত বছর যে পানিতে পড়ে মারা গেছে।

ধরতে পারলাম না ওটা। জবুথুবু হয়ে বসে পড়লাম ভেজা মাটিতে। গলা দিয়ে শব্দ করতে পারি না। শুধু পানি ঝরতে থাকে চোখ দিয়ে।

'ওসব নিয়ে কাম নেই। ছাড়, বাড়ি চলো।' আমাকে টেনে ওঠাল কালা। চুপচাপ ওর সাথে সাথে চললাম।

'কাইন্দে না! শালার ইবলিস-শয়তানরা! তোদের আল্লায় শাস্তি দিবি!'

'আল্লায় শাস্তি দেয়?'

'তাইলে আমরাই দেব।'

আসলে কিছুই করার নেই দু'টি কিশোরের। সুপারম্যান জাতীয় কিছু হতে পারলে কী করতাম নীরবে তাই ভাবতে থাকলাম।

'শালার ধান খ্যাত জ্বালাই দেবো!' কালা ফিসফিস করে বলল। ওর দিকে তাকালাম।

'ঘরে কেরোছিন আছে না? রাত দশটার সময়ে আমি আস্‌পো। সজাগ থাক্‌পা।'

আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব! উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়লাম আমি।

ফেরার সময় লাশটা দেখতে পেলাম না। এর মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। আবারও বৃষ্টি নামল। ভিজতে ভিজতে বাড়ি এলাম।

টেবিলের উপর হ্যারিকেন জ্বেলে রেখে গেছে। চৌকির নীচ থেকে কেরোসিন তেলের বোতল বের করলাম। বাতির তেলটাও ঢেলে রাখলাম বোতলে। এবার অপেক্ষা।

বাতিটা নিভে গেল একটু পরেই। টিনের চালে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ। তার সাথে যেন একতারা বাজিয়ে বিচিত্র ভাষায় গান গেয়ে ফিরছে এক বাউল। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমি। মুখ ভর্তি দাড়ি লোকটির। গান গেয়ে গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে চলেছে। অবসন্ন পা আর চলতে চায় না। কাঁধে শূন্য থলি। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওর ছোট মেয়েটির মুখ ভেসে উঠল। অপেক্ষা করে আছে। বাবা আসছে খাবার নিয়ে। ফিরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল লোকটি। জানিপুরের বাজারে এসে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। কোনই ব্যবস্থা হলো

না। অনেক রাতে নদীর ধার দিয়ে ফিরে চলল সে। হঠাৎ খেয়াল করল, পাকা ধান! সরকারী খাস জমির ধান। তাড়াতাড়ি গামছাটা পেতে ধান ঝরাতে শুরু করল। গামছায় ধান বেঁধে খুশি মনে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

চোখের পানি এসে নাকে ঢুকে সুড়সুড় করে উঠল। বাস্তবে ফিরে এলাম।

দশটা তো বেজে গেছে! কালা আসবে তো! বৃষ্টি কমে গেছে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। খুব ধীরে টোকা পড়ল দরজায়। এসে গেছে। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। আবছা আলো। বড় একটা মান কচুর পাতা মাথায় দিয়ে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কালা।

দেরি না করে তেলের বোতল আর ম্যাচটা নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা বাতাস। খুব জোরে হাঁটছে কালা। যেন ভেসে চলেছে। প্রায় দৌড়ে ওকে অনুসরণ করে চললাম। বারবার পা পিছলে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে হাজির হলাম।

ধান খেতের অবস্থা দেখে বোকা বনে গেলাম। একবারও মনে হয়নি, ভেজা ধানে আগুন লাগবে কী করে। তবু কতগুলো গাছ এক জায়গায় করে কেরোসিন ছিটালাম।

'ম্যাচটা ভিজে গেল কি না কে জানে।' দূরে দাঁড়িয়ে কালা। 'এদিকে এসো।' ডাকলাম ওকে। কোনও কথা বলল না। আরও দূরে সরে গেল। রাগ হলো আমার। ম্যাচটা বের করে জ্বালতে গেলাম। পারলাম না। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে এল। 'তোমার যা ইচ্ছা করো!' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ম্যাচটা।

ভিজে শরীর কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। কিছুই হলো না। ফিরে চললাম। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কালার উপর। খেতের ধার দিয়ে সবরি কলা গাছের সারি।

কেটে সাবাড় করতে থাকলাম গাছগুলো। 'তোরা মানুষ কুপিয়ে মেরে ফেলতে পারিস! কিচ্ছু রাখব না তোদের!' পাগলের মত রাগ ঝাড়লাম কলা গাছের উপর।

হঠাৎ কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হলো। কালাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠল। দৌড় দিলাম বাড়ির দিকে।

তেমাথায় এসে দেখা গেল কালাকে। আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে কেন!

'থাক, আর এগিয়ে দিতে হবে না।' মনে মনে বললাম আমি।

আমাদের লিচু গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল ও। কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

ঝট্ করে পেছন ফিরলাম।

মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি। গলায় লাল গামছা! ফিরে যাচ্ছে লোকটি।

এক লাফে বারান্দায় উঠে পড়লাম। ঘরে ঢুকেই বন্ধ করে দিলাম দরজা।

সকালে বিছানা থেকে উঠতে পারলাম না। প্রচণ্ড মাথাব্যথা–সর্দিজ্বর।

বিকালে কালা এল, 'আইজ পড়াবেন না, ছার? শালার বিষ্টির জন্যি রাইতে আসা হলো না।'

শাহরিয়ার আহমেদ তাকি

তেরো নাম্বার

জুটল্যাণ্ডের শহরগুলোর মধ্যে ভাইবর্গ সবচেয়ে সুন্দর। এটা একটা বিশফ্রিক[1] এলাকা। প্রচুর দর্শনীয় গির্জা আছে এখানে, আছে চমৎকার বাগান, সুন্দর জলাশয়, যেখানে সারসরা একপায়ে স্থির দাঁড়িয়ে যেন এই গ্রামীণ শহরের স্থবির জীবনযাত্রাকেই নির্দেশ করে। এর কাছেই হুন্ড, ডেনমার্কের অন্যতম দর্শনীয় জায়গাগুলোর একটা। এর পাশেই ফাইওার আপ শহর, যেখানে মার্কস স্টিগ ১২৮৬ সালে সেইন্ট সিসিলিয়ার দিনে[2] রাজা এরিক গ্লিপিংকে খুন করেছিল। সতেরোশ' শতকে রাজা এরিকের কবর উন্মোচন করার পর তাঁর মাথায় লোহার গদার আঘাতের ছাপ্পান্নটি চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। থাক সেসব কথা। আমি কোনও ইতিহাসের বই লিখতে বসিনি।

ভাইবর্গের ভাল হোটেলগুলোর মধ্যে প্রিসলার এবং ফিনিক্স উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমার চাচাত ভাই–যার অভিজ্ঞতা আমি লিখতে বসেছি–গোল্ডেন লায়নে গিয়ে উঠল। সেটা ছিল তার প্রথম ভাইবর্গ ভ্রমণ। কেন সে ভাল হোটেলগুলো পরিহার করল, সেকথা পরে বলছি।

গোল্ডেন লায়ন সেই সৌভাগ্যবান বাড়িগুলোর একটা যেটা ১৭২৬ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়নি। ধ্বংস হয়েছিল অনেক বিখ্যাত গির্জা, রেস্টুরেন্ট এবং প্রাসাদ। গোল্ডেন লায়ন একটি বিশাল লাল ইটের বাড়ি যার শীর্ষে একটি ত্রিকোণ মিনার আছে। সিঁড়িগুলো খাড়া, সামনে গাড়ি পার্কিঙের জন্য খোলা জায়গাটার ঘাস সযত্নে ছেঁটে ডিজাইন করা।

আমার চাচাত ভাই যখন গোল্ডেন লায়নের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, তখন সূর্যদেব অস্তগামী। গোধূলির মায়াবী আলো যেন এই প্রাচীন বাড়িটিকে রহস্যের মসলিন চাদরে আবৃত করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। সে এই জায়গাটির প্রাচীন চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে কোনও বিখ্যাত হোটেলে না উঠে আধুনিক সরাইখানা টাইপের এই বাড়িটিতে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

---

[1] যে এলাকা বিশপরা পরিচালনা করেন।

[2] একজন খ্রিস্টান মহিলা পাদ্রী। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ২য় শতকে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁকে বলা হয় চার্চ মিউজিক। কারণ তিনি নাকি মৃত্যুর সময় গানে গানে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন।

অ্যাণ্ডারসন (আমার চাচাত ভাই) সে অর্থে কোনও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভাইবর্গে আসেনি। সে ডেনমার্কের গির্জাগুলোর উপর একটা গবেষণা করছিল। সে হঠাৎ কীভাবে যেন খবর পেয়েছিল যে ভাইবর্গের রিগসারকিভে রোমান ক্যাথলিসিজমের শেষ দিনগুলোর কিছু দুর্লভ কাগজপত্র আছে, সেগুলো যেভাবেই হোক ১৭২৬-এর অগ্নিকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল। একজন ঐতিহাসিককে তাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য এটুকু খবর যথেষ্ট। সে এখানে দু'তিন সপ্তাহ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এর মধ্যেই এই দুর্লভ কাগজগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কপি করে নিতে হবে। সে গোল্ডেন লায়নে গিয়ে একটি বড়সড় ঘর খুঁজল যেটা তাকে একই সঙ্গে শোবার ঘর এবং স্টাডির সুবিধা দেবে। হোটেলের ম্যানেজার অ্যাণ্ডারসনের এই দাবি শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্ রুমটা আপনার জন্য উপযুক্ত হবে। ভাল হয় যদি আপনি নিজেই কয়েকটা রুম নিজের চোখে দেখে এর মধ্য থেকে আপনার পছন্দের রুমটা বেছে নেন।'

আইডিয়াটা মনে ধরল অ্যাণ্ডারসনের।

সবচেয়ে উপরতলাটা প্রথমেই বাদ দিল অ্যাণ্ডারসন। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এত সিঁড়ি ভাঙা ধাতে সইবে না তার। তৃতীয়তলায় বেডরুম এবং স্টাডি হিসেবে কাজে আসতে পারে, এমন কোনও ঘর চোখে পড়ল না অ্যাণ্ডারসনের। কিন্তু দ্বিতীয়তলায় দু'তিনটি ঘর সন্তোষজনক মনে হলো তার।

ম্যানেজার প্রথমে ১৭ নাম্বার ঘরটি দিতে চাইলেন। কিন্তু অ্যাণ্ডারসন আপত্তি জানাল। কারণ, এর জানালাটি অন্ধ। পাশের বিল্ডিঙের দেয়ালটাই শুধু চোখে পড়ে এখান থেকে। বিকেলেই সন্ধের আবছায়া নামবে এ ঘরে। বারো অথবা চোদ্দ নাম্বার ঘরটা বরং ভাল হবে। কারণ, এখান থেকে রাস্তা দেখা যায় এবং সন্ধ্যার মায়াবী আলোও উপভোগ্য হবে এ ঘরে। আর ঘরটা হোটেলের পেছন দিকে হওয়াতে নীরবতার মধ্যে কাজ করার আনন্দটা উপভোগ করা যাবে বেশ।

অবশেষে বারো নাম্বার ঘরটি নির্বাচিত হলো। আশপাশের ঘরগুলোর মত এটিতেও তিনটি জানালা, ঘরের একই পাশে। এর ছাদ বেশ উঁচু আর ঘরটিও যথেষ্ট লম্বা। ঘরে অবশ্য কোনও ফায়ারপ্লেস নেই, তবে একটি চমৎকার পুরনো স্টোভ আছে। স্টোভটি ঝকঝকে পেতলের, তাতে আব্রাহামের আইস্যাককে কোরবানি করার দৃশ্য খোদাই করা। এ ছাড়া ঘরটি সাদামাটা। ও, আচ্ছা, একটি পেইন্টিংও আছে দেখা গেল। এই শহরেরই একটি পুরনো, রং জ্বলে যাওয়া ছবি, নীচে সন লেখা আছে–১৮২০।

রাতে খাবার সময় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। হাতমুখ ধুয়ে অ্যাণ্ডারসন যখন নীচে এল, তখনও খাবার ঘণ্টা বাজতে খানিকটা দেরি। সে এই হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের লিস্ট দেখায় মনোযোগ দিল। ডেনমার্কের হোটেলগুলোতে সব বাসিন্দাদের নাম একটি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা থাকত। বাসিন্দাদেরকে অবশ্য তেমন কৌতূহলোদ্দীপক মনে হলো না অ্যাণ্ডারসনের। একজন আইনজীবী, একজন জার্মান, কোপেনহেগেন থেকে আগত কয়েকজন সেলসম্যান–এই।

একমাত্র যে জিনিসটা অ্যাণ্ডারসনকে চিন্তার খোরাক জোগাল তা হচ্ছে, এই হোটেলে তেরো নাম্বার কোনও রুম নেই। এর আগেও সে বিভিন্ন হোটেলে দেখেছে, হোটেল মালিকরা তেরো নাম্বারটি সযত্নে এড়িয়ে যায়। সে ভেবে বিস্মিত হলো, এই নির্দিষ্ট নাম্বারটির প্রতি মানুষের অভিযোগটা কী! সে ঠিক করল, হোটেল ম্যানেজারকে বিষয়টা জিজ্ঞেস করবে। জানতে চাইবে, তারা এমন কোনও কাস্টমার পেয়েছে কি না যে তেরো নাম্বার ঘরটা ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

রাতে খাবার সময় কী হলো তা অবশ্য অ্যাণ্ডারসন আমাকে বলেনি (আমি গল্পটা ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করছি যেভাবে আমার চাচাত ভাই আমাকে বলেছে)। পরবর্তী সময়টা সে ঘরে ফিরে তার বাক্স-পেঁটরা খুলে কাপড়-চোপড়, বই-পত্র এবং কাগজ বের করে ঘরটা তার কাজের উপযোগী করার কাজে ব্যয় করল। রাত এগারোটার দিকে সে ঘুমোতে যাবার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু সে বইয়ের পোকা এবং বিছানায় শুয়ে অন্তত কয়েক পাতা ছাপা অক্ষর না পড়লে তার ঘুম আসে না। বই তার ঘুমের ক্যাপসুল। যে বইটি সে ট্রেনে বসে পড়ছিল, সেটা তার ওভারকোটের পকেটেই রয়ে গেছে এখনও এবং ওভারকোটটি এখন আছে ডাইনিং রুমের বাইরের আলমারিতে, যেখানে অতিথিরা কোনও কাপড় ধোয়ার অপেক্ষায় জমা রাখতে পারেন।

ছুটে গিয়ে সেটি নিয়ে আসতে অবশ্য অ্যাণ্ডারসনের দু'মিনিটের বেশি লাগল না। প্যাসেজে মোটামুটি আলো ছিল এবং নিজের ঘরটি চিনে নিতেও তার কষ্ট হয়নি। কিন্তু সে যখন তার ঘরের দরজার নব ধরে মোচড় দিল, দরজাটি খুলতে চাইল না। খুট করে একটা আওয়াজ করে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করল। দরজায় শব্দ পেয়েই বোধকরি ভেতর থেকে কেউ একজন গোঙানির মত অদ্ভুত একটা শব্দ করল। অ্যাণ্ডারসন নিশ্চয়ই ভুল দরজায় চলে এসেছে। তার ঘরটা কি হাতের ডানদিকে ছিল না বাঁয়ে? ঘরের নাম্বারটার দিকে তাকাল সে। ওহ, এটা তেরো নাম্বার ঘর। তার মানে বারো নাম্বার হচ্ছে হাতের বাঁদিকে। এবার আর নিজের ঘরটা খুঁজে নিতে সমস্যা হলো না তার। আরাম করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে, বইয়ের তিন-চারটি পৃষ্ঠা পড়ল, বাতি নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল এবং তখনি তার মনে পড়ল, নীচে ব্ল্যাকবোর্ডে তেরো নাম্বার কোনও ঘর ছিল না। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই মাত্র সে তেরো নাম্বার খোদাই করা একটি ঘর দেখে এসেছে। সে আফসোস করল যে ওই ঘরটি কেন সে নিল না। বেচারা ম্যানেজার, তেরো নাম্বার ঘরটি কেউ ভাড়া নেয় না। সে ওই ঘরে বাস করে কুসংস্কারকে ভুল প্রমাণ করে দিত এবং ম্যানেজার পরে বলতে পারত, উচ্চবংশীয় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এই ঘরে বাস করেছেন এবং কোনও বিপদ ছাড়াই এখানে থেকে গেছেন। হতে পারে ওটা বেয়ারাদের ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ, ভেতর থেকে কে যেন শব্দ করেছিল। তবে ওই ঘরটা নিশ্চয়ই এতটা বড় আর খোলামেলা হবে না। ঘুমঘুম চোখে সে নিজের ঘরে একবার চোখ বোলাল। রাস্তার আলোয় ঘরের আকৃতিটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। 'এটা একটা অদ্ভুত

ব্যাপার,' অ্যাণ্ডারসন ভাবল, 'উজ্জ্বল আলোর তুলনায় ম্লান আলোয় ঘর একটু বড়ই দেখায়। কিন্তু এই ঘরটা যেন একটু অতিরিক্তই বড় দেখাচ্ছে! যাকগে, জাহান্নামে যাক। ঘুমের চেয়ে জরুরি কিছুই নেই আর এই মুহূর্তে।' কয়েক মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত অ্যাণ্ডারসন।

পরদিন অ্যাণ্ডারসন ভাইবর্গের রিগসারকিভে অভিযান চালাল। ডেনমার্কের প্রথা অনুযায়ী সবাই তাকে স্বাগত জানাল এবং সে যা যা দেখতে চায় সব দেখার অনুমতিও পেয়ে গেল। সে যে ডকুমেন্ট পেল, তার সংখ্যা এবং গুরুত্ব তার কল্পনার অতীত। অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশপ জরগ্যান ফিরিসের–যিনি ছিলেন সর্বশেষ রোমান ক্যাথলিক যিনি মানুষের ব্যক্তিজীবন এবং চরিত্র নিয়ে গবেষণা করেছিলেন–স্বহস্তে লিখিত কিছু চিঠিও পাওয়া গেল। কাগজপত্রে একটি বাড়ির বর্ণনাও পাওয়া গেল যেটি বিশপদের মালিকানাধীন ছিল অথচ কখনও সেখানে বাস করেননি তাঁরা। বাড়িটা দখল করেছিলেন রিফরমেশন পার্টির একজন হর্তাকর্তা। নাম বিশপ নিকোলাস ফ্র্যাঙ্কেন। তিনি ছিলেন এই শহরের প্রতি এক হুমকিস্বরূপ। তিনি গোপনে ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা করতেন এবং শয়তানের কাছে তাঁর আত্মা বিক্রি করেছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাবিলনের চার্চ এমন একজন বিষাক্ত রক্তচোষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার আদেশ দিয়েছিল। বিশপ জরগ্যান ফিরিস কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন, কালোজাদু ধরনের যে কোনও নিষিদ্ধ জিনিসকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশেষে ঘটনাটা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। প্রমাণ পাওয়া মাত্র এই ধর্মদ্রোহীকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন।[৩]

পরের চিঠিটি ছিল প্রটেস্ট্যান্ট নেতা র‍্যাসমাস নিলসেনের। কিন্তু সেদিনের মত রেকর্ড অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অ্যাণ্ডারসন চিঠিটি পড়ার সময় পেল না। কিন্তু মূল বক্তব্যটা সে এক নজরে দেখে নিতে পেরেছিল। রোমের খ্রিস্টানরা তখন আর বিশপদের একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বিশপদের আদালতকেও আর ন্যায়বিচারের একমাত্র জায়গা বলে স্বীকার করল না তারা।

অফিস থেকে বেরিয়ে অ্যাণ্ডারসনের সুযোগ হলো রেকর্ড ইনচার্জ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার, যেহেতু একই পথ ধরে ফিরছিল তারা। ভদ্রলোকের নাম হার স্ক্যাভেনাস। তিনি অবশ্য রিফরমেশন যুগের ব্যাপারে ততটা বিশেষজ্ঞ নন। তিনি শুধু এটুকু বললেন, 'বিশপ জরগ্যান ফিরিসের এই বাড়িটা আসলেই একটি রহস্য। ভাইবর্গ শহরের স্থাপত্যকীর্তির ইতিহাস আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। কিন্তু, বিশপের এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল ১৫৬০ সনে এবং আর্কাইভে এই বাড়িটি সম্পর্কে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস বাড়িটিকে

---

[৩] রোমাম ক্যাথলিক চার্চকে একদল খ্রিস্টান ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনকে বলে রিফরমেশন। চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে একদল ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহীদেরকে বলা হয় প্রটেস্ট্যান্ট।

একেবারেই মুছে দিয়েছে। তবে আশা করি একদিন ঠিকই এই ইতিহাস আমি বের করে ছাড়ব।'

কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে অ্যাণ্ডারসন গোল্ডেন লায়নে ফিরল। রাতে খাবার পর কিছুক্ষণ পাশা খেলল সে। তারপর শুতে চলল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, তেরো নাম্বার ঘর সম্পর্কে ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে ভুলে গেছে সে। নিজের ঘরের কাছাকাছি এসে সে যথারীতি তেরো নাম্বার ঘরটি দেখতে পেল। ভেতরে কোনও কাজ চলছে মনে হলো। কে যেন কথা বলছে আর পায়ের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। নাম্বারটা শিয়োর হবার জন্য থামল সে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের পায়ের আওয়াজটাও দরজার কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ভেতর থেকে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মনে হলো ঘরের বাসিন্দা প্রচণ্ড ক্রোধে ফোঁস করে উঠল। সে দেরি না করে নিজের ঘরে ফিরল এবং লক্ষ করল, গত রাতের তুলনায় ঘরটা এখন কত ছোট মনে হচ্ছে! সামান্য হতাশ হলো সে, সামান্যই। সে একটি রুমাল খুঁজল যেটি তার হাতব্যাগে রয়ে গেছে। আর ব্যাগটি আছে ঘরের অন্য প্রান্তে। অদ্ভুত ব্যাপার, সে ব্যাগটি খুঁজে পেল না। গেল কোথায় ঘর থেকে? চুরির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিল সে। ডেনমার্কের হোটেলে চুরি হওয়া বিরল ঘটনা। কিন্তু কিছু একটা তো হয়েছে, নইলে ব্যাগটা জায়গামত থাকত। যেহেতু রুমাল এমন কোনও জিনিস নয় যেটি না হলে তার রাতে ঘুম হবে না, কাজেই সে এ নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে ডানদিকের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। চেয়ে রইল নির্জন রহস্যময় রাস্তার দিকে। রাস্তার উল্টোদিকে একটি লম্বা দালান আছে। পথে কোনও পথিক নেই, নিস্তব্ধ নিশুতি রাত।

ঘরের আলোটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাণ্ডারসন এবং উল্টোদিকের বিল্ডিঙের দেয়ালে নিজের ছায়াটা সে মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার বাঁদিকের ঘরের দাড়িওয়ালা লোকটির ছায়াও দেখা যাচ্ছে সেখানে। অর্থাৎ সেও জানালায় দাঁড়িয়েছে। একটু পর ছায়াটাকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেল। তারপর চুল আঁচড়াল সে। একটি নাইট গাউন গায়ে চড়াল। তেরো নাম্বার ঘরের বাসিন্দার ছায়াও দেখা যাচ্ছে। তেরো নাম্বারকে দেখতেই বেশি আগ্রহ বোধ করল অ্যাণ্ডারসন। সেও তার মতই জানালায় কনুই ঠেকিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। লম্বা, পাতলা একজন মানুষ। কোনও মহিলা নয়তো? তার মাথায় ঘোমটা দেয়ার মত করে কাপড় দেয়া মনে হচ্ছে। তার ঘরে বোধহয় লাল কোনও টেবিল ল্যাম্প আছে। কারণ উল্টো দিকের দেয়ালে হালকা লাল রঙের একটা ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। একটু ঝুঁকে অ্যাণ্ডারসন তেরো নাম্বার ঘরের জানালাটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

রাস্তায় দূরাগত কোনও পথচারীর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তেরো নাম্বার ঘরের লাল আলো নিভে গেল। অ্যাণ্ডারসন হাতের সিগারেটের শেষাংশটা জানালায় ঠেসে নিভিয়ে ঘুমোতে চলে গেল। সিগারেটের টুকরোটা পড়ে রইল জানালায়।

সকালে গরম পানি দিয়ে একটা ভাল গোসল দিল অ্যাণ্ডারসন। লাল চাদর

গায়ে একটি মেয়ে চা নিয়ে এল তার জন্য। একে আগে এই হোটেলে দেখেনি সে। নতুন বেয়ারা নিয়োগ দিয়েছে বোধহয় ম্যানেজার। অ্যাণ্ডারসন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল তুমি কি এ ঘর থেকে একটা হাতব্যাগ নিয়ে গেছ?'

মেয়েটি রহস্যময় হাসি হেসে কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অ্যাণ্ডারসন মহাবিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বেয়াদব মেয়েটাকে ডেকে একটা কঠিন ধমক দেয়ার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু ডাকতে গিয়ে মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। একজন মানুষ যে কিনা নিজের পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে গর্ব বোধ করে, তার জন্য এটা একটা শক বৈকি! তার হাতব্যাগটা সে যেখানে রেখেছিল দিব্যি বহাল তবিয়তে সেখানেই আছে। তবে গতরাতে এটা তার চোখে পড়ল না কেন? হয়তো সে ক্লান্ত ছিল, ঠিকমত দেখতে পায়নি। যা হোক, জিনিসটা পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।

রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিন। অ্যাণ্ডারসন মুগ্ধ হয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। এমন চমৎকার সকাল বহুদিন দেখেনি সে। ঘরের তিনটি বড় বড় জানালা দিয়ে সূর্যদেব যেন তাঁর আশীর্বাদ ঢেলে দিচ্ছেন অ্যাণ্ডারসনের ঘরে। নিজের পছন্দ নিয়ে আবারও গর্ব হলো অ্যাণ্ডারসনের। এমন সুন্দর ঘর বোধহয় কোনও বিলাসবহুল হোটেলেও পেত না সে। সে পোশাক পরে তৈরি হলো এবং ঘর থেকে বেরোবার আগে আরেকবার জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে গেল। তখনি আরেকটি ধাক্কা খেল সে। গতরাতে জানালায় ফেলে যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা চোখে পড়ল তার। সে হলফ করে বলতে পারবে, গতরাতে সে দাঁড়িয়েছিল ডানদিকের জানালায় এবং সিগারেটের শেষাংশটা সে সেখানেই ফেলে এসেছিল। কিন্তু সেটা মাঝখানের জানালায় এল কী করে!

সকালের নাশতার জন্য নীচে নামতে একটু দেরি হয়ে গেল অ্যাণ্ডারসনের। কিন্তু তেরো নাম্বার আরও লেট। পেছনে তাঁর জুতোর আওয়াজ পেল সে। পুরুষ মানুষের জুতো–তার মানে তেরো নাম্বার কোনও নারী নয়। তখনি ঘরের নাম্বার প্লেটের উপর চোখ পড়ল তার। আরে! এ তো চোদ্দ নাম্বার, তেরো তো নয়! সে নিশ্চয়ই তেরো নাম্বার ঘর পেছনে ফেলে এসেছে, লক্ষ করেনি। একজন খুঁতখুঁতে মানুষের জন্য গত বারো ঘণ্টায় তিনটি এমন ভুল মেনে নেবার মত নয়। সে পেছনে ফিরে চলল। চোদ্দ নাম্বারের ঠিক আগে যে ঘরটি, তার নাম্বার বারো, তার নিজেরই ঘর। তেরো বলতে কোনও নাম্বার খুঁজে পেল না অ্যাণ্ডারসন।

নাশতা সারতে সারতে গত চব্বিশ ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো অ্যাণ্ডারসন। অবশেষে সে ভাবল, 'জাহান্নামে যাক। যদি এ মুহূর্তে আমার ব্রেন আমাকে প্রতারণা করে থাকে, তবে পরে আমি আবার পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখব। আর যা ঘটছে তা যদি সত্যি হয়, তবে স্বীকার করতে হবে, এটা অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। যাই হোক, পরবর্তীতে কী ঘটে, সেটা চুপচাপ লক্ষ করে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

পূর্বোল্লিখিত বিশপ-শাসিত যুগের কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে দিনটা কাটাল। ডকুমেন্টগুলো অসম্পূর্ণ দেখে সে হতাশ হলো। সবগুলো কাগজ যদি

খুঁজে পাওয়া যেত, তার গবেষণা খুব দ্রুত একটা পরিণতির দিকে এগোত। একটি চিঠিতে শুধু বিশপ নিকোলাস ফ্র্যাঙ্কেনের কিছু তথ্য পাওয়া গেল। চিঠিটা বিশপ জরগ্যান ফিরিস র‍্যাসমাস নিলসেনকে লিখেছিলেন। চিঠির খানিকটা অংশ এরকম:

'আমি আপনার সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করতে চাই না। বিশপ নিকোলাস ফ্র্যাঙ্কেন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত আপনি আদালতে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধেও আমার কিছু বলার নেই। প্রয়োজনে আমরা আপনাকে এই শয়তানের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত। সেইন্ট জন তাঁর অ্যাপোক্যালিপস[4]-এর পবিত্র রোমান ক্যাথলিক চার্চকে একটি প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আর সেই প্রতীকটি হচ্ছে, টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা একজন পবিত্র নারী। এটি আপনাকে জানিয়ে আনন্দ বোধ করছি।' ইত্যাদি।

অনেক খুঁজেও অ্যাণ্ডারসন এই চিঠির কোনও জবাব বা নিকোলাস ফ্র্যাঙ্কেন কিংবা পবিত্র নারীটি সম্পর্কে কোনও তথ্য বের করতে পারল না। তবে সে অনুমান করল, ফ্র্যাঙ্কেন নিশ্চয়ই হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। আর যেহেতু বিশপ নিলসেন এবং নিকোলাসের শেষ চিঠির তারিখে কেবল দু'দিনের ফারাক, কাজেই মৃত্যুটা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত ছিল।

বিকেলে সে হল্ডে ঘুরতে গেল এবং বিকেলের চা-টা সে সেখানেই খেল। সে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি যে তার চোখে কিংবা ব্রেনে কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে কি না। গত কয়েকদিন ধরে তার নিজের চোখ এবং ব্রেন তাকে ক্রমাগত ধোঁকা দিয়ে আসছে। তেরো নাম্বার ঘর হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার নেই হয়ে যাচ্ছে, সিগারেটের টুকরো ডান থেকে মাঝের জানালায় চলে আসছে, ঘরের জিনিসপত্র উধাও হয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে আসছে। হচ্ছে কী এসব!

রাতে খাবার সময় হোটেল ম্যানেজারের সাথে দেখা। টুকটাক কথাবার্তার পর সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এদেশে কোনও হোটেলেই তেরো নাম্বার ঘর নেই কেন বলতে পারেন? আপনাদেরও নেই দেখছি।'

ম্যানেজারকে কিছুটা বিস্মিত মনে হলো, 'আপনি এটা লক্ষ করেছেন! কেউ তো করে না। আমিও এ নিয়ে বেশ ভেবেছি, জানেন? শিক্ষিত একজন মানুষের এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করার কোনওই কারণ নেই। আমি ভাইবর্গের স্কুলেই ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছি এবং আমাদের একজন বয়স্ক শিক্ষক ছিলেন। তিনি এসব ব্যাপারে সবসময়ই আমাদের নিরুৎসাহিত করতেন। অনেকদিন হয় তিনি মারা গেছেন।'

'তার মানে আপনি মনে করেন তেরো নাম্বারকে এড়িয়ে যাবার বিশেষ

---

[4] 'রহস্যোদ্‌ঘাটন' নামক বাইবেলের সর্বশেষ পুস্তক।

কোনও কারণ নেই?'

'অবশ্যই নেই। হোটেলটা আমার পৈতৃক ব্যবসা। আমার বাবার আর্থাসে একটা হোটেল ছিল। যখন আমার জন্ম হলো, তখন আমরা ভাইবর্গে চলে এলাম। এখানেও তিনি একটি হোটেল চালাতেন যার নাম ছিল ফিনিক্স। আঠারো শ' ছিয়াত্তরে তিনি মারা যান। তারপর আমি সিল্কবর্গে ব্যবসা শুরু করি। বছরখানেক হয় আমি এখানে এসেছি এবং এ বাড়িটা কিনে হোটেল বানিয়েছি।'

'যখন আপনি এখানে এলেন, তখন কি এখানে তেরো নাম্বার কোনও ঘর ছিল?'

'না, ছিল না। এখানে নানান পেশার, নানান দেশের মানুষ আসে। তাদের নানান সংস্কার-কুসংস্কার থাকে। তেরো নাম্বার দেখলে হয়তো এর ত্রিসীমানায় কেউ থাকতে চাইবে না। তারা বরং গাছতলা বা রাস্তায় রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেবে। কুসংস্কার বড় ভয়াবহ জিনিস, অ্যাণ্ডারসন সাহেব। আমার কথা যদি জানতে চান, এসব আবর্জনায় আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। কত নাম্বার ঘরে থাকলাম তাতে আমার কচু যায় আসে। আমি নাম্বারটা রাখিনি শুধু ব্যবসায়িক কারণে।'

'তা হলে আপনার তেরো নাম্বার ঘরটা আপনি কী কাজে ব্যবহার করেন?' তার সাথে ঘটে যাওয়া রহস্যময় ঘটনাগুলো বেমালুম চেপে গেল অ্যাণ্ডারসন।

'আমার তেরো নাম্বার!' বোকচৈতনের মত কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন ম্যানেজার, 'আমি কি এইমাত্র বলিনি আপনাকে যে এই হোটেলে তেরো বলতে কোনও নাম্বার নেই? আপনি বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন। যদি তেরো নাম্বার কোনও ঘর থাকত, তবে আপনি তো সেটা দেখতেই পেতেন। আপনার পাশের ঘরটাই হতো সেই ঘর!'

'না...মানে...তা তো বটেই। ইয়ে, গতরাতে আমার মনে হলো আমি তেরো নাম্বার ঘরটা দেখলাম যেন। মনে হলো আমি ঠিকই দেখেছি। কারণ তার আগের রাতেও একই জিনিস চোখে পড়েছে আমার।'

অ্যাণ্ডারসন যা আশা করেছিল, ম্যানেজার ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলেন। আরও একবার অ্যাণ্ডারসনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তেরো বলতে কোনও নাম্বার এই হোটেলে নেই, কস্মিনকালেও ছিল না।

অ্যাণ্ডারসন কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো এই ভেবে যে সে নিশ্চয়ই তা হলে ভুলই দেখেছে। কিন্তু মনের ভেতরটা খচখচ করতেই লাগল। সে আসলেই কোনও ইল্যুশনের মধ্যে আছে কি না নিশ্চিত হওয়া দরকার। একটা বুদ্ধি বের করল সে। সবচেয়ে ভাল হয় ম্যানেজারকে সন্ধ্যায় তার ঘরে চুরুট খাবার নিমন্ত্রণ জানালে। তার কাছে ইংল্যাণ্ডের শহরগুলোর কিছু দুর্লভ ছবি আছে। সেগুলো দেখানোর অজুহাতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

ম্যানেজার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুব আহ্লাদিত হলেন এবং বিনা দ্বিধায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাত দশটায় তাঁর আসার কথা। তার আগে কিছু দরকারি চিঠি লিখতে বসল অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু সে লক্ষ করল, কাজে মন দিতে পারছে না। কাজ ফেলে

উঠে পড়ল সে। ঘর থেকে বেরিয়ে এগারো নাম্বার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, যাতে করে কোনওভাবেই তেরো নাম্বার ঘর তার নজর এড়াতে না পারে। ধীরে ধীরে এগোল সে—এগারো...বারো...চোদ্দ। আর কোনও দ্বিধা নয়। ঘরে ফিরে এসে কাজে মন দিল সে।

'বাহ! আমার প্রতিবেশীরা তো বেশ শান্তিপ্রিয়!' মনে মনে বিদ্রূপ করল অ্যাণ্ডারসন। কারণ, মাঝে মধ্যেই প্যাসেজের কোনও না কোনও ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল এবং একজোড়া বুটজুতো গটগট করে হেঁটে যাচ্ছিল। কোনও বেয়ারা তার ঘরের সামনে দিয়ে গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে হেঁটে গেল। নীচের গাড়ি-বারান্দায় একটু পরপর বিকট আওয়াজ করে এক একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামছিল।

অ্যাণ্ডারসন চিঠি লেখা শেষ করে হুইস্কি এবং সোডা অর্ডার করল। তারপর জানালায় দাঁড়িয়ে উল্টোদিকের দেয়াল পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। যতদূর তার মনে পড়ে, একজন আইনজীবী ভাড়া নিয়েছেন চোদ্দ নাম্বার ঘরটি। রাশভারী একজন মানুষ, খাবার টেবিলে খুব কম কথা বলেন। খাবার প্লেটের পাশে একতাড়া দলিল দস্তাবেজ নিয়ে বসে খেতে খেতে পড়েন। তবে তাঁর ভেতরের দ্বিতীয় সত্তাটি নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসে, নইলে এত রাতে নাচবেন কেন তিনি? উল্টোদিকের দেয়ালে তাঁর নাচের মুদ্রাটি বেশ ধরা পড়ছে। তাঁর হালকা-পাতলা ছায়াটি একটু পর পর দু'হাত দোলাতে দোলাতে জানালার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছিল। তাঁর পা দুটো লাথি মারার ভঙ্গিতে ওঠানামা করছিল। পা দুটো খালিই মনে হলো, কারণ নাচার কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

দরজায় ম্যানেজার সাহেবের টোকা শোনা গেল। ম্যানেজার সাহেব অ্যাণ্ডারসনকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন, কারণ তাকে দেখে অন্যরকম মনে হচ্ছিল। যা হোক, অ্যাণ্ডারসনের ছবিগুলো দেখে তিনি বেশ আনন্দ পেলেন। কথায় কথায় আবার তেরো নাম্বার ঘরের কথা এল আর তখনি চোদ্দ নাম্বার ঘরের বাসিন্দাকে গান গাইতে শোনা গেল। সে কী গান! এই গান শুনলে শ্রোতা নিশ্চিত হবে গায়ক নিশ্চয়ই পাঁড় মাতাল হয়ে আছে অথবা সে বদ্ধ পাগল। চিকন, উচ্চস্বরের শুকনো একটি কণ্ঠ। মনে হতে পারে জীবনে প্রথম গান গাইছে গায়ক। গানের কথা অবশ্য বোঝা গেল না, দুর্বোধ্য ভাষার কোনও গান। সুর যেমনই হোক, গায়কের গলায় জোর আছে বটে। মনে হচ্ছে তার কণ্ঠ ক্রমশ উঁচুতে উঠতে উঠতে চিমনি গলে অসীম আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। অ্যাণ্ডারসনের মনে হলো, সে যদি এই মুহূর্তে ঘরে একা থাকত, এই বীভৎস শব্দ সে সহ্য করতে পারত না। দৌড়ে হয়তো পাশের কোনও ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিত।

ম্যানেজার সাহেব মুখ হাঁ করে বসে রইলেন।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' অবশেষে বললেন তিনি। কপালের ঘাম মুছলেন, 'কী ভয়ঙ্কর আওয়াজ! স্বয়ং শয়তান গান গাইছে যেন। এই শব্দ আমি অবশ্য আগেও শুনেছি, ভেবেছি বিড়ালের কান্না।'

'পাগল নাকি ব্যাটা?' জিজ্ঞেস করল অ্যাণ্ডারসন।

'সুস্থ তো নয় বটেই। দুঃখজনক। এত ভাল একজন কাস্টমার, সফল আইনজীবী। যতদূর জানি তাঁর বউ-বাচ্চাও আছে। কী হবে বেচারাদের!'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কে যেন অস্থির ভাবে টোকা দিল। পরমুহূর্তে কোনও অনুমতি ছাড়াই ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। পাশের ঘরের আইনজীবী। রাতের পোশাক পরনে এবং এলোমেলো চুল। দেখে বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট রেগে আছেন তিনি।

'কী হচ্ছে এসব?' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন আইনজীবী, 'মাঝরাতে এসব না করলেই কি নয়?' বলেই থমকে গেলেন লোকটা। বুঝতে পারলেন অ্যাণ্ডারসন কিংবা ম্যানেজার–কেউই গান গাইছে না। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কিন্তু হচ্ছেটা কী? কোত্থেকে আসছে শব্দটা? কে এই মাঝরাতে বলির পাঁঠার মত চেঁচাচ্ছে? উফ, আমি পাগল হয়ে যাব।'

ম্যানেজার বললেন, 'আপনার পাশের রুম থেকেই আসছে শব্দটা? আপনি নিশ্চিত? চিমনিতে আটকা পড়া কোনও বিড়াল নয় তো?'

কিন্তু এসব অসার কথা কোনও কাজে এল না। এই ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকটি মানুষ বুঝতে পারল পৃথিবীতে এমন কোনও বিড়ালের জন্ম হয়নি যে এমন অপার্থিব শব্দ করতে পারে। ম্যানেজারের মুখ মাছের পেটের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মত ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে। চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

'অসম্ভব!' বললেন আইনজীবী, 'অসম্ভব, এবাড়িতে কোনও চিমনি নেই। শব্দটা এখানে হচ্ছে ভেবে এঘরে এসেছি। অবশ্যই শব্দটা আমার পাশের ঘরে হচ্ছে।'

'আপনার এবং আমার ঘরের মাঝখানে কি অন্য কোনও ঘর নেই?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অ্যাণ্ডারসন।

'না, জনাব!' বিদ্রূপাত্মক গলায় বললেন আইনজীবী, 'অন্তত আজ সকাল অবধি ছিল না।'

'গতরাতে?'

'ঠিক বলতে পারছি না।' ইতস্তত করলেন আইনজীবী, 'কিন্তু রাতারাতি মাঝখানে একটা ঘর কীভাবে গজিয়ে যায় বলতে পারেন?'

হঠাৎ পাশের ঘরের সেই বীভৎস চিৎকার থেমে গেল। নিচু স্বরে খিলখিল করে হাসতে শোনা গেল গায়ককে। এই হাসির জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোনও ভুবনে। অপার্থিব আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেল তিনজনের। গায়কের আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

'ম্যানেজার সাহেব,' আইনজীবীই প্রথম কথা বললেন, 'আপনার কী বলার আছে? এসবের মানে কী?'

'হা, ঈশ্বর!' গুঙিয়ে উঠলেন ম্যানেজার, 'আমি কী করে বলব? আপনারা যেখানে, আমিও সেখানে। এমন শব্দ যেন জীবনে দ্বিতীয় বার শুনতে না হয় আমাকে।' বুকে ক্রুশ আঁকলেন ম্যানেজার।

'আমিও তা-ই প্রার্থনা করি।' এরপর বিড়বিড়িয়ে কী যেন বললেন আইনজীবী, অ্যাণ্ডারসন ঠিক বুঝতে পারল না। তবে তার কেন যেন মনে হলো–'এখন চুপ, আবার পরে'–এই কথাটি উচ্চারণ করলেন তিনি। তবে নিশ্চিত হতে পারল না সে।

'কিন্তু আমাদের কিছু করা উচিত,' বলল অ্যাণ্ডারসন, 'আমরা তিনজন আছি। চলুন গিয়ে দেখি পাশের ঘরে সমস্যাটা কী।'

'কিন্তু পাশের ঘরটা তো ল'ইয়ার সাহেবের। গিয়ে কোনও লাভ নেই। তিনি তো আমাদের সাথেই রয়েছেন।'

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে পাশের ঘরটাই আমার কিনা।' বললেন আইনজীবী, 'আমার মনে হয় অ্যাণ্ডারসন সাহেব ঠিকই বলেছেন। আমাদের অবশ্যই গিয়ে দেখা উচিত।'

যাবার আগে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে হাতের কাছে পাওয়া গেল শুধু একটি ছড়ি আর একটি ছাতা। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে তিনজন অভিযাত্রী প্যাসেজে বেরিয়ে এল। মৃত মানুষের নিঃশ্বাসের মত নিস্তব্ধতা প্যাসেজে। কিন্তু পাশের ঘরের দরজার নীচ থেকে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাণ্ডারসন এবং আইনজীবী এগিয়ে গেল। অ্যাণ্ডারসন ছড়িটা উঁচিয়ে যে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত হলো এবং আইনজীবী দরজার নব ধরে মোচড় দিলেন এবং প্রচণ্ড ধাক্কা দিলেন। উদ্দেশ্য, ঘরের বাসিন্দা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে পাকড়াও করা। কিন্তু ব্যর্থ। দরজা ভেতর থেকে লক করা।

'ম্যানেজার সাহেব,' বললেন আইনজীবী, 'আপনি গিয়ে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী বেয়ারাটিকে ডেকে আনুন। দরজা ভাঙতে হবে।'

মাথা নেড়ে চলে গেলেন ম্যানেজার। মনে হলো ভয়াবহ এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যেতে পেরে খুশিই হলেন। দরজায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল অ্যাণ্ডারসন এবং আইনজীবী।

হঠাৎ অ্যাণ্ডারসন বলে উঠল, 'এটা তেরো নাম্বার ঘর, লক্ষ করেছেন?'

'তা-ই তো দেখছি।' নাম্বার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন আইনজীবী, 'ওই যে আমার ঘর, আর ওটা আপনার। মাঝখানে তেরো নাম্বার ঘর আছে তা হলে!'

'আমার ঘরে তিনটি জানালা আছে।'

'বলেন কী! আমারও তো তাই।' অ্যাণ্ডারসনের দিকে ফিরে বললেন আইনজীবী। তাঁর পিঠ এখন দরজার দিকে। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একটি হাত বেরিয়ে এসে আইনজীবীর কাঁধ খামচে ধরল। হাতটি লম্বা ঘন লোমে আবৃত, নখগুলো অস্বাভাবিক লম্বা আর ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডারসন। হাতটি আইনজীবীকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে ফেলার আগেই তাঁকে টেনে সরিয়ে আনল সে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এবং ভেতর থেকে নিচু কণ্ঠের হাসি শোনা গেল, স্বয়ং শয়তান হেসে উঠল যেন।

আইনজীবী হাতটি দেখেননি। অ্যাণ্ডারসন যখন কী হয়েছে বর্ণনা করল, তিনি

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন, 'আমার মনে হয় আমাদের চলে যাওয়া উচিত। যার যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকিগে।'

এমন সময় ম্যানেজার সাহেব ফিরলেন। সঙ্গে দু'জন শক্ত সমর্থ বেয়ারা। দেখে বোঝা যাচ্ছে দু'জনেই যথেষ্ট ভীত। আইনজীবী তাদেরকে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কৌতূহলী করার চেষ্টা করলেন। কোনও লাভ হলো বলে মনে হলো না। তারা তাদের শাবল দুটি মাটিতে ফেলে দিয়ে জানাল, শয়তানের গুহায় নিজের গলা ঠেলে দিতে রাজি নয় তারা। ম্যানেজার সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন। বোধশক্তিহীন জম্বির মত দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ অ্যাণ্ডারসনের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে বলল, 'এই কি ডেনমার্কের মানুষের সাহস যার সুনাম আমি এতদিন শুনে এসেছি? জার্মানদের মত কাপুরুষ ড্যানিশরাও? একজনের বিরুদ্ধে লড়তে আমরা পাঁচজন সাহস পাচ্ছি না!'

স্বদেশ এবং স্বজাতির দুর্নাম শুনতে রাজি নয় কেউই। বেয়ারা দু'জন লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং শাবল দিয়ে দরজা ভাঙতে উদ্যত হলো।

'দাঁড়াও।' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাণ্ডারসন, 'অস্থির হয়ো না। ম্যানেজার সাহেব, আপনি আলো নিয়ে এখানে দাঁড়ান। আর তোমরা, একজন দরজা ভাঙো, অন্যজন আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত থাকো। আর আমি যতক্ষণ না বলব ভেতরে ঢুকবে না।'

একজন এগিয়ে গেল এবং গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করল দরজায়। অদ্ভুত ব্যাপার! কাঠের দরজায় আঘাত করলে যেমন ফাঁপা একটা শব্দ হবার কথা, তেমন কিছু হলো না। ভোঁতা একটা আওয়াজ উঠল, যেন সিমেন্টের নিরেট কোনও দেয়ালে বাড়ি দেয়া হয়েছে। আর্তনাদ করে বসে পড়ল বেয়ারাটি। অ্যাণ্ডারসন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের সামনে কোনও দরজা নেই। শুধু একটি নিরেট দেয়াল হাসছে। ঘরের নাম্বার প্লেটটিও গায়েব। কিছুক্ষণ নিরেট নিস্তব্ধতা। বাইরে মোরগের ডাক শোনা গেল। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে তাকিয়ে অ্যাণ্ডারসন দেখল জানালা দিয়ে ভোরের ম্লান আলো প্রবেশ করেছে প্যাসেজে।

যার যার ঘরে ফিরে যাবার সাহস হলো না অ্যাণ্ডারসন কিংবা আইনজীবীর। তারা বাকি রাতটা একঘরে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। একজন যখন নিজের ঘর থেকে জিনিসপত্র আনতে গেল, অন্যজন গেল মোমবাতি হাতে। এমন ভয় জীবনে কখনও পায়নি তারা। তারা লক্ষ করল, বারো এবং চোদ্দ, উভয় ঘরেই তিনটি করে জানালা।

পরদিন সকালে তিনজনে আবার জড়ো হলো বারো নাম্বার ঘরে। থানা পুলিশ করতে রাজি হলেন না ম্যানেজার। এমন একটা বদনাম ছড়ালে তাঁর ব্যবসা লাটে উঠবে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত হলো যে, গতরাতে যা ঘটেছে, তার একটা সুরাহা হওয়া দরকার। বেয়ারা দু'জনের সাহায্যে ঘরের আসবাবপত্র সরানো হলো, এবং যথেষ্ট ঝামেলা করে বারো এবং চোদ্দ নাম্বার ঘরের মাঝখানের দেয়ালটি খোঁড়া হলো।

পাঠক হয়তো ভাববেন এখানে বিশপ নিকোলাস ফ্র্যাঙ্কেনের কঙ্কাল পাওয়া

যাবে। তা নয়। একটি তামার বাক্স পাওয়া গেল। তালা ভেঙে তার ভেতর পাওয়া গেল এক টুকরো পার্চমেন্ট কাগজ। মোটামুটি বিশ লাইনে কিছু একটা লেখা আছে তাতে। অ্যাণ্ডারসন এবং আইনজীবী কিছু কিছু প্রাচীন ভাষা জানতেন। তাঁরা এটা পেয়ে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই কাগজটি তেরো নাম্বার ঘরের রহস্য অনেকটাই সমাধানের পথে নিয়ে গেল।

জ্যোতিষবিদ্যার উপর একটি বই আছে আমার কাছে যা আমি কখনও পড়িনি। যার প্রচ্ছদে হ্যানস সেবাল্ড বেহামের[৫] খোদাই করা একটি ছবি আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন সন্ন্যাসী একটি টেবিল ঘিরে বসে আছেন। বইয়ের নামটা আমার মনে নেই এবং হাতের নাগালেও সেটা নেই এখন। অদ্ভুত এক ভাষায় লেখা ছিল সে বইটি। এমনকী আমি বুঝতে পারিনি এটা কোন্‌দিক থেকে পড়ব, ডান নাকি বাম, নাকি উল্টো করে পড়তে হবে। অ্যাণ্ডারসন এবং আইনজীবীরও একই অবস্থা হয়েছিল ওই পার্চমেন্ট কাগজটি পেয়ে।

দিন দুয়েক গবেষণার পর আইনজীবী বললেন যে ভাষাটা হয় ল্যাটিন নতুবা ডেনমার্কের কোনও পুরনো ভাষা।

অ্যাণ্ডারসন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে বাক্সটি ভাইবর্গের হিস্টরিক্যাল সোসাইটিতে জমা দিল সেখানকার জাদুঘরে রাখার জন্য। অ্যাণ্ডারসনের কাছ থেকে পুরো গল্পটি আমি শুনি মাসখানেক পর। আপসালার কাছে এক বনে বসে ছিলাম আমরা। সেখানে আমি এই মনে করে হাসাহাসি করছিলাম যে কীভাবে ড্যানিয়েল সালথেনাস[৬] তার আত্মাকে শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল। অ্যাণ্ডারসন খুব একটা বিস্মিত হলো বলে মনে হলো না।

'হারামজাদা।' সালথেনাসকে গালি দিল সে, 'সে জানে না যে কী করেছে।'

এরপরই সে আমাকে এই গল্পটি বলে। কিন্তু ভাইবর্গে আসলে কী ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকৃতি জানাল। অ্যাণ্ডারসন এবং আমি যেসব সিদ্ধান্ত দিলাম, তাও সে মেনে নিল না।

মূলঃ এম. আর. জেমস
অনুবাদঃ অনিরুদ্ধ

---

[৫] হ্যানস সেবাল্ড বেহাম (১৫০০—১৫৫০) একজন বিখ্যাত চিত্রকর। কাঠে খোদাই করে ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত।

[৬] জন্ম ১৭০১, মৃত্যু ১৭৫০, শোনা যায় তিনি শয়তানের কাছে নিজের রক্তে চিঠি লিখেছিলেন যাতে শয়তান তাঁকে অঢেল সম্পদের মালিক করে। চিঠিটি তিনি একটি ওক গাছের নীচে পুঁতে রেখেছিলেন। একজন স্থানীয় কৃষক সেটি খুঁজে পায়। তখন তিনি দেশ ত্যাগে বাধ্য হন।

পিশাচী

শুরুর আগে

জারি গানের আসর শেষ হতে হতে মাঝ রাত। হারান সাধু ভেবেছিল ফেরার পথে এক-দু'জন সঙ্গী জুটে যাবে। কিন্তু বরাত মন্দ। তাকে একা একাই এই মাঝরাতে নির্জন পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। তার নামটা শুনে অনেকেই মনে করতে পারে সে সাধু সন্ন্যাসী ধরনের কেউ। আসলে তা নয়, হারানের নামের পেছনে 'সাধু'টা তার পদবী। হারান সাধু তাগড়াই জোয়ান। পেটানো শরীর। চাঁপা কলার মত গায়ের রং। কুচকুচে কালো মাথার চুল। দেখতে সুপুরুষ। বলতে গেলে নারী পাগল করা রূপ তার। এই পাহাড়ি চার মাইলের পথ মাঝ রাতে একা একা পাড়ি দিলেও সে ভয় পাচ্ছে এমন নয়। ভয়-ডর তার নেই। তবে সঙ্গী পেলে পথ পাড়ি দেয়া সহজ।

চাঁদনী রাত। জোছনায় চারদিক থৈ-থৈ। পাহাড় আর জঙ্গল সেই চাঁদের আলোয় স্নান করছে। গাছের ডালে ডালে রাত জাগা পাখিদের হুটোপুটি। আপন মনে গুনগুনিয়ে পথ চলছে হারান। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এর মধ্যে অনেকখানি পথ চলে এসেছে সে। মনে হলো নূপুর পায়ে কেউ হাঁটছে তার পেছন পেছন! ঝিঁঝি পোকার ডাক অনেক সময় এমন নূপুরের শব্দের মত মনে হয়। কিন্তু এটা তেমন নয়। আসলেই নূপুর পরে কেউ তার পেছনে আসছে! পেছন ফিরে তাকাল হারান। একটা হার্টবিট মিস্ করল। সত্যি একজন বটে! এক রূপসী মেয়ে। একটা ধবধবে সাদা কাপড় পেঁচিয়ে পরেছে। গোড়ালির অনেক উপরেই থেমে গেছে কাপড়। শুধু এই কাপড় ছাড়া দেহে আর কিছু নেই। ঠিক হারানের সামনে এসে দাঁড়াল মোহিনী নারী। হারানের পঁচিশ বছরের জীবনে এমন সুন্দর রমণী আর দেখেনি। বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকল সে। তার এই তাকানো দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নিশাচরী। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল হারানের উপর। রক্তের শিরায় শিরায় শিহরণ জাগল হারানের। বুকের মধ্যে কিলবিল করে উঠল কামনার কাল সাপ। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল সে। বুঝতে চাইল না এই নিশিরাতে একা একা একটি মেয়ে এখানে বিজন পাহাড়ে কী করছে! জানতে

চাইল না কোথা থেকে এসেছে এই মেয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশাচরীর উপর। আর ওই রূপসী মেয়েও যেন তাই চাইছিল। আদিম উল্লাসে মেতে উঠল দু'জনে।

যেখান থেকে শুরু

বন্দুক হাতে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সতর্ক চোখ রেখে হাঁটছে শিকারী দু'জন। শিকারের প্যারমিট তাদের নেই। তাই বনরক্ষীদের নজর থেকে বাঁচতে তাদের এই সতর্ক অবস্থা। সময়টা ছিল বসন্তের শেষ বিকেল। গাছে গাছে পাখিদের কল-কাকলি। বনের ঝোপে ঝোপে নীল আর হলুদ ফুলের ছড়াছড়ি। শিকারী দু'জন সতর্ক থাকলেও একজোড়া রক্তচক্ষু ঠিকই তাদের দিকে নজর রাখছে। পিছু নিয়েছে ওদের। এতই নিঃশব্দে যে, ওরা একটুও টের পায়নি।

হঠাৎ করেই সামনের শিকারী থমকে দাঁড়াল। পেছনের জন তা দেখে থেমে গেল। দু'জনের মুখ দিয়েই বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল। একটা মায়া হরিণ। কোনও হিংস্র পশু যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ওটার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! শিকারী দু'জন নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ব্যাপারটা আসলে অবাক করার মতই। কারণ কোনও মাংসাশী প্রাণী হলে ওটাকে খুবলে খুবলে খেয়ে যেত। কিন্তু এটা কেমন জন্তু যে হরিণটার মাথা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! শিকারী দু'জনের ভয় ভয় করতে লাগল। ভৌতিক কোনও ব্যাপার নয়তো! দ্রুত পা চালাল ওরা।

এদিকে সন্ধেও হয়ে আসছে। আবার থমকে দাঁড়াতে হলো ওদের। আরেকটা মুণ্ডু ছেঁড়া পশু! খরগোশ একটা। হঠাৎ পেছনে একটা খস্ খস্ শব্দ উঠল। চমকে পিছন ফিরে তাকাল দুই শিকারী। বন্দুক তৈরি। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না।

হঠাৎ গাছের উপর থেকে ধুপ করে কী যেন একটা পড়ল ওদের সামনে! ওটা দেখেই আতঙ্কে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল শিকারী দু'জনের গলা চিরে। এবার আর নিজেদের ঠিক রাখতে পারল না তারা। একটা মুণ্ডুহীন লাশ! না, কোনও পশুর লাশ নয় এবার। একটা মনুষ্য দেহ! কোনও উপজাতি হতভাগার লাশ ওটা! বন্দুক দুটো হাত থেকে পড়ে গেল শিকারী দু'জনের। তারপর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুট লাগাল। ওরা বুঝে গেছে এই জঙ্গলে পিশাচের রাজত্ব। দৌড়ুতে দৌড়ুতে জঙ্গল ছেড়ে পাহাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এল। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তারপরও দৌড় থামাল না দু'জনে। দৌড়াতেই থাকল। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওদের পেছনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা রাতেই আকাশে বিশাল চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জীবনে এত ভয় পায়নি ওরা। ওদের ভয়ের যেন আরও কিছু বাকি ছিল। দৌড়ুতে দৌড়ুতে পাহাড়ি বাঁকটা পেরিয়ে আসতেই আবারও থমকে

দাঁড়াতে হলো ওদের। ওদের কাছ থেকে বড় জোর বিশ হাত সামনে কিছু একটা বসে আছে, পথের ধুলোয়। দেখতে অনেকটা মানব শিশুর মতই লাগছে। কিন্তু এই নির্জন পাহাড়ি এলাকায় ভূতুড়ে সন্ধ্যা রাতে শিশু আসবে কোথা থেকে! চোখের ভুল নয়তো? নাকি কেউ ইচ্ছে করে এই শিশুটা পথে ফেলে গেছে। মনে সন্দেহ পোষণ করে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল দু'জন। কাছে যেতেই চমকে গেল শিকারী দু'জন। আসলেই একটি মানব শিশু! সুন্দর ফুটফুটে পাঁচ-ছয় বছরের একটা ছেলে। পরনে ছোট নেংটি জাতীয় প্যান্ট। ফর্সা গায়ের রং। কোঁকড়ানো কুচকুচে মাথার চুল। টানা টানা চোখ। পথের ধুলোয় বসে খেলছে। নিষ্পাপ চেহারা।

ছেলেটা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন ওরা কত দিনের চেনা। হঠাৎ করেই ছেলেটার চোখের ভেতরের সাদা অংশটুকু আর সাদা থাকল না। টকটকে আগুনে-লাল হয়ে গেল! জায়গা মত চোখের মণি দুটো নেই! সম্পূর্ণ জ্বলন্ত আগুনের মত ধকধক করতে লাগল চোখ দুটো! চমকে পিছিয়ে গেল ওরা দু'পা। হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল রহস্যময় শিশুটি। আবার হাসল। চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ঠোঁটের দুই পাশ ঠেলে বেরিয়ে আসা দুটো তীক্ষ্ণ দাঁত। দেখতে দেখতে হাতের নখগুলো বড় হয়ে গেল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ছেলেটা। সহসাই কিছু বুঝে ওঠার আগে চড়ে বসল এক শিকারীর ঘাড়ে। গলা বরাবর বসিয়ে দিল তার তীক্ষ্ণ দাঁত। রক্ত চুষতে লাগল। তারপর এক ঝটকায় ছিঁড়ে ফেলল কণ্ঠনালী! এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে দ্বিতীয় শিকারী ফিরে দৌড় দিয়েছিল। কিন্তু ঘাস ফড়িঙের মত আবার লাফ দিয়ে প্রথম শিকারীকে ছেড়ে দ্বিতীয় শিকারীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল পিশাচ শিশু। দাঁত বসিয়ে দিল গলায়। একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার মাঝ পথেই থেমে গেল। সেই চিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল সেই মরণ চিৎকার।

নিশি আতঙ্ক

হারান সাধু বিয়ে করেছে আজ এক বছর হতে চলল। রূপসী বউ। বউটা পোয়াতি। এমনিতে বউ তার ভাল। কিন্তু তারপরও হারান সাধুর স্মৃতিতে হানা দেয় ছয়-সাত বছর আগের নিশুতি রাতের একটা ঘটনা। মনে হলেই এখনও সে পুলকিত হয়ে ওঠে। রাতের খাবার শেষ করেছে হারান সাধু আর তার বউ। ঘরের লাগোয়া তাদের টিউবওয়েল। সেখানে বউ গেছে এঁটো বাসনগুলো ধুতে। ঠিক তখনই দেখতে পেল সে ওটা! একটা ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে! তাকে ঘিরে আছে নীলাভ একটা আলো! ছেলেটার চেহারা দেখেই চমকে উঠল হারান সাধুর বউ চুমকী। চেহারাটা কেমন চেনা চেনা লাগল চুমকীর কাছে। কোথায় যেন একে দেখেছে। সে যা হোক, কিন্তু এই ছেলেটা এখানে এল কেমন

করে? এই রাতে এখানে এমন্ একটা ছোট্ট ছেলে থাকার কথা নয়! বিশ্বাস হচ্ছে না তার। আবার তাকাল সে।

কলতলার পেছন দিকের ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা ছাতিম গাছটার তলায় সহজে কেউ যেতে চায় না। কিন্তু ছেলেটা কোন্ বাড়ির? এখানে কী করছে? ভাবতে থাকল চুমকী। আরও ভাবল চেহারাটা এমন চেনা চেনা লাগছে কেন?

হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল তার চেহারাটা। এই চেহারাটা তো তার ঘরেই আছে। শো-কেসের ওপর ছোট ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি। ছবিটা হারান সাধুর ছোট বয়সের! আশ্চর্য! এত মিল হয় কেমন্ করে? চুমকীর হাত থেকে পড়ে গেল থালা-বাসনগুলো। ঝন ঝন করে উঠল। আবার ছেলেটার দিকে তাকাল। সাথে সাথে দেখতে পেল ছেলেটার চোখের মণি দুটো নেই! সেখানে সমস্ত চোখ জুড়ে ধকধকে রক্তলাল আগুনের আভা! একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল চুমকীর কণ্ঠ চিরে। দৌড়ে বেরিয়ে এল হারান সাধু। চুমকী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। আঙুল দিয়ে কলতলার পেছন্ দিকটা দেখাতে লাগল তার স্বামীকে। কিন্তু হারান সাধু কিছুই দেখতে পেল না। শুধু অন্ধকার ঝোপ। চুমকী তখন থর থর করে কাঁপছে। হারান সাধু তাকে ধরে ঘরে নিয়ে এল। চুমকী শুধু একটা কথাই বলল, 'তোমার ছোট বেলার চেহারার ওই ছেলেটা কে?' তার পরই জ্ঞান হারাল চুমকী।

ঘরে এনে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতেই চোখ মেলে তাকাল চুমকী। বিছানায় শুয়ে থেকেই শো-কেসের উপরে ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো হারান সাধুর ছোট বেলার ছবিটা এনে দিতে বলল্। হারান তাই করল। ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে চুমকী বলল, 'সেই চোখ, সেই মুখ, সেই কালো চুল...কেমন করে সম্ভব! কে এই ছেলে? আমাকে সত্যি করে বলো তুমি।'

হারান সাধু অবাক হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কী সব আবোল তাবোল বলছ বলো তো? তুমি মা হবে তো, আর তাই তোমার অবচেতন মন হয়তো এমন একটা ছেলে চাইছে, তাই ওই সব দেখেছ।'

'কিন্তু ওই আগুনের ভাটার মত চোখ দুটো!' বলেই আতঙ্কে চোখ ঢাকল চুমকী। ফুঁপিয়ে উঠল সে কয়েকবার।

যেভাবেই হোক রাতটা কেটে গেল। সকালে গোয়ালঘরে গিয়েই চিৎকার করে উঠল হারান সাধু। গোয়ালঘরে তখন বীভৎস অবস্থা। অতি সাধের দুধের গাইটার মুণ্ডুহীন দেহ পড়ে আছে মাটিতে! রক্তে থৈ-থৈ করছে চারদিক। যে-ই এই কাজ করে থাকুক, ভোরের একটু আগে করেছে। কিন্তু এমন কাজ কে করবে? কোনও মানুষের পক্ষে এমন নির্মম কাজ করা সম্ভব নয়। মাথায় হাত দিয়ে বিমূঢ়ের মত বসে থাকল হারান সাধু। প্রতিবেশীরা এসে দেখে গেল। আঁৎকে উঠল সবাই।

চুমকী কেমন যেন মন মরা হয়ে গেছে। ঘর থেকে বের হচ্ছে না। শুধু তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ওই রক্তচক্ষু। হারান সাধু নিজেকে সামলে নিয়েছে। গরু গেছে যাক। কিন্তু আর দু'একদিনের মধ্যে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা।

জয়তুন খালাকে জানিয়ে রাখা হয়েছে আগেই। এই পাহাড়ি পল্লীর নির্ভরযোগ্য ধাই। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া আছে মহিলার। এদিকে জঙ্গলে আর পাহাড়ি পথে মুণ্ডুহীন লাশগুলো দেখে ভয়ের একটা আবহ তৈরি হয়ে গেছে পাহাড় পল্লীতে। অশুভ কিছু যে আস্তানা পেতেছে এই এলাকায়, অনেকেই ফিসফাস কথার মধ্যে তা বলাবলি করছে। রাতবিরেতে জঙ্গুলে পথে চলা ফেরা বন্ধ হয়ে গেছে। রাত হলেই আতঙ্ক এসে গ্রাস করে সবাইকে।

এর মধ্যেই একরাতে প্রসব ব্যথা উঠল চুমকীর। তখন রাত দশটা। জয়তুন খালাকে খবর দেয়া দরকার। এক মুঠো পাট কাঠি মশালের মত তৈরি করে তাতে আগুন জ্বেলে ওটা নিয়েই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল হারান। যদিও চাঁদের আলো আছে। জয়তুন বিবির বাড়ি গিয়ে দেখে মহিলা ঘুমিয়ে গেছে। তাকে ডেকে তুলল হারান। জয়তুন বিবি বলল, 'যা, বাবা, তুই যা, আমি তৈরি হয়ে আসতেছি।'

হারান মাথা নাড়ল, 'না, খালা, সময়টা ভাল না। তুমি একা এই রাতে যেতে পারবা না। তারচেয়ে আমার সঙ্গেই চল।'

জয়তুন বিবি আপত্তি করল না।

আগে আগে চলছে হারান সাধু আর পেছনে জয়তুন বিবি। রাত নিঝুম। পাহাড়ি জঙ্গুলে পথ। কথা বলতে বলতে হাঁটছে তারা। হঠাৎ উপলব্ধি করল হারান, পেছনে জয়তুন বিবি নেই। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সত্যি নেই জয়তুন বিবি! কোথায় গেল?

ভয় পেয়ে গেল হারান। ডাকতে লাগল, 'খালা...ও, খালা, কোথায় গেলা?'

হঠাৎ তার হাত তিনেক সামনে থেকে বলে উঠল জয়তুন খালা, 'মর জ্বালা, আমি তো তোর সামনেই।'

জয়তুনকে দেখে স্বস্তি পেল হারান। কিন্তু অবাক হলো। একজনের পায়ে চলা পথ। তাকে ডিঙিয়ে তার অজান্তে জয়তুন খালা সামনে গেল কেমন করে! কিন্তু বউয়ের চিন্তায় বিষয়টাকে তেমন আমল দিল না হারান। দ্রুত পা চালাল সে।

বাড়ি এসে ঘরে ঢুকে পড়ল জয়তুন। বলল, 'এক গামলা গরম পানি করে আন, বেটা।' হারান তাড়াতাড়ি পানি গরম করে দিল।

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ঘরের দরজা লাগাতে লাগাতে জয়তুন বলল, 'তুই বেটা ছেলে, বাইরে থাক। সময় মত কান্না শুনতে পাবি।'

এদিকে ব্যথার তীব্রতায় উথাল পাথাল অবস্থা চুমকীর। এর মধ্যেই সে জয়তুন বিবিকে দেখল। বলল, 'খালা, ও, খালা, সব ভালয় ভালয় হবে তো?'

জয়তুন বিবি বলল, 'চিন্তা নাই। ঠিক হয়ে যাবে।' হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল জয়তুন বিবি। অবাক হয়ে চুমকী দেখল ওটা জয়তুন খালা না। অন্য কিছু। একটু আগে জয়তুন খালাই ছিল। কিন্তু এখন তার রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণ দাঁত বের হয়ে গেছে জয়তুনরূপী মহিলার। হাতের নখগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। চোখের রঙ আগুনের

মত লাল। থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে এল সে। চুমকী বুঝতে পারল কোনও এক পিশাচীর কবলে পড়েছে সে। চিৎকার করতে চাইল সে। মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না।

পিশাচী তার কাজ শুরু করে দিল। একটা মাত্র চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাল চুমকী। অবশেষে ভূমিষ্ঠ হলো সন্তান। ফুটফুটে একটা ছেলে। দু'হাতে রক্তাক্ত মানব শিশুটাকে মুখের সামনে তুলে ধরল জয়তুনরূপী পিশাচী। তার চোখ দুটি প্রচণ্ড আক্রোশে ধকধক করতে লাগল। রক্তাক্ত শরীর থেকে চেটে পুটে সাফ করে ফেলল রক্ত। ঠিক তখনই, ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া করে নিজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে প্রকাশ করল হারান সাধুর সন্তান। তার পরপরই দরজা ধাক্কাতে লাগল হারান সাধু, 'ও, খালা, দরজা খোল। ছেলে হলো না মেয়ে?'

ঘর থেকে জয়তুন খালার কণ্ঠ শোনা গেল, 'সবুর কর, বেটা, ছেলেই হইছে।'

এরপর আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। অধৈর্য হয়ে গেল হারান। তারপর আবার ডাকতে লাগল। কিন্তু কোনও সাড়া-শব্দ নেই। দরজা ধাক্কাতে শুরু করে দিল। কিন্তু তবু কোনও শব্দ নেই। কী এক অজানা ভয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলল হারান সাধু। কিন্তু একী! তার স্ত্রী–প্রিয়তমা স্ত্রী রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে শুয়ে আছে। তার সন্তান নেই! জয়তুন বিবি নেই! ঘরের পেছন দিকের গরাদেহীন জানালাটা খোলা। হাওয়ায় ওটার কপাট দুটো দুলছে! জয়তুন বিবি তার সন্তান নিয়ে পালিয়েছে? এ কেমন কথা! এদিকে তার স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এল। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে।

জয়তুন বিবি হারানের সদ্যোজাত সন্তান নিয়ে পালিয়েছে–মানতে পারল না কেউ। কারণ জয়তুনকে সবাই চেনে। এদিকে রিকশা ভ্যান চলে এসেছে। হারানের বউকে গাড়িতে তোলা হলো। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিতে হবে। ঠিক তখুনি দৌড়ে এল পাশের বাড়ির হারেস মণ্ডল। উত্তেজনায় তার বুক ওঠা-নামা করছে। সে কিছুই বলতে পারছে না। শুধু আঙুল দিয়ে জঙ্গলের দিক দেখাচ্ছে। আতঙ্কে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে তার দু'চোখ। শুধু বলল, 'জয়তুন বি...বি...'

সবাই ছুটল জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের মাঝখানে একটা বিশাল বাঁশ ঝাড়। তারই কয়েকটা বাঁশের সাথে–অনেক উঁচুতে–আটকে আছে জয়তুন বিবির লাশ। ঘাড়টা ভাঙা! আতঙ্কে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আছে। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই হারান সাধুর। সে স্ত্রীকে নিয়ে ছুটল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে।

শত্রু ভয়ঙ্কর

এই যাত্রা বিপদ কেটে গেছে চুমকীর। কিন্তু পাগলের মত হয়ে গেল সে। তার

কাছ থেকে সবাই ব্যাপারটা জানতে পারল। আসলে যে পিশাচীটা সন্তান নিয়ে পালিয়েছে সে-ই মেরেছে জয়তুন বিবিকে। এখন বুঝতে পারল হারান সাধু, কেন সে পেছন ফিরে সেদিন রাতে জয়তুন বিবিকে দেখতে পায়নি। কেন তাকে সহসা তার সামনে দেখতে পেয়েছিল। তারমানে, তার সাথে যে জয়তুন বিবি এসে ঘরে ঢুকেছে সে তা হলে একটা পিশাচ কন্যা! শিরশির করে উঠল হারানের শরীর।

চুমকী বলল, 'তাকে আমি দেখেছি! এখন আমি বুঝতে পারছি। সব বুঝতে পারছি। আমার কোনও সন্তান হতে দেবে না ওই পেত্নীটা। কোনও দিন আমি আর মা ডাক শুনতে পারব না। কিন্তু কেন?' বলেই হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করল চুমকী। এই ক'দিনে চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে তার। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। সারা দিন অগোছাল ভাবে থাকে। কোনও দিকে নজর নেই।

হাজীগঞ্জে একজন নামকরা তান্ত্রিক আছে। হারান সেটা জানে। সে-ই খবর পাঠাল তাকে। মনু কবিরাজ নামেই পরিচিত সে। সে এসে সবকিছু শুনে বলল, 'কোনও প্রেতিনী প্রতিশোধ নিতে চাইছে তোর উপর। তুই মনে করে দেখ কোন্ ঘটনা।'

হারান অবাক হলো, 'কীসের ঘটনা? আমি আবার কার কী করলাম?'

মনু কবিরাজ বলল, 'করেছিস, করেছিস। ভাল করে ভেবে বল।'

হারানের কিছু মনে পড়ল না।

মনু কবিরাজ বলল, 'আজ রাতটা আমি জঙ্গলে কাটাব। আর তোরা পুলিশকে জানিয়েছিস ঘটনাগুলো? ক'জন তো মরল। আমি জঙ্গলে আজ ওই দুষ্ট আত্মার সন্ধানে যাব।'

সে রাতে মনু কবিরাজ জঙ্গলে চলে গেল প্রেতিনীর সন্ধানে। ভয়াল আতঙ্ক নিয়ে রাত কাটায় এখন পাহাড়ি পল্লীর মানুষ। এমনি করেই রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই আতঙ্কে চিৎকার বেরিয়ে এল হারানের কণ্ঠ চিরে। তার উঠানে মনু কবিরাজের ছেঁড়া মুণ্ডুটা পড়ে আছে! লোকজন জমে গেল। পুলিশ এল। পুলিশে-মানুষে নানা রকম হয়রানি। পুলিশ আবার আসবে বলে গেল। মনু কবিরাজের লাশটাও পাওয়া গেছে জঙ্গলে। পুলিশ নিয়ে গেছে। জয়তুন বিবির কথা ও শিকারী দু'জনের লাশের কথা পুলিশের কাছে চেপে গেল পাহাড়ি পল্লীর জনগণ।

সেদিন মাঝ রাতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল চুমকী। হারান সাধু এমনিতে রাতে ঘুমায় না। কিন্তু আজ তার কেন যে এমন ঘুম চোখে নেমে এল কে জানে?

হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলে চলে এল চুমকী। বাঁশ ঝাড়টার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। বাঁশ ঝাড়ের নীচে নীল আলোর আভায় সেই ছেলেটাকে আবার দেখতে পেল সে। তার দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। চোখ দুটো আগুনের আভায় জ্বলে উঠল। আর ঠিক তখনই সে দেখতে পেল আরেক জনকে! ছেলেটার পেছনে দাঁড়ানো রূপবতী এক নারী। সমস্ত বাঁশ বন যেন তার রূপের আলোয় ভরে গেল। তারপরই বদলে যেতে থাকল তার চেহারা। ভয়ঙ্কর কুৎসিত হয়ে উঠল চেহারাটা। চোখ দুটো দিয়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল যেন।

চিৎকার করে উঠল ফ্যাসফ্যাসে নারী কণ্ঠে, 'চিনতে পারছিস আমাকে? আমি সেই, যে তোর ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে। হা-হা-হা-হা! ওই ছেলে আর পৃথিবীতে নেই।' একটু থামল প্রেতিনী। তারপর আবার বলল, 'এই যে সামনে দাঁড়ানো, একে দেখছিস? আমার ছেলে। এর বাপ কে জানিস? তোর স্বামী হারান সাধু। আমার ছেলেকে পিতৃ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তোর ছেলে, তা তো হয় না। তোর ছেলে শেষ। এবার তুইও শেষ!' হঠাৎ করেই যেন তীব্র নীল আলো ঝলসে উঠল প্রেত-নারীর চোখে। দুই চোখ থেকে দুটো নীল আলোর শলাকা ছুটে এসে বিঁধে গেল চুমকীর হৃৎপিণ্ডে।

পরদিন ওরা যখন চুমকীর লাশ খুঁজে পেল তখন দুপুর। হতবাক হয়ে বসে পড়ল হারান চুমকীর লাশের পাশে। চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। চুমকীর মাথাটা তার কোলের উপর। ভাষাহীন ভাবে সে তাকিয়ে আছে চুমকীর মুখের দিকে। হারানকে বুঝিয়ে অনেক কষ্টে চুমকীর লাশটা নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু হারান ওখানেই রইল। জঙ্গল ছেড়ে উঠে এল না। সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা গিয়ে রাত হলো। হারান সাধু ওখানেই থাকল। বিড়বিড় করে কথা বলল। কী বলে সে-ই জানে। গভীর রাতে বাঁশ বন থেকে বেরিয়ে এল হারান সাধু। চিৎকার করতে লাগল, 'পিশাচ নারী, তুই বের হয়ে আয়, তোকে দেখতে চাই। আজ তুই আমাকেও শেষ কর। আয়-আয়, আমাকেও শেষ কর। আমার বাঁচার ইচ্ছা নাই। আয়, কোথায় তুই...আ...য়...আয়...'

হঠাৎ করেই ছেলেটাকে দেখতে পেল হারান সাধু। ফুটফুটে একটা ছেলে। নীল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিট মিট করে হাসছে। হারান সাধুকে দেখেই ডাকল, 'বাবা...এই, বাবা।'

থমকে গেল হারান সাধু। টানা টানা চোখ, কোঁকড়ানো কালো চুল, সুন্দর লাল পাতলা ঠোঁট। হারানের ছোট বেলার ছবিটার কথা মনে করিয়ে দেয়। কে এই ছেলে? একেই তার স্ত্রী দেখেছিল কলতলায়? ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেটার পেছনে এক নারী মূর্তি দেখতে পেল হারান। কেমন যেন চেনা চেনা লাগল চেহারাটা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কিছু। আজ থেকে ছয় বছর আগের চাঁদনী রাতের এক ঘটনার কথা। ছেলেটা সত্যিই তার ঔরসজাত সন্তান, বুঝতে পারল হারান। ওই নারীর ঘরেই ছেলেটার জন্ম। সে রাতে পিশাচী চেয়েছিল ওকে বিয়ে করতে, কিন্তু হারান রাজি হয়নি।

মনে মনে ভাবল সে, আজ থেকে ছয় বছর আগে যদি সে পিশাচীটার মোহে না পড়ত, আজ তার এই অবস্থা হয় না। আজ তার সুন্দর একটা সংসার থাকত। ফুটফুটে সন্তান থাকত। সামনে দাঁড়ানো ওটাও তার সন্তান, তবে একটা পিশাচ–নরপিশাচ! কেমন করে বুকে টেনে নেবে তাকে? না, না, ওই পিশাচের কোনও অধিকার নেই তাকে বাবা ডাকার।

হঠাৎ কথা বলে উঠল পিশাচ কন্যা, 'তুমি আর সংসার করতে পারবে না, হারান সাধু। আমার ছেলেকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে তুমি আর কারও বাবা হতে পারবে না। আমাকে বঞ্চিত করেছ করো। কিন্তু ওকে পারবে না। তোমার

সন্তানকে বুকে টেনে নাও।'

চিৎকার করে উঠল হারান সাধু, 'না-না-না, ওরা কী দোষ করেছিল, আমার স্ত্রীর কী দোষ ছিল? আমার নিষ্পাপ সদ্যোজাত সন্তান? আজ আমাকেও মেরে ফেলো তুমি...মেরে ফেলো...' কান্নায় ভেঙে পড়ল হারান সাধু।

কিন্তু তার কান্না প্রেতিনীকে বিচলিত করল না। সে-ও চিৎকার করে ভয়ঙ্কর গলায় বলল, 'যতবার বিয়ে করবে তুমি, ততবার তোমার বউ মরবে, হারান। সাবধান! নিজ হাতে ওদের মারব আমি।'

পরিশিষ্ট

হারান সাধু আর বিয়ে করেনি। পাগল হয়ে গেছে সে। এক মুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। তারপর হঠাৎ একদিন কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। পাহাড়ি পল্লীতে আর পিশাচের উৎপাত নেই। শান্তিতে বসবাস করতে লাগল সবাই। তবে এখনও রাতের আঁধারে জঙ্গলের পথ পাড়ি দিতে ছমছম করে ওঠে কারও কারও গা। মনে হয় কে যেন নূপুর পায়ে পেছন পেছন হেঁটে আসছে। কিন্তু হারানের মত ভুল এখনও কেউ করেনি!

রতন চক্রবর্তী

আতঙ্ক

সে অপরূপা, সাদাসিধে আর নরম মনের তরুণী'। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির আনন্দময় স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছিল। কিন্তু স্বামীর গম্ভীর আচরণ ও রূঢ় স্বভাবের কারণে তার স্বপ্ন নস্যাৎ হতে চলেছে। স্বামীকে সে খুব ভালবাসত। মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে সে যখন রাতের বেলা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে, নিজে নিজেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তার সুন্দর সুপুরুষ স্বামীর দিকে চোরা চোখে তাকায়। জর্ডানও তার স্ত্রী অ্যালিসিয়াকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সে তা বুঝতে দেয় না।

মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে তাদের। এক বিশেষ ধরনের স্বর্গীয় সুখের মধ্যে বাস করছে তারা। যে বাড়িতে তারা থাকে সে বাড়িটা নির্জন, নিশ্চল আঙিনা, জমে থাকা বরফ, থাম আর মর্মর মূর্তিগুলোর শুভ্রতা তাকে জাদুমুগ্ধ করে। সে বাড়িতে অ্যালিসিয়া থাকে নিদ্রিত সুন্দরী হয়ে। স্বামী না আসা পর্যন্ত সে আর কিছু ভাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য! অ্যালিসিয়া দিন দিন শীর্ণ হয়ে যেতে থাকল। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাবে তার যে স্বাস্থ্যহানি হয়েছিল তা আর পুনরুদ্ধার হয়নি। অনেকদিন সে বিছানা থেকে উঠতে পারল না। শেষ পর্যন্ত এক বিকেলে সে বিছানা থেকে উঠল এবং স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে বাগান পর্যন্ত যেতে পারল। জর্ডান হঠাৎ পরম মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আর তাতেই নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ল অ্যালিসিয়া। তারপর উঠে দাঁড়ায় সে। স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ।

এটাই ছিল শেষদিন, যেদিন অ্যালিসিয়া একটু উঠে বসতে পেরেছিল। তার পরদিন ঘুম ভাঙার পর অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল তার। খুব শীঘ্রিই ডাক্তার নিয়ে এল জর্ডান। নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর ডাক্তার জানাল, রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।

যাওয়ার সময় ডাক্তার বলল, 'খুব বড় রকমের দুর্বলতায় ভুগছে সে, যা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। বমি-টমি কিছু নেই, তারপরও... আচ্ছা, কাল সকালে আবার ডাকবেন আমাকে।'

পরের দিন অ্যালিসিয়ার শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা

আলোচনায় বসলেন। সবার একই কথা—সাংঘাতিক রক্তশূন্যতায় ভুগছে সে। কিন্তু কেন? তা জানা সম্ভব হচ্ছে না।

অ্যালিসিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে মৃত্যু দুয়ার খুলে এগিয়ে যাচ্ছে সে। তার শয়নকক্ষে দিনের বেলায়ও আলো জ্বেলে রাখা হয়। সেখানে সবসময় বিরাজ করে অপার নৈঃশব্দ। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় শব্দহীনতায়। জর্ডান সবসময় ড্রইং রুমে থাকে। সারাক্ষণ উজ্জ্বল বাতির নীচে পায়চারি করে ক্লান্তিহীনভাবে। কার্পেটে তার পদক্ষেপগুলো গুনতে গুনতে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে বেডরুমে ঢোকে। স্ত্রীর বিছানার পাশ দিয়ে নীরবে হাঁটে।

আকস্মিক চিত্তবিভ্রম ঘটে অ্যালিসিয়ার। মনে হতে থাকে সে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে, আবার নেমে আসছে মাটিতে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে কার্পেটের দিকে। এক রাতে মুখে তার কালো চাকা-চাকা দাগ ওঠে। নাক ও ঠোঁটের উপর জমে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। প্রচণ্ড ভয়ে জর্ডানের নাম ধরে ডাকতে থাকে সে। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে জর্ডান। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অ্যালিসিয়া। আচ্ছন্নতা কেটে গেলে জ্ঞান ফিরে পায় সে। কম্পিত হাতে স্বামীর হাত ধরে নাড়তে থাকে।

আবার ডাক্তার ডাকা হয়, কিন্তু কোনও লাভ হয় না। তাদের চোখের সামনে একটি মেয়ে ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে, কিন্তু তারা এর কারণ জানে না। শেষবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ডাক্তাররা ভাল করে পরীক্ষা করল অ্যালিসিয়াকে। তার নাড়ি দেখল। তখন সে ছিল সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।

ডাক্তারদের প্রধান বললেন, 'এই রোগীর বিষয় ব্যাখ্যাতীত। কিছুই করার নেই আমাদের...' তাঁর কণ্ঠে প্রচণ্ড হতাশা।

জর্ডান চিৎকার করে উঠল, 'আমার শেষ আশাও নিভে গেল।' অন্ধের মত টলতে লাগল সে।

রক্তশূন্যতার কারণে ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল অ্যালিসিয়া। একদিন শুরু হলো প্রলাপ বকা। দিনের বেলা তার অবস্থা তেমন খারাপ না হলেও, ঘুম থেকে ওঠার পর তাকে মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে মনে হয়। রাতের বেলা তাকে দেখলে মনে হয়, তার প্রাণপাখি উড়ে গেছে। শুয়ে থাকার মুহূর্তগুলোতে যখন সে জেগে ওঠে, মনে হয় তার বুকের উপর লাখ লাখ পাউণ্ডের কোনও বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এইরকম রোগের তৃতীয় দিনে সে আবার বিছানা থেকে ওঠে। মাথাটা পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না। বিছানা স্পর্শ করতে দিচ্ছে না কাউকে। চাদরটা পর্যন্ত বদলাতে দিচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে অজানা কোনও ভয় তার দিকে দৈত্যের রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগল সে বিরতিহীনভাবে। মৃত্যুর মত স্তব্ধ ওই বাড়িটিতে অ্যালিসিয়ার বিরামহীন প্রলাপ আর জর্ডানের পদচারণা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

অবশেষে মারা গেল অ্যালিসিয়া। পরে বিছানা থেকে সবকিছু সরিয়ে নেয়ার সময় একজন গৃহপরিচারিকার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। জর্ডানকে ডেকে এনে সে বলল, 'স্যার, এই দেখুন।' জর্ডান দেখল গৃহপরিচারিকাটির হাতে একটা বালিশ,

যাতে অ্যালিসিয়া শুত। এবং দেখল তার মধ্যে রক্তের দাগ। বালিশের উপর ঝুঁকে পড়ল সে। বালিশের যেখানটাতে মাথা রাখত অ্যালিসিয়া সেখানে দুটি ছোট ছোট দাগ। 'এগুলোকে ফুটোর মত লাগছে,' বলল পরিচারিকা।

পরিচারিকা বালিশটাকে উপরে তুলে সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে, ভয়ে জড়সড়।

জর্ডান নিজেই তুলে আনল বালিশটা, এবং বুঝতে পারল পরিচারিকার ভয়ের কারণ। বালিশটা প্রচণ্ড ভারী। একটানে বালিশের কভারটা ছিঁড়ে ফেলল সে। প্রচণ্ড জোরে চিৎকার দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল পরিচারিকা। বালিশের ভিতর পালকের নীচে নড়াচড়া করছে একটি রোমশ পা। কুৎসিত-কদাকার কোনও প্রাণী ওটা। জীবন্ত, থকথকে আঠাল একটি গোলা। এমনভাবে ফুলে আছে যে, ওর মুখটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বিছানায় শুয়ে থাকার সময় রাতের পর রাত এই ঘৃণ্য প্রাণীটি অ্যালিসিয়ার মাথায় মুখ ডুবিয়ে ওর রক্ত শুষে নিয়েছে। বালিশের উপর ওই ক্ষুদ্র ফুটো দুটি কারও চোখে পড়েনি। প্রথমদিকে রক্তচোষার রক্তপানের গতি নিঃসন্দেহে শ্লথ ছিল। পরে যখন অ্যালিসিয়া আর নড়াচড়া করতে পারছিল না, তখন ওটার গতি ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত। পাঁচ দিন পাঁচ রাত এই কুৎসিত প্রাণীটি অ্যালিসিয়ার সমস্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেলে।

পালকযুক্ত প্রাণীদের এই পরজীবীরা নিতান্তই ক্ষুদ্র। তবে নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় এরা বিশাল আকার ধারণ করে। মনে করা হয়, মানুষের রক্ত এদের জন্য উপযুক্ত এবং পালকের বালিশে এদের দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং বালিশ হতে সাবধান!!

মূলঃ ওরাসিও কিরোগা
রূপান্তরঃ মোঃ ওমর ফারুক (মিঠুন)

প্রথম চাকরিতে

অনেক দিন আগের কথা, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে তখন রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি অবকাঠামো মেরামত বা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। সামান্য চেষ্টাতেই ঢাকায় বড় এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি গোছের চাকরি একটা জুটিয়ে ফেললাম। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে রাজধানীতে আসতে তখন একটাই প্রধান সড়ক। তাতে পদ্মার মত বড় নদী ছাড়াও ছোট বা মাঝারি একাধিক নদীতে ব্রিজ না থাকায় ফেরির মাধ্যমে পারাপার হতে হত। আমাদের কোম্পানি সে সময় ও পথেরই একটা মাঝারি নদীতে ব্রিজ নির্মাণের ফরমায়েশ লাভ করল। আর চাকরিতে ঢোকার দু'মাসের মাথায় আমাকেই সে নির্মাণ কাজের প্রাথমিক তদারকি করতে সেখানে পাঠানো হলো। প্রায় শ'পাঁচেক মিটার লম্বা ব্রিজের নির্মাণ মোটেই সহজ কিছু নয়। প্রচুর মাল-পত্র, লোক লস্কর নিয়ে বেশ এলাহী ব্যাপার আর সময়সাপেক্ষও বটে।

অফিস থেকে যথেষ্ট দিক নির্দেশনার সাথে সম্বল আমার কম বয়সের উৎসাহ আর মনোবল। কিছু কাপড়-চোপড়, টুকটাক দরকারী সামগ্রীর সাথে কম পয়সায় কেনা গোটা কয়েক গল্প, উপন্যাসের পুরাতন বই নিয়ে এক সকালে রওনা হলাম সাইট-এর উদ্দেশে। বিকেল নাগাদ সাইট এলাকায় পৌঁছে বেশ একটা ধাক্কাই খেলাম। কারণ এলাকাটা একেবারেই গ্রামাঞ্চল আর নিকটের থানা শহরটাও কমপক্ষে দশ কিলো দূরত্বে। তবে ঘাটকে কেন্দ্র করে নদীর এপাশে বাজারমত গড়ে উঠেছে। তাতে বেশ কিছু দোকানপাট, খাবার হোটেল, সেলুন, ওষুধের দোকান ইত্যাদি রয়েছে। ওখানে লোকের সমাগম আর বিদ্যুৎ সংযোগও রয়েছে। দোকানদাররা সবাই স্থানীয় আর আশপাশের গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় মোটামুটি সবকিছুই ওখানে পাওয়া যায় বলে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত লোকজনের ভালই আনাগোনা থাকে। এরপর থেকে কোলাহলটা কমতে কমতে বারোটা নাগাদ একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে এলাকাটা। কারণ তখনই ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় সেদিনের মত। প্রথমদিন এসেই নিজের পরিচয় দিয়ে দু'চারজনের সঙ্গে আলাপচারিতায় এসব জেনে নিলাম। তাদেরই একজনের সৌজন্যে সে রাতটা ঘাটের কোনও এক দোকানঘরে অন্তত ঘুমিয়েই কাটাতে পারলাম। ওখানে রাত কাটাবার জন্য কোনও আবাসিক হোটেল ছিল না।

পরদিন কাজের আদেশদাতা জেলা শহরের সরকারি অফিস থেকে লোক এসে আমাকে ব্রিজ নির্মাণের নির্ধারিত জায়গা দেখিয়ে দেয়ার সাথে সংযোগ সড়ক এবং আরও দরকারী বিষয়াদি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘাট থেকে প্রায় পাঁচ শ' গজ উত্তরে ব্রিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ততদিনে জেনেছি যে কোনও ব্রিজ নির্মাণের আগে তার জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন যথেষ্ট কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর করা হয়। ব্রিজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ঠিক পাশের জায়গাটা ছাড়া ছাড়া মাঝারি উচ্চতার কিছু সংখ্যক বাবলা গাছে ঘেরা খানিকটা উঁচু; ভিটি ধরনের চাষবিহীন পরিত্যক্ত দেখতে। এ ছাড়া নদীর উভয় পাশের সব জমিনেই চাষের চিহ্ন। বিস্তীর্ণ মাঠের পরে বেশ দূরে দূরে গাছপালায় ঘেরা গ্রাম। সে হিসেবে আমার কর্মযজ্ঞের স্থানটা যথেষ্ট নির্জন আর সেখানে লোকজনের চলাচলও নেই বললেই চলে। জরুরি কিছুর দরকার পড়লেও ফেরি ঘাটই একমাত্র ভরসা।

কোম্পানির নির্দেশে দু'তিনদিনের মধ্যে স্থানীয় কামলা লাগিয়ে ওই পরিত্যক্ত ভিটিতে সাইট অফিস কাম আমার থাকার বাসস্থান হিসেবে মোটামুটি সাইজের একটা ছাপরা ঘর তুলে ফেললাম। উপরে টিন আর চারদিকে বাঁশের বেড়া। পাতলা কমদামি কাঠের দরজা, জানালা, একটা চৌকি, টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ারও কেনা হলো। জানাই ছিল কাজশেষে এগুলো সব ফেলে যেতে হবে। হ্যারিকেন, টর্চ, বাসনপত্র, রান্নার চুলা সহ দরকারী জিনিসপত্র সব সাইট খরচ হিসেবে কোম্পানির পয়সায় কেনাকাটা করার স্বাধীনতা আমাকে আগেই দেয়া হয়েছে। কাজেই যখন যেটা দরকার পড়ছে ঘাটে ছুটে যাই কিনতে, না পেলে নিকটের থানা সদরেও যাই বাসে চেপে। দিন চারেক পরে কোম্পানির অফিস থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার সহ দু'জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে গেলেন। তাঁদের নির্দেশে ওই ভিটিতেই বিশাল করে আরও দুটো ছাপরা ঘর তৈরি করা হলো। একটাতে রড, সিমেন্টসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী থাকবে, অন্যটা কোম্পানির দক্ষ মিস্ত্রি এবং অস্থানীয় শ্রমিকদের জন্য। তারা এলেই রান্নার কাজের জন্য এবং রাতের পাহারার জন্য নিরাপত্তাকর্মী স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করার দায়িত্ব পড়ল। বিপুল সংখ্যক শ্রমিকও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। ঘাট এলাকায় ইতিমধ্যে স্থানীয় যাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছে তাদের মাধ্যমে রোজ বেতনে শ্রমিক পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। কিন্তু পাহারার ব্যাপারে কেউ আশ্বস্ত করতে পারল না, ওখানে রাত জেগে পাহারা দিতে নাকি কেউ আগ্রহী নয়। বেতন বাড়িয়ে দিলেও নয়। কেন জানতে চাইলে প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই ধরনের কথা বলে, ওখানে গিয়ে নাকি কারও সাহসেই কুলোবে না কিছু চুরিচামারি করার। কাজেই পয়সা খরচ করে লোকের কী দরকার। যদিও ঘাট এলাকায় বা আশপাশে টুকটাক চুরির ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে থাকে। কোম্পানির নির্দেশনা মত সবকিছুই প্রস্তুত করতে পেরেছি কেবল এই রাতের জন্য নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া। ব্যাপারটা নিয়ে পরদিন জাফর চাচার সাথে কথা বলতে হবে।

এখানে আসার পরে স্থানীয় এক যুবক আমাকে জাফর চাচার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব জাফর চাচার দেশের বাড়ি আমার নিজ জেলা এবং একই থানায়। এখানে নদীতে যে দুটি ফেরি চলাচল করে উনি তার একটির মাস্টার চালক। সরকারি ফেরির চালক হিসেবে এখানে এসেছেন স্বাধীনতারও বছর দেড়েক আগে। তখন অবশ্য একটাই ফেরি ছিল। দীর্ঘ দিন একই স্থানে থাকার কারণে স্থানীয় সবাইকেই তিনি চেনেন। স্থানীয়রাও তাঁকে যথেষ্ট খাতির সমীহ করে থাকে। পরিচয়ের পর থেকেই সম্ভবত একই এলাকার ছেলে বলে আমাকে যথেষ্ট আদর-স্নেহ করেন। চাকরির সুবাদে এই এতদূর নির্জন বিভূঁইতে এসে তাঁর মত বয়োজ্যেষ্ঠ এক আপনজন পেয়ে আমারও ভীষণ ভাল লাগল। কাজেই তাঁর সঙ্গে দিনরাতের একটা বড় সময় কাটানোটা আমার প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হলো।

সেদিন রাত দশটা নাগাদ ঘাটের হোটেল থেকে রাতের খাবার খেয়ে আমার সাইট অফিসের ছাপরা ঘরে ফিরছি। নির্জন অন্ধকারে নদীপাড়ের বালি মাটির উপর দিয়ে অন্যরাতের মতই নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে চলেছি। কোনও অপার্থিব ভয়ভীতি আমার কখনওই ছিল না। সেজন্য একলা অমন নির্জন প্রান্তরে রাত কাটাতেও কোনও দ্বিধাই আসেনি মনে। দিনভর আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন আর বিরক্তিকর গরম ছিল। পথের মাঝামাঝি আসতেই আকস্মিক জোর বাতাস শুরু হলো। সাথে দু'চার ফোঁটা করে বৃষ্টি। রাতটা বেশ আরামে কাটবে ভেবে দ্রুত হাঁটা শুরু করতেই দূর দিগন্তে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকাল। মুহূর্তে অতি সংক্ষিপ্ত সে আলোয় আমার চলতি পথের সামান্য সামনের বাঁদিকে ক্রমশ ঢালু হতে থাকা নদীর পাড়ে পুরুষ কি মহিলা অস্পষ্ট কোনও মানুষের দ্রুত অপসৃয়মাণ অবয়ব যেন দেখতে পেলাম। সাথে সাথে হাতের তিন ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ধরলাম। আশ্চর্য, কোনও মানুষ বা কোনওকিছুর উপস্থিতিই নজরে এল না। এদিক-সেদিক, সামনে-পিছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নদী পর্যন্ত আলো ফেলেও কোনও লাভ হলো না। বিদ্যুৎও চমকাতে শুরু করেছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু কাছে-দূরে কিছুই দেখতে পেলাম না। বৃষ্টির ধারা বাড়তে থাকলে আর বিলম্ব না করে দ্রুত পায়ে ছাপরা ঘরে চলে এলাম।

আমার একটা পছন্দের কাজ হলো শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবধি বই পড়া। সেরাতেও মাথার কাছে হ্যারিকেন জ্বেলে কী একটা উপন্যাস পড়ছিলাম। রাত ক'টা সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। বাইরে তখনও বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাস। ঘরের ভিতরটা ঠাণ্ডা হওয়াতে আগেই দরজা-জানালা সব বন্ধ করেছি। হঠাৎ মনে হলো বাইরে ভিটিতে বুঝি বৃষ্টির জল জমেছে আর তার উপর পা ফেলে ফেলে কেউ যেন বিক্ষিপ্তভাবে হেঁটে চলেছে, থপ্ থপ্। ইন্দ্রিয় পুরো সজাগ করেই স্পষ্ট কারও ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। কখনও ধীর, কখনও দ্রুত। এক বা একাধিকও হতে পারে। হাত থেকে বই নামিয়ে বিছানায় উঠে বসে জানতে চাইলাম, 'কে বাইরে এতরাতে?'

কোনও উত্তর এল না, চলাচলের শব্দও থেমে গেছে। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে

একদিকের জানালার একটা পাল্লা খুলে টর্চের আলো ফেললাম। কেবল বৃষ্টির পতন ছাড়া কিছুই নজরে এল না। কিন্তু ভুল তো শুনিনি। তবে কি বৃষ্টি বাদলের রাত দেখে কেউ চুরির মতলবেই এসেছে, যতই এলাকার লোক বলুক না কেন এখানে এসে চুরির সাহস কেউ করবে না। সাইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে কোম্পানির ভালই অর্থ কড়ি আমার সাথে রয়েছে সেটা মতলববাজদের না বোঝার কথা নয়। আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে কোনও কিছুর কিনারা করতে না পেরে ফের বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ঠিক করলাম পুরো রাতটাই না ঘুমিয়ে উপন্যাস নিয়ে জেগে কাটাব।

উপন্যাসে চোখ থাকলেও কান আমার ঠিকই বাইরে নিবদ্ধ ছিল। পাতা তিনেক পড়েওছি। ঠিক তখন, হ্যাঁ, ঠিক তখনই আমাকে চমকে দিয়ে পায়ের দিককার বাঁশের বেড়ার ওপাশ থেকে কেউ একজন নরম কিন্তু স্পষ্ট গলায় আমায় ডেকে উঠল, 'আবিদুর রহিম...'

হুট করে কোনও পরিস্থিতিতে হতবিহ্বল হয়ে পড়ার মত মানুষ আমি নই। নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম নিশ্চয়ই শুনতে ভুল করেছি। এই বৃষ্টি বিক্ষুব্ধ নিশুতি রাতে নিজস্ব চেনাজানার গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূরে এই নির্জন বিভূঁইয়ে কে আমাকে ডাকতে আসবে। এখানে স্বল্প পরিচিতের মধ্যে কেউ তো নয়ই বরং সমস্ত চেনাজানার মধ্যে থেকে কেবল একজনই কখনও আমাকে এমন পুরো নাম ধরে ডাকতেন। কিন্তু এখানে তাঁর হাজির হওয়ার দূরতম কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনি আমার ছোটবেলার গৃহশিক্ষক আর সর্বশেষ তাঁকে দেখে এসেছি মৃত্যুর অপেক্ষায় বিছানায় লেপটে থাকা অস্থিসার সর্বস্ব।

কিন্তু এবার? এবার আর নিজের কানকে অবিশ্বাস করার কোনও অজুহাত নেই। স্নায়ু পুরোপুরিই সজাগ ছিল। আর এবার ডাকটা এল মাথার দিককার বেড়ার ওপাশ থেকে, একই ভঙ্গি, একই স্বর, 'আবিদুর রহিম।'

হ্যারিকেন জ্বলছিলই তবু ঘরের মধ্যেই টর্চটাও জ্বেলে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ওখানে? বাইরে কে ডাকছেন আমাকে?'

আমার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরের জন্য কিনা কে জানে, আগন্তুক অত্যন্ত ধীরে, যেন প্রতিটা শব্দ খুঁজে পেতে বিলম্ব হচ্ছে সেভাবে উচ্চারণ করল, 'আহা, ব্যস্ত হয়ো না, বাছা, আর আলোটাও জ্বেলো না।'

'কিন্তু কে আপনি এতরাতে এখানে...' টর্চ নিভিয়ে জানতে চাইলাম।

আগন্তুক নিরুত্তর, আমি মাথার দিককার জানালাটা খুলব কি খুলব না ভাবছি অমনি মনে হলো সে যেন ঠিক আমার কাঁধের উপরেই বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। চমকে উঠলাম আর সত্যি বলতে কী, আমার সাহসের মিটারটা তখন একটু একটু করে নামতে শুরু করেছে। সে পুনরায় বলে উঠল, 'ফিরে যাও, বাছা, ফিরে যাও...'

'কী বলছেন আপনি, কোথায় ফিরে যাব, আর আপনিই বা কে?'

সে তার কথাই বলে চলেছে, 'বলছি ফিরে যাও, জায়গাটা সঠিক হয়নি...হবে না, হবে না...এতগুলো মানুষ...' শেষের কথা ক'টি স্বগতোক্তির মত আর

বলতেও যেন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

আমার মনে হলো লোকটা স্থানীয় কেউ হবে, আর ব্রিজ এবং রাস্তার কাজে তার হয়তো অনেকটা জমি হারাতে হচ্ছে যার জন্য মনের ক্ষোভ বা কষ্ট থেকে এইরাতে একাকী এসেছে আমাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা যে কোনও ভাবে কাজটা যাতে না হয় সে উদ্দেশ্য জানাতে। কিন্তু বোকা লোকটা বুঝবে কী করে যে আমার কোনও ক্ষমতাই নেই সরকারি কাজ রহিত করার। বললাম, 'আপনার বুঝি অনেকটা জায়গা হারাতে হচ্ছে ব্রিজ আর রাস্তার কাজে?'

'না, তা নয়...তা নয়।'

'তা হলে আপনার সমস্যা কীসে এখানে রাস্তা বা ব্রিজ হলে?' সন্দেহ হলো, লোকটার হয়তো ঘাটে কোনও চালু ব্যবসা রয়েছে আর ব্রিজ হলে ব্যবসা হারিয়ে তাকে পথে বসতে হবে। এতগুলো মানুষের কথা যে বলল হতে পারে ঘাটের অন্য সবাইকেই বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু এসব ভেবে কবে কোথায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ বন্ধ হয়েছে। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'আপনার পরিচয়টা বলবেন, আর বাইরের অন্ধকার বৃষ্টি থেকে ভিতরে আসবেন?'

'না না, তা পারিনে, তা হয় না...'

'কেন হবে না, আপনি আসুন, আমি দরজা খুলি।'

আগন্তুক এ কথায় ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'না, না, সে সম্ভব নয়, কিছুতেই না।'

'আশ্চর্য, বাইরে ভিজছেন অথচ ভিতরে আসবেন না। কেন লুকিয়ে রাখতে চাইছেন নিজেকে?' ওভাবে ভিজলে যে আপনার অসুখ করবে, আর নিজেকে গোপন রাখতে চাইলে না হয় আমিও কিছু বলব না কাউকে, তবু আপনি ভিতরে আসুন।'

আগন্তুক এবার কেমন যেন গা ছম ছম করা শুকনো গলায় বলে উঠল, 'কেন ডাকছ বারবার! আমায় দেখাটা তোমার ভাল কিছু হবে না।'

এমন জবাবে খানিক বিরক্তি খানিক অস্বস্তি নিয়েই বললাম, 'আপনার ভালর জন্যই বলছিলাম, তা ছাড়া আপনিই বা কেমন, এতরাতে অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন, আবার নিজেকে গোপন রাখতে চাইছেন।'

'সে তোমার জন্যই...এতটা কৌতূহল না দেখালেই ভাল করবে।'

আমারও কেমন জেদ হলো, বললাম, 'তবু আমি দেখতে চাই কে আপনি, কেন এসেছেন আমার কাছে।'

'বেশ। এতই যদি কৌতূহল, তবে...' কথার মধ্যেই আমার বিছানা থেকে অন্তত পনেরো ফুট দূরে দরজার পাশের বাঁশের বেড়ায় খুট করে শব্দ হলো। চকিতে সেদিকে তাকাতেই হ্যারিকেনের হলদেটে আলোয় দেখতে পেলাম বেড়ার খানিকটা ছিদ্র হয়ে তার মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাত প্রবেশ করে দরজায় খিল খুলতে কবাটের দিকে সরু আঙুলগুলো লকলকিয়ে প্রসারিত হচ্ছে। সে কোনও জীবিত মানুষের হাত নয়, মৃতের হাতের শুকনো কঙ্কাল। কোনও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সে বিকট দৃশ্য দেখে সুস্থ থাকার কথা নয়। আমারও শিরদাঁড়া

বেয়ে প্রচণ্ড এক হিমশীতল ধারা মুহূর্তের মধ্যে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে নেমে গেল। তবু কী করে যে হাতের টর্চ জ্বেলে আলো ফেললাম ওখানে। আলো জ্বলতেই হাতখানা দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল ছিদ্র পথে. আর সাথে সাথেই আমার মাথার দিকের বেড়ার ওপাশ থেকে তাচ্ছিল্যের শুকনো হাসির সাথে খনখনে গলার আওয়াজ ভেসে এল... 'জানতাম, আমি কি বলিনি...তবু, তবু এত কৌতূহল...হা হা...'

আতঙ্কে সারা শরীর আমার ঘামে ভিজে সপসপে, ওর মধ্যেই টর্চ ঘুরিয়ে আলো ফেললাম এদিকের বেড়ায়...উফ্ সে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য; টিনের চাল আর বেড়ার মাঝের ফাঁক দিয়ে সেই একই প্রকাণ্ড হাত! না, হাত নয়, হাতের কঙ্কাল লকলকিয়ে এগিয়ে আসছে...ঠিক তখনই, হ্যাঁ, তখনই, কারণ আর কিছুই মনে নেই আমার...'

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি টর্চ হাতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পড়ে আছি বিছানায়। বাইরে তখন বৃষ্টি শেষের পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। তখনও জ্বলছে হ্যারিকেন। তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দরজা-জানালা সব খুলে দিলাম। কেরোসিনের ধোঁয়া আর গন্ধ দ্রুতই কেটে গেল নির্মল বাতাসে। কিন্তু মনের আতঙ্ক তাতে কমল না, যখন দেখলাম দরজার পাশের বেড়ায় ছিদ্র একটা রয়েছে ঠিকই কিন্তু তা দিয়ে এমনকী কোনও বাচ্চা ছেলের হাতও ঢুকতে পারার কথা নয়। এর চাইতেও বড় কথা বাইরে বৃষ্টিস্নাত নরম মাটিতে কোথাও কারও কোনও পায়ের চিহ্নমাত্র নেই।

তা হলে রাতের ঘটনাবলী কী হতে পারে–নিছক কল্পনা নাকি অপার্থিব কিছু? নাকি স্থানীয় দুষ্ট মানুষের কারসাজি? কিছুই নিশ্চিত হতে না পেরে ছুটে গেলাম জাফর চাচার কাছে। তাঁকে পেলাম না। ফেরি সংক্রান্ত কাজে জেলা সদরে গেছেন, প্রতি মাসেই দু'একবার যেতে হয় তাঁকে এখানকার সিনিয়র স্টাফ হিসেবে। সৌভাগ্যবশত সেদিনই দুপুর নাগাদ একদল বিভিন্ন কাজের মিস্ত্রি সহ বিপুল পরিমাণ রড সিমেন্ট ইত্যাদির এক বিশাল বহর এসে পৌঁছাল কোম্পানি থেকে। ঘাট থেকে বিশাল বিশাল বাঁশ পুঁতে বিদ্যুতের লাইন টানা হলো। সন্ধ্যা নামতেই সাইট এবং আশপাশ আলোতে ভরে গেল। কোম্পানির কাউকে রাতের কথা কিছু বললাম না।

পরদিন নানান কাজের ব্যস্ততার মধ্যে সুযোগ করে জাফর চাচার কাছে গেলাম। তাঁকে সবিস্তারে সেরাতের কাহিনি সব খুলে বললাম। শুনে তিনি যা বললেন তাতে মনে হলো ওর মধ্যেই ঘটনার কোনও কার্যকারণ রয়েছে যার ব্যাখ্যা হয়, আবার না-ও হতে পারে। জাফর চাচা বললেন, একাত্তরে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় একদল পাকবাহিনী ঘাটের পাশে কিছুদিনের জন্য আস্তানা গেড়েছিল। দিনভর আশপাশের এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে যাদের ধরে আনা হত তাদের বেশিরভাগকেই গভীর রাতে ভিটির ওখানটায় নদীর ধারে নিয়ে ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলা হত। নদীর বুকে ফেরির ক্রুকেবিন থেকে ওই বীভৎস দৃশ্য নিরুপায় জাফর চাচাকে নিয়মিতই দেখতে হয়েছে। হায়েনাদের নির্যাতনে যন্ত্রণাকাতর নারীপুরুষের গগনভেদী আর্তনাদ আজও নাকি তিনি প্রায়শই গভীর রাতে শুনতে পান। এসব শুনে আমি ফের আতঙ্কিত হলাম

সেরাতের কথা মনে করে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পরের দিন কোম্পানির সাইট ইঞ্জিনিয়ার এলে পারিবারিক কারণ দেখিয়ে তার কাছে ইস্তফাপত্র দিয়ে জীবনের প্রথম চাকরি ছেড়ে এলাম। অনেকদিন পরে জেনেছি কোম্পানি সে কাজে লাভ করতে পারেনি। পরপর দু'বার সেখানে সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও ব্রিজের প্রথম পিলারটি অজানা কারণে যথাযথ দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। যথেষ্ট প্রস্তুতি এবং সতর্কতার সাথে ঢালাইয়ের কাজ শেষ হলেই পরদিন দেখা গেছে সেটা একদিকে অস্বাভাবিকভাবে হেলে পড়েছে। পরবর্তীতে স্থান পরিবর্তন করে আরও উত্তরে সরে তবেই ব্রিজ দাঁড় করানো সম্ভব হয়।

অমিত

রুম নং ২১৩

১৩ জুন, ২০১১, সকাল ১১টা।

'বার বার বলছি, এই নাম্বারের কোনও রুম আমাদের নেই। আর দিমিত্রি শোভন নামে কোনও ভদ্রলোকও আমাদের এখানে কাজ করে না। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।' অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল মারুফের কণ্ঠে।

রুমানার কণ্ঠে আকুতি, 'কিন্তু আমি ফোনে ইন্টারভিউ দিয়েছি। এই যে দেখুন জয়েনিং লেটার। ওটা তো আপনাদেরই অফিসের ঠিকানা, তা-ই না?' কাগজের উপরে মতিঝিলের স্বনামধন্য অফিসের ঠিকানাটি মনোগ্রাম সহকারে লেখা। এটা যে তাদেরই অফিশিয়াল কাজে ব্যবহৃত কাগজ, তা নিয়ে মারুফেরও কোনও সন্দেহ নেই। মারুফের কপালে ভাঁজ পড়ে। সে এই অফিসে জয়েন করেছে পাঁচ মাস হলো। প্রতি মাসে কেউ না কেউ তাদের অফিসে জয়েনিং লেটার নিয়ে আসছে। তাদেরকে ২১৩ নং রুমে দিমিত্রি শোভন সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। তাদের অফিসের কোনও ব্যক্তিই যে কাগজ চুরি করে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে; সেটা পাগলেও বুঝবে। কিন্তু মারুফের মাথায় আসে না যে এই প্র্যাক্টিকাল জোক করে মানুষকে কষ্ট দেয়ার মানে কী?

রুমানার চোখে জল আসি আসি করছে। মায়া কাড়া চেহারার তরুণীর দিকে তাকিয়ে মারুফের মন একটু নরম হলো।

'দেখুন, মনে হয় আপনার সাথে কেউ মজা করেছে। এটা আমাদের অফিসেরই কাগজ, মানছি। কিন্তু আমাদের এখন কোনও টাইপিস্টের পোস্ট খালি নেই। এবং আমরা পেপারে সার্কুলারও দিইনি। আপনি কোথা থেকে খবর পেলেন?'

'আমাকে ফোন করা হয়েছিল। আমি ডাক বাক্সের নাম্বারে চিঠি পাঠাই। এরপর এক সপ্তাহ আগে ফোনেই আমার ইন্টারভিউ নেয়া হয়। জয়েনিং লেটার ডাকে পেয়ে তারপরে এসেছি।' থেমে থেমে বলে রুমানা।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমাদের অফিসে ফোনে ইন্টারভিউ নেবার কোনও নিয়ম নেই। আর আমরা লোক লাগলে পেপারে প্রকাশ করি। কারও বাসায় ফোন করে নয়। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের অফিস ৬ তলা। এখানে আমরা প্রতি ফ্লোর এ, বি, সি, এভাবে মার্ক করি। সুতরাং ২১৩ নং

রুম থাকার প্রশ্নই ওঠে না।' কথা শেষ করেই মারুফ তার ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রুমানার চোখে জল টলমল করছে। এরকম নিষ্ঠুর মজা তার সাথে কে করতে পারে? অবসন্নভাবে সে সামনে এগুল। জানেও না কোন্‌দিকে চলেছে। এখন সে কীভাবে বাসায় যাবে? চাকরি হয়েছে শুনে কী খুশিটাই না হয়েছিল মা আর ছোট বোনটা। বাবা মারা যাবার পর থেকে তার মা সেলাইয়ের কাজ করে বহু কষ্টে দুই বোনকে বড় করেছে। বাংলায় অনার্স করে সে প্রায় এক বছর ধরে চাকরির চেষ্টা করছে; হয়নি। অযাচিতভাবে এই খবর আসায় তার মা আনন্দে গতকাল মিষ্টি কিনে এনেছিল। এখন সে কোন্ মুখে বাসায় যাবে? চারপাশে সবাই ব্যস্তভাবে ফাইল আর কাগজের স্তূপে মাথা ডুবিয়ে বসে আছে। তার কষ্টে কারও কিচ্ছু যায় আসে না। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ। করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা ফিল্টার দেখা যাচ্ছে। রুমানা অবসন্নভাবে ওটার দিকে এগিয়ে গেল। পানির গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াল। শীতল পানি তির তির করে গলা বেয়ে নেমে পুরো শরীরে শীতলতার আবেশ ছড়িয়ে দিল। ডানে তাকিয়েই রুমানা অবাক হয়ে গেল। পিতলের ঝকঝকে প্লেটে কালো রঙ দিয়ে লেখা, রুম নং ২১৩। পানি নেয়ার সময়ও তো আশপাশে কোনও দরজা ছিল না। নাকি সে খেয়াল করেনি? আনন্দে তার বুক কাঁপতে থাকল। ওই লোকটি মিথ্যুক ছাড়া কিছু না। কেন মিথ্যে বলবে? নির্ঘাত তার পরিচিত কেউ এই চাকরির জন্য আবেদন করেছে। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না; এমনকী দরজার সামনে কোনও পিয়নও নেই। রুমানা একটু অস্বস্তিবোধ করছে। বড় স্যারের রুমে কি খবর না পাঠিয়ে ঢোকা ঠিক হবে? দ্বিধাদ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত রুমানা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সাবেকী আমলের ভারী কাঠের নকশা করা দরজা। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে কালো রঙ দিয়ে আঁকা খুবই হিজিবিজি ধরনের নকশা। রুমানার প্রাচীন ভাষা নিয়ে বড় আগ্রহ। দরজায় হাত বুলিয়ে ওর মনে হতে লাগল এটা হায়ারোগ্লিফিক লেখা। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নক করল সে। একবার, দুইবার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার।

ভেতর থেকে ভারী কণ্ঠ ভেসে আসে, 'কে?'

'মে আই কাম ইন, স্যার?' বহুবার প্র্যাকটিস করা লাইনটি চমৎকার আত্মবিশ্বাসের স্বরে বলে রুমানা।

ভিতর থেকে নিচু স্বরের হাসি শোনা যায়। 'ইয়েস, ইয়েস।'

হাসিটার মাঝে কী আছে রুমানা জানে না, তবে তার গা শিউরে উঠল। হাতল ঘুরিয়ে দরজা সামান্য ফাঁক করল। ভিতরে আবছা অন্ধকার। রুমানা থমকে গেল। আলো ছাড়া কি রুমে ঢোকা ঠিক হবে?

আবার ভারী স্বরে কেউ বলে, 'হু আর ইউ অ্যাণ্ড হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

রুমানা দরজা ধরে রেখেই বলল, 'স্যার, আমি ফেরদৌসি রুমানা। টাইপিস্ট পদের জন্য আপনি ফোনে ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। জয়েনিং লেটার নিয়ে এসেছি।'

'হুমম, কাম ইন।'

রুমানা কী করবে বুঝতে পারছে না। ভারী কণ্ঠ যেন তার অস্বস্তি বুঝতে পারল।

'আমার মাইগ্রেনের সমস্যা আছে। অ্যাটাকের সময় আলো সহ্য করতে পারি না। কিছুক্ষণ ধরে আমার মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে।'

এই চাকরি তার চাই-ই চাই। মায়ের চোখে ছানি পড়া শুরু হয়েছে, অপারেশনের টাকাও তাদের নেই। মায়ের কথা মনে হতেই রুমানার সব দ্বিধা দূর হয়ে গেল। সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভারী দরজা একা একাই বন্ধ হয়ে গেল।

পুরোপুরি অন্ধকার নয় রুম। একপাশে ভীষণ ম্রিয়মাণ একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আবছা আলোতে রুমানা বুঝল ঘর কেন এত অন্ধকার। বিশ্রী রকমের কালো রঙ করা ঘর। অথবা সেটি অন্য কোনও গাঢ় রঙ, এই আলোতে কালো মনে হচ্ছে। টেবিলে স্তূপীকৃত বই; তার উপর রাশি রাশি ধুলা। দেয়ালের দিকে মুখ করা চেয়ারে গা এলিয়ে এক লোক বসে আছে। আবছা আলোতেও ল্যাম্পের উপরে মাকড়সার জাল স্পষ্ট। এরকম নোংরা পুরানো ঘরে কেউ কাজ করতে পারে? রুমানা নাক কুঁচকায়। ইঁদুর মরেছে নাকি? এরকম বিশ্রী পচা গন্ধ কেন রুমে? হ্যাঁ, ইঁদুরই। কিঁচ-কিঁচ শব্দ হচ্ছে কোথা থেকে যেন। নাকে ওড়না চাপা দিল সে। ডান পাশে তাকিয়ে রুমানা ভীষণ চমকে উঠল। তিনটা চোখ তাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে। অনেক কষ্টে চিৎকারটাকে চেপে রাখল। একটা মুখোশ। তবে পৃথিবীতে যে এরকম ভীতিকর ভয়ঙ্কর মুখোশের কোনও নির্মাতা থাকতে পারে, সেটাই তার ধারণাতে ছিল না। একটা পশুর মুখোশ; বাঁকানো শিং, সিংহের কেশরের মত কেশর। আবার মানুষের মত থুতনিতে দাড়ি। কপালের তৃতীয় চোখ কী দিয়ে বানানো কে জানে, মনে হয় ধক-ধক করে জ্বলছে। রুমানার মনে হতে থাকল মুখোশটা জ্যান্ত।

'স্যর?' ভীত কণ্ঠে ডাকল রুমানা।

কোনও উত্তর নেই।

'স্যর, আমি জয়েনিং লেটার কোথায় জমা দেব? আর আমার কাজ কী হবে, স্যর?'

অদ্ভুত রকমের নীরবতা।

রুমানা দুই পা এগোল। গন্ধটা আর সহ্য হতে চাইছে না। কিঁচ-কিঁচ শব্দ বেড়েই চলেছে। বেরিয়ে যাবে নাকি? ছোট বোনটার কথা কানে ভেসে এল, 'বুবু, আমাকে কিন্তু এই ঈদে একটা জামা কিনে দিস। মাত্র দুইটা জামাই রোজ কলেজে পরে যাই। সবাই কেমন করে তাকায়।'

'স্যর? শুনছেন?'

নিস্তব্ধতা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এগিয়ে গিয়ে চেয়ার ঘোরাল রুমানা।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। এরপর ভয়ঙ্কর চিৎকার করে পিছিয়ে গেল। কীসে পা পড়েছে, বলতে পারবে না, একরাশ বই আর আবর্জনার উপরে আছড়ে পড়ল সে। চিৎকার করতেই থাকল। সামনের চেয়ারে এক মেয়ের মৃতদেহ বসে। চোখ

দুটো খোলা। রুমানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে যেন চেয়ে। মাংস পচে-গলে জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে। মাথার লম্বা চুল আর কাপড় ছাড়া বুঝবার উপায় নেই যে সে নারী না পুরুষ।

পাশের ফাইল রাখার র‍্যাকটা ধরে উঠতে চাইল রুমানা, কী যেন লাগল হাতে। শক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে। চেয়ে দেখে সে র‍্যাক ভেবে ধরেছে একটা কঙ্কালের বাহু। দাঁত সব বের করে কঙ্কাল হাত পা ছড়িয়ে পড়েছে। রুমানা পিছনে চাইল। একটা না, অনেক কঙ্কাল। সবাই স্থির চেয়ে আছে ওর দিকে।

রুমানার মাথা কাজ করছে না। চিৎকার করতে করতে কোনওরকমে কঙ্কালগুলো লাথি মেরে সরিয়ে দরজার দিকে ছুটল।

কিন্তু দরজা কোথায়? চারদিকে শুধু কালো রঙের দেয়াল! দেয়াল হাতড়াতে গিয়ে চিৎকার শুরু করল রুমানা। এই তো, একটু আগে এখানে দরজা ছিল। এখন কোথায় গেল? বন্ধ ঘরে মাংস পচা বিশ্রী গন্ধে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে রুমানার। হঠাৎ কিঁচ-কিঁচ শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। সামনের ভারী কাঠের ডিজাইন করা আয়নার দিকে চেয়ে রুমানা দেখল পিছের দেয়ালের মুখোশের মুখে ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠছে। জিভ লকলক করছে, তৃতীয় নয়ন ভীষণ ক্ষুধা আর লালসার উল্লাসে উল্লসিত।

রুমানা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

১৩ জুলাই, ২০১১, সকাল ১১টা।

ডেস্কের সামনে অধীর আগ্রহে মি. মারুফের জন্য অপেক্ষা করছে আভা। বহু কাঙ্ক্ষিত চাকরিটি অবশেষে পেয়েছে। ২১৩ নং রুমটি এখন খুঁজে পেলেই হয়।

সামারা সারণী তিন্নি

জমিদার বাড়ি

ওরে নীল দরিয়া...। রিং টোনটা আমার মোবাইলের। রিসিভ করে 'হ্যালো' বললাম আমি। ওপাশ থেকে আমার দিলের দোস্ত রাজেনের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। ও জানাল আমাদের ক্লাবের সকল সদস্যের ঐকমত্যে আমাদের এবারের গ্রীষ্মকালীন ট্যুর হতে যাচ্ছে খুলনায়। আগামী শুক্রবার আমাদের শুভ যাত্রা। আর দু'একটা ফালতু আলাপ শেষে ফোন রাখল রাজেন। কী ভেবে আমার মনটা একটু খুশি হয়ে উঠল। খুলনায় আমার বড় মামারা থাকেন। আমার মামাতো বোনটা...

মোটামুটি প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি গুছিয়ে নিলাম। শুক্রবার সকালেই ক্লাবের সবাই গাবতলি থেকে খুলনার বাসে চেপে বসলাম। সবাই বলতে আমাদের এলাকার যুব-ক্লাবের সাতজন সদস্য। খুলনায় যখন বাস থেকে নামলাম তখন বেলা দুপুর। আগে থেকেই আমাদের ট্যুর ক্যাপ্টেন বাবু ভাই খুলনায় 'সহিদ হাদিস পার্ক' সংলগ্ন মাঝারি গোছের একটা আবাসিক হোটেলে রুম ভাড়া করে রেখেছিলেন। এই ভর দুপুরে বাস থেকে নেমে ঘেমে গোসল। হোটেলে গিয়ে উঠলাম আমরা সাত তরুণ। এখানকার পরিবেশ এক কথায় ছিমছাম। তিনটা রুম পাওয়া গেছে। তিনটা রুমে দু'দুটো করে মোট ছ'টা খাট। একজন সদস্যকে নিয়ে সমস্যা হলো। তাই সিদ্ধান্ত হলো চিকনা মহিউদ্দিন আর ওর ভাই টিটু একখাটে ডাবলিং করবে।

আমার রুমমেট কম কথার মানুষ সজল নামের ছেলেটা। পোশাক ছেড়ে গা এলিয়ে দিলাম সিঙ্গেল খাটে। বেশ ভাল একটা লাঞ্চ করিয়েছে আমাদেরকে বাবু ভাই। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে আমার শরীর। একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। বিকেলে আবার সবাইকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। মাথার উপর বন-বন করে ঘুরছে বেঢপ আকৃতির একটা ফ্যান। বিরক্ত লাগছে। ভেবেছিলাম মামার বাসায় গিয়ে উঠব। আদর-যত্নের অভাব হত না। কিন্তু সেটি করতে গেলে আমার বন্ধু প্রবরেরা আমাকে পিটিয়ে চ্যাপটা করে ফেলবে।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠলাম একটু দেরি করে। শরীরটা ক্লান্ত থাকায় বোধহয়। ক্লাব সদস্যদের দু'চারজন গেল কেনাকাটা করতে। আমার রুমমেট এখনও বিছানা ছাড়েনি। ছেলেটা বুঝি বা একটু বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাজেনও মার্কেটে যাবে। আমাকেও বলল যাওয়ার জন্য। প্রত্যাখ্যান করলাম ওর

প্রস্তাব। বললাম, ভ্রমণে এসে কেনাকাটা আমার মোটেও পছন্দ নয়।

ও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না। 'মামুর মেয়ের কাছে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?' খোঁটা দিয়ে বলল সে। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে চুপ হয়ে গেল রাজেন।

বাবু ভাই যাচ্ছে আগামীকালকে আমাদের বাগেরহাট ভ্রমণের জন্য একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করতে রেণ্ট-আ-কার অফিসে। আমি যাচ্ছি 'সাহেব বাড়ি মন্দিরে'। একটা আর্টিকেল লিখব পুরনো বাড়ি নিয়ে। তাই ভাবলাম ওটা একটু রেকি করে আসি। পরে আর সময় পাব না। আমার মামার বাসাটা নিরালায়। তবে আপাতত সে চিন্তা বাদ দিলাম। একটা লোকাল বাসে চেপে, 'চাপ' খেতে খেতে এসে নামলাম মহেশ্বরপাশা, মানিকতলার মোড়ে। রাস্তার ডান সাইডে একটা পুলিশ-বক্স দেখতে পেলাম। মোড় ঘুরে সাহেব বাড়ির গলিতে ঢুকলাম। এখানে আসার সময় রাস্তার ডানে বিশাল এরিয়ার বাড়ি দেখতে পেয়েছি একটা। বাড়িটা অত্যাধুনিক। এরকম নিরিবিলি এলাকায় জমকালো একটা বাড়ি দেখে অবাক হলাম। আরও অবাক হলাম সামনের মন্দিরটার অবয়ব চোখে পড়তে। প্রকাণ্ড দোতলা দালান। জমিদারী স্টাইলের প্রাসাদতুল্য ভবনটা প্রায় একশো ফুট চওড়া। দৈর্ঘ্যও একশো ফুটই হবে বোধহয়। উঁচু হবে পঁচিশ ফুট। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রায় সাতটা বাজে। উলু দিচ্ছে হিন্দু মহিলারা। একটা ছেলেকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, 'পুরনো বাড়ি' বলে এটাকে।

'পুজো হয় না এখানে, খোকা?'

'জী, হয়, অল্প স্বল্প,' বলল সে। আমার প্রশ্ন শেষ হতেই আবার দৌড়ে চলে গেল।

মন্দিরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। সাদা রঙ করা বেহাল দশার সিংহ দরজার উপর একটা মুকুটের প্রতিকৃতি। মূল ভবনটা কালের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। এখানে-সেখানে গজিয়ে আছে ঝাঁকড়া বটবৃক্ষের মত কী সব উদ্ভিদ। দেয়ালের ফাটলে আর ভাঙা ছাদের কার্নিশে অবস্থান ওগুলোর। নীচের তলাটা কোনমতে টিকে আছে। উপরের কয়েকটা কামরা এখনও অটল ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে। নইলে দোতলা বলতাম না ভবনটাকে। কারণ উপরের বেশির ভাগ কামরাই মুখ থুবড়ে পড়েছে এদিক-ওদিক। লাল ইঁটের দেয়াল কোথাও কোথাও বিচ্ছিরিভাবে বেরিয়ে পড়েছে মৃত মানুষের হাড়ের মত। জায়গায় জায়গায় জ্বলজ্বলে সবুজ রঙের শ্যাওলা পড়ে একটা থিকথিকে ভাব এনে দিয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখছিলাম। সংবিৎ ফিরে পেলাম রুক্ষ চেহারার এক তরুণের ডাকে। 'নমস্কার,' হাত উঁচু করে বলল সে। আমার বয়সেরই হবে। কেমন কবি কবি ভাব। না, কবিরা এত নোংরা থাকে না। সন্ন্যাসী বললে হয়তো ঠিক হবে। 'কী চান, দাদা?' অস্বাভাবিক বিনয় ঝরল তার কণ্ঠ দিয়ে।

'ইয়ে, মানে, আমি একটু মন্দিরটা ঘুরে দেখতে চাইছিলাম। দেখানো যাবে?' এক মনে ভাবছিলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন ফিরে যাই, কাল আবার আসব। পরমুহূর্তে আবার মনে হলো, কাল আর সময় পাওয়া যাবে না। এসেছি যখন, দেখেই যাই। যা আছে কপালে।

'যাবে।' আমাকে দৃষ্টি দিয়ে মেপে নিয়ে বলল সন্ন্যাসী। 'আসেন।'

তার পিছনে হাঁটতে লাগলাম আমি। মন্দিরের মেঝেতে পা রাখলাম কয়েকটা ধাপ টপকাবার পরে। কী যেন একটা দৌড়ে গেল আমার পায়ের কাছ দিয়ে। শিউরে উঠলাম।

'ভয় নাই, ইন্দুর,' অভয় দিয়ে বলল সন্ন্যাসী।

'তোমার নাম কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কৃষ্ণ, কৃষ্ণপদ,' আস্তে করে বলল হালকা-পাতলা লোকটা।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি হলঘরের মত বড়সড় একটা ঘরে। ঘরের ওমাথায় দেব-দেবীদের মূর্তিগুলো যার-পর-নাই ভয়ঙ্কর লাগছে এই অন্ধকারে। আলোর কথা জিজ্ঞেস করতে 'দাঁড়ান' বলে আমাকে একা ফেলে পাশের একটা খুপরিমত কামরায় ঢুকল কৃষ্ণ। তারপর একটা মোমদানিতে ইয়া মোটা একটা মোম জ্বালিয়ে নিয়ে ফিরে এল আবার হলঘরে।

'আমার সাথে আসেন,' বলে হলঘরটার দু'পাশ দিয়ে দুটি করিডরের একটার দিকে ছায়ার মত এগিয়ে গেল কৃষ্ণ, ওর পিছে পিছে আমিও করিডরের মত গলিটা ধরে এগোতে লাগলাম। হাতের ডানে মন্দিরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে প্রায় বিশ ফুট। আর বাঁ দিকে সারি সারি কামরা। দরজাগুলো ইঁট দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। করিডরটা সামনে 'ইউ'-এর মত বেঁকে গিয়ে ওপাশের কামরাগুলোর ভিতর দিয়ে দেব-দেবী রাখা হলঘরটার ভিতর গিয়ে মিশেছে। বড় কয়েকটা ঘর দেখিয়ে কৃষ্ণ বলল, ওগুলো জমিদারদের শোবার ঘর ছিল। শোনা যায় এটা নাকি ব্রিটিশ আমলে এক জমিদারের মঞ্জিল ছিল। পরে সেই জমিদার তার ছোট ভাইয়ের হাতে খুন হয় সপরিবারে। এ বাড়িটা তারপর বহুকাল পড়েছিল এমনিতেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কোনও এক সময় এটা কাজে লাগতে শুরু করে। এলাকার লোক মন্দির হিসেবে ব্যবহার করে আসছে কিছুকাল। তবে পুজো পার্বণে ওই সামনের ক'টা ঘরই ব্যবহার হয়। বাকি কয়েক ডজন কামরা আজও পড়ে আছে পুরনো আবেশ নিয়ে। পাগলাটে ওই কৃষ্ণ ছোকরা আমাকে আরও জানাল, এদিকের ঘরগুলোর দিকে কেউ আসে না। সেই হতভাগ্য জমিদার আর তার স্ত্রীপুত্রের দেখা পাওয়া যায় নাকি মাঝে মাঝে এখানে। ওরা প্রায়ই ঝড়ো রাতে ফিরে আসে এই জমিদার বাড়িতে। এতক্ষণে কৃষ্ণের সাথে সেই হলঘরটায় এসে পৌঁছেছি। হঠাৎ বাইরে তাকাতেই তাজ্জব বনে গেলাম। তুমুল ঝড় হচ্ছে বাইরে। চারদিক আঁধারে ছেয়ে এসেছে, কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল একটা, বিদ্যুতের ঝলকানিতে বাইরের নারিকেল গাছগুলোকে দেখতে পেলাম প্রায় শুয়ে পড়েছে। বৃষ্টির ছাট আসছে হলঘরে। বিরতিহীনভাবে ঝরে যাচ্ছে বৃষ্টির ভারী ফোঁটাগুলো। অন্ধকার যেন চাদর ফেলেছে বাইরে। একটু আগেই তো সন্ধ্যা হলো, এটুকু সময়ের মধ্যে এত অন্ধকার নামার কথা নয়। কবজিতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চাইলাম। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে না। পৌনে সাতটা বেজে থেমে গেছে, ঠিক যখন মন্দিরে পা রেখেছিলাম। সেদিনই নতুন ব্যাটারি লাগিয়েছি, ফুরিয়ে যাবার কথা নয়। হোটেলে ফেরার কথা

মনে হতে কান্না পেল আমার। অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করে উঠল বুকের ভিতরটা। পেটের ভিতর ফাঁকা একটা অনুভূতি টের পেলাম। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম কৃষ্ণের মুখপানে। জবাবে সে-ও তাকিয়ে থাকল নীরব দৃষ্টি মেলে। মূর্তিগুলোর উপর একবারের বেশি তাকালাম না। অন্ধকারে আরও ভয়ানক লাগছে ওগুলোকে। একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত ঠেকল আমার কাছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তো ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলেনি আজ। তা ছাড়া আজ সারাদিন, এমনকী বিকেলে যখন এখানে এলাম, তখনও তো আকাশ পরিষ্কার ছিল। একটুকরো মেঘ দেখিনি কোথাও। আরও কয়েকটা বিষয়ে খটকা লাগল মনে। কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করতে যা বলল তাতে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

'জমিদারের পরিবার যেদিন খুন হয়েছিল সেদিনও এমন ঝড়-ঝাপটা ছিল কিনা, তাই!' সবজান্তার মত বলল কৃষ্ণ।

'কেন?' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললাম আমি।

'এই দিনেই ওনারা খুন হয়েছিলেন,' এবার সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা শোনাল কৃষ্ণের কণ্ঠ। তারপর রহস্যময় একটুকরো হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে। 'চিন্তা নেই, সাহেব। এই ঝড়ের ভিতর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই আপনার। রাতটা থেকেই যান এখানে। আপনার থাকার ব্যবস্থা করা যাবে।' সান্ত্বনার সুরে বলল এবার আধপাগলা লোকটা।

আমার ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠতে দেখে একটা ঘরের দিকে ইশারা করল কৃষ্ণপদ, বুঝলাম এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। বাইরে বেরোনোর মত অবস্থা নেই। সম্মতির ভঙ্গিতে কাঁধ নাড়লাম। তবে মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে ভাব রয়েই গেল। বেডরুম সাইজের একটা বড়সড় কামরায় এনে হাজির করল কৃষ্ণ। এক সময় রাজকীয়ই ছিল বোধহয় এটা। ঘরের ঠিক মাঝখানে মিশমিশে কালো বিরাট এক পালঙ্ক। একপাশে আজদাহা মার্কা একটা আলমারি। আর আছে বুক সমান উঁচু একটা টেবিল। ঘরের আসবাবপত্র বলতে আর কিছু নেই। ওগুলো ওভাবে কতকাল পড়ে রয়েছে, আরও কতকাল থাকবে, কে জানে। এমন কাঠ, কাঠ-খেকোদের সাধ্য নেই ওতে দাঁত বসায়। কারও পদধূলি না পড়লেও ধুলোবালির কোনও অভাব নেই এখানে। ঘাড়ের ন্যাকড়াটা দিয়ে খাটটার উপর এক পোঁচ ঝাড়িঝুড়ি বুলিয়ে কোথা থেকে কম্বলের মত মোটা একটা কাঁথা এনে বিছিয়ে দিল সেটার উপর। একটা কভার ছাড়া বালিশও যেন কোথা থেকে নিয়ে এল। হাত-পা এদিক-ওদিক ছুঁড়ে কয়টা মাকড়সার জাল ভাঙল। তারপর খাটের উপর আমার পাশে এসে বসল কৃষ্ণপদ। ওর ভাব দেখে মনে হলো বহু কিছু করে ফেলেছে আমার জন্য। অবশ্য কমও করেনি। 'আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে পারলাম না,' দুঃখিত হয়ে বলল সে। অবশ্য তার ওই দুঃখ প্রকাশ সম্পূর্ণ কৃত্রিম লাগল আমার কাছে। পকেট থেকে আমার চুইং গামের প্যাকেটটা বের করলাম। কৃষ্ণের হাতে একটা গাম ধরিয়ে দিলাম।

'খাই না,' বলে উঠে দাঁড়াল সে। 'আপনি ঘুমান। আমি দেব-ঘরে থাকব, কোনও সমস্যা হলে কৃষ্ণ বলে হাঁক দেবেন,' কথাগুলো বলে মোমদানিটা খাটের

এককোণে রাখল সে, তারপর বড় দরজাটা দিয়ে করিডরের আঁধারে মিলিয়ে গেল।

ঘরটার চারধারে আর একবার নজর বুলিয়ে নিলাম আমি। মোমের শিখা ছায়া ফেলেছে একপাশের দেয়ালে। দেয়ালের গায়ে দাপাদাপি করছে কালো ছায়াটা। একটু গা ছমছমে পরিবেশই বটে। বাইরে ঝড়ের দাপট একবিন্দুও কমেনি। চারদিক থেকে অসুরের শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ছে মন্দিরের দেয়ালে। যেন জমিদারের মত তার বাড়িটাকেও গ্রাস করে নিতে চাইছে। আলমারির এক কোনায় কিছু খড়কুটোর উপর একটা বিড়াল বাচ্চা প্রসব করেছে। মিঁউ-মিঁউ করে উঠল তার একটা। চোখ না ফোটা বাচ্চাগুলোকে আগলে ধরেছে তাদের মা। রহস্যময় ঝড়ের তাণ্ডব টের পেয়েছে ওরাও বুঝি বা। যাক, ভালই হলো। ওরাই আজ আমার একাকীত্বের সাথী। আনমনে ভাবলাম আমি।

আমার আসলে এই প্রাচীন আলয়ে থাকতে ভয় হচ্ছে না, হচ্ছে দুশ্চিন্তা, আর সেই সাথে বিরক্তি। কেন যে মরতে এলাম এখানে। হোটেলে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে সবাই? কী দরকার ছিল আমার এই মরার বাড়ি দেখতে আসার? এর চেয়ে মামার বাসায় আজ রাতটা কাটালে...

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হলো, আমার এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের কারণে এখনই পঞ্চাশবার কান ধরে ওঠ-বস করা উচিত। বালিশটায় মাথা রাখতে গিয়ে সরিয়ে নিলাম। বোটকা গন্ধ, তেলচিটচিটে চেহারা, যেন তেলে চুবিয়ে আনা হয়েছে এই মাত্র। কাঁথাটারও একই দশা। বালিশটাকে পায়ের নীচে স্থান দিলাম। হাতের পাঞ্জার উপর মাথা রেখে সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকলাম।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে জেগে উঠলাম, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে হৃৎপিণ্ডটা। মনে হলো মন্দিরের ছাদ থেকে একটা বাচ্চা ছেলে পড়ে গেল। আর তার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে আমার। পরমুহূর্তে ভাবলাম একা থাকলে এরকম হতেই পারে। বাইরে ঝড় হচ্ছে, তাই হয়তো বাতাসের শব্দ আমার কাছে ওরকম মনে হয়েছে। কিন্তু একটু পরেই টের পেলাম আমার 'পুরনো বাড়িটা' নতুন হয়ে গেছে। ঝকঝকে পালঙ্কে শুয়ে আছি আমি, শরীরের নীচে রেশমি চাদরের অস্তিত্ব অনুভব করছি, মাথার নীচেও নরম একটা বালিশ। ঘরের আর সব আসবাবপত্রেরও একই অবস্থা। ঝকঝকে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে দামি দামি সব তৈলচিত্র, জমিদারী চেহারার এক লোকের সাথে তার স্ত্রী ও একটা ছেলের ছবি টাঙানো রয়েছে তার সাথে। মেঝেতে দামি কার্পেট–ফরাসি বোধহয়। প্রবেশমুখে এখন দেখা যাচ্ছে কারুকাজ করা পুরু কাঠের পাল্লা। ঘরময় গোলাপজল আর দামি সুগন্ধীর সৌরভ পাচ্ছি আমি। বুঝতে পারলাম, আশ্চর্য হলেও মন্দিরটা তার পুরনো ইতিহাস জাগিয়ে তুলেছে আজ। পুরনো সেই ঘটনা প্রবাহ আবার ঘটতে শুরু করেছে। আর সেই আবর্তে পড়ে গেছি আমি। একটু আগেই বোধহয় জমিদারের নিষ্পাপ ছেলেটাকে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আর একমুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। পালাতে হবে, নইলে ওই পগারে পড়েই মরে যাব আমি। বিছানা ছেড়ে উঠে

পড়লাম। খাট থেকে নামতে গিয়ে পায়ের কাছে একজোড়া সোনার চটি দেখতে পেলাম। পায়ে গলিয়ে নিলাম—একটু বড়ই হলো। মোমবাতিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। এক টানেই দরজাটা খুলে যাওয়ায় স্বস্তি পেলাম মনে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ফিরে চাইলাম একবার। এমন একটা দৃশ্য দেখলাম, ভয়ে ধড়াস করে উঠল কলজে। খাটের উপর যে ঝাড়বাতিটা ঝুলছে সিলিঙের সাথে, তার সাথে এখন আরও একটা জিনিস ঝুলছে—গলায় ফাঁস পরা একটা নগ্ন নারী দেহ।

আর দাঁড়ালাম না। করিডর ধরে হলঘরের দিকে ছুটলাম। সারা বাড়িময় দুই জোড়া ছুটন্ত পদশব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। তাতে আমার কী? হলঘরে এসে দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম পদশব্দ এদিকেই আসছে, ভাবলাম ছুটে পালাই, কিন্তু আমার পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করল। দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির।

দেখলাম মৃত্যু ভয়ে ছুটে আসছে একটা লোক। খান্দানি চেহারা লোকটার, তবে এই মুহূর্তে পানিতে পড়া ইঁদুরের মত লাগছে তাকে। লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। শোবার ঘরের দেয়ালে তার ছবি দেখেছি। শেরওয়ানি পরে আছেন ব্রিটিশ আমলের জমিদার। পায়ে ঠিক আমার মত কারুকাজ করা এক জোড়া চটি। এগিয়ে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। আমাকে যেন দেখতে পেলেন না এমন একটা ভাব করে ছুটে গেলেন পাশের একটা ঘরের দিকে। ভালই হলো, আমার উপস্থিতি টের পেলে বোধহয় আমাকেই ত্রাণকর্তা ভেবে বসতেন। তার পিছু নিয়ে যে লোকটা এল, ছুরি হাতে তাকে দেখে একটু অবাকই হলাম। লোকটা স্বয়ং কৃষ্ণপদ। কৃষ্ণ আমাকে দেখতে পেল না, তবে তাতে আমার লোকসানই হলো। সে একেবারে আছড়ে পড়ল আমার গায়ের উপর। তার ধাক্কায় পপাত ধরণীতল ঘটল। মোমবাতিটি ছিটকে পড়ে দপ করে উঠে নিভে গেল। আর কৃষ্ণপদ নির্দয়ের মত আমাকে মাড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল তার শিকারের পিছু পিছু। উঠে দাঁড়ালাম আমি। মনে হলো এই মাত্র ট্রেনের নীচে পড়ে কাটা গেল আমার মুণ্ডু। তবে হাত দিয়ে দেখলাম যথাস্থানেই আছে সেটা। তাকিয়ে দেখলাম জমিদার ঘরটায় ঢুকে কবাটটা আটকে দিচ্ছেন দরজার। তবে তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেল কৃষ্ণ। এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা। জমিদারের চোখে করুণ আকুতি ফুটে উঠতে দেখলাম। বাইরে তাকালাম। সমানে আছড়ে পড়ছে ঝড়-বৃষ্টি। চোখের সামনে দেখলাম কয়েকটা গাছ ঝড়ের দাপট সইতে না পেরে গা এলিয়ে দিল মাটিতে। বাইরের অবস্থা যাই হোক এখান থেকে আমাকে বেরোতেই হবে। একবার ভাবলাম জমিদারকে আমার সাহায্য করা দরকার। একটা অসহায় মানুষ আমার সামনে মরে যেতে পারে না। ভাবনাটা তাড়িয়ে দিলাম মাথা থেকে, কারণ মরামানুষকে বাঁচানোর দরকার কী! বাঁচাতে গেলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। ভাল করেই বুঝতে পারছি আমার চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে সবই মিথ্যা, একটা ভেলকি মাত্র। এখান থেকে বেরোতে পারলেই সব দূর হয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে। আর একমুহূর্তও দাঁড়ালাম না। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করে মন্দিরের ধাপ ক'টা ভেঙে ফাঁকা চত্বরে বেরিয়ে এলাম। ঝড়-

ঝাপটাকে আমল না দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলাম আমি। পিছন ফিরে চাইলাম শেষ বারের মত। গা হিম করা শব্দে মরণ চিৎকার দিল কেউ। খুন হয়ে গেলেন বোধহয় জমিদার সাহেব। কতক্ষণ দৌড়ালাম জানি না। মন্দিরের সীমানা থেকে বেরিয়ে এলাম এক সময়। আর তখনই চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। ভোর হয়ে এসেছে। ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নও নেই কোথাও। কোথায় গাছ পড়েছে? সব বহাল তবিয়তেই আছে কাল বিকেলের মত। এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিও জমে নেই কোথাও। অবশ্য সে সব দেখার মত সময় বা ইচ্ছে কোনটাই এখন আর নেই আমার। একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভিতর। এই 'খুনে বাড়ি'-টা থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে, বহু দূরে...পায়ের নীচে ইঁট পাটকেলের খোঁচা অনুভব করছি। জমিদারের চটি তো দূরের কথা, আমার 'বাটা' স্যাণ্ডেলটাও এখন নেই পায়ে। অনন্তকাল ধরে ছোটার পর মানিকতলা মোড়ে এসে পৌঁছালাম আমি। সামনে দেখতে পাচ্ছি মানিকতলা পুলিশ-বক্স। ওখানেই এখন যেতে চাই আমি। কারণ, একটু আগে আমার চোখের সামনে যে খুনগুলো হয়ে গেল তার ডায়েরী লেখাতে হবে না?

উপসংহার

পরে এলাকাবাসীর কাছে জানতে পেরেছিলাম যে, জমিদারের বাপের একটা পোষ্যপুত্র ছিল। বাবার মৃত্যুর পর সেই ছেলেটা জমিদারের কাছে সম্পত্তি দাবি করে বসে। অবশ্য ছেলেটা ছিল নেশাখোর, লম্পট। নারী আর মদ নিয়ে চুর হয়ে পড়ে থাকত সারাদিন। এসব দেখে জমিদার তাঁর ভাইকে সম্পত্তির ভাগ দিতে অস্বীকার করলে এবং তাকে জমিদার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে কোনও একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাতে সে মাতাল অবস্থায় এসে জমিদারের স্ত্রীকে নির্যাতন করে এবং তাঁর একমাত্র ছেলেকে বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দেয়। আর প্রতিশোধ নিতে জমিদারকে বাড়িভর তাড়িয়ে বেড়িয়ে ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে খুন করে। জমিদারের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন গলায় ফাঁস দিয়ে। ঠিক যেমনটি আমি দেখেছিলাম সেদিন রাতে। পরে অবশ্য ওই মাতালটাও পাগল হয়ে যায় কোনও এক রহস্যময় কারণে, এবং ওই জমিদার বাড়িতেই ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় নিঃসঙ্গ অবস্থায়। এলাকাবাসীর মাঝে গুজব আছে, এখনও নাকি মাঝে মাঝে জমিদারের সেই কুলাঙ্গার ভাইটাকে ওই মন্দিরে দেখা যায়। সে নিজেকে 'কৃষ্ণ' বলে পরিচয় দেয়। আর একটা সুসংবাদ আছে। দিনের বেলায় আবার গিয়েছিলাম মন্দিরে। সেখানে সেই বেডরুমটায় আমার 'বাটা' স্যাণ্ডেলটা পাওয়া গেছে। আর আমার কারণে আমাদের বাগেরহাট সফর বাতিল করা হয়েছে। আমি অসুস্থ থাকায় এখন মামার বাসায় আছি। মামাতো বোনের সেবা...

ফেরদাউস হাসান

ভো-ডু

সে যে কেন ওর সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি হলো নিজেও বুঝতে পারছে না। সে ওকে পছন্দ করে না, কোনওদিন করেওনি। কিন্তু তার ওপর বোধহয় লোকটার সম্মোহনী কোনও প্রভাব আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবারেই শেষবারের মত সে ওর সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে।

মাসতিনেক আগে ওদের পরিচয়, এ নিয়ে ছ'বার হলো তার সঙ্গে একটি সন্ধ্যা কাটাতে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল লোকটা। যতবারই তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে, প্রবল অস্বস্তি আর বিরক্তিতে ভুগেছে সে। লোকটার জন্য পরে তার মায়া লেগেছে বটে কিন্তু ওকে তার স্রেফ বিরক্তিকর এবং ঘিনঘিনে মনে হয়েছে। কেন, এর ব্যাখ্যা নেই ওর কাছে। লোকটার কথা মনে পড়তেই এই দেখো শিউরে উঠল গা।

লোকটা বেঁটে, মোটা, গোলাপী-সাদায় মেশানো কেমন অদ্ভুত গায়ের রঙ, ফুটবলের মত গোল মুখে কোনও রেখা বা ভাঁজ নেই, বিস্ফারিত দুই নীল চোখ। তার গলার স্বর ঈষৎ অনুনাসিক, কথা বলার সময় সারাক্ষণ হাতজোড়া নার্ভাস ভঙ্গিতে মোচড়াতে থাকে। আর হাঁটার ভঙ্গিটি খুবই কৃত্রিম। এধরনের পুরুষ কিছুতেই তার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। লোকটার নাম হেনরী ম্যালোরি। বয়স সাতাশ।

আর তার বয়স আঠারো। অপূর্ব সুন্দরী। রূপ নিয়ে তার গর্ব নেই, তবে জানে লোকে তাকে রূপসী বলে। চোখ ধাঁধানো এ সৌন্দর্যকে সে ঈশ্বরের দান মনে করে। সবাই, এমনকী তার বেডরুমের আয়নাটা পর্যন্ত ঘোষণা করে, 'তুমি রূপসী! তুমি সুন্দরী!' তার নাম শিলা ফ্রান্সিস।

তবে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, শিলার মা হেনরীকে খুবই পছন্দ করেন। হেনরীকে উৎসাহিত করার জন্য যা যা করা দরকার তিনি করেছেন এবং একটু বেশিই করে ফেলেছেন। কিন্তু শিলা তো জন কুলরিজকে মন দিয়ে রেখেছে, তাকে সে বিয়ে করবে এবং ওদের এনগেজমেন্টও হয়ে গেছে। শিলার মা ভাল করেই জানেন হেনরী শিলাকে আর বাইরে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। অন্তত আজ রাতের পর তো নয়ই।

জন চমৎকার একটি ছেলে। তার কথা মনে পড়তে হাসির রেখা ফুটল শিলার

ঠোঁটে। মেয়েরা একটি পুরুষের কাছে যা যা চায় সবই আছে জনের মধ্যে। সে লম্বা, ফর্সা এবং সুদর্শন। তার চুলের রঙ কুচকুচে কালো, বাদামী চোখ, সরু আকর্ষণীয় মুখ, অদ্ভুত সুন্দর হাসতে পারে সে তার ধবধবে সাদা দাঁতে, ভুবন ভোলানো হাসিতে যেন মেয়েদের মত মুক্তো ঝরে। তার গলার স্বরটি ভরাট এবং পরিষ্কার, কাঁধজোড়া বেশ চওড়া। একটি মেয়ের আর কী চাই?

আবার মৃদু হাসল শিলা প্রেমিকের কথা মনে করে। মাথায় গলিয়ে দিল উলেন ফ্রকটি। চেইন টেনে আটকে নিল। তারপর হাত বাড়াল মুক্তোর সেটের দিকে। ম্যাচিং করে কানের দুল পরল সে, দ্বিতীয়বার হালকা করে লিপস্টিক ছোঁয়াল কমলা-কোয়া অধরে, শেষবারের মত তাকাল আয়নায়। বেশ সুন্দর লাগছে। কোনও সন্দেহ নেই। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শিলা। শুধু যদি আজ জনের সঙ্গে বেরোতে পারত!

সদর দরজার কলিংবেল বেজে উঠল। এসে পড়েছে হেনরী। ড্রেসিং টেবিলের ঘড়ির দিকে তাকাল শিলা। সাতটা বাজে। ভীষণ পাংচুয়াল হেনরী। সময় মেপে চলে। সদর দরজা খোলার শব্দ শুনল শিলা। তারপর মানুষের গলা, সবশেষে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসা মায়ের পদক্ষেপ। এক মুহূর্ত পরেই মা ঢুকলেন ঘরে।

'হেনরী কী অসাধারণ ছেলে দেখেছিস?' কলকল করে উঠলেন তিনি। 'তোর জন্য চমৎকার কিছু ফুল আর এ ছোট্ট উপহারটা নিয়ে এসেছে।' টুকটুকে লাল রঙের গোলাপের প্রকাণ্ড একটি তোড়া আর চৌকোনা একটি পার্সেল এগিয়ে দিলেন মা। 'এই পার্সেলের উপহারটা তোকে পরে নিতে বলল ও। ওর বিবেচনাবোধ কী দারুণ আর ছেলেটাও কত চমৎকার! কেন যে তুই ওকে পছন্দ করিস না!'

গোলাপের গুচ্ছ হাতে নিয়ে নিয়ম মেনে গন্ধ শুঁকল শিলা। 'সুন্দর।' বলল ও।

'আমি পার্সেলটা খুলছি, সোনা,' বললেন মা, 'তুই তাড়াতাড়ি কোটটা পরে নে। না জানি কী জিনিস তোর জন্য নিয়ে এসেছে ছেলেটা। তবে ওকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না। বাইরে ওর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

'জনের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে,' ক্ষুব্ধ গলায় বলল শিলা। 'ফুল ছাড়া অন্য কোনও উপহার হেনরীর কাছ থেকে নেয়া ঠিক হবে না আমার।'

'রাবিশ!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ফ্রান্সিস। 'তুই দেখছি এখনও সেই আদ্যিকালেই রয়ে গেলি! অবশ্যই উপহার নেয়া উচিত হবে।'

শিলা তার নতুন চেরি-লাল কোটটি গায়ে চড়াল, এদিকে মা পার্সেল খুলে ফেলে আনন্দসূচক চিৎকার করে উঠেছেন। 'ওহ্, ডার্লিং,' শ্বাস টানলেন তিনি। 'দ্যাখ! কী দুর্দান্ত জিনিস!'

ছোট চৌকোনা একটি বাক্সে শুয়ে আছে বাদামী রঙের ছোট একটি ব্রোচ। ব্রোচটি তৈরি করা হয়েছে ক্ষুদ্রকায় একটি প্রাণীর আদলে। প্রাণীটির নাকটি চোখা, পুঁতির মত ছোট ছোট দুটি চোখ। তার গোলাকার ছোট শরীর ঢেকে রেখেছে লম্বা

মখমলের পশম। ওটার চারটে পা, সবগুলো পায়ের পাতা জোড়া লাগানো। প্রাণীটির ঘাড়ের সোনার কলারটি ব্রোচ-পিনের সঙ্গে সংযুক্ত একটি স্বর্ণের চেইন দ্বারা আটকানো। পিনটি লম্বা এবং মিনিয়েচার তরবারির মত খাড়া হয়ে আছে।

'নে, নে, এটা পরে ফ্যাল,' বালিকার উচ্ছ্বাস মিসেস ফ্রান্সিসের কণ্ঠে। 'তোর কী ভাগ্য রে! কী দারুণ একটা ব্রোচ উপহার পেয়েছিস!'

বাক্স থেকে ওটা তুলে নিল শিলা, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল খুদে জানোয়ারটার গা কেমন ভেজা ভেজা। কেন, কে জানে গা-টা ছমছম করে উঠল। বিবমিষা নিয়ে ওটার দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইল শিলা। পুঁতির মত চোখ জোড়া অভিব্যক্তিহীন। তারপর কোটের গায়ে পিনটি গাঁথল। ওর কল্পনা নাকি সত্যি, ও দেখেছে পিনটি পরার সময় প্রাণীটির চোখজোড়া এক পলকের জন্য যেন ঝিকিয়ে উঠেছিল সন্তুষ্টির ছাপ নিয়ে! নাহ্, ও ভুল দেখেছে কিংবা কল্পনা করেছে।

'অসাধারণ!' প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিসেস ফ্রান্সিস। 'অ্যাতো সুন্দর জিনিস জীবনে দেখিনি আমি, আর তোকেও যা সুন্দর লাগছে, সোনা!' মেয়েকে আদর করে চুমু খেলেন তিনি। 'আমার পুতুলসোনা, এখন নীচে চলো, নইলে রেগে যাবে হেনরী।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে গোলাকার, থলথলে শরীরের পেছনের অংশটা গরম করে নিচ্ছিল হেনরী। শিলাকে দেখে খুশি মনে হাত নাড়ল। ওকে আজ খুব সুন্দর লাগছে বলল। এক সেকেণ্ডের জন্য ব্রোচের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হলো। শিলার মনে হলো জানোয়ারটির মত হেনরীর চোখেও যেন একই রকম সন্তুষ্টি ফুটে উঠতে দেখেছে সে। তবে মাত্র এক লহমার জন্য বলে ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না শিলা।

মিসেস ফ্রান্সিস হেনরীর চামচামি করেই যাচ্ছেন। হেনরী কি একটু ড্রিংক করবে?–না, করবে না। তা হলে ডিনারে যেতে দেরি হয়ে যাবে। ওরা নৈশ ভোজে যাচ্ছে কোথায়? আর্লিংটনে? বাহ, কী চমৎকার–ওখানকার খাবারগুলো যেমন ভাল, পরিবেশটাও খুব মনোরম। যদিও খাবারের দাম আকাশ-ছোঁয়া কিন্তু দুষ্টু হেনরীর কাছে টাকা তো কোনও বিষয় নয়। ট্যাক্সি ভাড়ায় নিশ্চয় অনেকগুলো টাকা খরচা হবে। আর্লিংটনের পুরো রাস্তাটা ট্যাক্সি ভাড়া করে যাওয়ার দরকারটাই বা কী ছিল? ওটা ট্যাক্সি না ভাড়া করা গাড়ি? ওরে সব্বোনাশ! তা হলে তো আরও অনেকগুলো টাকা খসবে হেনরীর পকেট থেকে। অবশ্য দুষ্টু হেনরীর কাছে টাকা তো টাকা নয়, তেজপাতা। খোলামকুচির মত ওড়ায়। এজন্যেই তো হেনরীকে মিসেস ফ্রান্সিসের এত ভাল লাগে। মহা অধৈর্য হয়ে হেনরীর সঙ্গে মা'র প্যাঁচাল শুনছিল শিলা। সত্যি মা-টা মাঝেমাঝে এমন বোকার মত আচরণ করে। মা'র কি বুদ্ধিশুদ্ধি কোনওকালেই হবে না? আর ভাজা মাছটা উল্টে খেতে না জানার অভিব্যক্তি নিয়ে এবং বিনয়ের অবতার সেজে যেভাবে কথা বলে হেনরী–অসহ্য! ও আসলেই একটা বিরক্তিকর ক্যারেক্টার।

গাড়ি নিয়ে ওরা আর্লিংটন পৌঁছল প্রায় নীরবতার মাঝে, শিলা খুব হতাশ বোধ করছিল আর হেনরী ডুবে ছিল নিজের চিন্তায়। প্রধান সড়কের পাশের

বাড়িটিতে পৌঁছে সে শোফারকে বলল কোথাও রাতের খাবার খেয়ে নিতে, কারণ ঘণ্টা দেড়েক তাকে আর ওদের দরকার হবে না। তারপর সে শিলাকে নিয়ে আর্লিংটনের সুসজ্জিত ডাইনিংরুমে প্রবেশ করল।

জন থাকলে সময়টা দারুণ উপভোগ করতে পারত শিলা। এলিজাবেথিয়ান স্টাইলে তৈরি আর্লিংটনকে প্রথম দর্শনে পছন্দ না হলেও প্রায় জনশূন্য রেস্টুরেন্টটির খাবারগুলো সত্যি সুস্বাদু। হেনরী প্রচুর মদ গিলল। প্রথমে নিল শেরী, তারপর মাছের সঙ্গে পান করল হোয়াইট ওয়াইন, মাংসের সঙ্গে পেটে চালান দিল রেড ওয়াইন আর এখন মিষ্টি খাওয়ার জন্য মিষ্টি হোয়াইট ওয়াইনের অর্ডার দিচ্ছে। 'কিন্তু আমি খেতে পারব না!' আপত্তি জানাল শিলা। 'প্রথমত আমার মাথা ঘুরছে। দ্বিতীয়ত আমি মিষ্টি খাব না।'

'আমি খাব,' বলল হেনরী। 'আমি ক্রেপ সুফেট নেব।' তার বিবর্ণ ভেজা-ভেজা নীল চোখ চকচক করছে, লাল হয়ে আছে গাল।

শিলা সত্যি কথাই বলেছে। তার মাথা সত্যি ঘুরছে। তবে মস্তিষ্কের একটা অংশ এখনও সক্রিয় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বারবারই মনে হচ্ছে কী যেন একটা মিলছে না। হেনরীকে আজ এত খুশিখুশি লাগছে কেন? আজকের ডিনারটা তো বিদায়ী নৈশ ভোজ, কারণ শিলা জনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। খবরটা আগে যখন শুনেছিল হেনরী, খুবই কষ্ট পেয়েছিল। বলেছিল এ সংবাদে তার হৃদয় ভেঙে গেছে। তা হলে এখন এমন উত্তেজিত কেন সে?

হেনরী ক্রেপ সুফেট খাচ্ছে, ওকে লক্ষ করছিল শিলা। অনুমান করার চেষ্টা করছিল হেনরীর মতলবটা কী। হেনরীর খাদ্য গ্রহণের দৃশ্যটি মোটেই রুচিকর নয়। সে লোভীর মত হামহাম করে খায়, দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিটকে পড়ে খাদ্য কণা, লেগে থাকে মুখে, ঠোঁটে। ফলে মাঝে মাঝেই ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে হয়।

কফি পানের সময় হেনরী দু'জনের জন্য ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাচালের মত বকবক শুরু করে দিল। বেশিরভাগই নিজের সম্পর্কে প্যাঁচাল। শিলাকে নিজের নিঃসঙ্গ শৈশবের কথা বলল, জানাল বিধবা এবং কর্তৃত্বপরায়ণ মায়ের ঘরে তার বেড়ে ওঠা। সে নিজের একাকীত্ব দূর করতে কাল্পনিক কত রকম খেলা আবিষ্কার করেছিল তার ফিরিস্তি দিল। জানাল স্কুলে তার কোনও জনপ্রিয়তা ছিল না, কিন্তু সে বুঝতে পারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে, সকলের প্রশংসা পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় সে স্কুলের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর কোনওদিন দ্বিতীয় হয়নি কোনও পরীক্ষায়, সবসময় শীর্ষস্থান অধিকার করে রেখেছে এবং এখনও সে পরাজয় বা কিছু হারানোর যাতনা সইতে পারে না। তাকে প্রচুর প্রতিযোগিতার মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে, ঘোষণার সুরে বলল সে। তবে সে সম্প্রতি এমন একটি জিনিস খুঁজে পেয়েছে যে কোনও বাধাই এখন তার জন্য বাধা নয় এবং সর্বদাই সে জিতে যাবে।

শিলা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। বলতে ইচ্ছে করল না যে

সবকিছুই তার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। শিলাকে সে কোনওদিনই জিততে পারবে না।

হেনরী নিজেই প্রসঙ্গটি টেনে আনল। 'উদাহরণ হিসেবে তোমার আর আমার কথাই ধরো,' মৃদু গলায় বলল সে। 'তোমার ধারণা তুমি জনকে বিয়ে করবে, আমাকে নয়, ঠিক কিনা?'

'ধারণা নয়, আমি জানি আমি জনকেই বিয়ে করব,' জবাব দিল শিলা।

'আমার ব্যাপারে কি একবার সিদ্ধান্ত বদলানো যায় না? তোমার মত মেয়েকেই আমি আমার বধূ হিসেবে কল্পনা করি। কথা দিচ্ছি, আমি খুব ভাল স্বামী হব।'

'কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই,' বলল শিলা। 'তুমি তো জানোই আমি জনের প্রেমে পড়েছি।'

'প্রেম! প্রেম!' নাক সিটকাল হেনরী। 'সবাই খালি প্রেমের কথাই বলে, কিন্তু প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একজন ভাল স্বামী দীর্ঘস্থায়ী হয়।'

'তবু দেখি ঝুঁকি নিয়ে,' হেসে উঠল শিলা।

ভেজা, নীল চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে শিলাকে দেখল হেনরী। 'হেসো না,' তিরস্কার করল সে। 'ভেব না পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে আছে। তোমার মা কি তোমাকে কখনও বলেননি ওস্তাদের মারটা হয় সবসময় শেষ রাতে? আর তোমাকে যা বললাম, বিশ্বাস করো আমি কোনওদিন হারতে শিখিনি। তুমি কোনওদিনই জনকে বিয়ে করতে পারবে না।' অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল হেনরী। 'ব্রোচটা কেমন লেগেছে?'

ব্রোচে হাত বুলাল শিলা, তাকাল ওটার দিকে।

'খুব সুন্দর,' বলল ও।

'এটা একটা ভো-ডু,' বলল হেনরী।

'কী?'

'খুবই দুর্লভ প্রাণী। এক ধরনের ইঁদুর এটা। বাদুড়ের পূর্বপুরুষ।'

'আমি বাদুড় ঘেন্না করি,' বলল শিলা।

'কিন্তু এটা বাদুড় নয়, ইঁদুর। বাদুড় তো নানান রকমের আছে। পোষা বাদুড় থেকে শুরু করে ভারতের গুহায় বসবাসকারী বাদুড় এবং ভ্যাম্পায়ার।'

'চুপ করো!' শিউরে উঠল শিলা। 'বললাম না বাদুড়ের কথা শুনলেই আমার বমি আসে!'

'তোমাকে একটা জিনিস দেখাই,' বলল হেনরী। সে খুদে জানোয়ারটার ঘাড় থেকে সোনার কলারটি খুলে ফেলল। 'আমি ব্রোচ পিন থেকে ভো-ডুকে খুলে নিচ্ছি তবু ওটা পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে তোমার কোটের সঙ্গে লেগে থাকবে। এর পাগুলোই এরকম, যে কোনও কিছু আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। তুমি যতই কোট ঝাঁকাও, ভো-ডু কিছুতেই খসে পড়বে না।' সে প্রাণীটার কলার ফেলে দিয়ে ওটাকে কোটের সঙ্গে আটকে রাখল।

'তুমি এমনভাবে বললে যেন এটা একটা জ্যান্ত প্রাণী,' বলল শিলা।

'তোমার তা-ই মনে হলো বুঝি?' হাসল হেনরী। 'তা হলে তো বোকার মত হয়ে গেল কথাটা।' ব্র্যাণ্ডির গ্লাস উঁচিয়ে ধরল। 'আজই কি বিদায়, শিলা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল শিলা।

'তোমার মত বদলানোর শেষ সুযোগটি দিচ্ছি,' বলল হেনরী, 'কারণ আমি তোমাকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করি।'

'অন্যরা কারা?' জানতে চাইল শিলা।

'অন্য মেয়েরা,' আবছা গলায় জবাব দিল হেনরী। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করল। 'গুডবাই, শিলা।'

'টু ইউ,' বলল শিলা।

হেসে উঠল হেনরী। 'থ্যাংক ইউ, মাই ডিয়ার। আই শ্যাল বি ফাইন।'

চুপচাপ দু'জনে ড্রিংক শেষ করল। হেনরী তার সিগারেট অ্যাশট্রেতে ডলে নিভাল। ওয়েটারকে ইশারায় ডেকে মিটিয়ে দিল খাবারের বিল।

'এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না,' বলল হেনরী। 'আমি শোফারকে বিদায় করে দিচ্ছি। চলো, ফক্সের গেমিং হাউসে গিয়ে দু'জনে মিলে একটু জুয়া খেলি। কী বলো?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল শিলা। 'আমি জুয়া পছন্দ করি না। তা ছাড়া আমার খুব ক্লান্তি লাগছে।'

'বেচারী,' বিড়বিড় করল হেনরী, 'যাকগে, তোমার যা ইচ্ছা।'

ওকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এল সে, শোফারকে বলল, 'ব্রাউন, আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরব। তুমি একা একা যেতে পারবে না?'

শোফার জবাব দেয়ার আগেই হেনরী শিলাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি বলছি জন কোনওদিন তোমাকে বিয়ে করতে পারবে না। অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি।' প্রবল বেগে চুমু খেল সে মেয়েটাকে, নিজেকে ছাড়াবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল শিলা। বিব্রত শোফার মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে আর রেস্টুরেন্টের ডোরম্যান আকাশের তারা গুণতে লাগল।

হেনরী অবশেষে যখন রেহাই দিল শিলাকে, রাগে ফোঁসফোঁস করছে সে। 'আবার যদি অমন করেছ, হেনরী, চড় মেরে তোমার দাঁত ফেলে দেব।'

হেসে উঠল হেনরী, আবার জাপ্টে ধরল শিলাকে। 'আমার মন যা চায় তা-ই আমি করি।' বলল সে। শিলার ঠোঁটে অনেকক্ষণ চেপে রইল তার মুখ।

আবার নিজেকে ছাড়াতে ধস্তাধস্তি করল শিলা। 'আর জীবনেও যদি তোমার সঙ্গে কোথাও গেছি!' হেনরী ওকে মুক্তি দেয়ার পরে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল শিলা। 'তারচেয়ে আমার মরণও ভাল।'

'তোমার যা ইচ্ছা,' হাসছে বটে হেনরী কিন্তু কণ্ঠে ওর বিষ।

'আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও,' ডোরম্যানকে হুকুম করল শিলা। 'এক্ষুণি।'

'এ সময়ে কোথাও ট্যাক্সি পাবেন না, ম্যাডাম,' বলল ডোরম্যান।

'তা হলে ভাড়া গাড়ির ব্যবস্থা করো।'

'অনেক সময় লাগবে, ম্যাডাম।'

'তা হলে আমি হেঁটেই যাব,' বলল ক্রুদ্ধ শিলা।

'বোকার মত কথা বোলো না,' বলল হেনরী। 'এখান থেকে তোমার বাড়ি তিন মাইল দূরে। এত রাতে অতদূর একা একা হেঁটে যেতে পারবে না।'

'গ্রাহ্য করি না। তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার চেয়ে অন্য যে কোনও কিছু করতে আমি রাজি।'

'ঠিক আছে,' বলল হেনরী, 'তোমার যদি জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনতে ইচ্ছে করে আমার কিছু করার নেই।' গাড়িতে চড়ে বসল সে, হতভম্ব ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল গাড়ি চালাতে।

একটু ইতস্তত করল শিলা, তারপর হাঁটা দিল। মাত্র ন'টা বাজে, রাতটিও বেশ চমৎকার, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, ও হাইহিলও পরেনি, কাজেই তিন মাইল রাস্তা জোর কদমে হেঁটে বাড়ি ফিরতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

শিলা অবাক হয়ে লক্ষ করল রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। রাস্তাটা যে এমন নির্জন এখানে আসার সময় খেয়ালই করেনি। অবশ্য এতে একদিক দিয়ে সুবিধেই হলো–হাঁটাটা সহজ হবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল শিলা। মাইল খানেক পথ এগিয়েছে, এমন সময় ঘাড়ের কাছটা কেমন ব্যথা করে উঠল। চমকে গিয়ে গলায় হাত দিল ও। ব্রোচের খুদে প্রাণীটা জায়গা বদল করে ওর কোটের কলারের ওপর উঠে এসেছে। ভয় পেলেও শিলা মনে মনে ব্যাখ্যা দিল দ্রুত গতিতে হাঁটার কারণে নিশ্চয় ওটা ঝাঁকি খেয়ে ওখানে চলে এসেছে। কোটের কলার থেকে জানোয়ারটাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো শিলা। ভো-ডু আটকে রইল ওর কাপড়ের সঙ্গে। চাঁদের আলোয় এখন ও দেখতে পেল আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে রক্ত। আশ্চর্য! রক্ত এল কোত্থেকে? আতঙ্কিত শিলা আবার হামলা চালাল ব্রোচের ওপর। এবারে বুড়ো আঙুলে তীক্ষ্ণ খোঁচা খেল ও। খোঁচা? নাকি কামড়? মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল শিলার। চোখের সামনে কুয়াশার ধোঁয়াটে একটা পর্দা দেখতে পাচ্ছে ও, কানের ভিতরে ড্রাম বাজানোর আওয়াজ। মাথা ঝাঁকাল ও কুয়াশার পর্দা আর ঢাকের শব্দ দূর করতে। ভাবল রাস্তার পাশে ঘাসের ধারে বসে খানিক বিশ্রাম নেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে দ্বিতীয় কামড়টা খেল। উন্মত্তের মত ব্রোচের জানোয়ারটাকে টান মেরে ফেলে দিতে গিয়ে মহা আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করল ওটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে আকারে।

প্রচণ্ড ভয় গ্রাস করল শিলাকে। রাস্তা ধরে দৌড়াতে লাগল, টপটপ পানি পড়ছে গাল বেয়ে। 'পরের গাড়িটা,' দিশেহারা হয়ে ভাবছে ও। 'পরের যে গাড়িটাই চোখে পড়ুক আমি ওটা থামিয়ে লিফট চাইব।' কিন্তু কোনও গাড়ি এল না।

এদিকে ব্রোচটা আকারে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আরও ভারী হয়ে উঠছে। শেষতক ওজনের চাপে আর দৌড়াতে পারল না শিলা। কোট ছেড়ে দিয়ে জানোয়ারটা এখন ওর গলা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। শিলা টের পেল ওটার তীক্ষ্ণধার দাঁত ওর ত্বক খুঁজছে। আবার কামড় দিল ভো-ডু এবং শিলার অন্তরাত্মা

কাঁপিয়ে দিয়ে চুষে খেতে লাগল রক্ত। গলা ফাটিয়ে একের পর এক চিৎকার দিচ্ছে শিলা। কিন্তু কেউ শুনল না ওর আর্তনাদ। ভো-ডু নামের রক্তচোষাটাকে গলা থেকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল শিলা। কিন্তু একচুল নড়ানো গেল না পিশাচটাকে। চুক চুক রক্ত চুষেই চলেছে, সে সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে ফুলে উঠছে ওটার শরীর, বৃদ্ধি পাচ্ছে আয়তনে। শিলার মুখে নখরযুক্ত থাবা চালাল ভো-ডু। রাস্তায় পাগলের মত ছোটাছুটি করছে শিলা, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু কেউ ওর সাহায্যে এগিয়ে এল না। শেষ মরণ আর্তনাদটা দিয়ে ও ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। প্রকাণ্ড প্রাণীটা সারি সারি ক্ষুরধার দাঁত বের করে এক কামড়ে ছিঁড়ে নিল ওর কণ্ঠনালী।

রাস্তার ধারের একটা খাদের মধ্যে শিলার লাশ পাওয়া গেল। ঘাড় আর মুখে অসংখ্য কামড়ের দাগ, বড় বড় গর্ত হয়ে আছে। গর্তভর্তি রক্ত। ওর জুগুলার ভেইন টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, একটা চোখ খুবলে খাওয়া, আরেকটা শরীরের পাশে, পড়ে আছে ঘাসজমিনে। ওর লাল কোটের গায়ে একটি চেইনসহ সোনার ছোট একটি তরবারি আটকানো। কিন্তু ব্রোচের রোমশ প্রাণীটি অদৃশ্য।

শিলার মৃত্যুর সঙ্গে হেনরীর কোনও যোগসাজশের প্রমাণ মিলল না, কারণ তার পারফেক্ট অ্যালিবাই ছিল। আর শিলার নির্বোধ মা ভাবছিলেন ব্রোচের সেই মিষ্টি ছোট্ট জানোয়ারটি কোথায় খসে পড়ল। মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা কস্মিনকালেও তাঁর মাথায় এল না।

ওই রাস্তার দু'একজন মোটরসাইকেল আরোহী বলেছে তারা মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে দানব শজারুর মত রোমশ একটি প্রাণীকে ছুটে যেতে দেখেছে। তবে ভো-ডু কোনওদিন ধরা পড়েনি এবং ওই এলাকায় প্রতি পূর্ণিমার রাতে কেন দু'একটি নৃশংস মৃত্যু ঘটে সে রহস্যও কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি।

মূল: ডুলসি গ্রে
রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

ঈশ্বরী

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

ঈশ্বরী

এক

বান্দরবান যাবার নাম শুনলেই অয়ন একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এপর্যন্ত বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবের সাথে কতবার যে সে বান্দরবান গিয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। অবশ্য জায়গাটাও এমন যে হাজারবার গেলেও তৃষ্ণা মেটে না। দুর্গম পাহাড়ের অন্ধ উপত্যকাগুলোতে কত যে রহস্য লুকিয়ে আছে, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। এতবার গিয়েও তাই বান্দরবানের সব রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি অয়ন, সে নিজে অন্তত সেটাই মনে করে।

ওখানে খুব ভাল একটা বন্ধুও পেয়েছে ও। তারই সমবয়সী, আদিবাসী, মারমা। ছেলেটার আসল নাম মিরনিয়াং থোয়াই মারমা। তবে এত কঠিন নামে তাকে ডাকে না অয়ন, সহজ করে ডাকে, মিরন। মিরনও এই নামেই খুশি, বিন্দুমাত্র আপত্তিও করেনি সে এ নামে ডাকায়। দূরে থাকলেও দু'বন্ধুতে গলায়-গলায় ভাব, ভালবাসে একে অপরকে ভীষণ।

আদিবাসী হলেও বাংলা-ইংরেজিতে খুবই ভাল দখল মিরনের। আদিবাসীরা যে এখন আর পড়াশোনায় মোটেও পিছিয়ে নেই, মিরনই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

মিরন যখন একরাতে ফোনে জানাল, এবার বান্দরবান গেলে অয়নকে সে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটা জিনিস দেখাবে, অয়ন রীতিমত টগবগিয়ে উঠল। দুটো পাখা থাকলে সে যে তৎক্ষণাৎ উড়াল দিত, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু চাইলেই তো আর সবকিছু করা যায় না, তাই তখনই যাওয়া হলো না তার। সেমিস্টার ফাইনাল চলছে, এটা শেষ হবার আগে কোন ধরনের নড়ন চড়ন সম্ভব নয়। অগত্যা গভীর আগ্রহে পরীক্ষা শেষের প্রতীক্ষায় রইল ও।

কী দেখাবে, এ নিয়ে তাকে কিছুই জানায়নি মিরন। বলেছে সারপ্রাইজ দিতে চায়। ব্যাটাকে ঝাঁটাপেটা করতে পারলে ভাল হত। এভাবে তাকে টেনশনে রাখার কোন মানে হয়?

কী হতে পারে জিনিসটা? কোন নতুন ঝরনা? নাকি হঠাৎ আবিষ্কার হওয়া

নতুন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা? নাকি মাটি খুঁড়ে পাওয়া কোন অ্যান্টিক সামগ্রী?

সম্ভাবনাগুলো নিয়ে বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেও শেষমেশ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি অয়ন। দেখাই যাক না, কী নিয়ে তার জন্য অপেক্ষায় আছে বন্ধু মিরন।

প্রতীক্ষার প্রহর অনেক দীর্ঘ হলেও, একসময় সেটা শেষ ঠিকই হয়। অয়নের পরীক্ষাও শেষ হলো। এরপর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি সে। তাই সেদিনই গাঁটরি বোঁচকা গুছিয়ে রাতের কোচে বান্দরবান রওয়ানা হলো সে। সকাল নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছে যাবে এ আশা নিয়ে সিটে শরীর এলিয়ে চোখ মুদল।

সকালে বাসস্ট্যাণ্ডে তাকে নিতে এল মিরন। বহুকাল ধরেই বান্দরবান এলে বন্ধুর বাড়িতেই ঠাঁই হয় তার, হোটেলে উঠতে দেয়া হয় না তাকে। মিরনের নানা এখানকার মারমা গোত্রের রাজা, সেই সুবাদে রাজকীয় আপ্যায়নই করা হয় তাকে প্রতিবার। অতিথি ভগবান, এমন কোন সংস্কার এদের না থাকলেও আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হয় না কখনও। সবচেয়ে বেশি সমাদর করেন মিরনের মা। তাঁর আয়োজনের ব্যাপ্তি দেখে মাঝেমাঝেই ভিরমি খাবার জোগাড় হয় অয়নের। তার মত সাধারণ একজন মানুষের জন্য এহেন আয়োজন সত্যিই অবিশ্বাস্য।

বহুবার মিরনকে এগুলো করতে বারণ করেও কোন লাভ হয়নি। হাসিমুখে মিরন জানিয়েছে, রান্নাঘরের রানী তার মা, সেখানে কেবল তাঁর হুকুমই খাটে। তাই এসব নিয়ে কথা বলার বিন্দুমাত্র অধিকারও নেই তার। অবশ্য থাকলেও যে মিরন কিছুই বলত না, একথা ভালই জানা আছে অয়নের।

এবারেও তাই রাজকীয় অভ্যর্থনাই পেল অয়ন। নানা পদের খাবার গিলতে-গিলতে যখন তার পেট আক্ষরিক অর্থেই ফাটবার উপক্রম হলো, তখনই কেবল নিস্তার দিলেন মিরনের মা। তারপরও বারবার হতাশ গলায় বলতে লাগলেন, ছেলেটা কিছুই খেল না! আসলে কোন সন্তানের খাওয়া নিয়েই বোধহয় মায়েরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না!

খাবার টেবিল থেকে মুক্তি মিলতেই ওরা সরাসরি চলে এল মিরনের ঘরের পিছনের বারান্দায়। এখান থেকে পিছনের পাহাড় আর উপত্যকাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। তাকালেই মনটা ভাল হয়ে যায়। সত্যি, কত সুন্দর করেই না পৃথিবীটাকে বানিয়েছেন ঈশ্বর। খানিক বাদেই কয়েকটা বাটিতে নানা ধরনের ফলের সালাদ নিয়ে এলেন মিরনের মা। একটা টেবিলে ওগুলো ঢেকে রেখে চটজলদি চলে গেলেন নিজের কাজে। কথা বলতে-বলতে যদি ছেলেদের কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে হয়, তা হলে এগুলো খেতে পারবে ওরা। যদিও আজ সারাদিনে আর কিছু মুখে দিতে পারবে কি না এ নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে অয়নের মনে।

'এবার বল, কী দেখানোর লোভ দেখিয়ে আমাকে ঢাকা থেকে টেনে আনলি?'

'বাজি রেখে বলতে পারি, বন্ধু, এমন জিনিস এ জীবনে তুই আর কোনদিনও দেখিসনি। এমনকী আর কোনদিন দেখবিও না!' মিটিমিটি হাসছে মিরন।

'জলদি বল, ব্যাটা। তর সইছে না আমার।'

'একজন মানুষ। মানুষটা অদ্ভুত, ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

কথাটা শুনে মেজাজ খিঁচড়ে গেল অয়নের। একটা অস্বাভাবিক মানুষ

দেখাতে মিরন তাকে ডেকে এনেছে ঢাকা থেকে! রাস্তাঘাটে অস্বাভাবিক লোকের কি অভাব পড়েছে নাকি? যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই তো অস্বাভাবিকতা নজরে আসে। তারা নিজেরাই কি স্বাভাবিক? কে বলতে পারে।

অয়নের মনের কথাগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারল মিরন। বুঝল, রেগে যাচ্ছে তার বন্ধু। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে, ধীরেসুস্থে বোমাটা ফাটাল সে।

'লোকটার বয়স ছয়শ' বছর।'

দুই

হতভম্ব হয়ে মিরনের দিকে তাকিয়ে রইল অয়ন। কী বলছে এগুলো ও? তার সাথে রসিকতা করছে না তো? কিন্তু মিরনের চেহারায় রসিকতার কোন ছাপ দেখতে পেল না সে, মুখটা গম্ভীর। মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছে ও। কিন্তু তা কী করে হয়?

'তোর মাথা ঠিক আছে তো? কী বলছিস এসব পাগলের মত?'

'পাগলের প্রলাপ নয়, বন্ধু, সত্যিই বলছি আমি। অবশ্য তোকে দোষ দিচ্ছি না, প্রথম শুনে আমারও ঠিক তোর মতই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু শোনার পর আমার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে। একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মত বিষয় অন্তত নয়। তাই তো তোকে ডেকে আনলাম। দু'বন্ধুতে মিলে ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করব বলে।'

কিছুটা শান্ত মনে হলো অয়নকে। 'খুলে বল সবকিছু জলদি।'

'লোকটার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়, বাজারে যাবার পথে যে বড় আমগাছটা আছে, ওটার নীচে। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর হাত পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন তিনি। দু'চোখে অসহায় চাহনি। বিকেলে বাজার সেরে ফিরছিলাম, তখনই তাঁর উপর চোখ পড়ল। নতুন লোক, এলাকায় আগে কখনও দেখিনি, তাই কৌতূহলবশতই এগিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি জানালেন, সত্যিই এদিকটায় নতুন এসেছেন। পাহাড়ের ভিতরদিকটায় একখানা কুঁড়েঘর মতন বানিয়েছেন, কয়েকটা দিন নিভৃতে কাটাবেন বলে। নিজেকে পরিচয় দিলেন একজন লেখক হিসেবে, নতুন উপন্যাসের কাজের জন্যই নাকি কিছুদিনের একাকীত্ব প্রয়োজন তাঁর।

'কিছুক্ষণের আলাপচারিতাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, প্রায় সব ব্যাপারেই অগাধ জ্ঞান ওনার। রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে। তাই পরবর্তীতেও তাঁর সঙ্গ পেতে চাইলাম।'

'উনিও বোধকরি আমাকে খানিকটা পছন্দ করে ফেলেছিলেন, তাই খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কুঁড়েঘরটা পাহাড়ের ঠিক কোথায় আছে। পরদিনই গিয়ে হাজির হলাম তাঁর ডেরায়। এরপর থেকে প্রায় নিয়মিতই যেতে লাগলাম।

সব বিষয়ে এমন সাগরসম পাণ্ডিত্য আছে, এমন কোন লোক আমি এর আগে কোনদিন দেখিনি। মুগ্ধতা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

'একটা বিষয়ে বেশ অবাক হতাম, তাঁকে দেখে বয়স একেবারেই কম মনে হয়। এই ধর বড়জোর ত্রিশ বলা যায়, অথচ কী গভীর জ্ঞান! নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ আছে কি না এটা আমি ধরতে পারিনি। কারণ সব বিষয়েই উনি সমান আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেন। তবে অতিপ্রাকৃত বিষয়েই যে আমার আগ্রহটা সবচেয়ে বেশি, এটা উনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

'একদিনের আড্ডায় হঠাৎ বলে বসলেন তাঁর বয়স সম্পর্কিত এই অদ্ভুত কথাটি। সাথে অবশ্য এটাও যোগ করলেন, এর আগে পৃথিবীর কাউকেই তিনি একথা জানাননি। আমিই প্রথম মানুষ, যাকে বিশ্বাস করে বহুদিনের লুকানো কথাটি তিনি বলেছেন।

'শুনে আমার খুব আজব লেগেছিল। তবে তাঁর প্রতি এতদিনকার গড়ে ওঠা শ্রদ্ধাবোধের কারণে কোন বেফাঁস কথা বলতে পারছিলাম না। তারপর উনি অনেকটা সময় নিয়ে হালকা করে ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দিলেন আমাকে। ওটা শোনার পরেই আমার মনে হলো তাঁর দাবিটা হয়তো আদৌ মিথ্যে নয়।'

'ব্যাখ্যাটা কী?' অবশেষে মুখ খুলল অয়ন। এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল মিরনের বয়ান।

'সেটা তুই ওনার মুখ থেকেই শুনিস। আমি হয়তো ওনার মত গুছিয়ে বলতে পারব না তোকে।'

'উনি বলবেন আমাকে?'

'হ্যাঁ, বলবেন। কারণ আমি ওনাকে বলেছি তোর কথা। আধিদৈবিক ব্যাপার নিয়ে তোর আগ্রহ যে আমার চেয়েও অনেকগুণ বেশি, সেটাও বলেছি। মজার ব্যাপার হলো, উনি তোকে চেনেন। মানে, পত্র পত্রিকায় আধিভৌতিক বিষয়ে তোর বিভিন্ন লেখা পড়েছেন আর কী। তাই যখন বলেছি, তোর সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করতে চাই এবং তোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়, তখন আর অমত করেননি উনি। তোকেও সবকিছু খুলে বলতে রাজি হয়েছেন। এ নিয়ে পরবর্তীতে তুই কোন গল্প ফাঁদলে, তাঁর নাকি মন্দ লাগবে না।'

'উনি নিজে না লেখক বললি?'

'হ্যাঁ, নিজের এই পরিচয়ই উনি দিয়েছেন বটে। তবে তাঁকে কখনও আমি লিখতে দেখিনি কিছু। কে জানে, হয়তো এটা তাঁর সত্যিকারের পরিচয় নয়।'

লোকটার সঙ্গে দেখা করার জন্য রীতিমত অস্থির হয়ে উঠল অয়ন। তক্ষুনি ছুটে যেতে চাইল লোকটার বাড়িতে। কিন্তু বিধি বাম। যাওয়া হলো না তাদের।

বাড়ির উঠানে আদিবাসীদের সভা বসেছে, মধ্যমণি হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করছেন মিরনের নানাভাই। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ডেকে পাঠানো হলো মিরনকে। ভবিষ্যতে সে-ও এই গোত্রের রাজা হতে পারে, এ বয়সে সমাজের সব নিয়ম কানুন শিখে না রাখলে, আর শিখবে কখন?

তিন

দুপুরের খাবারের পর আর দেরি করেনি ওরা, বেরিয়ে পড়েছে লোকটার বাড়ির উদ্দেশে। অনেক দূরের পথ, যেতে মেলা সময় লাগবে। খানিকটা পথ ওরা গেল অটোরিকশায় চড়ে, তারপরেই শুরু হলো পায়ে চলা সরু পথ। কখনও বা দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে, কখনও আবার সরাসরি কোন টিলার উপর দিয়েই এগিয়েছে পথটা। মিরন পাহাড়ি ছেলে, এসব পথে চলাচলেই অভ্যস্ত সে। অবশ্য অয়নেরও তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না পথ চলতে, জীবনে পাহাড়ে-পাহাড়ে সে নিজে তো কম ঘুরে বেড়ায়নি। একসময় শেষ হয়ে গেল পায়ে চলা পথটাও। পথের শেষপ্রান্তের পাহাড়টার উপরেই লোকটার আবাস, নীচ থেকে সহজে সেটা একদমই চোখে পড়ে না। নিভৃতে কাটানোর জন্য তিনি বেশ ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছেন বলা যায়। উঁচু পাহাড়টার উপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সহজেই দৃষ্টি চলে যায়।

ঘরের দরজা বন্ধ, তিনি বাড়ি আছেন কি না কে জানে। এত কষ্ট করে এসে তাঁকে না পেয়ে ফিরে যেতে হলে খুব খারাপ হবে ব্যাপারটা। শেষমেশ অবশ্য বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে, দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলেন। দরজার কবাটে মিরনের টোকার শব্দ শুনে উঠে এসেছেন, চোখে এখনও ঘুমের রেশ রয়ে গেছে।

লোকটাকে দেখে যারপরনাই হতাশ হলো অয়ন। অতি সাধারণ চেহারা, তেমন কোন বিশেষত্বই নেই। বাংলাদেশে না হলেও এই উপমহাদেশেই তাঁর জন্ম। লোকটার চেহারার গড়ন থেকে এটুকু বেশ সহজেই আন্দাজ করা যায়। বয়স বড়জোর পঁয়ত্রিশ হবে, ছয়শ' হবার তো প্রশ্নই আসে না। অয়ন মনে-মনে বলল, তিনি হয়তো ধাপ্পা দিয়েছেন মিরনকে। অথবা মজা করার জন্যই কথাটা বলেছেন, মিরন সেটা ধরতে পারেনি।

লোকটার সঙ্গে অয়নের পরিচয় করিয়ে দিল মিরন। মনে যা-ই থাকুক না কেন, তাঁর চেহারা দেখে অন্তত মনে হলো, ওদের আগমনে অখুশি হননি মোটেও। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলার পরও এতটুকু বিরক্তির আভাস নেই তাঁর মুখটাতে। যদি এটা ভান হয়, মানতেই হবে অনেক বড় অভিনেতা লোকটা।

ঘরের ভিতর থেকে মোড়া এনে ওদেরকে বসতে দেয়া হলো ঘরের বারান্দায়। নিজে বসলেন একটা শীতল পাটিতে। হয় তিনি মেঝেতে বসতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, নয়তো ঘরে আর মোড়া নেই। দ্বিতীয়টা হবার সম্ভাবনাই বেশি। যেহেতু তিনি এখানে একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে এসেছেন, মেহমানদারী করার জন্য পর্যাপ্ত সামগ্রী তাঁর কাছে না থাকারই কথা।

অয়ন খেয়াল করল, নিজের নাম বলেননি উনি ওদেরকে। অয়নের জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন, নাম ভুলে গেছেন! বহুকাল আগে কী নাম রাখা হয়েছিল, তা কি

আর এতকাল পরে মনে থাকে?

সরাসরি লোকটার বয়সের প্রসঙ্গ তুলল না অয়ন, সেটা চূড়ান্ত অভদ্রতা হবে। অন্যান্য বিষয় নিয়ে হালকা কথাবার্তা শুরু করল। বয়সের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করার অনেক সুযোগ রয়েছে হাতে, সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটার প্রতি মুগ্ধতা বাড়তে লাগল অয়নের। মিরন একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই সব ব্যাপারে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর!

অয়ন বুদ্ধিমান ছেলে, নানা বিষয়ে তার নিজের পড়াশোনাও নিতান্ত কম নয়। অসাধারণ মেধা দিয়ে বহু ঘাগু লোককেই অতীতে ঘায়েল করেছে সে। কিন্তু লোকটার সাথে আলাপচারিতায় অয়ন বুঝতে পারছে তার নিজের জ্ঞান কতটা নগণ্য! এমনকী শহরের বড়-বড় প্রফেসররাও কোন বিষয়ে এ লোকটার সমান ধারণা রাখেন না। এত অল্প বয়সে কী করে এতটা বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছেন? প্রকৃতির এক অসামান্য প্রতিভা। তা হলে সভ্য সমাজ ছেড়ে এই বনবাদাড়ে আত্মগোপন করে তিনি কি তাঁর মেধার অপচয় করছেন না? পৃথিবীর সব ভাষা জানেন তিনি, সব। যে-কোন ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, যেন সবক'টাই তাঁর মাতৃভাষা! অনেক ভাষাবিদের সাথে পরিচয় আছে অয়নের, কিন্তু তাঁদের কেউই এ লোকটার মত স্বতঃস্ফূর্ত নন। এত বেশি ভাষার উপর দখল নেই ওঁদের কারও। কীভাবে সম্ভব?

অবশেষে এল সে প্রসঙ্গ, লোকটার বয়স। খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল অয়ন, 'আসলে আপনার বয়স কত?'

একটুও ইতস্তত না করে, স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ছয়শ' বছরের মত হবে।'

অবাক হলো না অয়ন, এ জবাবই আশা করেছিল সে। মিরন তো তাকে আগেই জানিয়েছে এ ব্যাপারে। হয় তিনি এখনও মজা করছেন, নয়তো মানসিকভাবে সুস্থ নন। সম্ভবত প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণেই খানিকটা ভারসাম্য হারিয়ে নিজের বয়স সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছেন। কখনও-কখনও অস্বাভাবিক জিনিয়াসরা জীবনের ছোট-ছোট বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমন কিছুই ঘটেছে। নিজের অজান্তেই নিজেকে অনেক বেশি বয়স্ক ভাবতে শুরু করেছেন। অবচেতন মনে গেঁথে গেছে সেটা, ধীরে-ধীরে দৃঢ় হয়েছে বিশ্বাস। এতদিন বিশ্বাসটা শুধু নিজের ভিতরেই ছিল হয়তো, এখন সেটা অন্যদের কাছেও প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে মুখ খুলল অয়ন। 'স্বীকার করছি, আপনার মত অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কাউকে আগে কখনও দেখিনি আমি। সত্যিই আপনি অবিশ্বাস্য জ্ঞান রাখেন প্রায় সব বিষয়ে। কিন্তু আপনার উপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনি যা বলছেন, সেটা কোনমতেই আপনার সত্যিকারের বয়স হতে পারে না। এতবছর কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, প্রকৃতি সেটা হতে দেবে না কিছুতেই।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইলেন তিনি। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'সত্যি বলতে,

আমি আসলে অমর! স্বাভাবিক মৃত্যু নেই আমার। তাই এতকাল ধরে দিব্যি বেঁচে আছি।'

ভয়ানক চমকে উঠল অয়ন। আর যা-ই হোক, এ জবাব অন্তত আশা করেনি সে। মিরনের দিকে তাকিয়ে দেখল, সে-ও হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোঝা গেল, এ তথ্য তার বন্ধুর কাছেও নতুন, একই রকম ধাক্কা খেয়েছে সে-ও।

চার

'কী বলছেন, আপনি নিজে কি সেটা জানেন?' অজান্তেই গলা খানিকটা চড়ে গেল অয়নের।

কিন্তু বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না এতে উনি। শান্তস্বরে বললেন, 'খুব ভাল করে জানি। তবে আগে আমাকে বলো, কেন আমার বয়সটাকে অবিশ্বাস্য লাগছে তোমাদের কাছে?'

জবাবটা দিল মিরন। 'কারণ ব্যাপারটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। স্বাভাবিক নিয়মে আপনি এতদিন বেঁচে থাকতে পারেন না।'

'কেন পারব না?' বলে উনি তাকালেন অয়নের দিকে। 'মোহাম্মদের আগে কি তোমাদের অন্যান্য নবী রাসূলরা শত শত বছর বেঁচে থাকেননি? তাঁদের অনুসারীরা বাঁচেনি সহস্র বছর?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁরা বেঁচে ছিলেন, কিন্তু সময় পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের গড় আয়ু এসে ঠেকেছে ৬০-৭০ বছরে। তাই কিছুতেই আপনি ছয়শ' বছর বেঁচে থাকতে পারেন না, এটা সম্ভব নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। অয়ন ভাবল, কথা হারিয়েছেন উনি, হয়তো এখনই পরাজয় মেনে নেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। তিনি ভাবছিলেন, ওদেরকে ঠিক কতটুকু বলা যায়। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, সবকিছুই খুলে বলবেন ওদের, কিছুই বাদ দেবেন না। নিজের ভিতর বহুকালের এ রহস্য লুকিয়ে রাখতে-রাখতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। এ ভার একা বহন করা আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

সবসময়ই তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেননি। পাছে একাধিক প্রজন্ম তাঁকে দেখে ফেলে, কেউ বুঝে ফেলে যে বয়স বাড়লেও তাঁর দেহ অপরিবর্তিতই থাকছে! তাই শ্রীলঙ্কায় জন্মালেও কেবলই পালিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এ সুবিশাল জীবনে একটা জিনিসই অঢেল ছিল তাঁর, সময়। সেটা পুরোটাই কাজে লাগিয়েছেন তিনি, জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন জ্ঞান অন্বেষণ করে। বিয়ে করেননি,

সংসার পাতেননি, কোনধরনের মায়াজালেই নিজেকে জড়াননি তিনি। শুধু একটা কাজই নিরবচ্ছিন্নভাবে করে গেছেন, বেঁচে থাকা। রাচার জন্য খাবার অপরিহার্য ছিল না, তাই অর্থ রোজগারের চিন্তায় তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়নি। খুব বেশি প্রয়োজন হলে কোন দেশের ব্যাংকে গিয়ে দিনে দুপুরে হানা দিয়েছেন। অস্ত্রের মুখে সবার চোখের সামনে তুলে এনেছেন একতাড়া নোট। পুলিশ তাড়া করেছে, গুলি ছুঁড়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি, গুলির ক্ষমতা নেই তাঁর কোন ক্ষতি করার। সহজেই পালিয়ে গিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছেন দিন কয়েকের জন্য। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে চলে গেছেন অকুস্থল থেকে অনেক-অনেক দূরে। কিন্তু ঘটনাবিহীন, বন্ধনহীন শুধু বেঁচে থাকার এ জীবন তাঁর আর ভাল লাগছে না মোটেও। নিজের ভিতরের গোপন কথাগুলো কাউকে বলার জন্য বহুকাল ধরেই প্রাণটা আইঢাই করছিল। আজ সুযোগ এসেছে এই দুই যুবককে তাঁর রহস্যের কথা জানানোর। আজ সুযোগ এসেছে নিজের বুকের ভার খানিকটা লাঘব করার। সুযোগ এসেছে দুনিয়াকে সত্যটা আবারও মনে করিয়ে দেবার, যা তারা ইতোমধ্যেই দিব্যি গিলে খেয়ে ফেলেছে!

ভারী গলায় বললেন, 'আমি যদি বলি মানুষের আয়ু কমার জন্য ক্রমবিবর্তন নয়, বরঞ্চ মানুষের নিজের ভুলই দায়ী?'

'কীসের ভুল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অয়ন।

লম্বা দম নিলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কারণ, মানুষ এখন শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে। কিছু বিপথগামী মানুষ আত্মা বিক্রি করে শয়তানের কাছে। কিন্তু মানুষ বেমালুম ভুলে গেছে ঈশ্বরীর কথা, যে তাদেরকে পরমায়ু দিতে সক্ষম!'

'ঈশ্বরী!' চিৎকার করে উঠল মিরন। 'সেটা আবার কে?'

নিশ্চুপ রইল অয়ন। একই প্রশ্ন তারও, যা ইতোমধ্যেই করে ফেলেছে মিরন।

'ঈশ্বর এবং শয়তানের বাইরে মহাপরাক্রমশালী তৃতীয় সত্তা। প্রাচীন মানুষেরা যাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং নিয়মিত ঈশ্বরীর উপাসনাও করত তারা। বিনিময়ে তাদেরকে ঈশ্বরী দিয়েছিলেন অনেক-অনেক বছরের জীবনকাল। তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকত অনেক লম্বা সময় ধরে। যা থেকে বঞ্চিত এ যুগের মানুষেরা। তারা কেউ আর এখন ঈশ্বরীর পূজা করে না।'

'এমন অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা কোত্থেকে মনে আসন গেড়েছে, বলেন তো?' হাসিমুখে বলল অয়ন। আজগুবি এসব গালগল্প শুনতে তার খুব একটা খারাপ লাগছে না।

'ভ্রান্ত ধারণা নয়, অয়ন। তোমার কোন ব্যাপারে ধারণা নেই, তার মানে এই নয় যে ব্যাপারটার অস্তিত্ব নেই। তাই নয় কি? হয়তো বিষয়টার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ। তুমি জানো না বলেই কি সেটা মিথ্যে হয়ে গেল?'

হাসি মুছে গেল অয়নের মুখ থেকে। লোকটার কথায় যুক্তি আছে।

তিনি আবার বললেন, 'তা ছাড়া প্রমাণ হয়ে তো আমিই স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের চোখের সামনে। যে বেঁচে আছে ছয়শ' বছর ধরে এবং সেটা সম্ভব

হয়েছে শুধুমাত্র ঈশ্বরীর দয়ায়।'

'আপনি ঈশ্বরীর আরাধনা করেন?'

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন উনি।

'ঈশ্বরীর ব্যাপারে আমাদেরকে সব খুলে বলবেন, প্লিজ?'

'তোমরা সেটা বিশ্বাস করবে না বলে আগেই মনস্থির করে রেখেছ। তা ছাড়া তুমি মুসলিম, তাই তোমার ধর্মবিশ্বাসের সাথে ব্যাপারটা মিলবে না কিছুতেই, অয়ন। বলে কী লাভ?'

'আমার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধুবান্ধব রয়েছে। তাদের আলাদা ধর্মবিশ্বাস আমাদের বন্ধুত্বে কোনরকম সমস্যা তৈরি করেনি। যার-যার বিশ্বাস তার নিজের কাছে, সেটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার বিশ্বাস আপনার, আমার বিশ্বাস আমার। তা ছাড়া আপনার ঈশ্বরীর কাহিনিটা আমি না হয় একটা মিথ হিসেবেই শুনলাম। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসারই কোন সুযোগ থাকে না তা হলে।'

'ঠিক আছে, বলতে আপত্তি নেই আমার। তবে বলা শেষে, যদি তোমরা চাও, তা হলে আমি প্রমাণ করে দিতে পারব যে আমার কথাগুলো মিথ্যে নয়!'

'তা হলে তো আরও ভাল হয়।'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

ঈশ্বরীর কাহিনি শুনতে তৈরি হলো ওরা। জানা নেই, ভাগ্য তাদেরকে নিয়ে কী খেলার আয়োজন করতে চলেছে।

পাঁচ

'ঈশ্বরীকে সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। দিয়েছেন নিজের সর্বময় ক্ষমতার ঠিক অর্ধেক।' বলতে শুরু করলেন তিনি।

'কেন তাকে সৃষ্টি করতে গেলেন ঈশ্বর? আর করলেনই যদি, তা হলে কেন নিজের সবটুকু ক্ষমতা তাকে দিলেন না?' জানতে চাইল অয়ন।

'সম্ভবত ঈশ্বর একাকীত্বে ভুগছিলেন। নিজের সৃষ্টির সাথে, সেটা মানুষ, জিন কিংবা ফেরেশতা, যা-ই হোক না কেন, তাঁর ক্ষমতা আর জ্ঞানের ছিল বিস্তর ফারাক। তাদের সঙ্গ কাঁহাতক আর তাঁকে আনন্দ দিতে পারে? একান্তে কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ করার সঙ্গী কই? তাই হয়তো তিনি বানিয়েছিলেন ঈশ্বরীকে। দিয়েছিলেন নিজের অর্ধেক জ্ঞান আর ক্ষমতা। আর নিজের সবটুকু ক্ষমতা কি কাউকে কখনও দেয়া যায়? সেটা কি সম্ভব? আর সেটা যদি ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভবও হয়, তা হলেই বা উনি দেবেন কেন? তা হলে আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রইল কই? কেন ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করবেন? তাই তিনি সবটুকু ক্ষমতা দেননি ঈশ্বরীকে। অটুট রেখেছেন নিজের আধিপত্য। ঈশ্বরী, ঈশ্বরের নিষ্কাম সঙ্গী বৈ আর কিছু নয়। ঈশ্বর-ঈশ্বরী সব ধরনের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে।'

নিশ্চুপ রইল দুই যুবক। জানে, লোকটার কথা এখনও শেষ হয়নি, আরও অনেক কিছু বলার আছে।

'ঈশ্বর বসবাস করেন সর্বোচ্চ আসমানে। তাঁর হিসাব-নিকাশ, কথোপকথন শুধুমাত্র আত্মার সাথে। দেহের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর বহু আগেই তিনি সবার আত্মা তৈরি করে এক জায়গায় স্তূপ করে রেখেছেন। তারপর সেখান থেকে একে-একে তাদেরকে পাঠাচ্ছেন দুনিয়ায়। পৃথিবীতে থাকাকালীন তাঁর সাথে তাদের আর কখনওই সরাসরি কথোপকথন হয় না। মৃত্যুর পর তারা আবার ফিরে যায় তাঁর কাছে, ঊর্ধ্ব আকাশে। অপেক্ষায় থাকে মহাপ্রলয়ের, শেষ বিচারের। সেদিন ঈশ্বর তাদের পাপ-পুণ্যের হিসাব নেবেন, দেবেন পুরস্কার অথবা শাস্তি। পাঠিয়ে দেবেন চিরকালের জন্য জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

'আর ঈশ্বরীর আবাস মাটির তলায়, পাতালে। সেখানেই তাঁর বসবাস। আত্মাদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর সব যোগাযোগ কেবলই দেহের সাথে। মানুষের দেহ তৈরি করেন ঈশ্বরী, তাঁর সাম্রাজ্যের মাটি দিয়ে। যোগ করে দেন ঈশ্বরের বানানো আত্মার সাথে, গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। মৃত্যুর পর আবার সে দেহ ফিরে যায় তাঁর অধীনে, মাটির নীচে। দেহটা রেখে আত্মাকে ফেরত পাঠানো হয় ঈশ্বরের দরবারে। মানুষের দেহকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত পরমায়ু দান করার ক্ষমতা ঈশ্বরীকে দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। চাইলেই দুনিয়াতে মানুষকে তিনি অবিনশ্বর করতে পারেন। অতীতে যারা তাঁর উপাসনা করত, তাদের তিনি দিয়েছিলেন শত সহস্র বছরের আয়ু। এখনও কেউ তাঁর আরাধনা করে খালি হাতে ফেরে না, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আমি নিজেই। আমার পুজোতে সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বরী আমায় পুরস্কৃত করেছেন অমরত্ব দিয়ে।

'আকাশ এবং মাটির মধ্যবর্তী জায়গাটায় রাজত্ব শয়তানের। আকাশের উপর যখন আত্মা ঈশ্বরের কাছে থাকে, তখন এদের উপর কোন প্রভাব থাকে না তার। কিংবা যখন মৃত্যুর পর দেহ চলে যায় ঈশ্বরীর কাছে, তখনও সে অসহায়। শুধুমাত্র আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে যখন আত্মা এবং দেহ এক থাকে, তখনই তার উপর প্রভাব খাটাতে পারে শয়তান। চেষ্টা করে মানুষকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীর পথ থেকে বিপথে টেনে নিতে। বানাতে চায় নিজের অনুসারী। দিন-দিন বেড়েই চলেছে তার অনুসারীর সংখ্যা, তবে সেই বোকার দলের জানা নেই, ওটা ভুল পথ। পৃথিবীতে বহুকাল রাজত্ব করে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে শয়তান। ইতোমধ্যেই সে মানুষের মন থেকে ঈশ্বরীর নাম মুছে ফেলতে পেরেছে। যেদিন ঈশ্বরের নাম নেয়ার মতও কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না বসুন্ধরায়, ভয়ানক রেগে যাবেন ঈশ্বর। ঘটাবেন মহাপ্রলয়। শেষ হবে মানবজাতির বহুকাল ধরে সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করার মিছে প্রচেষ্টার।'

'দুর্দান্ত একটা রূপকথা,' কোনমতে বলল মিরন।

মৃদু হাসলেন তিনি। 'যীশু জানতেন ঈশ্বরীর কথা। কিন্তু তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটা!'

'কিন্তু কেন? কেন তিনি জেনেও এতবড় একটা সত্য লুকাতে যাবেন গোটা দুনিয়ার কাছে?' উত্তেজিত গলায় বলল অয়ন।

'এর সঠিক কারণ আমার জানা নেই। তবে সম্ভাব্য দুটো কারণ আমি তোমাদের বলতে পারি। প্রথমত, তিনি মানুষের কাঁধের উপাসনার বোঝাটা আর বাড়াতে চাননি। এক ঈশ্বরকে ডাকার সময়ই পায় না এখনকার সদাব্যস্ত মানুষজন, ঈশ্বরীকে ডাকবে কখন? তা ছাড়া শয়তানকে হয়তো বাড়তি সুবিধা দিতে চাননি যীশু। ঈশ্বরীর অস্তিত্ব প্রকাশ করলে সেটা ব্যবহার করে ঈশ্বরকে অপবিত্র করার নোংরা রটনায় মেতে উঠত শয়তান। তাঁর কুমারী মাতা মেরীকে নিয়েই যথেষ্ট নোংরা কথা ছড়িয়েছে খবিশটা। তাই তাকে আরেকটা সুযোগ দেবার প্রশ্নই আসে না।'

'আর দ্বিতীয় কারণ?'

'দ্বিতীয় কারণটা হলো, ঈশ্বরীকে না ডাকলে, তাঁর আরাধনা না করলে, তেমন কোন ক্ষতি কিন্তু নেই। মানুষের উপর কোন গজব নাযিল করেন না ঈশ্বরী, সে ক্ষমতা ঈশ্বরের। শুধুমাত্র তাঁকে ডাকাই পরকালের পুরস্কার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়। ঈশ্বরীকে ডাকলে, দুনিয়ায় বাড়তি কিছুদিন বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন নগদ প্রাপ্তির সুযোগ নেই। তাই হয়তো দুনিয়ার মানুষের ভালর জন্যই যীশু ঈশ্বরীর কথা গোপন করেছেন।'

'কেন? কী ভাল হলো এতে দুনিয়ার?'

'তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, একদিন দুনিয়া ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যাবে। চারদিকে থাকবে কেবল মানুষ আর মানুষ। অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব, মনুষ্যত্বের অভাব, এগুলো মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। তখন যদি একেকজন মানুষ কয়েকশো বছর ধরে বেঁচে থাকে, তা হলে পরিণাম কী হবে, ভাবতে পার?'

পাথরের মূর্তির মত বসে রইল দুই বন্ধু। মাথার ভিতরটা এলোমেলো লাগছে ওদের। কী শুনছে ওরা এসব? সত্যিই কি আছেন ঈশ্বরী? দিতে পারেন অমরত্ব?

ছয়

'আপনি তা হলে অমরত্ব লাভের জন্যই ঈশ্বরীর উপাসনা করতেন?' অস্বস্তিকর নীরবতাটুকু কাটানোর জন্য বলল অয়ন।

মাথা কাত করে সম্মতি জানালেন তিনি।

'তবে শুরুর দিকে অমরত্ব লাভের কোন বাসনা সত্যিই আমার ছিল না। জানতামই না যে ওটা পাওয়া সত্যি সম্ভব। ঈশ্বরীর কাছে আমার প্রার্থনা ছিল মূলত একটা দীর্ঘ আয়ু। যেন অনেকটা সময় ধরে এ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পৃথিবীটাকে প্রাণভরে উপভোগ করতে পারি। তবে আমি যখন আরাধনা শুরু

করি, ততদিনে দুনিয়ার মানুষ ঈশ্বরীকে প্রায় ভুলেই গেছে। তাই আমার উপর বেজায় খুশি হয়ে ঈশ্বরী আমাকে সরাসরি অমরত্বই দিয়ে দিলেন। তবে এখন আর এই অবিনশ্বর জীবন আমার ভাল লাগছে না। আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিরক্ত, এহেন অদ্ভুত জীবনের ভার বহন করতে-করতে।'

'কেন? যুগ-যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষের চরম আরাধ্য বস্তুটি কেমন করে আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মিরন।

'জীবনের আনন্দ এত বেশি, কারণ যে-কোন মুহূর্তে মরণের মাধ্যমে সেটার পরিসমাপ্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে। মৃত্যুভয়হীন একটা অনন্ত জীবন, মানুষকে ক্লান্ত বিরক্ত করতে পারে বৈ কী!'

'কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন, অতীতে মানুষ শত সহস্র বছর বেঁচে থাকত।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে তখন জীবন আনন্দময় ছিল। কারণ দীর্ঘ হলেও, সে জীবনের একটা শেষ ছিল। এবং তারা কেউই জানত না যে, ঠিক কখন সেটার সমাপ্তি ঘটবে। এ অনিশ্চয়তাই তাদের জীবনযাপনকে দিত পরিপূর্ণ তৃপ্তির আস্বাদ। আর তখন তাদের আশপাশের সব মানুষই একইরকম দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকত। তাই বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিয়েই মানুষ একধরনের মায়ার বন্ধনে জীবন কাটাত। আমার সে সুযোগ কোথায়? কোন মায়া নেই, কোন ভালবাসা নেই, শুধুই নিরন্তর বেঁচে থাকা। ক্লান্তি না লেগে উপায় কী?'

'ঈশ্বরীর আরাধনা বন্ধ করে দিন, তা হলেই তো হয়।' কোনমতে বলল অয়ন।

'ঈশ্বরী একবার কাউকে বর দিলে, সেটা আর সহসা ফিরিয়ে নেন না। গত একশ' বছরে আমি একটিবারের জন্যও তাঁকে ডাকিনি। কিন্তু উনি এতে ক্রুদ্ধ হননি। একবার সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তকে যে বর দিয়েছেন দেবী, তা আর ফিরিয়ে নেন কী করে? তা ছাড়া তিনি আমার শারীরিক উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন, বিনিময়ে গোটা শরীরকে করেছেন অবিনশ্বর। উপঢৌকন যেহেতু ফিরিয়ে দেননি, তাই বিনিময়টুকুও আর ফিরিয়ে নেননি।'

'মানে?'

ওদের চোখের সামনে দু'হাত তুলে ধরলেন লোকটা। তারপর সামনে বাড়িয়ে ধরলেন পা দুটো। অবাক হয়ে দেখল ওরা, হাত পায়ের কোনটারই কনিষ্ঠ আঙুলগুলো নেই!

'তোমাদের আগেই বলেছি, মানুষের আত্মার একরত্তি মূল্যও নেই ঈশ্বরীর কাছে, তিনি দাম দেন কেবল দেহকে। তাই দেহের অংশবিশেষ দিয়েই উপাচার সাজিয়ে তাঁকে নৈবেদ্য দিয়েছি। একসময় দেবী সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাকে ভক্তরূপে গ্রহণ করেছেন।'

পুরো বোবা হয়ে গেল অয়ন আর মিরন। মুখে কোন কথাই ফুটছে না ওদের। কী বলবে?

উনি বলে চললেন, 'ঈশ্বরীর আরাধনা করার সময় বলি দেয়া প্রত্যঙ্গগুলো আমাকে আর ফেরত দেননি তিনি। তবে ওগুলো ছাড়া, বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুৎপাদনে সক্ষম এখন আমার শরীর।'

'বলেন কী!' হতভম্ব হয়ে বলে উঠল মিরন।

'যা সত্যি, তা-ই বলছি। প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যে-কোন কারণে আমার দেহের কোন অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, সাথে-সাথেই সেটা নতুন করে গজিয়ে যায়। দেহের প্রত্যেকটা কোষেরই এ ক্ষমতা আছে। তাই বছরের পর বছর আমার শরীরের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সেলুলার এজিং নামের কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কখনও যেতে হয়নি আমাকে। তোমরা জানো যে, মানুষের মস্তিষ্কের কোষগুলো একবার নষ্ট হয়ে গেলে, সেটা আর নতুন করে তৈরি হয় না। একই কথা প্রযোজ্য স্নায়ু কোষগুলোর ক্ষেত্রেও। তবে আমার ক্ষেত্রে এরাও পুনরুৎপাদিত হয়। অমরত্ব পাবার পর থেকে আমার মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যা এক্‌বিন্দু কমেনি।'

'তারপরেও কিন্তু আপনি নিজের নাম মনে রাখতে পারেননি।' মনে করিয়ে দিল অয়ন।

'হ্যাঁ। সেটা আমি ইচ্ছে করেই মনে রাখিনি। নানা রকম প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে আমার মস্তিষ্কের প্রায় প্রতিটি নিউরন পরিপূর্ণ। নিজের নামের মত অপ্রয়োজনীয় তথ্য মনে রেখে আমি কেন নিউরনের মূল্যবান জায়গা অপচয় করতে যাব? এই যে তোমরা আমার নাম জানো না, এতে কি আমাদের আলাপচারিতায় কোন সমস্যা হচ্ছে?'

চট করে জবাব দিতে পারল না ওরা। সত্যিই কোন সমস্যা হচ্ছে না। নামের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা এগিয়ে চলেছে, নাম নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন কারও।

'সত্যিই কি আপনার শরীর রিজেনারেশন করতে পারে?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল অয়ন।

মৃদু হাসলেন তিনি। বসা থেকে উঠে গিয়ে ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খানিক বাদে যখন ফিরে এলেন, তাঁর হাতে একখানা নতুন ভোজালি রীতিমত চকচক করছে।

এ পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় সবাইকেই ভোজালি ব্যবহার করতে হয়। ঝোপঝাড় কেটে পথ করে সামনে এগোতে হলে, ভোজালির কোন বিকল্প নেই।

ওদের চোখের সামনে নিজের বাম হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর আচমকা তাদেরকে ভয়ানক চমকে দিয়ে, ডান হাতে ভোজালি ধরে একটা কোপ বসিয়ে দিলেন বাম হাতের কবজি বরাবর! মুহূর্তেই কবজি থেকে পরের অংশটুকু কেটে খসে পড়ল মাটিতে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

নিজের অজান্তেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ওরা।

সাত

সীমাহীন আতঙ্কে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা। ওদের হতভম্ব চোখের সামনেই লোকটার হাতের কাটা জায়গাটা থেকে ধীরে-ধীরে নতুন করে হাত গজাতে লাগল। দেখতে-দেখতেই হাতটা ঠিক আগের মত হয়ে গেল, এতটুকু পার্থক্যও নেই! যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে মাটি থেকে কাটা অংশটুকু তুলে নিয়ে দূরে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর হাসিমুখে তাকালেন ওদের দিকে। 'এবার বিশ্বাস হলো?'

দ্রুত মাথা নেড়ে সায় জানাল ওরা। মুখ দিয়ে কোন শব্দ করার সামর্থ্য নেই ওদের এখন। গলার ভিতরটা শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে গেছে, একটু আগে দেখা দৃশ্যটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না। চোখের সামনে দেখেও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। কী করবে এখন ওরা? নিজের চোখকেই কি অবিশ্বাস করবে? যা দেখল, কীভাবে সম্ভব এটা?

আবারও চাটাইয়ের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন তিনি। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চোখ মুদলেন। ওদেরকে স্বাভাবিক হবার সময় দিচ্ছেন, বিস্ফারিত নেত্রে এখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা অপলক।

কিছুক্ষণ একনাগাড়ে নিজে-নিজেই বকবক করে চললেন উনি। বিভিন্ন দেশে তাঁর দেখা মজার-মজার ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। কোন্ দেশের মানুষ নিজেদের সবচেয়ে বেশি সভ্য ভাবে, কিন্তু আসলে তারা কতটা অসভ্য, এসবের বিবরণ দিতে গিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়লেন তিনি। ধীরে-ধীরে পরিবেশের গুমট ভাবটা কেটে গেল। অয়ন আর মিরনও স্বাভাবিকভাবে আলোচনায় অংশ নেয়া শুরু করল। কিছুক্ষণ পর আবারও মূল আলাপে ফিরল অয়ন, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন? একান্তে নিভৃতে কয়েকটা দিন কাটানোই কি একমাত্র উদ্দেশ্য?'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইলেন উনি, মাটির দিকে একমনে তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ পর মুখ তুলে চাইলেন ওদের দিকে। 'এটা একটা কারণ বটে, তবে প্রধান কারণ নয় মোটেও। আমি এখানে এসেছি এখানকার ঈশ্বরীর উপাসনালয়টার হালহকিকত যাচাই করতে!'

'মানে?' একযোগে বলে উঠল ওরা। 'এখানেও আছে ঈশ্বরীর উপাসনালয়! সত্যি?'

মিটিমিটি হাসছেন লোকটা। 'পৃথিবীর সবখানে এখনও ঈশ্বরীর কিছু প্রার্থনালয় অবশিষ্ট রয়েছে। সবচেয়ে বেশি আছে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে। বেশ কয়েকটা আছে সাইবেরিয়ায়। ভারতে আর শ্রীলঙ্কায় আছে বেশ কিছু। তোমাদের দেশে, এই বান্দরবানেও আছে একটা। কক্সবাজারের কাছাকাছি সাগরের একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপেও ছিল একটা, কিন্তু দু'শ' বছর আগে সেটা তলিয়ে গেছে

বঙ্গোপসাগরের বুকে।'

'এখানে আছে! কোথায়?' ফিসফিস করে বলল মিরন। যেন জোরে বললেই সেটা ছুটে পালিয়ে যাবে।

হাত তুলে দূরের একসারি টিলা দেখালেন তিনি। 'ওখানে।'

সবুজে ছাওয়া কয়েকটা একই আকৃতির টিলা দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা ঠেকিয়ে। এদের পায়ের কাছ দিয়ে রূপালী ফিতার মত বয়ে চলেছে একটা ছোট পাহাড়ি নদী। শেষ বিকেলের সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে এখন ওটা। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, যেন পৃথিবীর কোন অংশ নয়, স্বর্গ থেকে একটা টুকরো তুলে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানটায়।

অপলক কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইল ওরা। মিরন জানে, জায়গাটা এখান থেকে কাছে দেখালেও আদৌ খুব একটা কাছে নয়। ওদিকটায় কখনও যায়নি সে, আদিবাসীরা কেউই যায় না। বহুকাল আগে থেকেই ওদিকে যাওয়া বারণ তাদের গোত্রের সবার জন্য। কিন্তু ঠিক কী কারণে এ নিষেধাজ্ঞা, এ ব্যাপারে কেউ কোনদিন খোলসা করে কিছু বলেনি। তা হলে কি তাদের পূর্বপুরুষেরা জানত ঈশ্বরীর কথা? জানত ঈশ্বরীর মন্দির আছে ওখানে? নিজেদের দেবদেবীর সাথে সংঘর্ষ হবার ভয়েই কি তাদের কাছে লুকানো হয়েছিল বিষয়টা? না হয় কেন ছিল এ নিষেধাজ্ঞা?

'আমি ওখানে যেতে চাই। দেখতে চাই মন্দিরটা।' অবশেষে মুখ খুলল অয়ন।

'তুমি?' মিরনকে প্রশ্ন করলেন তিনি। কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছেন, বিষয়টা নিয়ে তার মনে সংঘাত চলছে। সত্যিই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল মিরন। একদিকে সম্পূর্ণ নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণ, অন্যদিকে হাজার বছর ধরে চলে আসা বাপ-দাদাদের পুরানো সংস্কার। কোন্ পথে যাবে সে?

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। শিক্ষিত হয়েও যদি কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়, তা হলে আর শিক্ষার মূল্য রইল কই?

'যাব, আমিও যাব।' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল মিরনের কণ্ঠ।

ঠিক হলো পরদিন সকালেই ঈশ্বরীর মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করবে ওরা। আজ আর যাওয়ার সময় নেই, প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। এখন ফিরতে হবে মিরনের বাড়িতে, সেটাও নিতান্ত কম দূরে নয়।

ফেরার পথে দু'বন্ধুতে বলতে গেলে তেমন কোন কথাই হলো না। দু'জনের মন জুড়ে রয়েছে একটাই নাম—ঈশ্বরী।

আট

পরদিন সকাল-সকালই লোকটার ডেরায় পৌঁছে গেল ওরা। ভোরে উঠে কোনমতে মুখে দুটো খাবার গুঁজেই বেরিয়ে পড়েছে। ঈশ্বরীর মন্দিরটা দেখার জন্য তর সইছে না যেন ওদের। লোকটা তৈরি হয়েই ওদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন, তাই মন্দিরের উদ্দেশে রওয়ানা হতে বেশি একটা সময় লাগল না তাদের।

তিনজনই হাতে ভোজালি নিয়েছে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হবে। এদিকটায় লোক চলাচল নেই একদম, তাই পায়ে চলা পথও নেই। লোকটা পিঠে একখানা ঝোলা ঝুলিয়ে নিয়েছে, কী আছে ওতে কে জানে!

উপর থেকে দূরত্বটা নিতান্ত কম মনে হলেও, পথে নেমে ওরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে কতটা দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে, আর সেটা কতটা দুর্গম এবং বিপদসংকুল।

চলতে বেশ পরিশ্রম হচ্ছে ওদের, গা বেয়ে টপাটপ ঘাম ঝরছে। পাহাড়ি ঝোপের কাঁটা লেগে শরীরের এখানে-ওখানে চামড়া ছড়ে যাচ্ছে। কখনও আবার পা জড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি লতায়। কিন্তু এসব বাধা মোটেও কেয়ার করছে না ওরা। দুর্দমনীয় ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের পানে। যত জলদি ওখানে পৌঁছনো যায়, তত বেশি সময় ধরে মন্দিরটা ঘুরে-ফিরে দেখা যাবে।

কয়েকটা পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে অবশেষে ওরা পৌঁছে গেল সংকীর্ণ পাহাড়ি নদীটার তীরে। প্রস্থে তেমন একটা বেশি না হলেও নদীটা ভীষণ গভীর। আর স্রোতও প্রচণ্ড। টলটলে স্বচ্ছ পানি, তলার বালি-পাথর উপর থেকে স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে। দু'-একটা ব্যাঙ ভাসতে দেখা গেলেও পানিতে কোন মাছের দেখা পাওয়া গেল না।

এমন খরস্রোতা নদী কীভাবে পার হওয়া যায়, ভেবে-ভেবে হয়রান হলো ওরা, কিন্তু কোন উপায় বের করতে পারল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে নদীটার তীর ধরেই হাঁটতে লাগল, যদি কোথাও নদীটা অনেক বেশি সংকীর্ণ হয়ে আসে, তা হলে লাফিয়েই পার হওয়া যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ভাগ্য সহায় হলো, পার হওয়ার উপায় পাওয়া গেল। মোটা কাণ্ডের একখানা নারিকেল গাছ আড়াআড়ি পড়ে আছে নদীটার উপর। ওটার উপর দিয়ে হেঁটে, সহজেই ওরা পার হয়ে গেল নদীটা। পানির ছলকানিতে কাণ্ডের একটা জায়গা অনেক পিচ্ছিল হয়ে ছিল। ওখানটায় তাল হারিয়ে ফেলেছিল অয়ন, আরেকটু হলেই মুখ থুবড়ে পড়ত ও নদীতে। সময়মত লোকটা পিছন থেকে তাকে ধরে ফেলায়, এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে সে।

লোকটার পিছন-পিছন ওরা এসে হাজির হলো একটা বদ্ধ উপত্যকায়।

সামনে দুটো অনুচ্চ টিলা, গায়ে গা লাগিয়ে এগোনোর পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু এটা দেখেও থামলেন না তিনি, এগিয়ে গেলেন দুই পাহাড়ের সংযোগস্থলটার দিকে।

ওরা অবাক হয়ে দেখল, হাতের ভোজালি দিয়ে ওখানকার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদেরকে আরও খানিকটা অবাক করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল একখানা পাথরের প্রাচীর। টিলার গায়ে শুধুই একটা প্রাচীর, আর কিছু নেই! তা হলে কি কালের আবর্তে বাকি মন্দিরটা পাহাড়ের ভিতরে হারিয়ে গেছে?

ওদের ভাবনাটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন উনি। ইশারায় কাছে ডাকলেন দু'জনকে।

প্রাচীরটার কাছাকাছি যেতেই ওদের চোখে পড়ল প্রাচীরটার উপরের দিকে দু'পাশে দুটো সাদা মতন পাথর বসানো রয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এগুলো মূল প্রাচীরের অংশ নয়, পরবর্তীতে আলাদা করে লাগানো হয়েছে।

অয়নকে এদের একটাতে চাপ দিতে বলে নিজে অন্য পাথরটা দু'হাতে চেপে ধরলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি পাথরটায় চাপ দেয়া শুরু করল অয়ন, কিন্তু কিছুই ঘটল না! পরক্ষণে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিল অয়ন। এবারে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল, ওকে অবাক করে দিয়ে পাথরটা প্রাচীরের গায়ে খানিকটা দেবে গেল। চমকে হাত সরিয়ে নিল ও। পাশে তাকিয়ে দেখল, লোকটাও তাঁর সামনের পাথরটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছেন।

ওদের ছানাবড়া চোখের সামনেই প্রাচীরটা ঘড়ঘড় শব্দ তুলে একপাশের দেয়ালের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল। যেন আরব্য রজনীর আলিবাবার চিচিংফাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা!

ঘটনার আকস্মিকতায় পুরো হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। তবে লোকটাকে দেখে মনে হলো না যে বিন্দুমাত্র অবাক হয়েছেন। তাঁর জানা ছিল এমনটাই ঘটবে।

বিহ্বলতা কাটতেই ভয়ে-ভয়ে ভিতরে উঁকি দিল ওরা। একপ্রস্থ সিঁড়ি, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে নেমে গেছে মাটির গভীরে। ভিতরটা অন্ধকার, তাই বোঝা যাচ্ছে না নীচে ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ওটা। পরক্ষণেই কথাটা মনে পড়ল ওদের। ঈশ্বরীর বসবাস পাতালে, তাই তাঁর উপাসনালয় যে মাটির গভীরে হবে, এটা আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল ওদের।

নয়

পিঠের ঝোলা থেকে তিনটা মোমবাতি বের করে জ্বাললেন তিনি। তারপর একটা নিজে রেখে বাকিগুলো ওদের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'চলো, নামি।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে শুরু করলেন তিনি। ওরাও সঙের মতন দাঁড়িয়ে না থেকে দ্রুত পা চালাল। মোমবাতির আলোয় ভিতরের জমাটবাঁধা আঁধারের অনেকখানি কেটে গেছে। আবছা আলোয় নীচে তাকিয়ে কেবল সিঁড়ি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না ওদের। যতদূর চোখ যায় শুধু সিঁড়ি আর সিঁড়ি। যেন একেবারে পৃথিবীর তলায় নিয়ে যাবে ওদের। নামতে অবশ্য খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। সিঁড়িগুলো খুব একটা খাড়া নয়, তা ছাড়া ছাদও বেশ খানিকটা উঁচুতে। সোজা হয়েই নামতে পারছে ওরা, ছাদ মাথায় ঠেকে যাচ্ছে না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ পর-পরই সাধারণ সিঁড়ির চেয়ে অনেক বিশাল একেকটা সিঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত নামার সময় বিশ্রামের জন্যই বানানো হয়েছে ওগুলো।

কোন রেলিং নেই, তাই একপাশের দেয়ালে হাত রেখে নামতে হচ্ছে ওদের। একবার পা ফসকে গেলে গড়াতে-গড়াতে কোথায় চলে যাবে কে জানে! দেয়ালটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে, ভেজা। হাত দিলে শরীরটা ঘিনঘিন করে ওঠে। কিন্তু আর কোন উপায় না থাকায় ওটাকেই অবলম্বন করে নামতে হচ্ছে ওদের।

ওরা যখন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে প্রায়, ঠিক তখনই শেষ হলো সিঁড়ি। বিশাল এক ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়িটা। আধুনিককালের অডিটোরিয়ামের মত বিরাট ঘরটা, জোরে কথা বললে প্রতিধ্বনি হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, ঘরটা অন্যান্য সাধারণ ঘরের মত চারকোনা নয়, পুরো গোল। যেন বিশাল একখানা গোলাকার ইনডোর স্টেডিয়ামে এসে ঢুকেছে ওরা! ঘরটা প্রায় ফাঁকা, মালামাল নেই বললেই চলে। শুধু মাঝখানে বিরাট একখানা বেদী, তবে সামনে কোন প্রতিমা নেই। সম্ভবত বেদীটার উপর বসেই ঈশ্বরীর পূজা করত লোকে। বেদীটার পাশেই পড়ে আছে বিশালাকার একটা বাক্স। ঢাকনা দেয়া, কালের আবর্তে কালচে হয়ে গেছে বাক্সটার রঙ। এ ছাড়া পুরো ঘরটায় আর কিছুই নেই।

অবাক করা ব্যাপার, কোথাও একরত্তি মাকড়সার ঝুলও ঝুলছে না! টিকটিকি, তেলাপোকা, নিদেনপক্ষে একটা পিঁপড়েও নেই ঘরটায়! যেন অশুভ কিছুর ভয়ে এখান থেকে লেজ গুটিয়ে সদলবলে পালিয়ে গেছে জীবন্ত প্রাণীর দল। কিংবা জায়গাটা মহা পবিত্র কোন জায়গা, কারও অধিকার নেই ওটা নোংরা করার!

'এটাই ঈশ্বরীর মন্দির?' জিজ্ঞেস করল মিরন।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তাঁর দু'চোখে কীসের যেন ঘোরলাগা দৃষ্টি।

'ঈশ্বরীর কোন প্রতিমা নেই কেন?' এবারের প্রশ্নটা অয়নের।

'ঈশ্বরীকে কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর প্রতিমা বানাবে কেমন করে? ওই বেদীটার উপর বসেই তাঁর আরাধনা করা হত। ওখানেই উৎসর্গ করা হত নিজেদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। কখনও সে নৈবেদ্য গ্রহণ করতেন ঈশ্বরী, কখনও করতেন না। উনি গ্রহণ করলে, সাথে-সাথেই বেদীর উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত ভক্তের দেয়া ভেট।'

'ওই বাক্সটায় কী আছে?'

জবাব দিলেন না তিনি। এগিয়ে গেলেন বাক্সটার দিকে। ঢাকনাটা সরানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। বেজায় ভারী ওটা। অন্যরাও এসে হাত লাগাল। তিনজনের শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো ওটা, খুলে গেল ঢাকনাটা।

'বাক্সটা সোনার তৈরি।' বললেন উনি।

চমকে উঠল অয়ন। সত্যি নাকি?

হাত দিয়ে ঘষে বাক্সটার একপাশের দেয়াল থেকে তুলে ফেলল কালচে ধুলোর আস্তরণ। বেরিয়ে পড়ল উজ্জ্বল সোনালী রঙের ধাতব দেয়াল। লোকটা মিথ্যে বলেননি, সত্যিই বাক্সটা সোনা দিয়ে বানানো।

বাক্সটার ভিতরে উঁকি দিল ওরা, ওটাও প্রায় খালিই বলা যায়। শুধু তলায় বিছিয়ে আছে একখানা পাতলা ধাতুর পাত। গোল, বিশালাকার। আর বাক্সের কোনার দিকটায় পড়ে আছে ছোট দুটো নিরেট পিরামিড। তাতে বিজাতীয় নকশা আঁকা। ওগুলো বের করে হাতে নিলেন তিনি। ধাতুর পাতটাও বের করে মেঝেতে বিছিয়ে দিলেন। কাউকে বলে দিতে হলো না, সবগুলো জিনিসই খাঁটি সোনার তৈরি। ওরা অবাক হয়ে দেখল, ধাতব পাতটায় বিরাট একটা জ্যামিতিক আকৃতি আঁকা। একটা লাল রঙের পেন্টাকল।

'কী হয় এসব দিয়ে?' জানতে চাইল অয়ন।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। যেন জবাব দেয়া ঠিক হবে কি না ভাবছেন। তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'এগুলো দিয়ে ডেকে আনা যায় ঈশ্বরীকে।'

দশ

ওরা প্রথমে ভাবল হয়তো ভুল শুনেছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই। এ কী করে সম্ভব? স্বয়ং ঈশ্বরীকে হাজির করা, এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে?

'আপনি সত্যি বলছেন?' কোনমতে বলল মিরন।

'হ্যাঁ। ডেকে আনা সম্ভব ঈশ্বরীকে। তবে কাউকে কোনদিন ডেকে আনতে দেখিনি। এনেছিল বলে শুনিওনি। তবে জানি ডাকার পদ্ধতিটা কী।'

'কিন্তু কেন একজন সাধারণ ভক্তের ডাকে হাজির হবেন তিনি? তা হলে কি স্বয়ং ঈশ্বরকেও ডেকে আনা সম্ভব?'

'না। ঈশ্বরকে ডেকে আনা সম্ভব নয় মোটেও। তাঁকে প্রতিনিয়ত ডাকছে লক্ষ কোটি অনুরাগী। ক'জনের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হবেন তিনি? একই সময় তো তাঁকে অন্য ভক্তরাও ডাকবে। তবে ঈশ্বরীকে ডাকে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ। এখন তো সে সংখ্যাটা একেবারেই নগণ্য। হয়তো সারা পৃথিবীজুড়ে

আমার মতন অল্প ক'জন ঈশ্বরীভক্তই কেবল খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সশরীরে হাজির হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব। তা ছাড়া আগেই তো বলেছি, তাঁর কোন কাজে কোন জটিলতা নেই। তিনি নিজে যেমন সরল, তাঁর সংশ্লিষ্ট সবকিছুই সরল।'

'আপনি কি তাঁকে ডাকবেন আজ?'

চমকে উঠলেন তিনি। কী করে বুঝে ফেলল ছেলেটা?

'হ্যাঁ। আমি আসলে এজন্যই এখানে এসেছি। তাঁকে ডাকব আমি, তারপর তাঁর বর তাঁকে ফিরিয়ে নেবার অনুরোধ করব। এ অহেতুক বেঁচে থাকার জীবন আমি আর চাই না।' মৃদুস্বরে বললেন লোকটা। ছেলেদের কানে কণ্ঠটা খানিকটা কাঁপা-কাঁপা শোনাল। আবেগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইল সবাই। তারপর মুখ খুলল অয়ন, 'পদ্ধতিটা কেমন?'

'একদমই সহজ। বলেছিই তো, ঈশ্বরীর সবকিছুই জটিলতামুক্ত। ওই ধাতুর পাতে আঁকা পেন্টাকল আর নকশাকাটা নিরেট পিরামিডগুলোই ঈশ্বরীর আগমনের পথ খুলে দেবে। তাঁর সাথে যোগ হব আমি, হয়তো হাজির হবেন ঈশ্বরী।'

'আমরা থাকতে পারব না?'

মুখ তুলে তাকালেন উনি। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না। তোমরা চলে যাবার পর কাজটা শুরু করব আমি। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য। খুব ভাল লেগেছে তোমাদের দু'জনের সঙ্গ আমার। সাহসী ছেলে!'

'কিন্তু আমরা থাকলে অসুবিধা কী? আমরাও না হয় দেখলাম ঈশ্বরীকে।' অনুনয়ের সুরে বলল অয়ন।

'না, কাজটা বিপজ্জনক। আমি আদৌ জানি না ঈশ্বরী আসার পর ঠিক কী ঘটবে। তোমাদের ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।'

চট করে কোন জবাব মাথায় এল না অয়নের। লোকটার কথায় যুক্তি আছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে, সবকিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু এরপরের ধাপটুকু তাঁর কাছেও অচেনা। সেখানে ঝুঁকি না নেবার সিদ্ধান্তটাই বরঞ্চ স্বাভাবিক, বেশি যৌক্তিক।

'অন্তত ডাকার পদ্ধতিটা কি আমাদের জানানো যায়?'

'হ্যাঁ, তা যায়। যদি তোমরা কথা দাও, নিজেরা কোনদিন এটা করার চেষ্টা করবে না।'

মাথা কাত করে সায় জানাল দু'জনেই, নিজেরা চেষ্টা করতে যাবে না।

'বাক্সটা আসলে ঈশ্বরীর পৃথিবীতে আগমনের একটা গুপ্তপথ। মেঝেতে বিছানো পেন্টাকলটার সাহায্যে সেটা খোলা যাবে। পেন্টাকলের দুই বাহুতে ওই দুটো পিরামিড রাখলেই সাথে-সাথে খুলে যাবে পথটা। তারপর বাকি তিন বাহুতে তিনজন অনুসারী দাঁড়ালেই পেন্টাকলটা ঘুরতে শুরু করবে। এর পর-পরই আসার কথা ঈশ্বরীর।'

'কিন্তু আপনি বাকি দু'জন অনুসারী পাবেন কোথায়?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মিরন।

মুচকি হাসলেন তিনি। 'আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি যে ঈশ্বরীর কাছে আত্মার কোন মূল্য নেই, মূল্য আছে শুধু দেহের। তাই আমার দেহের যে-কোন দুটো অংশ কেটে পেন্টাকলের দুই বাহুতে বসিয়ে দেব। কাটার সাথে-সাথেই আমার দেহ সে অংশগুলো পুনরুৎপাদন করবে। এরপর আমি নিজে দাঁড়াব সর্বশেষ বাহুটায়। হয়ে গেল পেন্টাকলের পাঁচটা বাহুর চাহিদা পূরণ।'

চুপ করে রইল ছেলেরা। বুঝতে পারছে, বিষয়টা অসম্ভব নয়।

'এবার তোমরা যাও। কিছুক্ষণ আমার জন্য পাহাড়ের গোড়ায় অপেক্ষা করতে পার। অল্পক্ষণের ভিতর যদি না ফিরি, তা হলে বাড়ি ফিরে যেয়ো। ভুলেও কখনও আর এখানে ফিরে এসো না।'

যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না ওদের। কিন্তু থাকার মত কোন ছুতোও খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ বলে উঠল অয়ন, 'আচ্ছা, আপনি বললেন পিরামিড দুটো পেন্টাকলের দুই বাহুতে বসালেই ঈশ্বরীর আগমনের পথটা খুলে যাবে। তা হলে ওই আগমনী পথটা কি আমরা একবার দেখতে পারি?'

হাসতে-হাসতে মাথা নাড়লেন উনি। ছেলেগুলো বড্ড বেশি একগুঁয়ে, বড্ড বেশি নাছোড়বান্দা। 'এসো। দেখে যাও। তার পর-পরই কিন্তু তোমরা বিদায় নেবে। এরপর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না তোমাদের।'

পেন্টাকলের দুই বাহুতে পিরামিড দুটো রাখলেন তিনি। খেয়াল রাখলেন কোন অংশ যেন বাহুর বাইরে বেরিয়ে না থাকে। তারপর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছুই ঘটল না! চোখে প্রশ্ন নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল ছেলেরা।

'একবার বাক্সটার ভিতর উঁকি দিয়ে দেখো এখন।' হেসে বললেন তিনি।

চটজলদি পা চালিয়ে বাক্সটার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ওরা। মুহূর্তেই বিস্ময়ে পুরোপুরি জমে বরফ হয়ে গেল। এ কী করে সম্ভব! বাক্সটার তলা বলতে এখন আর নেই কিছু। নীচে যতদূর চোখ যায় শুধু শূন্য আর শূন্য। খুলে গেছে পাতালের সাথে সরাসরি সংযোগ সড়ক! এ পথেই পৃথিবীতে এসে হাজির হবেন ঈশ্বরী।

একে অপরের দিকে তাকাল ওরা। চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল দু'বন্ধুতে। স্পষ্ট বুঝতে পারল ওরা একে অন্যের মনের ভাবনা। দৃঢ় পায়ে লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। জানাল ওদের সিদ্ধান্ত, ঈশ্বরীকে ডাকার সময় ওরাও থাকবে। এতে যা হয় হোক, পরোয়া করে না ওরা। পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েই ঈশ্বরীকে দেখার এহেন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় ওরা। অনেকক্ষণ ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন লোকটা। সম্ভাব্য বিপদ-আপদ সম্পর্কে হুমকি-ধমকি দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ানো গেল না ওদের। শেষমেশ বাধ্য হয়েই হাল ছেড়ে দিলেন তিনি, এমন জেদি ছেলেদের নিরস্ত করা সম্ভব নয় কোনমতেই।

হাতের মোমবাতিগুলো বেদীতে রেখে ধীরপায়ে পেন্টাকলের বাকি তিন বাহুতে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর নড়ে

উঠল পেন্টাকল, শুরু হলো ঘূর্ণি। প্রবল গতির ঘূর্ণনে চকিতেই ওদের সামনে থেকে সব দৃশ্য হারিয়ে গেল। ওরা ভুলে গেল ওরা কে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তাশক্তি লোপ পেল পুরোপুরি। পেটের খাবার পাক খেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু বমি করার সুযোগটাও পেল না ওরা। পাগলা ঘূর্ণি, চলছে তো চলছেই। ওদের মনে হলো, অনন্তকাল ধরে ঘুরছে ওরা, এর বুঝি শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল ঘূর্ণন, থেমে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল পেন্টাকল। ঘরের সবক'টা মোমবাতি কখন নিভে গেছে, সেটা কেউ জানে না। পুরো ঘর অন্ধকার থাকার কথা, কিন্তু তা নেই মোটেও। বরঞ্চ আগের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি আলোকিত হয়ে আছে। বাক্সটার ভিতর থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে অপরিমেয় অপার্থিব আলোকরশ্মি।

বাতাসের কানফাটা গর্জন শুনতে পেল ওরা, যেন ডজনখানেক টর্নেডো একযোগে হামলা করতে ছুটে আসছে। কানে তালা লাগার উপক্রম হলো, আঙুল দিয়ে কান চেপে ধরতে বাধ্য হলো ওরা।

পরমুহূর্তেই তীব্র আলোর ঝলকানির সঙ্গে বাক্সের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ঈশ্বরী! এক সেকেণ্ডের কয়েক কোটি ভাগের একভাগ সময়ের জন্য তারা দেখতে পেল তাঁকে। সাথে-সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল তাদের সবক'টা ইন্দ্রিয়। তারা হয়ে গেল অন্ধ, মূক, বধির। হারাল গন্ধ এবং স্বাদ আস্বাদনের ক্ষমতা। বোধ-বুদ্ধি বলতে আর কিছুই রইল না তাদের। ঈশ্বরীর স্বরূপ সহ্য করবার মত ক্ষমতা কোন মানব ইন্দ্রিয়ের থাকতে পারে না, এ সাধারণ সত্যটা তারা কখনও ভেবে দেখেনি।

ঈশ্বরী চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেখানে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল অয়ন আর মিরন। তবে তাদেরকে আর মানুষ বলার কোন উপায় নেই। রক্ত মাংসের একেকটা দলা যেন ওরা, যদিও আত্মা এখনও ছেড়ে যায়নি ওদের।

মাটিতে পড়ে রইল লোকটার মৃতদেহ। তাঁর অমরত্বের অবসান ঘটেছে এতকাল পরে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁর হাত-পায়ের কনিষ্ঠ আঙুলগুলো এখন ঠিকঠাকই আছে। ঈশ্বরী ফিরিয়ে দিয়েছেন ভক্তের দেয়া উপঢৌকন, ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁর দেয়া বর।

অয়ন আর মিরনকে তাদের স্বজনেরা আর কখনও খুঁজে পায়নি।

শুধু আপনারা জানেন, কেন তাদের খোঁজ মেলেনি, কোথায় হারিয়ে গেছে তারা।

আঙ্কেল টম'স কেবিন

শহরের বাইরের খোলা ময়দানটায় বিশাল এক কার্নিভাল বসেছে। অবশ্য প্রতিবছরই এ সময়ে কার্নিভালটা এখানে জেঁকে বসে, এর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। গত দশ বছরে অন্তত এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় দেখেনি শহরবাসী। স্কুল-কলেজগুলোতে এসময় গরমের ছুটি থাকে, তাই দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা গিয়ে কার্নিভালে হাজির হয়। তারপর নানারকম মজাদার রাইডে চড়ে, এটা-ওটা খেলে জীবনের শ্রান্তিগুলো ভুলে যাবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, কোনরকমের দুর্ঘটনা না ঘটলে প্রতিবছরই বেশ মোটা অঙ্কের লাভ হয় কার্নিভাল মালিকের। তাই তো গরমের ছুটির পুরো সময়টা এখান থেকে নড়ার নামও নেয় না লোকটা। শহরের মেয়রের সাথে ভাল খাতির তার, তাই জায়গা বরাদ্দ পেতেও কোন সমস্যা হয় না কখনও।

মালিক লোকটার নাম আঙ্কেল টম। নিন্দুকেরা বলে, মহা ধুরন্ধর এই লোক, চালাকিতে খেঁকশিয়ালকেও সে পিছনে ফেলার সামর্থ্য রাখে। তবে আঙ্কেল টমকে কখনও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখেনি কেউ। লোকের কথায় কান দিয়ে কী হবে? কেউ কি তাকে একবেলার খাবার জোগাড় করে দেবে? নাকি তার পরিবারের জন্য প্রতি মাসে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা পাঠাবে দেশে? যার যা খুশি বলুক না, কী আসে যায় তার।

আঙ্কেল টমের আসল নাম কবির খান। বাংলাদেশের মানুষ। বয়সও খুব বেশি নয়। ইচ্ছে করেই নিজের নাম পাল্টে আঙ্কেল টম রেখেছে সে। কার্নিভাল মালিকের নাম যদি গালভরা না হয়, আর তাতে যদি খানিকটা নাটুকেপনা না থাকে, তা হলে চলবে কেন? এসমস্ত শো-বিজ তো টিকেই থাকে নাটকীয়তার উপর। যে যত বেশি বাগাড়ম্বর করে, তার আশপাশে ভিড়ও তত্তটাই বেশি। পয়সা খরচ করে লোকে এখানে রঙ-ঢঙ আর মেকি চাকচিক্যই দেখতে আসে, বাস্তব জীবনের বিবর্ণ খণ্ডচিত্র নয়।

প্রথমদিকে দেশের বাইরে এসে অন্য আট-দশজন সাধারণ বাংলাদেশীর মত নিম্নশ্রেণীর কাজগুলোই করত কবির। রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ, শপিং মলে ঝাড়ুদারের কাজ, শহরের রাস্তায় ট্যাক্সি চালানো, জীবিকার তাগিদে হেন কোন কাজ নেই যা সে করেনি। কিন্তু তার স্বপ্নটা ছিল চিরকালই আকাশছোঁয়া। তাই সবসময়ই তার মাথায় ঘুরত ব্যতিক্রম কিছু করার তাড়না। সুযোগটা পেতে খুব একটা সময় লাগেনি তার। এক বিকেলে চায়ের টেবিলে পরিচয় হয় এক বার্মিজ ভদ্রলোকের

সাথে। সে এদেশে বিভিন্ন মেলা-কার্নিভালে ক্লাউনের কাজ করে পেট চালায়। দু'-এক কথায় কাজটা সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিয়ে কবিরও যোগ দেয় তার সাথে। বেশ কয়েকমাস বিশাল এক কার্নিভালে খণ্ডচুক্তিতে কাজও করে। ততদিনে এ ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিয়েছে সে। কার্নিভালে থাকা-খাওয়া ফ্রি হওয়ায়, হাতে বেশ মোটা অঙ্কের টাকাও জমেছে। অবশেষে বহু খোঁজ-খবর করে এক বুড়ো মালিকের কাছ থেকে ছোট একটা মৃতপ্রায় কার্নিভাল কিনে নেয় কবির। তারপর আর তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কখনও। নিজের মেধা এবং পরিশ্রমের জোরে, সেই শ্রীহীন কার্নিভালটাকেই সে রূপ দিয়েছে আজকের এই মহাযজ্ঞে।

অবশ্য এ উন্নতির পিছনে তার অবাক করা উদ্ভাবনী ক্ষমতার অবদান এতটুকুও কম নয়। এই প্রতিযোগিতার বাজারে নিত্যনতুন চমক দেখাতে না পারলে চলবে কেন? তাই সবসময় দর্শকদের জন্য অপ্রত্যাশিত নয়া চমক হাজির করতে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। এই ব্যবসার উন্নতির জন্য হেন কিছু নেই যা কবির করেনি।

একবার খালাতো ভাই মকবুলকে দিয়ে দেশ থেকে নিয়ে এল কয়েক জোড়া সরাইলের লড়াকু মোরগ। তারপর আয়োজন করল জমজমাট মোরগ লড়াইয়ের। ভিনদেশী দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করতে লাগল, বিশালদেহী লম্বা গলার মোরগগুলোর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ফাইট রিঙের ভিতর মোরগগুলো যখন ধারাল ঠোঁট আর নখের সাহায্যে একে অপরকে ক্ষতবিক্ষত করার নেশায় মত্ত থাকত, দর্শকরা তখন উত্তেজনায় রীতিমত ফেটে পড়ত। চেঁচামেচি করে তারা উৎসাহ জোগাত নিজের পছন্দের লড়াকুকে। সম্ভাব্য বিজয়ীর উপর উচ্চ অঙ্কের বাজি ধরত। প্রচুর ভিড় হত সে কক-ফাইটগুলোর রিঙে। আর ফুলে ফেঁপে উঠত কবির খানের পকেট। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবজাতি মল্লযুদ্ধের ব্যাপারে দুর্বল, আর এই দুর্বলতাকেই পুঁজি করে গড়ে উঠেছিল কবিরের এই ব্যবসাটা।

তবে বছর দু'-এক পর দর্শকরা এর প্রতি আকর্ষণ হারাতে শুরু করল। কাঁহাতক আর মোরগের লড়াইয়ে মজা পাওয়া যায়? তাই খেলাটা একসময় বন্ধ করে দিল কবির, মন্দা খেলা দেখিয়ে কার্নিভালের বদনাম করার ইচ্ছে নেই তার। তারপরের আকর্ষণ ছিল দুটো হাঙর। মেলা-কার্নিভালে দর্শকরা সাধারণত ডলফিন বা তিমির নানা কসরত দেখতে পেত। এ দুটো প্রাণীই বেশ শান্তিপ্রিয়, মানুষের ক্ষতি হত কদাচিৎ। তাই বলে হাঙরের মত খুনে প্রাণীকে দিয়েও যে খেলা দেখানো যায়, তা কারও কল্পনাতেও ছিল না তখন। কবির সেটাই করে দেখাল, সে খেলাও আবার যে সে খেলা নয়, একেবারে মরণখেলা! তাই প্রচুর লোক সমাগত হতে থাকল সে খেলায়।

দর্শকদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় কেউ একজন হাঙর দুটোর সাথে বিরাট এক পুলে নেমে যেত। তার সামনে তখন থাকত বিশাল অঙ্কের অর্থ কামানোর এক দুর্লভ সুযোগ। পুলে নামার পর থেকে যতক্ষণ নিজেকে অক্ষত রাখতে পারবে, ততক্ষণই টাকা পেতে থাকবে সে। আশপাশে তার নিরাপত্তার জন্য তৈরি থাকবে কার্নিভালের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মীরা, বড় ধরনের আঘাত পাবার আগেই তাকে

উপরে তুলে আনবে ওরা। পুলে নামার পর থেকে প্রতিটা সেকেণ্ডই হয়ে উঠত তার জন্য মহামূল্যবান। হাঙরদের আকৃষ্ট করার জন্য তার দেহে বাঁধা থাকত সূক্ষ্ম ফুটোযুক্ত একখানা ব্লাড ব্যাগ। তা থেকে চুইয়ে-চুইয়ে পানিতে মিশতে থাকত ফোঁটায়-ফোঁটায় তাজা রক্ত। খুনে হাঙরগুলোকে পাগল করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। প্রবল প্রতাপে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটত ওই ব্যক্তির দিকে। আর সে-ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে ছুটে বেড়াত পুলের এধার থেকে ওধারে।

পুরো ব্যাপারটার মধ্যে দর্শকরা অদ্ভুত রোমাঞ্চ খুঁজে পেত। যদিও সামান্য আহত হওয়া মাত্রই পুলের লোকটাকে উপরে তুলে আনার ব্যবস্থা রাখা হত, তারপরেও মাঝে-মাঝেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। হাঙরের আক্রমণে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যাওয়ার উদাহরণও বিরল ছিল না। যদিও সবকয়টা ঘটনা কবির বুদ্ধিমত্তার সাথে সহজেই সামলে নিয়েছিল।

তবে শেষ রক্ষা করা গেল না কিছুতেই। একদিন এক দর্শককে খুনে হাঙর দুটো একেবারে প্রাণে মেরে ফেলায়, সরকারি চাপে খেলাটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কবির। হাঙরগুলোকেও পরে ছেড়ে দেয়া হয় খোলা সাগরে।

এরপরেই কার্নিভালের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে আঙ্কেল টম'স কেবিন–এখনও যা সগৌরবে লোকের পকেটের পয়সা খসিয়ে চলেছে। নামটা অবশ্য হ্যারিয়েটের কাছ থেকে ধার করা, তবে গল্পের কেবিনের সাথে বাস্তবের এই কেবিনের আকাশ পাতাল ফারাক। হঠাৎ একদিন কবির আবিষ্কার করল, মানুষ নিরাপদ জায়গায় বসে ভয় পেতে ভীষণ পছন্দ করে। তার জন্য দেদারসে খরচ করতেও তাদের মোটেও আপত্তি নেই। তা হলে তাদেরকে ভয় পাইয়ে পয়সা রোজগার করলে কেমন হয়?

কিছুদিনের মধ্যেই কবির আবিষ্কার করল দুঃস্বপ্নের এক ভয়াল জগৎ আঙ্কেল টম'স কেবিন! ভয় পাইয়ে মানুষের পিলে চমকে দেয়ার এক সুবিশাল আয়োজন করা হলো সেখানে।

অল্পদিনেই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠল কবিরের এই নতুন ভয়-ঘর। স্রোতের মত টাকা আসতে শুরু করল, প্রতিটি শো-ই হাউসফুল! দেখতে-দেখতে রীতিমত ধনী লোকে পরিণত হয় কবির, ওরফে আঙ্কেল টম।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় সে, সামনের বছরই চিরতরে দেশে ফিরে যাবে সে। এতদিনের জমানো টাকা-পয়সা দিয়ে বাকি জীবনটা অনায়াসে রাজার হালে কাটানো যাবে। নিজ বাসভূম ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে আর কত পড়ে থাকা যায়?

দর্শকরা কেবিনে ঢোকার পর-পরই তাদের পিছনে চট করে বন্ধ হয়ে যায় দরজাটা। সেই সাথে ঝপ করে নিভে যায় ঘরের সমস্ত বাতি। চকিতেই দর্শকদের মনে হয়, তারা তাদের চেনা জগৎ ছেড়ে অচেনা ভয়ঙ্কর এক জগতে চলে এসেছে, যেখান থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই! পরক্ষণেই লুকানো স্পিকারগুলো থেকে ভেসে আসতে শুরু করে রক্তহিম করা সব শব্দ। অতি-উৎসাহী কিংবা অতিমাত্রায় ভীতু কোন দর্শক হয়তো তখনই তারস্বরে চেঁচানো শুরু করে। তবে তার জানা নেই, আসল নাটকের তখনও কিছুই শুরু হয়নি! হঠাৎই হয়তো ঘরের অন্ধকার কোণে হাজির হয় ভয়ঙ্কর চেহারার গোটা কয়েক পুতুল। আঁধারে লুকিয়ে থেকে দক্ষ

হাতে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে চলে অভিজ্ঞ লোকেরা। তবে দর্শকরা কখনওই সুতো কিংবা পিছনের লোকদের দেখতে পায় না। পিলে চমকানো আওয়াজের সাথে কিম্ভূতকিমাকার অশুভ পুতুলের আগমনে তারা ভয়ে কেঁপে ওঠে ক্ষণে-ক্ষণে। পরক্ষণেই হয়তো লুকানো প্রোজেক্টরের সাহায্যে দেয়ালে ভেসে ওঠে কোন অশরীরী নারীমূর্তির প্রতিবিম্ব। নিশুতি রাতে যে নির্জন কোন রাস্তায় সাদা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্মোক মেশিনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় গোটা ঘর। দর্শকদের চোখ জ্বালা করে ওঠে। চোখ মুছতে-মুছতেই তারা আবছাভাবে দেখতে থাকে অশরীরীটির কাণ্ডকীর্তি। চলতে-চলতেই হয়তো সে থমকে দাঁড়ায়, হঠাৎ পিছনে ফিরে তাকায় দর্শকদের দিকে। পাণ্ডুর মত সাদা সে মুখ দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় প্রতিটি দর্শকের। সবার কাছেই মনে হয়, অশরীরীটি বুঝি সোজা তার দিকেই সরাসরি তাকিয়ে আছে! এ ধাক্কা সামলাতে-সামলাতেই হয়তো দৃশ্যপটে হাজির হয় ভয়ংকরদর্শন কোন জানোয়ার। এসেই বিকট শব্দে গর্জন করে ওঠে ওটা। যেন এখনই দর্শকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে সবাইকে। আতঙ্কে প্রাণ বাঁচাতে দর্শকরা পড়িমরি করে ছুটে যায় পাশের ঘরে। তবে সেখানে তাদের আতঙ্ক বাড়ে বৈ কমে না! গোটা ঘরের সবকয়টা দেয়ালই সেখানে নানারকমের আয়নায় ঢাকা। নানা জাতের, নানা বর্ণের আয়না বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বসানো গোটা ঘরময়। দর্শকরা আধো-অন্ধকারে নিজেদের অবয়ব দেখেই ভীষণভাবে চমকে ওঠে। একটু নড়লেই যেন চারপাশ থেকে হাজারটা রাক্ষস ঝাঁপ দিয়ে পড়বে তাদের উপর। সেই সাথে ভয়াবহ সব গা গুলানো শব্দে আতঙ্কে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয় সবার। তবে আঙ্কেল টম'স কেবিনের বিশাল আয়োজন তখনও শেষ হয় না। একের পর এক আসতে থাকে ওরা। লুকানো ক্যামেরায় দর্শকদের উপর নজর রাখতে থাকে আঙ্কেল টম। যেন তাদের করুণ দশা চাক্ষুষ করে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

একসময় দর্শকদের মনে হয়, এই ভয়াবহ জগৎ থেকে তাদের বুঝি আর মুক্তি নেই, বাঁচবে না কেউ আর আজ তারা! কেউ-কেউ প্রাণভয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কেউ-বা আবার অচেতন হয়ে এলিয়ে পড়ে যায়।

ঠিক তখনই দপ করে জ্বলে ওঠে কেবিনের সবক'টা আলো। দর্শকদের মুক্তি দেয় শ্বাসরুদ্ধকর দুঃস্বপ্নের এই জগৎ থেকে। মুক্ত বাতাসে বের হওয়ামাত্রই দর্শকদের মনে হয়, চড়া মূল্যে টিকেট কাটাটা সার্থকই হয়েছে তাদের, সত্যিকারের ভয়ের দেখা পেয়েছে আজ তারা। অতি উৎসাহী কেউ-কেউ হয়তো তখনই আবার পরবর্তী শো-এর টিকেট কাটতে চায়। তবে তাকে সে সুযোগ দেয়া হয় না, প্রতিজন দর্শক একদিনে কেবলমাত্র একবারই আঙ্কেল টম'স কেবিনে ঢোকার সুযোগ পায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, একদিনে একাধিকবার স্নায়ুর উপর এমন চাপ নেবার সামর্থ্য সব মানুষের নেই। তাই বেশি লাভ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে শো-টা পণ্ড করতে চায় না কবির খান, ওরফে আঙ্কেল টম।

একদিন সারাদিনের হিসেব মেলাতে-মেলাতে বেশ রাত করে ফেলল কবির। কার্নিভালটা শেষ হতে চলেছে; ক'দিন পরেই ভেঙে যাবে আসর। আবার হয়তো

আগামী বছর নতুন কোন মালিকের অধীনে এখানে বসবে এ জমজমাট আয়োজন। তবে তখন এদেশে থাকবে না কবির, বাংলাদেশে ফিরে যাবে।

শেষের দিনগুলোতে কার্নিভালে লোক সমাগম অনেক বেশি হয়। যারা নানা কারণে প্রথমদিকে আসতে পারেনি, তারা একটিবারের জন্য হলেও আসার চেষ্টা করে। আর যারা ইতোমধ্যেই এসে ঘুরে গিয়েছে, তারাও আসে পছন্দের রাইডগুলো আরেকটিবার উপভোগ করার জন্য। তাই শেষের দিনগুলোতে কার্নিভালের আয় যেমন বেড়ে যায়, তেমনি বাড়ে হিসাব নিকাশের ঝক্কিটাও। ক্লান্তিকর দিনের শেষে আজ তেমনই একটি রাত।

কার্নিভালের লোকেরা সাধারণত বিশালাকার ট্রেলার ট্রাকেই রাত্রিযাপন করে। সারা বছর যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটতে হয় বলে তারা সংসারটাকেও সাথে নিয়ে চলতেই পছন্দ করে। কবিরও তার ব্যতিক্রম নয়। তার ট্রেলারটাও অন্যান্যদের সাথে কার্নিভালসংলগ্ন নিচু জমিটায় পার্ক করা। কাজ শেষে নিজের অফিস ঘরটা থেকে বেরিয়ে সেদিকেই হেঁটে চলল কবির। হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়বে, শরীরটা আর কিছুতেই চলতে চাইছে না।

কিছুদূর গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। কী ব্যাপার? আঙ্কেল টম'স কেবিনের ভিতরে আলো জ্বলছে কেন?! বিকেলে শো শেষ হবার পর ঝাড়ুদার খুব ভাল করে কেবিনের ভিতরটা একবার পরিষ্কার করে। কাজটা কবির নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে। রেকি করা শেষে প্রথমে দরজার অটোম্যাটিক তালাটা লাগায়, তারপর বাইরে থেকে একখানা বড় তালাও ঝুলিয়ে দেয়। চোর ছ্যাঁচড়ের অভাব নেই এলাকায়, সুযোগ পেলেই এটা-ওটা নিয়ে দিব্যি কেটে পড়বে ওরা। সব কার্নিভালেই কিছু ভবঘুরে লোককে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কার্নিভালের লোকদের টুকটাক ফাই-ফরমায়েশ খেটে জীবন চালায় ওরা। তবে এরাই আবার সুযোগ পেলে বিনা নোটিশে নিজেদেরকে চোর প্রমাণ করতে এক মুহূর্তও দেরি করে না। সাবধান না থেকে উপায়ই বা কী?

শুতে যাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে দিয়ে বাতি নেভাতে কেবিনে চলল কবির। সারারাত বাতি জ্বেলে অপচয় করার কোন মানে নেই। সে জানে, একেকটি টাকার কতটা মূল্য, ওগুলো কামাই করতে কতটা মেহনত করতে হয়েছে তাকে। তবে আলো জ্বলে থাকার ব্যাপারটা এখনও রহস্যময়ই লাগছে তার কাছে। আবছাভাবে মনে পড়ছে, সে নিজেই সবগুলো বাতি নিভিয়ে দরজায় তালা দিয়েছিল। তা হলে? নাকি স্মৃতিভ্রম ঘটছে তার? হতেও পারে, বয়স তো আর কম হয়নি। এবার দেশে ফিরেই একটা বিয়ে থা করে সংসার পেতে থিতু হতে হবে। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জীবনের অচিরেই ইতি ঘটতে চলেছে, এটা ভাবতেই ভাল লাগছে তার। কেবিনের তালাগুলো খুলেই আলো নেভাতে সুইচের দিকে হাত বাড়াল কবির। হাতের বাঁ পাশেই সুইচবোর্ড, দরজায় দাঁড়িয়েই দিব্যি নাগাল পাওয়া যায়, ভিতরে ঢুকতে হয় না।

মেঝের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে। ওগুলো কীসের ছাপ মেঝেতে? গোটা মেঝে জুড়েই অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি পায়ের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে, যেন

ঘরময় হেঁটে বেড়িয়েছে কোন ছোট বাচ্চা! ছাপগুলো পরীক্ষা করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল কবির। পরক্ষণেই দড়াম করে তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল! ক্লিক করে লেগে গেল অটোম্যাটিক তালাটা। পিছন থেকে দরজার আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কবির, কপাল ঠুকে গেল মেঝেতে। আচমকা দপ করে নিভে গেল ঘরের একমাত্র জ্বলতে থাকা বাতিটা! নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করে নিল কবিরের চারপাশটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য কবিরের মনে হলো জ্ঞান হারিয়েছে সে। কিন্তু চোখ তুলে সামনে তাকাতেই বুঝতে পারল, জেগে-জেগেই দুঃস্বপ্ন দেখতে চলেছে ও।

তার সামনে হাজির হয়েছে ক্ষুদ্র পায়ের ছাপের মালিকেরা। ওগুলো আর কেউ নয়, তার চিরচেনা কদাকার পুতুলগুলো! তবে ওদেরকে কেউ এখন সুতো ধরে নিয়ন্ত্রণ করছে না, ওরা নিজেরাই দিব্যি হাঁটতে শিখে গেছে! খিল-খিল করে হেসে উঠল ওরা, গুটি-গুটি পায়ে হেঁটে আসছে কবিরের দিকে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল ও, শত চেষ্টাতেও দাঁড়াতে পারল না! পায়ে জোর পাচ্ছে না কিছুতেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার, সমস্ত পশম কখন দাঁড়িয়ে গেছে নিজেও জানে না। আচমকা স্পিকারে বাজতে শুরু করল বুক কাঁপানো সব সাউণ্ড এফেক্ট! মেইন ইলেকট্রিক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় বিকেলেই, তারপরও ওটা কীভাবে বাজছে কে জানে! হঠাৎ কবির খেয়াল করল স্পিকারে ভেসে আসা সাউণ্ডগুলো তার কম্পিউটারে নেই, পুরোপুরি নতুন আর অচেনা ওগুলো। অনেক বেশি জীবন্ত, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। কোত্থেকে আসছে এসব আওয়াজ? দরদর করে ঘামতে শুরু করল কবির।

হঠাৎ হাড়কাঁপানো গর্জন ছেড়ে কেবিনের অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল দুটো গরিলা। এরাও কবিরের অপরিচিত নয়, নিজের হাতে এদের বানিয়েছে সে। কিন্তু এখন আর ওরা সেই খেলনা গরিলা নেই, পুরোদস্তুর জংলী গরিলা হয়ে গেছে! ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরছে ওগুলোর, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে প্রবল হিংস্রতায়। রক্তলাল চোখগুলোতে বন্য খুনে দৃষ্টি। ধারাল নখরযুক্ত থাবাগুলো সামনে বাড়িয়ে রেখেছে, চিরে ফালাফালা করতে চায় যেন কবিরকে। আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল কবির, নড়ার একবিন্দু সাহসও আর নেই তার। কী হচ্ছে এসব? পরক্ষণেই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা গভীর কালো ছায়া। গোটা দেহটা লম্বা ঝুলওয়ালা আলখিল্লায় ঢাকা। পাণ্ডুর মত সাদা মুখ তুলে চাইল ওটা কবিরের দিকে, দু'চোখে ভয়ানক অশুভ দৃষ্টি। ভ্যাম্পায়ার!

এরপর একে-একে আসতে থাকল ওরা, আসতেই থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা কেবিনে তিল ধারণের জায়গা রইল। ওরা সবাই আঙ্কেল টম'স কেবিনের জন্য তৈরি করা কবিরের বিশেষ আয়োজন!

আচমকা রিনরিনে গলায় কথা বলে উঠল ছোট্ট একটা পুতুল, 'অন্যের হাতে আমাদেরকে তুলে দিয়ে কোথায় পালাতে চেয়েছিলে, আঙ্কেল টম?'

আরেকটা পুতুল বলল, 'আমরা তোমার জন্য সারা জীবন খেটে মরেছি, তবু আমাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও আপন ভাবতে পারনি তুমি! বিক্রি করে দিতে

চলেছ অন্যের হাতে!'

ভয়াল পিশাচটা বলে উঠল, 'আমরা তোমাকে কোথাও যেতে দেব না, আঙ্কেল টম! এখন থেকে তুমি আমাদের একজন হয়েই থাকবে!'

পরক্ষণেই সম্মিলিতভাবে গর্জন করে উঠল ওরা সবাই। তারপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল কবিরের উপর।

কবিরের বুক চিরে বের হওয়া অন্তিম আর্তনাদ বাইরের কারও কানেই পৌঁছল না। কারণ আঙ্কেল টম'স কেবিন সাউণ্ড-প্রুফ।

পরদিন থেকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না কবিরকে। কার্নিভালের লোকেরা সপ্তাহখানেক খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দিল। অনেকের ধারণা, দেশে ফিরে গেছে সে। কেউ খেয়াল করল না, আঙ্কেল টম'স কেবিনে পুতুলের সংখ্যা আগের চেয়ে একটা বেশি! সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল কার্নিভালটা। তারপর এক সকালে নিলাম ডেকে বিক্রিও করে দিল।

লম্বা চুলের মালিক, ডেভিড শেফার্ড-এর খুব পছন্দ হলো আঙ্কেল টম'স কেবিন। মানুষকে ভয় দেখানোর কী চমৎকার আয়োজন! অনেকদিন কার্নিভালটা চালানোর পর একদিন সে সিদ্ধান্ত নিল, পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবে। বিক্রি করে দেবে আঙ্কেল টম'স কেবিনসহ গোটা কার্নিভালটা।

সে রাতে আচমকা আঙ্কেল টম'স কেবিনে আলো জ্বলতে দেখে সেটা নেভাতে চলল ডেভিড শেফার্ড। তারপর কী হলো, সেটা আপনারা জানেন।

ইউটোপিয়া

প্রথম যখন প্রস্তাবটা হাসান দিল, বেশ অবাক হয়েছিলেন জাকির সাহেব! এ কী বলছে ও! এখন কি বেড়ানোর সময়? আচ্ছা না হয় মেনেই নিলেন যে, বেড়ানোর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখন-তখন হাওয়া বদলের জন্য কক্সবাজার যাওয়া যেতে পারে। কিংবা পাহাড়ি ঝরনায় ক্লান্তি ধুয়ে ফেলার জন্য সিলেট অথবা বান্দরবান। এমনকী তারুণ্যের স্মৃতি হাতড়ে কিছুটা সাহস ধার করে, বাঘ দেখার জন্য সুন্দরবনও যাওয়া যেতে পারে। তাই বলে কোন এক অজপাড়াগাঁয়ে অদ্ভুত কোন ক্ষমতার অধিকারী মানুষ দেখতে যাওয়া? তা-ও আবার অফিস কামাই দিয়ে!

আরে, বাবা, তিনি তো আর কোন পত্রিকা অফিসে চাকরি করেন না যে, উদ্ভট কোন খবর শুনলে ব্রেকিং নিউজের সন্ধানে সেখানে ছুটে যাবেন! তিনি চাকরি করেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এক মন্ত্রণালয়ে। পদটাও নিতান্ত ছোট নয় যে, যখন-তখন অফিস কামাই করা যায়। তা ছাড়া গোটা দেশটাই যেখানে অদ্ভুত, সেখানে উদ্ভট জিনিসের কী আর অভাব আছে নাকি? কয়দিন পর-পরই তো পত্রিকায় কিছু না কিছু উদ্ভট খবর আসছে, আর তাই নিয়ে বেশ কয়েকদিন তুমুল মাতামাতিও হচ্ছে। আস্তে-আস্তে হুজুগটা থিতিয়ে পড়লে, আবার আসছে নতুন কিছু। হুজুগে বাঙালি, এই পরিচয়টা যাতে কিছুতেই লোপ না পায়, এজন্য সাংবাদিকদের চেষ্টার অন্ত নেই! সাধারণ একটা খবরকেও রঙ চড়িয়ে অসাধারণ রূপ দিতে তাদের জুড়ি মেলা ভার! পত্রিকার তেমন একটা খবরই যে হাসানের এই অস্বাভাবিক প্রস্তাবের নেপথ্যের কারণ, সে বিষয়ে জাকির সাহেবের লেশমাত্র সন্দেহও ছিল না!

অবশ্য পরে জানা গেল, খবরটা হাসান পত্রিকা থেকে পায়নি, পেয়েছে তার দূরসম্পর্কের এক ফুফার কাছ থেকে। চিকিৎসা নিতে কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এসেছেন তিনি। গ্রামের নানা রকম গল্প করতে-করতে মনার গল্পটাও করেছিলেন হাসানের সাথে। ব্যস, হাসানকে আর পায় কে? হাঙরকে রক্তের সন্ধান দেয়া হলে হাঙর কি আর স্থির থাকতে পারে! সাথে-সাথে উত্তেজনায় টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে হাসান। ফুফা হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করেননি যে, হাসান এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়বে! যতসব উদ্ভট আর অবাস্তব খবরগুলোতে তার বাড়াবাড়ি রকম আকর্ষণের খবর তো আর ফুফার জানা নেই।

হাসানের এক চিন্তা, পত্রিকাওয়ালারা খবর পাবার আগেই মনাকে দেখতে যেতে হবে। না হয় মনার প্রকৃত রূপটা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। একবার বিখ্যাত হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা ঢুকে যায়। কৃত্রিম মনাকে দেখে তার মন

ভরবে না কিছুতেই। তার চাই আসল অকৃত্রিম মনা, আর সেটা অবশ্যই মনার নিজস্ব পরিবেশে!

ফুফার কাছ থেকে পথঘাট খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছে হাসান। তারপর পাকড়াও করেছে জাকির সাহেবকে। কারণ জানে, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ছোটবেলার বন্ধুত্বে কখনও কোন ফাটল ধরেনি। এখনও রাস্তার পাশে টঙ দোকানে আড্ডা দিতে-দিতে চা খায় ওরা। দেখে বোঝার উপায় থাকে না জাকির সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আর হাসান একজন ফ্লপ লেখক! যার কোন বই-ই এখন পর্যন্ত বিক্রির সংখ্যা ১০০ ছাড়াতে পারেনি! বন্ধুরা প্রায়ই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এ নিয়ে। টিপ্পনী কেটে বলে, 'লুঙ্গির আবার সাইড পকেট! তা-ও আবার চেইন সিস্টেম!'

এতকিছুর পরও অবশ্য হাসানের লেখা থেমে থাকে না! তার ধারণা, তার বাবার রেখে যাওয়া অঢেল টাকা খরচ করার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত খাত কমই আছে!

কখন এবং কীভাবে হাসান তাঁর সম্মতি আদায় করে ফেলেছে, তা জাকির সাহেব নিজেও জানেন না! ভেবে অবাক হলেন, কেন রাজি হলেন তিনি? তাঁকে জানানো হলো, আজ রাতেই রওনা করা হবে!

শুরুতে সামান্য আপত্তি অবশ্য করেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি গোছগাছ করা সম্ভব? কিন্তু হাসানের কাছে কোন ওজর-আপত্তিই টিকল না! অবশেষে কিছুটা হতাশ হয়েই মেনে নিতে হলো তাঁকে। কী আর করা যাবে, পড়েছেন মোঘলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে! অফিস শেষে বাসায় গিয়েই কোনমতে তড়িঘড়ি করে গোছগাছ সেরে নিলেন। তারপর স্ত্রী-কন্যার চক্ষু ছানাবড়া করে দিয়ে রাত নয়টা নাগাদ পৌঁছলেন হাসানের বাসায়।

যাত্রার বিশাল আয়োজন দেখে রীতিমত ভিরমি খেলেন জাকির সাহেব। বিরাট কিন্তু গোছানো আয়োজন করেছে হাসান, একেবারে এলাহি কারবার যাকে বলে আর কী! এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কিছুতেই এত আয়োজন করা সম্ভব নয়। তা হলে কি হাসান জানত যে তিনি রাজি হবেনই? হাসানকে জিজ্ঞেস করাতে সে সহাস্যে জবাব দিল, 'জানতাম বৈকী! আমি বলব আর তুই মানা করবি, তা কী করে হয়!'

যেভাবেই বলা হোক না কেন, কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। তাই বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলেন না জাকির সাহেব। ছোটবেলা থেকেই বড্ড ভালবাসেন তিনি তাঁর পাগলাটে এই বন্ধুটিকে। সত্যিই হাসানের কোন আবদারে মানা করা সম্ভব না তাঁর পক্ষে, তা যত উদ্ভটই হোক না কেন!

রাত ১১টা নাগাদ রওনা করা হলো। দূরের পথ, তাই যতটা সম্ভব আরামের ব্যবস্থা করেছে হাসান। তাদের দু'জনের গাড়িই ছোট হওয়ায়, বড় একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে। গাড়ির পিছনের সিটগুলো সরিয়ে ফেলে সেখানে পেতে দেয়া হয়েছে নরম মখমলের গালিচা। পুরোটা পথ শুয়ে-বসে গল্প করতে-করতে যাওয়া যাবে। সাথে রয়েছে পর্যাপ্ত চা-কফি আর হালকা নাস্তার ব্যবস্থা। আর পছন্দের গান শোনার ব্যবস্থা তো আছেই।

নাহ! যতটা ভেবেছিলেন, ভ্রমণক্লান্তি হয়তো ততটা হবে না। মনে-মনে হাসানের প্রশংসা না করে পারলেন না জাকির সাহেব। একেবারে ভোরের দিকে গন্তব্যে এসে পৌঁছল মাইক্রোবাসটি। মসজিদে-মসজিদে তখন মুয়াজ্জিনেরা সুললিত কণ্ঠে ডাকছে সবাইকে, 'এসো, কল্যাণের দিকে।' সেই ডাকে সাড়া দিলেন হাসান ও জাকির সাহেব। ফজরের সালাতটুকু আদায় করে নিলেন।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য অবলোকন করে বিস্ময়ে বাক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন দু'জনেই! বহুদিন হয় গ্রামে আসা হয় না। প্রকৃতির এত রূপ শহরে মিলবে কোথায়?

পুব আকাশে উঁকি দিচ্ছে লাল রঙের সূর্য, ছড়িয়ে দিচ্ছে রঙিন আভা। সেই আলো শান্ত নদীর 'পর ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ছে। পরম মমতায় আচ্ছাদিত করছে সতেজ-সবুজ বৃক্ষরাজিকে। এ যেন মর্ত্যের কোন অংশ নয়, ঠিক যেন স্বর্গের এক টুকরো এনে বসিয়ে দিয়েছে কেউ এখানে। সত্যি যদি এটা পৃথিবীর অংশই হয়, স্বর্গ না জানি কত সুন্দর করে বানিয়েছেন বিধাতা!

জাকির সাহেব ভেবেছিলেন সকাল-সকাল হাসানের নতুন আকর্ষণ মনাকে দেখে নিয়েই ফিরতি পথ ধরবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। গ্রামের চেয়ারম্যান কোত্থেকে যেন খবর পেয়ে গেছে যে, তিনি এসেছেন! তারপর রীতিমত জোর করে, বলতে গেলে তুলেই এনেছেন নিজের বাড়িতে। নাস্তাটা নাকি তাঁর বাড়িতেই সারতে হবে! যতই বলেন যে তাঁরা গাড়িতেই নাস্তা সেরে নিয়েছেন, ততই চেয়ারম্যানের গাল ফুলতে থাকে!

অতীতে কোন এক সময়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে তাঁর দপ্তরে যেতে হয়েছিল কোন একটা বিশেষ কাজে। সে সময় জাকির সাহেব নাকি তাঁকে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। চেয়ারম্যান সাহেব তো আর অকৃতজ্ঞ নন! তাই সেই উপকারী মানুষটিকে বিধাতা যখন অতিথি করে তাঁরই গ্রামে পাঠালেন, তখন তাঁর খেদমত করে ঋণের বোঝা সামান্য হালকা করার সুযোগ চেয়ারম্যান সাহেবই বা ছাড়বেন কেন?

জাকির সাহেব অবশ্য কিছুই মনে করতে পারলেন না! না চেয়ারম্যান সাহেবকে, না তাঁকে করা তাঁর উপকারকে! প্রতিদিনই তাঁকে এমন হাজারো কাজ করতে হয়, ক'জনের কথা মনে রাখবেন?

নাস্তার রাজসিক আয়োজন দেখে থমকে গেলেন জাকির সাহেব! দেশের সব চেয়ারম্যানই কি এতটা ধনী? তা হলে আর শুধু-শুধু মন্ত্রীদের দোষ দেয়া কেন! মাত্র একটি ইউনিয়নের বরাদ্দ থেকে যদি একজন চেয়ারম্যান এতটা সম্পদ নিজের করে নিতে পারেন, তা হলে গোটা দেশের বরাদ্দ থেকে মন্ত্রীরা টাকার পাহাড় হাতিয়ে নেবেন, এটাই কি স্বাভাবিক না?

তবে খানিক বাদেই ভুলটা ভাঙল তাঁর! জানা গেল বনেদী পরিবারে জন্ম চেয়ারম্যান সাহেবের। তাঁর বাপ-দাদারা তাঁর জন্য যেটুকু সম্পদ রেখে গেছেন, তা সাত পুরুষ খেয়েও শেষ করতে পারবে না! কথায় আছে, 'এক পুরুষে করে ধন, এক পুরুষে খায়, আর এক পুরুষ এসে দেখে খাওয়ার কিছু নাই'—এই কথা

চেয়ারম্যান সাহেবের পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি!

তিনি নির্বাচন করেছিলেন শুধুমাত্র জনগণের সেবা করার জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই। এলাকার বহু স্কুল-মাদ্রাসা তাঁর নিজের করা, সরকারি অনুদানে নয়। কৃষকদের সেচের সুবিধার জন্য বিশাল এক খালও কেটেছেন তিনি। খাল কেটে পানি নামের অমৃত এনেছিলেন তিনি, কুমির নয়! সেই পানি রুক্ষ জমির বুক ভিজিয়ে তা থেকে সোনা বের করে এনেছে। চেয়ারম্যান সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব বেঁচে থাকলে, এই খাল কাটার জন্য তিনি অবশ্যই স্বর্ণপদক পেয়ে যেতেন এতদিনে! কথায়-কথায় চেয়ারম্যান সাহেব মেহমানদের আগমনের কারণ জানতে পারলেন। জানার পর গর্বে তাঁর বুকের ছাতি অন্তত এক হাত ফুলে গেল। তাঁর এলাকার মনা যে এতটা বিখ্যাত হয়ে গেছে, এটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না।

জানালেন, দুপুরের খাবার পর-পরই মনার 'খেলা' দেখার আয়োজন করবেন তিনি! দুপুর পর্যন্ত অতিথিরা তাঁর গ্রামটা ঘুরে দেখুক। তাঁর এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন জাকির সাহেব। দুপুরের আগেই মনার সাথে দেখা করে বিদায় নিতে চান তিনি। শুধু-শুধু নিতান্ত অপরিচিত একজনের বাড়িতে আরও একবেলা খাবার খেতে ভীষণ সংকোচ হচ্ছে তাঁর। এমনিতেই সকালের নাস্তার জন্য মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে, এর উপর আবার দুপুরের খাবারের কথা তো তিনি ভাবতেই পারেন না!

কিন্তু কোন কথাতেই কোন কাজ হলো না। চেয়ারম্যান সাহেব লোকটা বড্ড একগুঁয়ে! মুখটাকে হাঁড়ির তলার মত করে বার-বার মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, দুপুরে না খেয়ে তাঁদের বাড়ি থেকে আজ অবধি কোন অতিথি বিদায় নিতে পারেনি। যদি আজ এই শতবছরের ঐতিহ্য ভাঙা হয়, তা হলে তাঁর বাপ-দাদাদের অপমান করা হয়!

এহেন অকাট্য যুক্তির পর তো আর কোন কথা চলে না! তাই নিতান্ত হতাশ হয়েই তাঁর কথা মেনে নিতে হলো জাকির সাহেবকে। তবে অনুরোধ করলেন, আয়োজন যেন একদম সাদামাঠা হয়। শুধু-শুধু ভারী আয়োজন করার কোন সার্থকতা নেই। কারণ, তিনি বা হাসান, দু'জনের কেউই তেমন ভোজনরসিক নন। জবাবে চেয়ারম্যান সাহেব কিছু বললেন না, শুধু মৃদু হাসলেন। তাঁর হাসিই বলে দিল, এতক্ষণ বলা কথার কোনটিই তিনি রাখবেন না!

পুরোটা সকাল গ্রামটা ঘুরে-ঘুরে দেখল মেহমানরা। স্বীকার করতেই হয়, একবিন্দু বাড়িয়ে বলেননি চেয়ারম্যান সাহেব। যে-কোন বিচারেই গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম বলা যেতে পারে। যদি কখনও পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে এই গ্রামটিকে অন্য কোন গ্রহে বসিয়ে দেয়া হয়, তা হলে তারা দিব্যি নিজেদের চাহিদা নিজেরাই মেটাতে পারবে! এতটুকু নির্ভর করতে হবে না বাইরের সাহায্যের উপর। তাদের মনের গভীরে আবারও একটি পুরানো সত্য বেজে উঠল, এদেশের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে, প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন করতে হবে সবার আগে। শুধু নগরায়ন কখনওই সভ্যতার উৎকর্ষের মাপকাঠি হতে পারে না! বরঞ্চ অপরিকল্পিত নগরায়ন একটু-

একটু করে ঝুঁকির মুখে ফেলছে আধুনিক সভ্যতাকে। কোন কারণে এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, নতুন সভ্যতার সূচনা যে গ্রাম থেকেই হবে, এ ব্যাপারে কারও লেশমাত্র সন্দেহও থাকা উচিত না।

দুপুর নাগাদ ক্লান্ত হয়ে চেয়ারম্যান বাড়িতে ফিরে রীতিমত চমকে উঠলেন মেহমানেরা! চেয়ারম্যান সাহেব যে ভাল আয়োজন করবেন, এ ব্যাপারে তাদের কারওই সন্দেহ ছিল না। তাই বলে সেই 'ভাল'-এর সীমা যে পরিমাপ করা যাবে না কিছুতেই, এতটা অবশ্যই আশা করেননি কেউ!

বাড়ির উঠনে আস্ত এক ছাল ছাড়ানো খাসীর কাবাব বানানো হচ্ছে। অদূরে বড়-বড় চুলোয় রান্না হচ্ছে গরু ও মুরগির মাংস। তার পাশেই কয়েকটা রাজহাঁসের পালক ছাড়াচ্ছে কয়েকটা অল্পবয়সী মেয়ে। কাঁঠাল গাছের ছায়ার নীচে বেতের চেয়ারে বসে-বসে আয়েশি ভঙ্গিতে পান চিবুচ্ছেন এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য লোক! অতিথিদের সম্মানে এঁদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন চেয়ারম্যান সাহেব। এঁরাও আজ অতিথিদের সাথে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাবেন।

একে-একে সবার সাথে হাত মেলাতে হলো মেহমানদের। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসতে হলো আড্ডা দেবার জন্য। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের রাজনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করলেন! শহুরে মেহমানদের কাছে পাণ্ডিত্য জাহির করতে, নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন তাঁরা। হাসানকে সহাস্যে তাঁদের সাথে তাল মেলাতে দেখে মনটা একেবারে বিষিয়ে উঠল জাকির সাহেবের। বহু কষ্টে নিজের মুখে একটা মেকি হাসি ধরে রেখে আলোচনা শুনে গেলেন। কোনরকম মন্তব্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন, আলোচনার গতি এতে আরও বেড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। যখন একেবারে হাঁপিয়ে উঠছিলেন, ঠিক তখনই ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব!

রান্না শেষ হয়েছে, তাই সবাইকে ডাকতে এসেছেন তিনি। নিজেরা চরম নিরুৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও, একদল অতি উৎসাহী মানুষের সাথে রাজকীয় ভোজে যোগ দিতে হলো শহুরে অতিথিদের!

খাওয়ার পর এল বিখ্যাত মনা!

নিতান্ত সাধারণ বেশভূষা। পরনে একখানা ময়লা লুঙ্গি, গায়ে রঙচঙা একটা শার্ট। গলায় একটা ভেজা গামছা জড়ানো, একটু পর-পরই সেই গামছায় মুখ মুছছে সে। মনাকে মোটামুটি এরকমই কল্পনা করেছিলেন, তাই একটুও অবাক হলেন না জাকির সাহেব। কিন্তু হাসানের চেহারায় হতাশার ছাপ স্পষ্ট। সে হয়তো ভেবেছিল, একদল গুণগ্রাহী সারাক্ষণ মনাকে ঘিরে রাখে। মনা যেখানে যায়, তার শিষ্যের দলও সাথে-সাথে যায়! কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু দেখা না যাওয়ায়, সে যারপরনাই হতাশ হয়েছে।

মনার অদ্ভুত গুণের কথা বিস্তারিত জানা গেল। গ্রামের পুরানো লালদীঘিতে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে! একটিবারও শ্বাস নেবার জন্য উপরে উঠে আসে না! আশপাশের গ্রামের বহু সাঁতারু মনার সাথে লালদীঘিতে দমের খেলা খেলেছে, কিন্তু কেউই মনার ধারেকাছে যেতে পারেনি।

এসব বৃত্তান্ত শুনে চরম বিরক্ত হলেন জাকির সাহেব। একজন মানুষ বেশিক্ষণ পানিতে দম রাখতে পারে, এজন্য ঢাকা থেকে কাজকর্ম ফেলে তাকে দেখার জন্য ছুটে আসতে হবে?

স্রষ্টা সব মানুষকেই আলাদা করে বানিয়েছেন, কেউ কারও মত নয়! হাতের ছাপ, ঠোঁটের ছাপ, চোখের রেটিনার ছাপ, জিভের ছাপ...প্রতিটা মানুষেরই আলাদা-আলাদা। একেকজন একেকটা বিষয়ে পারদর্শী হবে, এটাই স্বাভাবিক। একজনের মধ্যে কোন বিশেষ গুণের বিকাশ ঘটতেই পারে। এতেই সে সাধারণ মানব গোষ্ঠী থেকে খারিজ হয়ে অতিমানব হয়ে যায় না! তাই যদি হত, তা হলে একজন ক্রিকেটারকে একজন ফুটবলারের সাপেক্ষে অতিমানব বলা যেত, কিংবা ফুটবলারকে ক্রিকেটারের সাপেক্ষে! এভাবে ভাবলে তিনি নিজেও হয়তো মনার সাপেক্ষে অতিমানব! কারণ, এমন অনেক কাজই তিনি করতে পারেন, যা মনা কল্পনাও করতে পারবে না, যদিও কাজগুলো যে-কোন শিক্ষিত মানুষের কাছে হয়তো নিতান্তই স্বাভাবিক কাজ!

কিন্তু মনার পরের কথাগুলো জাকির সাহেবের বিরক্তি কাটিয়ে কৌতূহল ফিরিয়ে আনল! মনা দাবি করছে তাঁর মোটেও বেশি দম রাখার ক্ষমতা নেই! সে লালদীঘিতে ডুব দিলেই একটা রাজপ্রাসাদ দেখতে পায়! সেই প্রাসাদের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই একদম অন্যরকম একটা জগতে চলে যায় সে! হাজার-হাজার পরীর বসবাস সেখানে। তাদের সাথে মনার অনেক কথা হয়, অনেক আদর-যত্ন করে তারা মনাকে! হরেক রকম ফল-ফলাদি খেতে দেয়, যার একটার নামও মনার জানা নেই! ওদের সাথে থেকে যাবার অনুরোধ করে ওরা মনাকে। কিন্তু মনা কখনও রাজি হয়নি। উপরে তার পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে সে কেন থাকতে যাবে অচেনা পরীদের দেশে? কিছুক্ষণ ওখানে থেকে মনা যখন উপরে উঠে আসে, ততক্ষণে উপরে অনেকটা সময় কেটে যায়! গ্রামের লোক ভাবে, সে বুঝি দম বন্ধ করে এতক্ষণ ডুবেই ছিল! কেউ বিশ্বাস করে না মনার কথা। কারণ মনার সাথে ডুব দিয়ে অনেকেই সেই রাজপ্রাসাদ খুঁজেছে, কিন্তু কেউ তার ছায়াটিরও সন্ধান পায়নি!

যদি সত্যিই এমন কিছু থাকত, অন্যরা একদিন হলেও তো তার দেখা পেত! কিন্তু কই? মনা ছাড়া আর কেউ তো দেখল না ওই রাজপ্রাসাদ!

জাকির সাহেব চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন উপস্থিত মুরুব্বীদের দিকে। একজন মাতব্বর গোছের লোক নড়েচড়ে বসে বললেন, 'অতিবিনয়ী পোলা, স্যর! মানুষজন যেন তার এই দম রাখার ক্ষমতা লইয়া হিংসা না করে, হের লাইগা এই মিথ্যা কাহিনি বানাইছে। লালদীঘিতে যদি কোন রাজপ্রাসাদ থাকতই, তার কিসসা আমরা দাদি-নানির কাছে নিচ্চই হুনতাম। তেমন কিছু তো আমরা কেউ কোনদিন হুনি নাই। শুধু আমরা ক্যান, আমাগো মুরুব্বীরাও কেউ হোনে নাই।'

মনা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, ব্যাপারটা অভিনয় কি না বুঝতে পারলেন না জাকির সাহেব। অবশ্য মনার কথা বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না। যেখানে গ্রামের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষই মনার কথা বিশ্বাস করছে না, সেখানে জাকির সাহেবের বিশ্বাস করার কোন কারণই নেই। তিনি ভাবছেন এই ঘটনার ব্যাখ্যাটা

কী?

সহজ ব্যাখ্যা, মনা মিথ্যে বলছে। কিন্তু যদি ধরে নেন, মনা মিথ্যে বলছে না, তা হলে ব্যাখ্যাটা কী? পানিতে ডুবে থাকতে-থাকতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ায় কি মনা উল্টাপাল্টা দেখছে? নাকি পানির নীচের অতিরিক্ত চাপটা সে সহ্য করতে পারছে না?

'মনা, তুমি কি যে-কোন পানিতে ডুব দিলেই প্রাসাদটা দেখতে পাও?'

'না, স্যর। বিশ্বাস করেন, শুধু লালদীঘিতেই এইটা আছে।'

'চলো, তা হলে দীঘির পাড়ে যাই। দেখি তোমার প্রাসাদ কোথায়...

গ্রামের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে একটা জংলামত জায়গায় লালদীঘির অবস্থান। বহুকাল আগে কোন এক জমিদার দীঘিটা কাটিয়েছিলেন। একসময় হয়তো অনেক বিশালই ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুতেই এটাকে দীঘি বলা যাবে না, বড়জোর পুকুর বলা যেতে পারে। চারদিক ঘিরে রেখেছে ঘন ঝোপঝাড়। এর মাঝে খানিকটা জায়গা ঝোপের দখলমুক্ত। সেখানেই লালদীঘির শানবাঁধানো প্রাচীনকালের ঘাট। এখন অবশ্য জরাজীর্ণ অবস্থা ঘাটটার, প্রাচীনকালের জৌলুসের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই! জায়গায়-জায়গায় আস্তর খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে ভিতরকার কাঠামো। কখন যে পুরোটা ভেঙে পড়ে দীঘিতে, কে জানে!

দীঘিতে ফুটে রয়েছে অজস্র লাল শাপলা ফুল। সম্ভবত লালদীঘি নামকরণের কারণ এই ফুলগুলোই। ঘাটের সৌন্দর্যে না হলেও দীঘির সৌন্দর্যে ঠিকই মুগ্ধ হলেন জাকির সাহেব। আজকাল লাল শাপলা খুব একটা দেখা যায় না।

যদিও জাকির সাহেব কিংবা হাসান, কেউই মনাকে পানিতে নামতে বলেননি, তবুও এলাকার মুরুব্বীদের পীড়াপীড়িতে পানিতে নামল মনা। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন চেয়ারম্যান সাহেব। শহরের অতিথিরা মনার খেলা না দেখে ফিরে যাবে? তা কী করে হয়! দেখুক ভাল করে, গ্রামেও প্রতিভার অভাব নেই!

ডুব দিল মনা।

দশ মিনিট, বিশ মিনিট করতে-করতে প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল! মনা উঠে এল না পানি থেকে! অতিথিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন! কিছুতেই কোন মানুষের পক্ষে এতক্ষণ দম রাখা সম্ভব নয়!

গ্রামের লোকেরা বিচলিত হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত আধ ঘণ্টার বেশি পানিতে থাকেনি মনা। কী হলো আজ তার?

ঠিক তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে পানিতে মাথা তুলল মনা। জানাল, আজ পরীরা কিছুতেই তাকে আসতে দিতে চাচ্ছিল না! রীতিমত জোর করে আসতে হয়েছে তাকে, তাই এত দেরি!

বলা বাহুল্য, গ্রামের কেউই তার কথা একবিন্দু বিশ্বাস করল না। এমনকী হাসানের মুখভঙ্গিই বলে দিচ্ছে তার মনের ভাবনা, সে ভাবছে, ব্যাটা ডাহা মিথ্যুক।

তবে হাসানের দৃষ্টিতে কিছুটা প্রশংসাও আছে, ব্যাটা মিথ্যুক হলেও তার দম রাখার ক্ষমতা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। শুধু জাকির সাহেবের মুখ দেখে তাঁর

মনের ভাবনা কিছুই বোঝা গেল না। ভীষণ চিন্তিত তিনি, কপাল কুঁচকানো, আনমনে হাতের নখ কামড়াচ্ছেন! একসময় নীরবতা ভেঙে বললেন, 'আচ্ছা, মনা, তুমি কি এখন আবার যেতে পারবে ওখানে?'

'পারুম, স্যর। ক্যান?'

'কিছু ছবি তুলে আনবে ওখানকার। আমার মোবাইল ফোনটা সাথে নিয়ে যাবে। ফোনটা পানি নিরোধক। তাই পানি ঢুকে নষ্ট হবার ভয় নেই। পারবে তো?'

'জে, পারুম। ক্যামনে ছবি তোলে, শিখাইয়া দেন।'

জাকির সাহেব শিখিয়ে দিলেন। মনা মোবাইল নিয়ে পানিতে নেমে গেল। সবাই চরম উৎসাহ নিয়ে মনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা করে পুরো দুই ঘণ্টা হয়ে গেল, মনা ফিরল না!

আর থাকতে পারলেন না জাকির সাহেব। সবাইকে অবাক করে দিয়ে নিজেই পানিতে নামলেন। অনেকক্ষণ দীঘিতে একের পর এক ডুব দিলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না! না মনা, না মনার রাজপ্রাসাদ! খবর পেয়ে গ্রামের একগাদা জোয়ান ছেলেপিলে এল। ডুবের পর ডুব দিয়ে খুঁজতে লাগল। গ্রাম্য জেলেরা দীঘিতে মাছ ধরার বড় জালটা ফেলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, পাওয়া গেল না মনাকে!

জাকির সাহেব নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শহর থেকে হেলিকপ্টারে করে ডুবুরি আনালেন। তারা বিকেল থেকে গভীর রাত অবধি গোটা দীঘি তোলপাড় করে ফেলল। খোঁজ মিলল না মনার!

তারপর থেকে গ্রামের লোক আর কোনদিন মনাকে দেখেনি। যদিও একটা দুষ্টু ছেলে কোন এক ভরদুপুরে মনাকে লালদীঘিতে সাঁতার কাটতে দেখেছে বলে দাবি করেছিল! তবে তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি!

কাজের ফাঁকে জাকির সাহেব প্রায়ই ভাবেন, কেমন আছে মনা সেই রাজপ্রাসাদে?

ফেলিস ক্যাটাস

বাড়িতে পা দিয়েই মেজাজ পুরোপুরি বিগড়ে গেল মিসেস সেলিমের। একেবারে শুরু থেকেই ব্যাপারটা অপছন্দ ছিল তাঁর। সেলিম সাহেব যেদিন অফিস থেকে ফিরে খুশি-খুশি গলায় জানালেন, তাঁকে সিলেটের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের চা বাগানে বদলি করা হয়েছে, সেদিনই চেহারাটা হাঁড়ির তলার মত কালো করে ফেলেছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, কর্তার উচ্ছ্বাস এতটুকুও স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে। ঢাকা শহরের অমন বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে কোন্ গৃহিণীই বা চাইবে মফস্বলে গিয়ে থাকতে? প্রকৃতির শোভা দেখে আর কদ্দিন? সেখানে কি রাজধানীর সব নাগরিক সুবিধার ছিটেফোঁটাও মিলবে? কক্ষনো না! মেয়ের পড়াশোনার জন্য ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে? বিশালাকার শপিং মল, বিউটি পার্লার, সিনেপ্লেক্স? প্রশ্নই আসে না! তা হলে?

সেলিম সাহেবের হাস্যোজ্জ্বল চাঁদবদনের দিকে তাকালেই রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর। সে জ্বলুনি আরও বাড়ল, যখন একমাত্র মেয়ে ইশানাও বাপের শিবিরে যোগ দিয়ে যাবার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে গেল! ফলশ্রুতিতে তিন সদস্যের পরিবারে দুই-এক ভোটে হেরে গিয়ে ঢাকা ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে হলো তাঁকে। তারই ধারাবাহিকতায় এই হতচ্ছাড়া শ্রীহীন বাড়িতে তাঁদের পদার্পণ! মেজাজ আর ঠিক থাকে কী করে?

বাড়িটা পুরানো, তবে গঠন বেশ মজবুত। অযত্ন অবহেলায় দেয়ালগুলো রঙ হারিয়েছে বহুকাল আগেই। আশপাশে আর কোন বাড়ি-ঘরও নেই। আঙিনার আগাছার জঙ্গল এত ঘন যে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার না পারলেও দু'-একটা মেছোবাঘ যে সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! বাড়ির পিছনের ঝোপগুলো আরও এক কাঠি বাড়া! দূরের পাহাড়ের আবছা চূড়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না ওদিকে তাকালে। পুরো বাড়িটায় কেমন যেন একটা অশুভ-অশুভ গন্ধ!

দেখে শুনে সেলিম সাহেবও মনে-মনে খানিকটা দমে গেলেন। তবে বাইরে অবশ্য সেটা মোটেও প্রকাশ করলেন না। সস্তা হাসি তামাশা করে স্ত্রী-কন্যাকে প্রাণবন্ত করে রাখতে চাইলেন। তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ করলেও তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শায়লা, ইচ্ছেমত তাঁর পিণ্ডি চটকাবে! কাল সকালে উঠে আবার ঢাকা ফেরত যাবার জন্য গোঁ ধরে বসলেও, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না! শায়লার তেড়া ঘাড়ের রগের সাথে ভালই পরিচয় আছে

তাঁর!

তাই বাড়িটিকে জমিদার বাড়ি আর নিজেদেরকে জমিদার পরিবার ভাবতে বললেন স্ত্রী-কন্যাকে। ইশানা অবশ্য মোটেও মন খারাপ করেনি। নতুন জায়গায় এসেছে, এতেই আনন্দ তার চোখে-মুখে উপচে পড়ছে। সে ভাবছে এটা একটা ট্যুর, ক'দিন পরেই ফিরে যাবে চেনা জীবনে। তাই সে খুশি মনেই জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শায়লাকে সাহায্য করছে আর বাবা-মায়ের খুনসুটি উপভোগ করছে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে শায়লার মুখ চলছে মেশিনগানের মত! প্রতি মিনিটেই অন্তত দশবার সেলিম সাহেবের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছেন অবলীলায়। সেলিম সাহেব অবশ্য এসব কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। রাগের মাথায় বলা কথাকে গুরুত্ব দিতে হয় নাকি আবার?

ঘর গুছাতে-গুছাতেই অনেকটা সময় কেটে গেল। পাহাড়ি এলাকা, রাত নামে ঝপ করে। দিন আর রাতের মধ্যবর্তী সান্ধ্য-বিরতি অতি স্বল্প এখানে। দেখতে-দেখতেই কালিগোলা অন্ধকারে ছেয়ে গেল গোটা এলাকা। কালো মেঘে ঢাকা আকাশে একরত্তি চাঁদও নেই যে, খানিকটা আলো বিলাবে। মেঘ না থাকলে বেশ বড়সড় একখানা চাঁদের দেখা পাওয়া যেত নিঃসন্দেহে। পূর্ণিমা বিদায় নিয়েছে দিন তিনেকের বেশি তো হয়নি।

অনেকটা পথ ভ্রমণের ধকল, সেই সাথে ঘর গুছানোর ক্লান্তিতে রীতিমত ভেঙে পড়তে চাইছে সবার শরীর। চোখগুলো বুজে আসতে চাইছে, খুলে রাখতে হচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায়। ঢাকা থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার দিয়েই ডিনার সারা হবে আজ। তাই চটজলদি ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ল সবাই। দু'মুঠো খাবার মুখে দিয়েই শুতে যাবে।

খাবার আধাআধি মতন হয়েছে, ঠিক তখনই প্রথম দর্শনার্থীটির দেখা পেল সেলিম সাহেবের পরিবার! বাড়ির কেয়ারটেকার লোকমান, সেই যে দুপুরে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে পালিয়েছে, এরপর আর দেখা মেলেনি তার। লোকমানকে বাদ দিলে, এই প্রথম আরেকটি জীবন্ত প্রাণী দৃষ্টিগোচর হলো। এর আগে অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন শায়লা, বাড়িটিতে ইঁদুর, টিকটিকি দূরে থাক, এমনকী একটা মাকড়সা পর্যন্ত নেই! অবাক হলেও মনে-মনে অবশ্য খুশি হয়েছেন তিনি। এসব প্রাণীকে পছন্দ করার কোন কারণ নেই। নাহ, তাঁদের দর্শনার্থীটি কোন মানুষ নয়, একটা বিড়াল। কুচকুচে কালো রঙের একটা বিড়াল। জানালা টপকে ভিতরে ঢুকে মেঝের এককোণে গুটিসুটি মেরে বসল ওটা। তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেবিলে বসা মানুষগুলোর দিকে। চোখের পলক পড়ছে না যেন ওটার! কালো মিশমিশে দেহটা অন্ধকারে মিশে গেলেও, চোখগুলো টর্চের মত জ্বলছে। মনে হচ্ছে দেহবিহীন শুধু একজোড়া চোখ যেন শূন্যে ভেসে রয়েছে!

দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শায়লার। বিড়াল তাঁর এমনিতেই অপছন্দ, আর সেটা কালো হলে তো কথাই নেই। কে না জানে যে কালো বিড়াল কতটা অশুভ?

হাত নাড়িয়ে, সেই সাথে মুখে শব্দ করে তাড়াতে চাইলেন অনাহূত

অতিথিটিকে। কিন্তু কৃষ্ণ শ্বাপদ সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে, গ্যাঁট হয়ে বসে রইল নিজের জায়গায়। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখছে শায়লাকে! বিড়ালটার চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন শায়লা। সেলিম সাহেবকে অনুরোধ করলেন, বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দিতে।

জবাবে হো-হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন সেলিম সাহেব। তারপর বললেন, 'একটা সাধারণ বিড়ালকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে শুনি? বেচারা এসেছে খাবারের গন্ধ পেয়ে। আমাদের খাবার শেষে কাঁটাকুটো যা হবে, দিয়ো এটাকে। এই বনবাদাড়ে খাবার জোগাড় করা কি চাট্টিখানি কথা? হয়তো বিড়ালটা সারাদিনেই কিছু খায়নি।'

রেগে গেলেন শায়লা। 'কালো বিড়ালের প্রতি এত দরদ দেখাতে হবে না। কালো বিড়াল যে অশুভ, সেটা জানা নেই মনে হয় তোমার?'

আবারও হেসে উঠলেন সেলিম সাহেব। 'এত শিক্ষিত হয়েও, কী করে এসব কুসংস্কার বিশ্বাস করো, বলো তো, শায়লা? আর বিশ্বাসই যদি করবে, তা হলে কালো বিড়ালকে নিয়ে ভাল কুসংস্কারগুলো বিশ্বাস করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

'কালো বিড়ালকে নিয়ে আবার ভাল কথাও আছে নাকি?' খানিকটা অবাক হলেন শায়লা।

'আছে বৈ কী! ব্রিটেনের কিছু অংশে বিশ্বাস করা হয়, কালো বিড়াল হলো সৌভাগ্যের প্রতীক! সেকালের কিছু-কিছু নাবিক তাদের জাহাজে কালো বিড়াল রাখত জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায়! তা ছাড়া স্কটিশরা বিশ্বাস করে, যে নারীর কাছে কালো বিড়াল থাকবে, তার অনেক পাণিপ্রার্থী হবে!' বলে চোখ টিপলেন সেলিম সাহেব।

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মিসেস সেলিম। 'দরকার নেই আমার এসব বিশ্বাস করার। এখনই বিড়ালটাকে তাড়াও বলছি।'

'আচ্ছা, বাবা, তাড়াচ্ছি। তুমি শান্ত হয়ে খাও তো।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সেলিম সাহেব। কিন্তু কোথায় বিড়াল? নেই ওটা! তাঁদের কথাবার্তার কোন এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শায়লা।

মাঝরাতে মৃদু গরগর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সেলিম সাহেবের। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না কোথায় আছেন। পরক্ষণেই মনে পড়ল সব, আজই ঢাকা থেকে এই পাহাড়ি অঞ্চলে এসেছেন।

শব্দের উৎস আবিষ্কার করার জন্য হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে চশমাটা নিলেন। পাঞ্জাবীর কোনায় খানিকটা মুছে, চোখে দিয়েই ভয়ানক চমকে উঠলেন!

আকাশের মেঘ কেটে গেছে বেশ খানিকক্ষণ আগেই। চাঁদের বাঁধভাঙা আলো জানালার চৌকাঠ গলে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতর। সে আলোয় সেলিম সাহেব দেখলেন, মেঝেতে অগণিত বিড়াল বসে আছে! প্রত্যেকটার রঙ মিশমিশে কালো! ঠোঁটের কোনায় লালা ঝরছে ওগুলোর! সবক'টার সম্মিলিত মৃদু গরগর শব্দে অদ্ভুত অশুভ এক গুঞ্জনে ভরে গেছে গোটা ঘর! চোখের জায়গায় যেন

আগুনের গোলক বসানো বিড়ালগুলোর। বিশাল খাটটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখে স্থির হয়ে বসে আছে ওরা! কীসের অপেক্ষায় আছে কে জানে! ঠিক কখন শায়লা জেগে উঠেছেন, সেটা টেরও পাননি সেলিম সাহেব। ভীষণ ভয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করতে গিয়েও পারেননি শায়লা, শব্দ বেরোয়নি এতটুকুও। সেলিম সাহেবের পাশেই বরফের মূর্তির মত বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন তিনি।

বিড়ালগুলোর মধ্যে সহসা একটা উত্তেজনার রেশ দেখা গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে-ধীরে বৃত্ত ছোট করে আনতে লাগল ওরা! মৃদু গরগর এখন আর মৃদু নেই, অনেকটা জোরাল হয়েছে!

পরক্ষণেই পাশের ঘর থেকে ইশানার রক্ত হিম করা অন্তিম আর্তনাদ ভেসে এল। কেঁদে উঠে সেদিকে ছুটে যেতে চাইলেন সেলিম দম্পতি। আর ঠিক তখনই জোড়া শিকারের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল কৃষ্ণ শ্বাপদের দল! বহুকাল ধরে অভুক্ত ওরা।

নেক্সাস

ধীরে-ধীরে চোখ খুলল মামুন। তার মাথার মাত্র একহাত তফাতে দাঁড়িয়ে তেলাপোকাটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। দু'হাতে চোখ রগড়ে আবারও তাকাল মামুন। নাহ, তেলাপোকাটা এখনও আগের জায়গায়ই আছে, চোখের ভুল নয়। গড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। সিলিংটাকে মনে হচ্ছে অযুত লক্ষ মাইল দূরে, যেন ওটা আর সিলিং নেই, আকাশ হয়ে গেছে!

রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে মামুন। শুয়ে আছে না বলে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বলাটাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। রাতে হয়তো কিছু একটা খুঁজতে রান্নাঘরে এসেছিল, আর ফিরে যেতে পারেনি। সিংকের নল দিয়ে টপ-টপ করে পানি ঝরছে, রাতে নেশার ঘোরে ওটা বন্ধ করার মত সামর্থ্যও ছিল না মামুনের।

কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল মামুন, টলতে-টলতে বেডরুমের বিছানায় গিয়ে বসল। চোখদুটো লাল হয়ে আছে, ফুলেও গেছে খানিকটা। রাতভর ছাইপাঁশ গিললে, চোখেরই বা আর কী দোষ!

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই খিদেটা চাগিয়ে উঠল তার। দুপুর বারোটা বেজে গেছে, পেট জানান দিচ্ছে খাবার চাই তার। গতকাল দুপুরের পর থেকে আর ভারী কিছু খাওয়া হয়নি। বিকেলের দিকেই চলে গিয়েছিল জুয়ার আড্ডায়, সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত গড়িয়ে গেছে। খাবে আর কখন?

দুপুরের খাবারটা মোড়ের হোটেলটা থেকেই সারে মামুন। যদিও মেলা টাকা বাকি পড়ে গেছে, তবুও কোন সমস্যা হয় না। হোটেলের মালিক তার পূর্ব-পরিচিত, সেই সাথে লতায়-পাতায় কেমন একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আবিষ্কার হয়েছে ক'দিন আগে। তাই খুব একটা রা করে না সে, শুধু মামুন গেলে মুখটাকে হাঁড়ির তলার মত কালো করে ফেলে। ওয়েটাররাও খুব একটা পাত্তা দেয় না মামুনকে, হয়তো এতদিনে ওরাও জেনে গেছে ভিতরের খবর। মাংস চাইলে সাফ বলে দেয়, নেই! বেশিরভাগ সময়ই কাঁটাওয়ালা নলা মাছ দিয়ে ভাত খেতে হয় তাকে। কোনদিন যদিও-বা দু'-এক টুকরো মাংস দেয়, এমন টুকরোগুলোই খুঁজে এনে দেয়, যেগুলো একেবারেই খাওয়ার অযোগ্য! হয়তো পুরোটাই হাড়, একরত্তি গোশত নেই পুরো টুকরো জুড়ে। নয়তো রবারের মতন এক্কেকটা খণ্ড, যেগুলো দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া আর মোহাম্মদ আলীর সাথে বক্সিং লড়া একই কথা! তবুও মামুন কিছু মনে করে না, চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ে।

দিনের পর দিন বিনা পয়সায় খাচ্ছে, কী-ই বা বলার থাকতে পারে তার? যদিও হিসেবের খাতায় প্রতিদিনই তার নামে যোগ হচ্ছে নতুন-নতুন অঙ্ক। তবে সেগুলো শোধ করার সম্ভাবনা যে একেবারে শূন্যের কোঠায়, সেটা মামুনের পাশাপাশি হোটেল মালিকেরও জানা আছে।

খাবার প্রসঙ্গ আসতেই রাশিদার কথা মনে পড়ে গেল মামুনের। সে আগেও খেয়াল করেছে, কেবল পেটে টান পড়লেই রাশিদাকে মনে পড়ে তার, অন্য সময় খুব একটা পড়ে না। আহা, মেয়েটা থাকতে খাবার নিয়ে কোনরকম চিন্তা করতে হত না তাকে। যখনই সে বেহেড মাতাল হয়ে ঘরে ফিরত, দেখত দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে সাথে যে-কোন একটা তরকারি ঠিকই রেঁধে রেখেছে রাশিদা তার জন্য। কোত্থেকে যে মেয়েটা এসব কেনার পয়সা জোগাড় করত, তা কেবল আল্লাহ্ পাকই বলতে পারবেন! তার পকেট মারত নাকি মাগীটা? নাহ, তা-ই বা কী করে হয়। কারণ বাড়ি ফেরার সময় কখনও মামুনের পকেটে ফুটো কড়িও থাকত না। বাড়িতে সে পয়সা নিয়ে ফিরেছে, এমন ঘটনা চেষ্টা করেও মনে করা যায় না। এমন নয় যে সে কখনও জুয়ায় জিতত না, তবে জেতা পয়সাটুকু সে উড়িয়ে আসত কোন পানশালা কিংবা বেশ্যাপাড়ায়। আর পরাজিত হয়ে ফিরলে অকারণেই রাশিদার কপালে জুটত অবর্ণনীয় নির্যাতন, যেন সে-ই মামুনের পরাজয়ের জন্য দায়ী! কখনও প্রতিবাদ করেনি মেয়েটা, নীরবেই সবকিছু সহ্য করে গেছে যত দিন বেঁচে ছিল।

রাশিদার কথা মনে পড়তেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল মামুনের। রাশিদাকে সামনে পেলে এখনই একচোট পিটিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ত সে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে উপায় নেই আর, মরে গেছে রাশিদা কয়েকমাস আগেই। মামুনই পিটিয়ে মেরে ফেলেছে একরাতে! এ নিয়ে অবশ্য তাকে খুব একটা ঝামেলায় পড়তে হয়নি। রাশিদার দিনমজুর ভাইয়ের থানা পুলিশ করার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না মোটেও। বোনের কবর জড়িয়ে সকাল-বিকাল কাঁদত সে, আর আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ জানাত। যেন স্রষ্টাই মামুনকে উপযুক্ত শাস্তি দেন। এসব অভিসম্পাতের থোড়াই কেয়ার করে মামুন। এই কালে যে তাকে কোন আইনি ঝামেলায় জড়াতে হয়নি, এতেই খুশি সে। পরকালেরটা পরকালে দেখা যাবে'খন। সে অবশ্য রাশিদাকে পিটিয়ে মারার মধ্যে নিজের কোন দোষ খুঁজে পায় না! মারবে না-ই বা কেন? যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, তাকে পিটিয়ে মারাই তো উচিত, নাকি? কী এমন আকাশ কুসুম আবদারটা মামুন করেছিল রাশিদার কাছে শুনি? একটা রাতেরই তো ব্যাপার। তাতে কী এমন ক্ষতিটা হত? জুয়ার আড্ডায় জরু-বাজি রাখা কি নতুন কিছু নাকি? শাশ্বতকাল ধরেই তো এটা চলে আসছে। কখনও অর্থের অভাবে জুয়াড়িরা নিজেদের বউ বাজি রাখছে। কখনও বা আবার খেলার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য ঘরের স্ত্রীকে তোলা হচ্ছে বাজির টেবিলে! সে রাতেও তেমনি একটা বাজিতে হেরেছিল মামুন। এজন্য রাশিদাকে কেবলমাত্র একটি রাত হারুন ভাইয়ের সাথে থাকার জন্য বলেছিল। এতে সমস্যাটা কোথায়? স্বামী হিসেবে মামুনেরই যেখানে কোন আপত্তি নেই, সেখানে রাশিদার এত নখরার

কারণ কী? পাশ্চাত্যে তো আজকাল দাম্পত্যের একঘেয়েমি কাটাতেও হরহামেশাই স্ত্রী কিংবা স্বামী বদল হচ্ছে কিছুটা সময়ের জন্য। এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে? বরঞ্চ তারা সুখে আছে, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত আছে। একই রেসিপিতে আটকে না থেকে, ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদ নিচ্ছে। এতে দোষের তো কিছু নেই!

অথচ রাশিদা মাগীটা করল কী? কথাটা শোনা মাত্রই ঘরের ভিতর একটা নাটক জুড়ে দিল! মামুনের পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। চিৎকার করে বলতে লাগল, এ কাজ করার চেয়ে নাকি তার মরণই ভাল। তো মামুন সেরাতে ঠিক তা-ই করেছে, রাগের চোটে পিটিয়েই মেরে ফেলেছে রাশিদাকে। মাগীটা অমন ড্রামা না করলেও পারত। মামুন তাকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছে যে জুয়ার আড্ডায় এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কয়েক সপ্তাহ আগে মামুন নিজেও এমন একটা বাজিতে জিতেছিল। বিনিময়ে একরাতের জন্য পেয়েছিল নয়না ভাবীকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এসব শোনার পর রাশিদার কান্নার পরিমাণ যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? মামুনের ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে, নাকি?

নয়না ভাবীর কথা মনে পড়তেই মামুনের মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নয়না, সুব্রত ভাইয়ের বউ। কী একখানা শরীর! আহা, যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা; দেহের প্রতিটি উঁচুনিচু ভাঁজে বার-বার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বিছানার ছল-চাতুরীও সে জানে মেলা, একেবারে পাকা খেলোয়াড়। মামুন জাগিয়ে রাখবে কী, উল্টো সে-ই সকাল অবধি একরত্তি ঘুমোতে দেয়নি মামুনকে। সে রাতের কথা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না মামুন। সত্যি বলতে, নয়নাকে আরেকবার পাবার লোভেই জরু-বাজিতে নাম লিখিয়েছিল সে। কিন্তু বিধি বাম। তার পরিকল্পনা মোতাবেক হয়নি কিছুই!

গোসল সেরে হোটেল থেকে ভরপেট ভাত খেয়ে এল মামুন। আজ তার কপালটা বেশ ভাল বলা যায়, কারণ আজ তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে খাসীর গোশত খেতে দেয়া হয়েছে! দুটো টুকরোর একটিও খাওয়ার অযোগ্য নয়, বরঞ্চ দুটোই ছিল তুলতুলে নরম। সুস্বাদু তরকারি পেয়ে, গোটা চারেক প্লেট ভাত সাবাড় করে দিয়েছে আজ মামুন। মালিকের কুঞ্চিত ভুরু তাকে দমাতে পারেনি। তবে বেশি খেয়ে এখন কেমন যেন হাঁসফাঁস লাগছে তার, শুয়ে বসে কোনভাবেই ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না সে। কিছুক্ষণ টিভি দেখার বৃথা চেষ্টা করল মামুন, কিন্তু মন বসাতে পারল না। মন পড়ে রয়েছে সে জুয়ার আড্ডার প্রশস্ত টেবিলে। আড্ডায় যাবার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ। কারও কাছ থেকে যে ধার নেবে, সে উপায়ও নেই আর। সম্ভাব্য প্রত্যেকের কাছ থেকেই ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধার নেয়া হয়ে গেছে। তাকে দেখতে পেলেই ওরা এখন পুরানো পাওনা আদায়ের জন্য তাড়া করবে, নতুন করে আর দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না!

গোটা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মামুন। নাহ, বেচার মতন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। রাশিদা মরার পর ঘরের সবকিছু বেচতে-বেচতে প্রায় খালি করে

ফেলেছে ও। রাশিদা থাকলে কিছুতেই দাদার আমলের স্মৃতিগুলো বেচতে দিত না, ঠিকই আগলে রাখত। বিনিময়ে হয়তো তার পিঠের ছাল চামড়া উঠে যেত, তবুও পিছু হটত না সে মোটেও। থাকার মধ্যে ঘরে আছে কেবল একটা একুশ ইঞ্চি রঙিন টিভি। কিন্তু ওটা বাড়িওয়ালার, নিজের হলে কবেই বেচে দিত মামুন। রাশিদাকে মা ডাকত বাড়িওয়ালা বুড়োটা, তাই তাকে আদর করে দেখতে দিয়েছিল টিভিটা। রাশিদার মৃত্যুর পর আর ফেরত নিতে আসেনি। পারতপক্ষে মামুনের সামনেই আসে না এখন লোকটা। ভাড়ার তাগাদা দেবার সময়ও অন্য কাউকে পাঠায়, নিজে আসে না। কদাচিৎ যদি মামুনের সামনে পড়েও যায়, চোখ-মুখ শক্ত করে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যায় সে। দু'চোখে নীরব ঘৃণা জ্বলজ্বল করতে থাকে তার। সেটা মামুন নিজেও বুঝতে পারে, কিন্তু পরোয়া করে না। এসবে কিছুই যায় আসে না তার।

যতই সময় গড়াতে লাগল, ততই অস্থির হয়ে উঠল মামুন। আড্ডায় যাবার সময় আর বেশি বাকি নেই, দ্রুত কিছু টাকা যেভাবেই হোক জোগাড় করতেই হবে তাকে। কিন্তু কোথায় পাবে সে টাকা? কোন উপায়ই মাথায় আসছে না তার। ভাবতে-ভাবতে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেল ও। পরক্ষণেই বিদ্যুৎ চমকের মত সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিল তার! রাশিদার কঙ্কালটা বেচে দিলে কেমন হয়? কবিরের কাছে সে শুনেছে, মেডিকেলের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কঙ্কালের দরকার হয়। প্রতিবছরই বাড়ছে এর চাহিদা, সে তুলনায় সরবরাহ নেই তেমন। তাই এককেটা কঙ্কাল বেশ চড়া দামেই বিক্রি হয় এখন। কবির একটা সরকারি মেডিকেলে পিয়নের কাজ করে। তাকে বললে, সে সহজেই বেচে দিতে পারবে কঙ্কালটা। অবশ্য তাকে দু'য়েক হাজার টাকা কমিশন ঠিকই দিতে হবে, তবে এটুকু দিতে আপত্তি নেই মামুনের। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মামুন। এটাই একমাত্র উপায়, কবর থেকে তুলে বেচে দেবে সে রাশিদাকে। বেঁচে থাকতে কোন মূল্যই তো ছিল না মাগীটার, মরে গিয়ে অন্তত কিছুটা দাম বেড়েছে তার!

কাজটা করার জন্য খুব একটা দূরেও যেতে হবে না মামুনকে। বাড়ির সামনের রাস্তাটার লাগোয়া গোরস্থানেই কবর দেয়া হয়েছিল রাশিদাকে। ওখান থেকে সহজেই তুলে আনা যাবে ঝকঝকে কঙ্কালটা। আচ্ছা, একটা আঙুল ভাঙা থাকলে কি কঙ্কালের দাম কমে যায়? পিটিয়ে একবার রাশিদার বাম হাতের কড়ে আঙুলটা ভেঙে দিয়েছিল মামুন। এতে যদি দু'-এক হাজার টাকা কমও পাওয়া যায়, তাতেও অবশ্য রাজি মামুন। সবকিছু বাদছাদ দিয়েও যেটুকু থাকবে, তা দিয়ে দিব্যি ক'দিন চুটিয়ে জুয়া খেলতে পারবে সে।

গভীর রাতের অপেক্ষায় রইল মামুন। সময় যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। একের পর এক সিগারেটের ধোঁয়া গিলেই মুহূর্তগুলো পার করতে হলো তাকে। একখানা কোদাল নিয়ে সে যখন গোরস্থানের দিকে যাত্রা করল, তখন ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। কবরটা খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট হলো না মামুনের। যদিও এ কয়েক মাসে আগাছা জন্মে প্রায় ঢেকে গেছে, তবুও

বেশ সহজেই ওটা খুঁজে পেল মামুন। চারপাশে তাকিয়ে কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল তার। সারি-সারি কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে চকিতেই মৃত্যুচিন্তা জেগে উঠল তার মনে। কেমন থাকে কবরে মৃত মানুষেরা? গভীর নিশ্ছিদ্র আঁধারে একাকী কেমন করে থাকে ওরা!

একনাগাড়ে ঝিঁঝি পোকা ডেকে চলেছে। তাদের গুঞ্জনে মাথাটা ঝিম-ঝিম করে উঠল মামুনের। পুরো পরিবেশটা তার কাছে কেমন যেন অপার্থিব মনে হচ্ছে। তবে সহসাই ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারল সে। গলা পর্যন্ত গেলা মদের ভূমিকা এক্ষেত্রে স্বীকার না করে উপায় নেই। কোদালের প্রথম কোপটা কবরে পড়তেই ঝিঁঝি পোকাদের ডাক আচমকা বন্ধ হয়ে গেল! চমকে উঠল মামুন। চারপাশের এহেন নীরবতা অসহ্য ঠেকল তার কাছে। গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে কোদাল চালাতে লাগল ও কবরের উপর। রাতের নিশ্ছিদ্র নীরবতা চিরে গেল একের পর এক কোদালের কোপের আওয়াজে। হঠাৎ মামুনের মনে হলো কারা যেন ঝোপগুলোর আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ঝোপ থেকে কেমন যেন একটা গোঙানির মতন শব্দ ভেসে এল না? ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল মামুন। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না তার। শিয়াল নাকি? পাত্তা দিল না মামুন। সমানে কুপিয়ে চলল। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সমাধা করে এই অশুভ জায়গাটা থেকে বিদায় নিতে চায় সে। অনেকক্ষণ কোপানোর পর কবরের প্রায় তলায় পৌঁছে গেল মামুন, কাজ শেষ হয়ে এল বলে। পরক্ষণেই মাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল একখানা হাত। যদিও মাংসের আর ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই ওটাতে, তবুও সহসাই ওটা চিনতে পারল মামুন, রাশিদার হাত! আর অল্পক্ষণের মধ্যেই গোটা শরীরটা বের করে ফেলা সম্ভব হবে। আবারও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল মামুন। আচমকা হাতটা খপ করে মামুনের গলা চেপে ধরল। সীমাহীন আতঙ্কে দু'চোখ বিস্ফারিত হবার জোগাড় হলো তার। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল সে। তবে চিৎকার শোনার মত আশপাশে তখন নেই কেউ। বহুদূর থেকে যারা ঘুমের ঘোরে সে চিৎকার শুনতে পেল, তারাও কেউ ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না যে আওয়াজটা কীসের! আবারও শোনার অপেক্ষায় কান পেতে রইল কেউ-কেউ, কিন্তু আর শোনা গেল না কোন আর্তনাদ। কারণ ততক্ষণে মামুনকে কবরের ভিতর টেনে নিয়েছে রাশিদা। বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে রেখে, আরেক হাতে কবরের পাশের আলগা মাটি ভিতরে ফেলছে। চিৎকার করতে গিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না মামুনের মুখ দিয়ে। দেহের সর্বশক্তি কাজে লাগিয়েও সেই বজ্রকঠিন বাঁধন থেকে মুক্তি পেল না সে। ততক্ষণে প্রায় সবটুকু মাটি দিয়ে কবরটা আবার ঢেকে ফেলেছে রাশিদা। স্বামীকে এতদিন পর কাছে পেয়েছে, ছাড়বে কেন এত সহজে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবারও ঝিঁঝি পোকারা ডাকতে শুরু করল। চিরচেনা নিশ্ছিদ্র আঁধারে ঢেকে রইল চারপাশ। যারা এ ঘটনার সাক্ষী রইল, তারা কেউ কোনদিন মুখ খুলবে না মানুষের কাছে!

পরদিন সকালে বোনের কবরটা দেখতে এল রাশিদার দিনমজুর ভাইটা। সে

দেখতে পেল, কবরের উপরের দিকের মাটিগুলো কেমন যেন আলগা হয়ে আছে। শেয়ালকে গালাগাল করতে-করতে চেপেচুপে মাটিগুলো ঠিক করে দিল সে। তারপর মনে মনে আবারও মামুনের নামে স্রষ্টার দরবারে নালিশ করল। গরীবের ফরিয়াদ কি সত্যিই শোনেন বিধাতা? তার জানা নেই, গতকাল রাতেই ঈশ্বর তার প্রার্থনা কবুল করেছেন!

প্রেতচক্র

শহরের এদিকটায় এমনিতেই লোক বসতি খুব একটা নেই। যাও-বা কয় ঘর লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এখানে, তারাও বেশিরভাগই শ্রমিক শ্রেণীর। তাই রাত দশটা বাজতেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আয়োজন করে তারা। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর বেশি রাত অবধি জেগে থাকার সামর্থ্য থাকে না আর কারও!

তাই রাত বারোটা নাগাদ যখন কবির আর লিটন রাস্তায় নামল, আশপাশে কোন জনমানবের চিহ্নও খুঁজে পেল না ওরা! ওদের অবশ্য আরও আগেই বেরোনোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পুলিশের ভয়ে সেটা সম্ভব হয়নি। শহরের কোথায় যেন বিকেলের দিকে বেশ গোলাগুলি হয়েছে, তাই রাত এগারোটা পর্যন্ত পুলিশের গাড়ি টহল দিয়ে বেড়িয়েছে গোটা শহর জুড়ে। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কপালে দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না, তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই পুলিশের টহল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে ওদের। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দেরি করে বেরোনোর কারণে আরেক দিক থেকে ক্ষতি কোন অংশে কম হয়নি। একটা শিকারের টিকিটুকুনও দেখা যাচ্ছে না কোথাও!

ওদের দু'জনের হাতেই সদ্য শান দেয়া মাঝারি আকারের ভোজালি শোভা পাচ্ছে। মানুষ শিকারে বেরিয়েছে ওরা! আজ তাদের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ এক রাত। আজ সফলভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারলেই কেবল তাদের এতদিনের লালিত স্বপ্ন সফল হবে। মিলবে মহাপরাক্রমশালী শয়তানের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ! আজ রাতে প্রেতচক্রে একখানা তাজা নরমুণ্ড চড়ানোর মাধ্যমেই পরিসমাপ্তি ঘটবে এতদিনের দীর্ঘ কর্মসূচীর!

বহুদিন ধরেই একনিষ্ঠভাবে শয়তানের উপাসনা করে যাচ্ছে ওরা। অবশ্যই তাদের জানা আছে যে ঈশ্বরই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তবে গোটা দুনিয়া জুড়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে অগণিত মানুষ। ক'জনকে ক্ষমতা দেবেন তিনি? তার উপর ঈশ্বর খুশি হলেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা কিছুতেই দেন না তিনি পৃথিবীতে! কিছু রেখে দেন পরকালের উপহার স্বরূপ, সেখানে নির্ধারণ হয় স্বর্গ-নরক। শয়তানের উপাসনায় এসবের বালাই নেই মোটেও! দুনিয়াতেই কেবল সকল ক্ষমতা দেবার সামর্থ্য আছে তার, পরকালের স্বর্গ-নরকে দখল নেই একফোঁটাও! শয়তানের পূজারীদের সংখ্যাও হাতে গোনা। তাই যারা স্বেচ্ছায় শয়তানের উপাসনায় নিজেকে সঁপে দেয়, তাদেরকে বিশেষ পছন্দ করে সে। অজস্র ক্ষমতায় ভরিয়ে

দেয় তাদের গোটা জীবন! এ ক্ষমতার লোভেই যুগ-যুগ ধরে কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ প্রেত সাধনায় নাম লিখিয়ে এসেছে!

কবির এবং লিটন এপথে এসেছে লোকনাথ তান্ত্রিকের হাত ধরে। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে এই কামেল তান্ত্রিকের দেখা পেয়েছিল ওরা। তারপর থেকেই তান্ত্রিকের দেখানো পথ ধরে একনাগাড়ে শয়তানের উপাসনা করে যাচ্ছে দিনরাত। মাঝে-মাঝে করতে হয়েছে বিশেষ কিছু আচার-অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে বাদুড়ের ডানার স্যুপ থেকে শুরু করে জ্যান্ত হরিণের মাংস খাওয়া পর্যন্ত সবই ছিল! বাদুড় জোগাড় করা অবশ্য খুব একটা কঠিন হয়নি, তবে ঝামেলা হয়েছিল জীবন্ত হরিণের মাংস খেতে গিয়ে! আজকাল সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের প্রহরা ভীষণ কড়া। তা ছাড়া জলদস্যু কিংবা বাঘের শিকার হয়ে যাওয়ার ভয়টাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না কোনমতেই। শেষমেশ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপে গিয়েই খেতে হয়েছে জীবন্ত হরিণের মাংস! সেখানে হরিণের এক বিশাল অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে বেশ অনেকদিন আগে। হরিণটাকে না মেরে তার জীবন্ত শরীর থেকে মাংস খুবলে খেতে গিয়ে যে জান্তব অনুভূতি হয়েছিল, সেটা অনেকদিন পর্যন্ত তাজা ছিল ওদের মনে!

এ-গলি ও-গলি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও একটা মানুষের দেখা পেল না ওরা! অন্যদিন গভীর রাত অবধি চায়ের দোকানগুলো অন্তত খোলা থাকে, সেখানে দু'জন মানুষ পাওয়া মোটেও কষ্ট হত না। আজ শহরের গোলমালের জন্য একটা দোকানও খোলা নেই কোথাও! খোলা দোকান তো দূরের কথা, একটা নাইটগার্ড পর্যন্ত নেই রাস্তায়! পুলিশ শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, এই ভরসায় সবক'টা নির্ঘাত নাক ডাকছে নিরাপদ গার্ড রুমের চৌকিতে শুয়ে। বাইরে থাকলে ওদের দুয়েকটাকে তো অন্তত পাকড়াও করা যেত!

শেষরাত অবধি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ব্যর্থ হয়ে মানসিকভাবে রীতিমত ভেঙে পড়ল লিটন! তবে কি তাদের এতদিনের সব সাধনা বিফলে যাবে?

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে বলল, 'এখন কী হবে, বল তো? সব পরিশ্রম তো জলে যাবার উপক্রম হয়েছে!'

কবির বেশ শান্ত, অস্থিরতা তার স্বভাবে নেই একদম। ধূর্ততার জন্য পরিচিত মহলে বেশ কুখ্যাত সে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'কোন না কোন উপায় ঠিকই বেরিয়ে যাবে! অস্থির হওয়ার কিছু নেই, দোস্ত!'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিল লিটন, 'কীসের উপায় বেরোবে, শুনি? অন্তত একজন মানুষ পেলেও তো আমাদের যে-কোন একজনের উপাসনাটা সম্পূর্ণ করা যেত। সেটুকুও তো পাওয়া গেল না। পুরো চক্রটাই হয়তো আবার নতুন করে শুরু করতে হবে আমাদের। এতদিনের সবকিছু ধুলোয় মিশে গেল পুরোপুরি!'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কবির, মুখে এতটুকু শব্দও উচ্চারণ করল না! পরক্ষণেই চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। মনে হয় কোন একটা উপায় সে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলেছে! 'দু'জনের পরিশ্রম বেকার যাবে

া, দোস্ত! শুধু তুই যদি একটু সহযোগিতা করিস!'

বেশ খানিকটা অবাক হয়েই তার দিকে তাকাল লিটন! 'মানে?'

জবাব না দিয়ে ধীরে-ধীরে লিটনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল কবির। তারপর মাচমকা ভোজালির এক কোপে লিটনের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল স! পুরো ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের পলকে, বাধা দেয়ার সামান্যতম সুযোগও পল না লিটন! প্রেতচক্রে চড়ানোর জন্য একখানা তাজা নরমুণ্ড জোগাড় করে ফলেছে কবির!

মুঠোফোন

আনন্দ যেন কিছুতেই বাঁধ মানছে না সামির। মানবেই বা কী করে? আজ বিকেলেই সে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত মোবাইল ফোনটা হাতে পেয়েছে কি না! যদিও ফোনটা একদম আনকোরা নতুন নয়। কিন্তু তাতে কী? তার কাছে তো জিনিসটা নতুন। যাক, এবার অন্তত বন্ধুদেরকে নিজের নাম্বার দেয়া যাবে। এতদিন নিজের ফোন ছিল না বলে কী লজ্জাটাই না তাকে পেতে হত! কাউকে ফোন করতে হলে দোকান থেকে করা, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। তোর মোবাইল নেই? কথাটা সবাই এমনভাবে বলত, যেন মুঠোফোন জিনিসটা শরীরের একটা অঙ্গ! যা অন্য সবার আছে, কিন্তু তার না থাকায় সে একটা বিকলাঙ্গ প্রাণী! বন্ধুরা মুখের উপরই নানা হাসি তামাশা করত আর বান্ধবীরা মুখ টিপে-টিপে হাসত! যাক, এবার বুঝি এসব থেকে মুক্তি মিলল।

তার ফোন থাকবে কী করে? একটা মোবাইল সেটের দাম কি একেবারে কম? এটা তো আর মোড়ের দোকানের মুড়ি না যে, দু'টাকা দিয়ে ঠোঙা ভরে কিনে আনলাম। যার জীবন চলে টিউশনির টাকায়, সে-ই কেবল বোঝে কত ধানে কত চাল! থাকা-খাওয়া, পড়াশুনা এসব নানা রকম দৈনন্দিন খরচের পর, মাস শেষে কত টাকাই-বা হাতে থাকে? এর মধ্যে একটা মোবাইল কেনার টাকা জমানো কি চাট্টিখানি কথা? সে তো আর অন্যদের মত বাবার টাকায় চলে না। তার নিজের জীবন চলার খরচ তার নিজেকেই জোগাড় করতে হয়। বাবাই নেই, তার আর বাবার টাকা! শুধু বাবা-মা কেন, তার যে নিকটাত্মীয় বলতেই কেউ নেই দুনিয়ায়, সে খবর ক'জন রাখে? তার বন্ধুদের মধ্যে কে আর তার মত ছোট্ট একটা চিলেকোঠার ঘরে ভাড়া থাকে? টিটকারি আর হাসি তামাশা করা ওদের কাছে যতটা সহজ, তার জীবনে শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই তার চেয়ে ঢের কঠিন!

অনেক দিন আগেই মোড়ের চা দোকানদার রফিক ভাইকে একটা ব্যবহৃত মোবাইল সেটের কথা বলে রেখেছিল সামি। রফিকের কাছে প্রায়ই অনেক পুরানো ব্যবহৃত মোবাইল সেট আসে। কোত্থেকে আসে সেটাও এলাকার সবাই জানে, সামিও জানে। যত গুণ্ডাপাণ্ডা আর নেশাখোরের সাথে চলাফেরা রফিকের। তাদেরই কেউ-কেউ হাত খরচ অথবা নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি-ছিনতাই এসব করে। চুরির মাল নিজে বিক্রি করতে গেলে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা নেহায়েত কম নয়, তাই সেগুলো বিক্রির জন্য নিয়ে আসে রফিকের কাছে। বলা বাহুল্য, বিক্রির টাকা থেকে নিজের জন্য একটা মোটা অঙ্কের কমিশন ঠিকই

বাগিয়ে নেয় রফিক।

অমন একটা মোবাইল সেটই আজ বিকেলে রফিকের কাছ থেকে কিনেছে সামি। সেটটা মোটামুটি নতুনের মতই লাগে দেখতে। আগের মালিক যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা এমনও হতে পারে যে, কেনা হয়েছে অল্প ক'দিন আগে। সেটটার কোথাও কোন আঁচড়ের দাগ নেই, শুধু পিছন দিকে এক ফোঁটা লাল রঙ লেপটে ছিল! তবে সেটা অনেক আগেই টিস্যু পেপার দিয়ে ঘষে মুছে ফেলেছে সামি। তারপর মার্কেট থেকে কিনে এনেছে নতুন সিম কার্ড। তারপর থেকেই সামির মনে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। একটু পর-পরই ফোনটা পকেট থেকে বের করে দেখছে, তারপর আবার পকেটে রেখে দিচ্ছে! বন্ধুদের কাউকে এখনও ফোন করেনি, কাল কলেজে গিয়ে সবাইকে সারপ্রাইজ দেবে। বটতলার আড্ডায় যখন সে পকেট থেকে মুঠোফোনটা বের করবে, তখন সবার চোখগুলো রসগোল্লার মত হয়ে যাবে না? কারও মুখে কোন কথা ফুটবে? ভাবতেই সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল সামির। রাতটা যে কখন কাটবে, কখন সকাল হবে আর কখন যে কলেজে যাবে, সময় যেন কাটছেই না আজ!

উত্তেজনায় ঠিকমত পড়তেও পারল না ও! বইয়ের টেবিলেই রেখেছিল মুঠোফোনটা। পড়তে-পড়তে বার-বারই চোখ চলে যাচ্ছিল ফোনটার দিকে। আর অজান্তেই মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল তার ভিতরের উচ্ছ্বাস। উফ্...কী যে ভাল লাগছে তার, কোন অক্ষরেই তা প্রকাশ করা যাবে না! বহুদিন এমন ভাল লাগেনি ওর। দুঃখ ভরা এ জীবনে ভাল লাগার উপলক্ষ বড্ড কম ছিল কি না!

রাত বারোটার দিকে ঘুমোবার আয়োজন করল সামি। স্যারের আজকের হোমওয়র্কগুলো বড্ড জটিল ছিল। একেবারে ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছে তার। ঘুমও এসেছে খুব। তাই আজ আর রাত জাগবে না বলে ঠিক করেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বিছানা করতে যাবে, ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে গেল। এই যাহ! ঘরে তো মোমবাতিও নেই। এখন? ঠিক তখনই মনে পড়ল, আরে, এখন তার মোবাইল ফোন আছে না? তা হলে আর চিন্তা কীসের? মোবাইলের আলো দিয়েই তো বিছানা করা যাবে। শেষ পর্যন্ত মোবাইলের আলোতে বিছানা করেই শুয়ে পড়ল সামি। মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে ভাসছে বন্ধুদের অবাক হওয়া মুখগুলো!

একটু পরেই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল! ধড়মড় করে লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠল সামি। কাঁচা ঘুম ভেঙেছে, তাই খানিকটা সময় লাগল ধাতস্থ হতে। কে ফোন করেছে তাকে এত রাতে? সে তো নাম্বার কাউকে দেয়নি এখনও! হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিল সামি। অবাক হয়ে দেখল, রিং বাজছে ঠিকই, কিন্তু স্ক্রীনে কোন নাম্বার নেই! শুধু কলিং-কলিং লেখা ভাসছে! ফোনটার ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গেল নাকি? নাকি চোখের ভুল? ভাল করে চোখ রগড়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল সামি। নাহ! সেই একই দৃশ্য। নাম্বার নেই কেন? তবে কি এটা মোবাইল অপারেটরের কল? কিন্তু ওরাই বা এত রাতে কেন কল করবে! কাণ্ডজ্ঞান বলতে কি কিছু নেই ওদের? এত রাতে গ্রাহকদের ফোন করে জ্বালাতন করার মানে কী? কেমন আজব

কোম্পানি এরা!

এসব ভাবতে-ভাবতেই কলটা রিসিভ করল সামি।

'হ্যালো...'

ফোনের অন্যপ্রান্তে অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল একটি নারীকণ্ঠ। যেন কেউ গলা চেপে ধরেছে, কথা বলতে যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার! এমন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'আমি বলছি...'

'আমি কে? পরিচয়টা দিন দয়া করে...'

'তোমার মোবাইলটা আগে আমার ছিল।'

ভীষণ চমকে উঠল সামি! হতে পারে সেটটা এই মেয়ের ছিল, কিন্তু ও তো নতুন সিম কার্ড লাগিয়েছে। তা হলে? ওই মেয়ে তার নাম্বার পেল কীভাবে? তা হলে কি প্রযুক্তির ব্যবহারে জেনে নিয়েছে যে এই সেটে এখন কোন্ সিম ব্যবহার হচ্ছে? অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সামি। বলল, 'ফোনটা আপনার হতে পারে। কিন্তু আমি তো এটা আপনার কাছ থেকে আনিনি, এক দোকানদারের কাছ থেকে কিনেছি।'

'জানি, জানি, জানি। সব জানি আমি।' জান্তব চিৎকার ভেসে এল অন্যপ্রান্ত থেকে! যেন কোন হিংস্র পশুর ক্রুদ্ধ গর্জন! কোন মেয়ের গলা দিয়ে এমন অমানুষিক আর্তনাদ বেরোতে পারে, নিজের কানে না শুনলে কখনও বিশ্বাস করত না সামি! ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল তার গোটা শরীর জুড়ে। ঘামে ভিজে উঠল জামা-কাপড়। বুঝে গেছে, এই মেয়ে সাধারণ কেউ নয়, এই ফোন আর রাখা হবে না তার। এই ভয়ঙ্কর মেয়ে তাকে রাখতে দেবে না কিছুতেই। এতদিনের কষ্ট করে জমানো টাকাগুলো বুঝি অবশেষে জলেই গেল! কোনমতে বলল, 'আপনি কি আপনার ফোন ফেরত চান?'

এবার অট্টহাসি ভেসে এল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। যেন খুব মজার কোন রসিকতা করেছে সামি!

'কী করব আর এখন এটা নিয়ে আমি? কী কাজে লাগবে এটা আমার?'

'তা হলে? কী চান আপনি আমার কাছে? কেন ফোন করেছেন?'

'কেন ফোন করেছি...?'

এটুকু বলেই থেমে গেল কণ্ঠটা। আবার শোনা গেল অট্টহাসি। সে হাসিও কোনমতেই স্বাভাবিক হাসি নয়! যেন পাহাড়ে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে অজস্র হাসির ফোয়ারা!

'কে বলল আমি তোমায় ফোন করেছি? আমি তো সেই শুরু থেকে এখানেই আছি, দূরে কোথাও যাইনি!'

'মানে...?'

জবাবে আবারও শোনা গেল হাসির শব্দ। সেই সাথে শোঁ-শোঁ করে বাতাসের গর্জন। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল সামির। এ কার পাল্লায় পড়ল ও এই মাঝরাতে?

হঠাৎ খেয়াল হলো, বাতাসের গর্জন ফোনের ভিতরে নয়, বাইরে! ভীষণ ঝড়

আসছে। বাতাসের তোড়ে একটা আরেকটার সাথে বাড়ি খাচ্ছে জানালার কবাটগুলো। অথচ স্পষ্ট মনে আছে তার, ওগুলো বন্ধ করেই শুয়েছিল সে। খুলল কীভাবে? ছিটকিনিগুলো কি নষ্ট হয়ে গেছে? নাকি ভালমত লাগায়নি তখন? হঠাৎ আবার কথা ভেসে এল ফোনে:

'একটা-একটা করে সবগুলোকে ধরব আমি। কাউকে ছাড়ব না, কাউকে না!'

'দে...দেখুন। আমি আপনাকে আপনার ফোন ফিরিয়ে দিতে চাই। আপনি নিতে না চাইলে কালই এটা দোকানদারকে ফেরত দিয়ে দেব। আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'তুমি তো ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছ, সামি! এ থেকে তোমার আর কোনমতেই মুক্তি নেই। তোমার ওই দোকানদারও মুক্তি পাবে না! যারা তাকে ফোনটা এনে দিয়েছে, তারাও না। কারও নিস্তার নেই, কারও না!'

'কা...কারা? কারা এনে দিয়েছিল ফোনটা?'

ভয়ের চোটে তোতলাতে লাগল সামি। একবার ভাবল ফোনটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু ফেলে দেবার সাহসটুকুও আর নেই ওর।

'যারা এই সামান্য ফোনটার জন্য আমাকে মেরে ফেলেছিল...' হিসহিস করে বলল মেয়েটা। তার ভিতরকার জমানো ক্রোধের আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে তার কণ্ঠস্বরে।

ফোনের এ প্রান্তে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে রইল সামি, চোখ দুটো বিস্ফারিত। এ কী শুনছে সে? এ কী শুনছে? ভুল শুনছে না তো? একজন মৃত মানুষ তার সাথে ফোনে কীভাবে কথা বলবে? এটা কীভাবে সম্ভব? খোদা তাকে এ কীসের মধ্যে এনে ফেলল? প্রাণপণে চেষ্টা করেও মোবাইলটা ফেলতে পারল না সামি। হাতগুলো যেন কিছুতেই মস্তিষ্কের আদেশ মানতে চাইছে না। বিমূঢ়ের মত মুঠোফোনটা কানে লাগিয়ে ঠায় বসে রইল সামি। ফোনের অপর প্রান্তে থেমে নেই কণ্ঠটা! হিসহিস করে বলে চলেছে...'আমি তো আমার সবকিছু দিয়ে দিতে আপত্তি করিনি। প্রাণ বাঁচাতে এমনকী ইজ্জতটুকুরও মায়া করিনি। তারপরও ওরা কেন আমায় মেরে ফেলল? কেন মারল আমায়, কেন? বলতে পার?'

'আমি জানি না। আমি জানতে চাই না। আমায় ক্ষমা করো, প্লিজ...দয়া করো...' ভাঙা গলায় বলল সামি। আরও একবার ফোনটা ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কী এক অদৃশ্য শক্তি যেন মোবাইলটা তার কানের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছে! শত জনমের জমে থাকা কথামালা শেষ না হলে যেন কিছুতেই ছাড়বে না!

'তুমি শুনতে চাও? শুনতে চাও আমার গলা কাটার মিষ্টি শব্দগুলো? পেতে চাও ঝরনার মত বেরিয়ে আসা উষ্ণ রক্তের স্পর্শ?'

'না না না...' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল সামি। কিন্তু তার সব আপত্তি বিফলে গেল!

ততক্ষণে সে শুনতে শুরু করেছে মেয়েটিকে জবাই করার গা শিউরে ওঠা শব্দ। মেয়েটির প্রাণ বাঁচানোর অন্তিম আকুতি, জান্তব আর্তনাদ! গরগর শব্দ তুলে

কাটা গলা দিয়ে রক্তধারা প্রবাহিত হবার অসহ্য আওয়াজ...

হঠাৎ মুঠোফোনটা থেকে খানিকটা তাজা রক্ত ছলকে এসে পড়ল সামির সারা মুখে। চিৎকার করে কেঁদে উঠল ও। তার কান্নার শব্দ হারিয়ে গেল বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড তাণ্ডবে!

'তুমি আমায় দেখতে চাও, সামি? দেখতে চাও কাল ঠিক এসময় দোকানদার রফিক কাকে দেখবে?'

ততক্ষণে বিছানায় নেতিয়ে পড়েছে সামি। মোবাইলটা তখনও কানে ধরা তার। কোন কথার জবাব দেবার মত অবস্থা আর নেই ওর।

'একটু তাকাও, সামি...'

চোখ তুলে তাকাল সামি। সাথে-সাথে তীব্র আতঙ্কে চোখগুলো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল। মুখ দিয়ে ফেনার সাথে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে।

হ্যাঁ, সে দেখতে পাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে, এলোচুলের একটা তরুণী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো রক্তে ভেজা আর রাজ্যের ধুলোয় মাখামাখি। গলাটা কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে দু'ফাঁক করা। ঠোঁটের দু'কোণ দিয়ে সামান্য রক্ত বেয়ে পড়ছে। একটা চোখ চুলে ঢাকা, আরেকটা চোখে পাথুরে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। তাতেও ভিতরকার ঘৃণা চাপা পড়েনি! হাত দুটো আলতো করে সামনে বাড়ানো। ছোট পদক্ষেপে হেলেদুলে আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে সামির দিকে।

আর সহ্য করতে পারল না সামি! দু'চোখ বুজে অপেক্ষায় রইল। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে তার!

অঙ্গজ

বিকেল গড়ালেই আজকাল মনের গভীরে ঘরে ফেরার তাগাদা অনুভব করে জালাল মিয়া। সাঁঝ ঘনালেই সেই আকুতি একলাফে বেড়ে যায় বহুগুণে। তাই পারতপক্ষে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে চায় না সে। বার-বার মনে হতে থাকে, ঘরে পোয়াতি বউটা একা, সে আবার অন্ধকারকে ভীষণ ভয় পায়। তাই চটজলদি বাড়ি ফিরে আসে জালাল। তাকে ফিরতে দেখলে ভয়ে চোখমুখ শুকিয়ে আসা রহিমার চেহারায়ও রঙ ফিরে আসে।

জালাল পেশায় একজন রিক্সাচালক। তবে রিক্সাটা তার নিজের নয়, মালিকের কাছ থেকে রোজকার হিসেবে ভাড়া নিয়ে চালায় সে। প্রতিদিনকার আয় থেকে মালিকের ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর খুব একটা টাকা অবশিষ্ট থাকে না তার হাতে। তবে যেটুকু থাকে, তা দিয়েই দু'জনের সংসারটাকে ঠেলেঠুলে চালানো যায়। আল্লাহ্‌র কাছে খুব বেশি চাওয়া নেই, তাই দিন শেষে নিজেকে সুখীই মনে হয় জালালের।

অবশ্য সংসার শুরুর প্রথমদিকে অনেক রাত অবধি রিক্সা চালাত জালাল। প্যাডেল ঘুরলেই যখন টাকা আসছে, তখন জোয়ান মর্দ ছেলে অকারণে ঘরে বসে থাকবে কেন? তা ছাড়া রাতের বেলায় তুলনামূলক বেশিই ভাড়া পাওয়া যায় দিনের চেয়ে। তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে এতটুকুও কার্পণ্য করত না জালাল।

তার উপর সংসার জীবনে তখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি সে। সদ্য কৈশোর পেরোনো রহিমার সাথে একই ঘরে সময় কাটাতে কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা লাগত তার! চিরকাল একাকী জীবন কাটানোর ফল। তাই যতটা সম্ভব ঘরের বাইরে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত সে।

তবে সহসাই নিজের এহেন জীবনধারা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিল জালাল। ঘুমোতে যাবার আগে বহু ভণিতার পর সলজ্জ রহিমা যেদিন তাকে জানিয়েছিল, মা হতে চলেছে সে, খুশিতে একেবারে পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল সে। ঝট করে জড়িয়ে ধরেছিল রহিমাকে। চুমোয়-চুমোয় রীতিমত অস্থির করে তুলেছিল তাকে। সেদিনই এক নিমিষে দূর হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যকার সমস্ত সংকোচ, সে জায়গায় ঠাঁই নিয়েছিল একরাশ ভালবাসা।

তারপর থেকেই যথাসম্ভব দ্রুত বাড়ি ফিরতে শুরু করল জালাল। খালি হাতে বাড়ি ফেরার স্বভাব নেই তার মোটেও। রোজ সে দৈনন্দিন বাজারের পাশাপাশি গর্ভবতী স্ত্রীর জন্য নিয়ে আসে রকমারি ফল-ফলাদি। সামর্থ্যের ঘাটতির কারণে

যদি বা কখনও আঙ্গুর, কমলা আনতে না পারে, এক হালি পেয়ারা অথবা গোটা দু
ডালিম আনতে কক্ষণও ভুল হয় না তার।

পোয়াতি মেয়েদের আলাদা যত্নআত্তি করতে হয়, একথা তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আপা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রহিমার দেহের ভিতর তিল-তি করে বেড়ে উঠছে আরেকটি শরীর, তাই তার চাই বাড়তি খাবার, চাই বাড়তি যত্ন একথা কি আর জালাল বোঝে না? বোঝে সে।

তাই তো নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে রহিমার যত্নআত্তির দিে নজর দিয়েছে সে।

নিজে রিক্সায় চড়িয়ে নিয়মিত তাকে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করতে নিয়ে যায় জালাল ডাক্তার আপার সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলতে রহিমাকে রীতিমত বাধ্য কে সে।

রহিমাকে যেন ঘরের ভারী কাজগুলো করতে না হয়, এজন্য একজন ঠিব বুয়ার ব্যবস্থাও করেছে সে। সকাল-সকাল এসে ঘরের যত ভারী কাজ, সব কে দিয়ে যায় বুয়াটা। এ নিয়ে অবশ্য জালালকে প্রতিবেশীদের নানারকম উপহাস সহ করতে হয়েছে। অনেকেই মুখ বাঁকিয়ে বলেছে, গরিবের ঘোড়ারোগ ভাল ন মোটেও। নানাজনের কানকথা শুনতে-শুনতে রহিমা পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে, ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছে বুয়াকে, ঘরের কাজ সে একাই করতে পারবে, দরকার নে বাড়তি পয়সা নষ্ট করার। দু'খানাই তো মোটে ঘর ওদের। তবে কারও কথা মোটেও কর্ণপাত করেনি জালাল। একগুঁয়ের মতন বলেছে, বউ আমার, সন্তা আমার, টাকাও আমার। তা হলে অন্যের কথা শুনতে যাব কোন দুঃখে?

একথার পর আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে রহিমার? তাই বেচা তৎক্ষণাৎ চুপ মেরে গেছে। মনে-মনে স্বামীর ভালবাসার গভীরতা বুঝতে পে খুশিতে ডগমগ হয়েছে। আবার খানিক বাদে অকারণেই শঙ্কিত হয়েছে, এত সু সইবে কি তার কপালে?

এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খানিকটা অবাক হলো জালাল। ঘরটা অন্ধকার, বা জ্বালেনি রহিমা। অথচ এমনটা কখনও হয় না, বিকেল গড়ালেই ঘরের সবক' বাতি জ্বেলে দেয় সে, আঁধারকে ভীষণ ভয় পায় কি না!

তা ছাড়া সন্ধ্যায় ঘর অন্ধকার থাকলে গৃহকর্তার অমঙ্গল হয়, এমনটাই বিশ্বা করে সে। তা হলে? কোথাও কি বেড়াতে গেছে রহিমা? আশপাশের ভাবীদে কারও ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছে না তো? ভাবতে-ভাবতেই ঘরে ঢোকে জালাল সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দেয়। পরক্ষণেই রীতিমত চমকে ওঠে জালাল একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে, খাটের কোনায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে রহিমা মাথাভর্তি কালো চুলগুলো পিঠময় ছড়ানো। চোখগুলো রক্তলাল, মুখটা শুকি আধখানা হয়ে আছে। এই গরমকালেও হি-হি করে কাঁপছে সে, যেন ভীষণ ঠা লাগছে তার! দাঁতে দাঁত ঠোকার স্পষ্ট আওয়াজ দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছে জালাল

কী হয়েছে রহিমার? ভয় পেয়েছে সে? কীভাবে?

জালালকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রহিমা

তারপর হাউমাউ করে শিশুদের মত কাঁদতে লাগল। শক্ত করে আষ্টেপৃষ্ঠে জালালকে জড়িয়ে ধরেছে, যেন ছাড়লেই পালিয়ে যাবে সে! হতভম্ব জালাল কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। পরম ভালবাসায় রহিমার মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে। সান্ত্বনার কোন বাণী রহিমাকে শোনানোর জন্য তার মনটা আকুলিবিকুলি করলেও মুখে কোন কথা জোগায় না তার! বহুক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুই নরনারী। তারপর একসময় ঝড় শান্ত হয়, কান্না থামিয়ে স্বাভাবিক হয় রহিমা।

জানা যায়, দুপুরে খাবার পর একটুখানি ভাতঘুম দিয়েছিল সে। তখন ভীষণ রকম বাজে একটা স্বপ্ন দেখে ও। স্বপ্নে ভয়ঙ্করদর্শন এক প্রাণীর সাথে তার আলাপ হয়। জানোয়ারটা রহিমাকে তার গর্ভের সন্তান সম্পর্কে সতর্ক করে। বলে যে, এ সন্তান জন্ম দেয়াটা কোনমতেই উচিত হবে না, একে গর্ভে থাকতে মেরে ফেলাটাই সমীচীন!

ঘুম ভেঙে রহিমা দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভয়ানক আতঙ্কিত হবার কারণে সে একধরনের ঘোরের মধ্যে চলে যায়। ঘুম ভাঙার পর থেকে জালাল বাড়ি ফেরা অবধি সময়টা সে বিছানার উপর ঠায় বসে থেকেই কাটায়। নেমে এসে আলো জ্বালবার সাহসটুকুও ছিল না তার। তার কাছে মনে হয়েছে, খাটের তলায় সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা ঘাপটি মেরে আছে। বিছানা থেকে নামলেই তার টুঁটি চেপে ধরবে! পুরো বৃত্তান্ত শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হয় জালাল, শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে! তার জানা আছে, গর্ভকালীন সময়ে মেয়েরা নানারকমের উদ্ভট স্বপ্ন দেখে। যার বেশিরভাগ জুড়েই থাকে তার অনাগত সন্তানের রকমারি বিপদ-আপদ। প্রথমবার মা হবার বেলায় এসব স্বপ্নের পরিমাণ বেড়ে যায় বহুগুণে। মাতৃত্ব নিয়ে উৎকণ্ঠা, সেই সাথে অনভিজ্ঞতাই এর কারণ। তাই এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

হেসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে সে রহিমাকে। রহিমাও পরম নির্ভরতায় বিশ্বাস করে জালালের প্রতিটি কথা। কারণ তার জানা আছে, পেশায় রিক্সাচালক হলেও তার স্বামী মোটেও গণ্ডমূর্খ নয়। এস.এস.সি পরীক্ষায় একবার অংশ নিয়েছিল জালাল, তবে পাশ করতে পারেনি। এক বিষয়ে ফেল করার পর, সেখানেই লেখাপড়ার যবনিকা ঘটেছিল তার।

ভালবাসার স্বামীর আশ্বাসে শঙ্কা অনেকখানি কেটে যায় রহিমার। জালালকে হাতমুখ ধুয়ে আসতে বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় সে। খাবার গরম করে দু'জনে একসাথে খাবে।

এরপর আর বেশ কিছুদিন অমন কোন উদ্ভট স্বপ্ন দেখেনি রহিমা। কিংবা হয়তো দেখেছে, জালালকে জানায়নি। বেচারা এমনিতেই সারাটাদিন খেটে মরে, কী দরকার আর তার পেরেশানি বাড়ানোর? এ ব্যাপারে জালালের অভিমত তো জানাই আছে রহিমার! একরাতে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে রহিমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়ায় জালাল। হাত গিয়ে ঠেকে শূন্য বিছানায়, নেই রহিমা! চমকে জেগে ওঠে জালাল। বেড সুইচ টিপে আলোটা জ্বালতেই দেখতে পায়, খাটের

কোনায় বসে আছে রহিমা! সেদিনের মতই আলুথালু উদ্‌ভ্রান্ত দশা। দু'চোখে কেমন ঘোর লাগা দৃষ্টি!

কাছে গিয়ে আলতো করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় জালাল। মৃদু গলায় জানতে চায়, আবারও ভয়ের কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না সে। ঝট করে তার দিকে ফিরে তাকায় রহিমা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে নিমিষেই গায়ের রোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় জালালের। তাকে পুরোপুরি হতবাক করে দিয়ে নিজের মনোবাসনা জানায় রহিমা। তার কণ্ঠস্বরে কোন জড়তা বা অনিশ্চয়তা নেই। যেন যা বলছে, সচেতনভাবেই বলছে সে।

রহিমা জানায়, তার গর্ভের সন্তান সে আর বহন করতে রাজি নয়! হাসপাতালে গিয়ে সবকিছু খালাস করে দিতে চায় সে। সে পুরোপুরি নিশ্চিত, তার গর্ভে অশুভ কিছু একটা বেড়ে উঠছে! কী লাভ একে জন্ম দিয়ে?

কথাগুলো জালালকে খানিকক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি করে দিলেও, অচিরেই বোধবুদ্ধি ফিরে পায় সে। সকালেই হাসপাতালে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে রাতের মত রহিমাকে ঘুম পাড়ায়। আপাতত পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হোক, পরেরটা পরে দেখা যাবে।

সত্যি-সত্যিই পরদিন সকালে রহিমাকে নিয়ে হাসপাতালে যায় সে। তবে অ্যাবরশনের জন্য নয়, ডাক্তার আপাকে দিয়ে রহিমাকে বোঝানোর জন্য। সে আগেই খেয়াল করেছে, ডাক্তার আপার প্রতি অগাধ ভক্তি রহিমার। তাঁর প্রতি ভক্তি অবশ্য জালালের নিজেরও কোন অংশে কম নেই। আশা করা যায়, তিনি বোঝালে অবশ্যই বুঝতে পারবে রহিমা।

জালালের পরিকল্পনা বৃথা যায়নি। সেদিনের পর থেকে একেবারে শান্ত হয়ে যায় রহিমা। তবে সে যে এখনও স্বপ্নটা প্রায়ই দেখে, সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। প্রায় রাতেই ঘুম ভেঙে জালাল দেখে, না ঘুমিয়ে ঠায় বসে আছে রহিমা। ফুলে ওঠা পেটের দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন ভেবে চলেছে। সে চোখের দৃষ্টিতে আর যা-ই হোক, অনাগত সন্তানের প্রতি ভালবাসা যে নেই, এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারে জালাল।

একরকম জোর করেই রহিমাকে শুতে বাধ্য করে সে। একেবারে না ঘুমালে মেয়েটা বাঁচবে কেমন করে? মাথার চুলে আলতো করে বিলি কেটে দেয়, কখনও-বা ছেলেভুলানো কোন হাস্যকর গল্প শোনায়। তারপর একসময় পরিশ্রান্ত জালাল নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার জানা হয় না, তখনও রক্তলাল দু'চোখ মেলে দিব্যি চেয়ে আছে রহিমা!

দেখতে-দেখতে রহিমার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য দিনটা ঘনিয়ে আসে। তার ফুলে ওঠা পেটের সাথে-সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে জালালের দুশ্চিন্তা! তার কেবলই মনে হয়, কখন আবার মেয়েটা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে গর্ভের সন্তানের কোন ক্ষতি করে বসে। তাই আজকাল বাইরে বলতে গেলে থাকেই না জালাল। দিনের খোরপোশের খরচটা কোনমতে তুলতে পারলেই, রিক্সা জমা দিয়ে ঘরে ফিরে আসে। রহিমাকে একা থাকতে দিতে বড্ড ভয় হয় তার।

রহিমার পেট গড়পড়তা অন্যান্য পোয়াতি মেয়েদের তুলনায় বড় হয়ে উঠেছে। ডাক্তার আপার ধারণা, যমজ বাচ্চার জন্ম দিতে চলেছে রহিমা। এ নিয়ে আশপাশের বাড়ির ভাবীরা অবশ্য জালালকে একা পেলে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না! দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'জালাল ভাই তো দেহি মরদের মতন মরদ! এত কাছে থাইকাও আমরা কুনুদিন টের পাইলাম না! কেমুন কইরা রহিমারে জোড়া পেট বাধাইয়া দিলেন!'

জালাল লজ্জা পায় ভীষণ। চট করে মাথা নিচু করে ফেলে, চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তার এমন সঙ্গিন অবস্থা দেখে ভাবীরা আরও মজা পায়, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। নিচু মাথা আরও নিচু হয়ে যায় জালালের।

এক ঝড়-বাদলের রাতে আচমকা প্রসব বেদনা ওঠে রহিমার। অথচ ডাক্তার আপার কথামত এখনও দিন পনেরো বাকি সম্ভাব্য তারিখ আসতে! সেই মতনই প্রস্তুতি নিচ্ছিল জালাল। তার ইচ্ছে ছিল, নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত সপ্তাহখানেক আগে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে রহিমাকে। ক'টা দিন রিক্সা চালানোয় ইস্তফা দিয়ে সারাক্ষণই পাশে থাকবে রহিমার। কিন্তু হঠাৎ এই মাঝরাতে তার প্রসব বেদনা ওঠায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় জালাল। কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এমনিতেই এতরাতে হাসপাতালে নেয়া কষ্টকর হত, আর আজ এই ঝড়-তুফানের মধ্যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। শেষমেশ বাধ্য হয়েই পাশের পাড়া থেকে ললিতা ধাইকে নিয়ে আসে জালাল। বাচ্চা প্রসবে বেশ অভিজ্ঞ সে, এই এলাকার প্রায় সব বাচ্চার জন্ম তার হাতেই হয়েছে। নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো এখনও সন্তান জন্মদানের মত গোপন ব্যাপারে একজন ডাক্তারের চেয়ে একজন ধাইয়ের উপরই নির্ভর করে বেশি।

ললিতা ধাই এসেই নানা ফুট-ফরমায়েশ দিতে শুরু করল জালালকে। জালালও ছুটোছুটি করে তার চাহিদামত সব জিনিসপত্র জোগাড় করে দিল। তারপর ঘরের বাইরে এসে বৃষ্টির মধ্যেই অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগল।

সে অবশ্য এ সময়টায় রহিমার পাশে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু ললিতা ধাই তাতে রাজি হয়নি। মেয়েছেলের একান্ত ব্যাপারে একজন পুরুষ মানুষ উপস্থিত থাকবে, এটা আবার কেমন কথা? সে যতই মেয়েটার স্বামী হোক না কেন, পুরুষ তো!

হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চলে গেল। সাথে-সাথেই ভিতর থেকে ডাক পড়ল জালালের। দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ঘরের দুটো লণ্ঠন জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা করল সে। তারপর আবারও বাইরে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। থেকে-থেকেই শরীরটা কেঁপে উঠছে তার। শীতে নাকি ভয়ে, কে জানে!

ভিতরবাড়িতে লণ্ঠনের আলোয় নিবিষ্টমনে কাজ করে চলেছে ললিতা ধাই। একনাগাড়ে রহিমার চাপা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জালাল ঝড়-তুফানের মধ্যেও। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে তার। আহারে, না জানি বউটার কত কষ্ট হচ্ছে। আচমকা থেমে গেল রহিমার গোঙানি, পরক্ষণেই শোনা গেল ললিতা ধাইয়ের রক্ত হিম করা চিৎকার! পিলে চমকে উঠল বাইরে দাঁড়ানো জালাল মিয়ার! কী হয়েছে? রহিমার কিছু? নাকি বাচ্চার? ওরা বেঁচে আছে তো?

এক দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল জালাল। ঢুকেই চোখে পড়ল বিছানায় অচেতনভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা অর্ধনগ্ন রহিমার দিকে। তার বুকের ওঠানামা দেখে নিজের বুকের উপর থেকে একখানা দশমণ ওজনের পাথর সরে গেল জালালের। শ্বাস চলছে রহিমার, বেঁচে আছে সে।

পরক্ষণেই তার চোখ পড়ল বিছানার পাশে মেঝেতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা ললিতা ধাইয়ের উপর। হায়, খোদা! ললিতা ধাইয়ের পাশে কী ওটা?

ঠিক তখনই মুখ তুলে কুতকুতে চোখে জালালের দিকে চাইল ওটা। ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল জালালের। বুঝে গেছে কী ওটা এবং কোত্থেকে এসেছে!

এ ভয়ঙ্করদর্শন জানোয়ারটা তাদেরই ঔরসজাত সন্তান!

কোন মানবশিশুর জন্ম দেয়নি রহিমা, জন্ম দিয়েছে এক দানবের। যার অবয়ব বর্ণনা করার মত শব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই! আচমকা ললিতা ধাইকে খেতে শুরু করল ওটা, শুরু করেছে বুক থেকে! নরম মাংসে কচকচ করে বসে যাচ্ছে ধারাল দাঁতগুলো! মন্ত্রমুগ্ধের মত বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে রইল জালাল। হাড় ভাঙার মুড়মুড় শব্দ কানে যেতেই সংজ্ঞা হারাল সে! তার জানা নেই, শুধু ললিতা ধাইকে দিয়ে পেটের ভয়ঙ্কর খিদে মিটবার নয় তার সন্তানের!

নিশিযাত্রা

চিঠিটা আজ বিকেলেই মাত্র হাতে পেয়েছেন আলম সাহেব। অথচ এসেছে কি না আরও এক সপ্তাহ আগে! ঘরসুদ্ধ লোকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে নাকি? এরা বুঝবে না কোন্টা জরুরি আর কোন্টা জরুরি না? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সিল-ছাপ্পড় মারা একটা সরকারি চিঠি। জিজ্ঞেস করতে গিয়ে উল্টো বউয়ের কাছে ঝাড়ি খেতে হলো! মুখ ঝামটা মেরে বলে দিল, 'তোমার টেবিলের উপরই তো ছিল, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?'

আশ্চর্য ব্যাপার! অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে একজন মানুষ খুঁজবে নাকি যে ঘরের কোথায় কী পড়ে আছে? অবশ্য এ নিয়ে আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি তিনি। এ যুগে হোম মিনিস্টারের সাথে ঝামেলা শুধু বলদেরাই করে! এতটা বলদ তিনি এখনও হননি!

চিঠির বিষয়বস্তু হলো, তাঁকে একটা স্কুল পরিদর্শনে যেতে হবে। যাকে বলে সারপ্রাইজ ভিজিট, অর্থাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে যাওয়া যাবে না! আজকালকার মাস্টাররা পরিদর্শকদের নানাভাবে তোয়াজ করতে শিখে গেছে। আগে জানিয়ে গেলে স্কুলের মূল রূপটি ধরা পড়বে না কিছুতেই।

আলম সাহেব চিঠিটা হাতে নিয়ে হিসেব করে দেখলেন, সময় বাকি আছে মোটে দুই দিন। অর্থাৎ যেতে হলে কালই রওনা করতে হবে। তাই রাতের মধ্যেই গোছগাছ করে নিলেন সবকিছু। মিলুর জামাইয়ের দেশের বাড়ি ওই এলাকায়। মিলুটাও নাকি এখন ওখানে বেড়াতে গেছে। তাই ঠিক হলো, মিলুদের ওখানেই থাকবেন। মোটে তো একটা রাতের ব্যাপার, কোন অসুবিধা হবার কথা না!

পরদিন সকালে যথাসময়ে রেল স্টেশনে গেলেন আলম সাহেব। বহুদিন হয় রেলে চড়া হয় না, তাই জানতেন না টিকেটে উল্লিখিত সময় আর বাস্তবে যাত্রার সময়ের ফারাকটুকু! হতভম্ব হয়ে গেলেন একের পর এক ট্রেনের দেরি দেখে। দেশটা চলছে কয় চাকার উপর? যোগাযোগ মন্ত্রী কি বেঁচে আছেন? অবশেষে হালকা মাথাব্যথা নিয়ে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত ট্রেনে উঠতে পারলেন। তাঁর ট্রেন অবশ্য খুব একটা দেরি করেনি, মোটে চার ঘণ্টা!

জানালার পাশেই সিট পেয়েছেন আলম সাহেব। ভাবলেন একটু ঘুমিয়ে না হয় পুষিয়ে নেবেন চার ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ধকলটুকু। ঘুমালে হয়তো মাথাব্যথাটাও ছেড়ে দেবে।

কিন্তু বিধি বাম! ঘুমানো আর হলো না তাঁর কিছুতেই! কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর পাশের সিটের সহযাত্রী মহোদয়! ভদ্রলোক এতটা বকতে পারেন, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারোরই! শ্বাস ফেলার মতই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন তিনি! শুধু যে নিজে বলছেন ব্যাপারটা এমন না! অন্যদেরও জোর করে বলাচ্ছেন! একটু পর-পরই আলম সাহেবকে বলছেন, 'এই যে, ভাই, কী, ঠিক বললাম না?'

অমনোযোগী আলম সাহেব জানেনও না, কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তারপরও হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়েন। মুখে ফুটিয়ে তোলেন সমঝদারের ভঙ্গি। তা-ও ক্ষণিকের জন্য, তারপর আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান। মাথার ব্যথাটাও ধীরে-ধীরে বেড়ে চলেছে। কানের কাছে একনাগাড়ে একটা খই ফোটানোর মেশিন চলতে থাকলে, কমার কি আর উপায় আছে নাকি?

শ্রোতারা শুনতে-শুনতে ক্লান্ত হয়ে যান, কিন্তু বক্তা বকে ক্লান্ত হন না! কথার তুবড়ি ছোটান পূর্ণ গতিতে, যেন বহুকাল হয় কথা বলতে পারেননি তিনি! তাই আজ সুযোগ পেয়ে চুকিয়ে দিচ্ছেন সব দেনা! আলম সাহেব আর সহ্য করতে না পেরে একবার সবিনয়ে বলেন, 'বড্ড মাথা ধরেছে, ভাই। একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

সাথে-সাথে সহযাত্রীটি দ্বিগুণ উৎসাহে বলেন, 'মাথাব্যথা কেন করবে না বলুন? মাথারই বা দোষ কী শুনি? যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, তা কি আর বিশুদ্ধ আছে? যা খাচ্ছেন, যা পান করছেন, কোন্‌টাতে ভেজাল নেই বলুন দেখি? আমরা ভুলে থাকতে চাইলেও মাথা কি আর আমাদের ভুলে থাকতে দিতে পারে? তাই তো বার-বার মনে করিয়ে দেয়।'

কোনমতেই আর সইতে পারলেন না আলম সাহেব। টয়লেটে যাবার নাম করে উঠে পড়লেন সিট ছেড়ে। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করবেন, ঘুমের চিন্তা আপাতত বাদ। এখানে থাকলে কখন যে দুম করে ব্যাটাকে মেরে বসবেন তার ঠিক নেই!

একটু পরই ট্রেনটা একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জানা গেল সামনে রাস্তার উপর একটা মালগাড়ির বগিগুলো খুলে গেছে, ওটা না সরানো পর্যন্ত এই লাইনে আর ট্রেন চলাচল সম্ভব নয়। স্টেশনের লোকেরা জানাল, খুব একটা সময় লাগবে না কাজটা করতে। তবে সেই অল্প সময়টা যে মাত্র তিন ঘণ্টা, সেটা বুঝতে পারেননি আলম সাহেব!

এই তিন ঘণ্টায় তাঁর জীবনে রীতিমত নরক নেমে এল! কিছুতেই সেই বাচাল সহযাত্রীটির হাত থেকে মুক্তি পেলেন না তিনি! প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়েও মুখ বুজে চুপচাপ সহ্য করে গেলেন সে নরক যন্ত্রণা। ইতোমধ্যেই স্টেশনের কেরোসিনের গন্ধযুক্ত চা অন্তত সাত কাপ খেয়েছেন তিনি, তবুও ব্যথাটা ছাড়ল না কেন, কে জানে!

অবশেষে ট্রেন ছাড়ল। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তাঁর মুখর সহযাত্রীটি পাশের সিটে নেই! কামরার কোনার দিকের দুটো মুখোমুখি সিটে বসে গুণ্ডা চেহারার চারজন লোক তাসের আসর বসিয়েছে। আপাতত তিনি সেখানেই আজাব হিসেবে নাযিল হয়েছেন। তাঁর সঙ্গ যে খেলোয়াড়রা খুব একটা উপভোগ

করছেন না, তা তাদের বিকৃত মুখ দেখেই বলে দেয়া যায়। কখন যে চারজন মিলে ধোলাই দিয়ে বসে, কে জানে!

আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে-করতে সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুদলেন আলম সাহেব। সেই ঘুম ভাঙল তাঁর রাত ১২টায় ট্রেনের গার্ডের মৃদু ধাক্কায়। ট্রেন ততক্ষণে চলে এসেছে শেষ স্টেশনে! সেটা অবশ্য কোন ব্যাপার না, কারণ এখানেই নামার কথা আলম সাহেবের।

প্ল্যাটফর্মে নেমে রীতিমত ভিরমি খাবার দশা হলো তাঁর! শুধুমাত্র স্টেশন মাস্টারের কামরায় একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে, তা না হলে পুরো স্টেশনেই ঘুটঘুটে অন্ধকার! অল্প ক'জন যাত্রী তাঁর সাথে ট্রেন থেকে নামল, বেশিরভাগই নেমে গেছে আগের স্টেশনগুলোতে। যারা এখানে নেমেছে, তারাও শ্রমিক শ্রেণীর লোক। ট্রেন থেকে নেমেই যে যার মত অন্ধকারে বাড়ির পথ ধরেছে। কাউকে জিজ্ঞেস করারও ফুরসত পাননি, স্টেশন থেকে কীভাবে তিনি তাঁর গন্তব্যে যাবেন!

অগত্যা স্টেশন মাস্টারের রুমেই গেলেন আলম সাহেব। বহু কষ্টে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে জানা গেল, এত রাতে কোন বাহনই পাওয়া যাবে না। রাতটা ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন ওয়েটিং রুমের ভেজা বেঞ্চে কাটিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে তিনি মনে করেন! এটুকু জানিয়েই আবার ঘুমিয়ে গেলেন স্টেশন মাস্টার।

চরম হতাশ হয়েই স্টেশনের প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন আলম সাহেব। স্যাঁতস্যাঁতে ওই অন্ধকার রুমে কিছুতেই তাঁর পক্ষে রাত কাটানো সম্ভব নয়! ঢুকলেই উৎকট দুর্গন্ধে বমি চলে আসে, বসে থাকা তো আরও পরের কথা! যা হোক, একটা না একটা ব্যবস্থা করতেই হবে যাবার। দরকার হলে হেঁটেই রওনা হবেন, তা-ও ওই রুমে থাকবেন না কিছুতেই!

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তাঁর হতাশা আরও খানিকটা বাড়ল বৈ কমল না! রিক্সা-ভ্যান দূরে থাক, একটা ঠেলাগাড়িও নেই কোথাও! শুধু দুটো নেড়ি কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে মাঝ রাস্তায়।

'বাবু, কোথাও যাবেন?'

ভীষণ চমকে উঠলেন আলম সাহেব। তাঁর ঠিক পিছন থেকে ভেসে এসেছে কথাগুলো। ফিরে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেলেন। পরনে সাদা একখানা লুঙ্গি, গায়ে চাদর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য চাদরটা দিয়ে কান-মাথা ভাল করে ঢাকা। অন্ধকারে চেহারাও দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। তবে দাঁড়ানোর সহজাত ভঙ্গিই বলে দেয়, এলাকাটা অতি পরিচিত তার, এখানকার স্থানীয় লোক সে।

'হ্যাঁ। যেতে তো হবে। কিন্তু কিছুই তো পাচ্ছি না যাবার মত। কী করে যাই বলো তো?'

'কোন চিন্তা নেই, বাবু। যেখানে যেতে চান, আমার পঙ্ক্ষীরাজ আপনাকে নিয়ে যাবে।' পিছনের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল লোকটা।

অন্ধকারে চোখ পিটপিট করে ভাল করে তাকালেন আলম সাহেব। একটু

দূরে বড় একটা গাছের নীচে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও-কোথাও এটি টমটম হিসেবেও পরিচিত। এত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে যে, ভাল করে না তাকালে কিছুতেই এই কালিগোলা অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

এখানে এখনও তা হলে টমটমের প্রচলন আছে! তা বেশ। পায়ে হেঁটে যাবার চেয়ে ঘোড়ার গাড়িতে যাবেন, মন্দ কী? সময় হয়তো আধুনিক গাড়ির চেয়ে অনেক বেশি লাগবে। লাগুক না হয় একটু বেশি সময়, তাঁর অত তাড়াও তো নেই। সকালের আগে-আগে গিয়ে মিলুদের বাড়ি পৌঁছতে পারলেই হলো।

'রসুলপুরের সালাম উকিলের বাড়ি চেনো?'

'আজ্ঞে চিনি। ওখানেই তো আমার নিবাস! তার দু'বাড়ি পরই আমার বাড়ি কি না...'

'কতদূর এখান থেকে?'

'তা, বাবু, মাইল দশেক তো হবেই।'

'ওরে, বাবা! বেশ দূর দেখছি। কতক্ষণ লাগবে যেতে?'

'তা জানি না, বাবু। সবই ঘোড়ার মর্জি।'

আর কথা বাড়ালেন না আলম সাহেব। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কোচোয়ান লোকটা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই অবাক হতে হলো আলম সাহেবকে। এত নরম তুলতুলে বসবার সিটটা, যেন কোন দামি মোটর গাড়িতে বসেছেন! আর বাইরের কনকনে ঠাণ্ডার ছিটেফোঁটাও নেই ভিতরে, কেমন যেন একটা নাতিশীতোষ্ণ আরামদায়ক অনুভূতি! বাহ!

চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনে বুঝলেন, চলতে শুরু করেছে টমটম। নরম গদিতে গা এলিয়ে দিলেন আলম সাহেব। খুব ভাল লাগছে তাঁর। সামনের দিকের চালকের আসনে বসে ঘোড়ার রশিগুলো ধরে রেখেছে কোচোয়ান। পিছন থেকে তার মাথার সামান্য একটু অংশ দেখা যাচ্ছে।

'তোমার নাম কী, কোচোয়ান?'

'আজ্ঞে, হরিনাথ।'

'তোমার গাড়ির ভিতরটা তো বেশ আরামদায়ক। সিটগুলো এত নরম কেন? শিমুল তুলার নাকি?'

এ কথার কোন জবাব দিল না হরিনাথ। নীরবে সামনে তাকিয়ে ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত রইল।

তাই আলম সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এদিকে কি বেশ টমটম চলে নাকি, হরিনাথ?'

'আজ্ঞে না। আর একটাই মাত্র চলত।'

'চলত বললে যে? এখন আর চলে না?'

'গত পরশু রাতে একটা দুর্ঘটনায় চালকসুদ্ধ টমটমটা পাহাড় থেকে পড়ে গেছে। এখন টমটম বলতে এ এলাকায় শুধু আমারটাই আছে, বাবু।'

'হায়, আল্লাহ্! কীভাবে হলো অমন একটা অ্যাকসিডেন্ট?'

'হঠাৎ করে পথের উপর একটা জংলী অজগর চলে এসেছিল, বাবু। চলার

পথে একেবারে ঘোড়াটার সামনেই পড়েছিল কি না...ঘোড়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে একদম লাফিয়ে উঠেছিল। কোচোয়ান কিছুতেই আর সামলাতে পারেনি। রাস্তার পাশের ঢাল ভেঙে পাহাড় থেকে খাদে পড়ে যায় গাড়িসুদ্ধ!'

'আহারে, বেচারা! লোকটার নাম কী ছিল, হরিনাথ?'

এ কথারও কোন জবাব দিল না হরিনাথ। দু'জনেই যেহেতু টমটম চালাত, হয়তো হরিনাথের বন্ধুই ছিল বেচারা। বন্ধুর কথা মনে পড়ায় এখন হয়তো মনে-মনে কষ্ট পাচ্ছে সে। আবার পেশার প্রতিযোগিতার কারণে শত্রু হওয়াটাও বিচিত্র নয়! তাই আর কথা বাড়ালেন না আলম সাহেব। একেবারে চুপ মেরে গেলেন।

হঠাৎ খেয়াল করলেন, কী ব্যাপার? গাড়ির ভিতর তো কোন ধরনের ঝাঁকুনি অনুভব করছেন না! শুধু ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দই নিশ্চিত করে যে, গাড়িটা চলছে। তার মানে গাড়ির স্প্রিংগুলোও নিশ্চয়ই কোন কারিগরি ফলিয়েছে হরিনাথ! না হয় রাস্তার যে অবস্থা দেখেছিলেন, এতক্ষণে ঝাঁকুনির চোটে দুয়েকটা হাড় নিশ্চিত ভাঙত!

একবার ভাবলেন হরিনাথকে জিজ্ঞেস করবেন কি না, কিন্তু কী ভেবে আর করলেন না। কী লাভ? হরিনাথ হয়তো জবাবই দেবে না। জগতে কত বিচিত্র প্রজাতির মানুষ যে বানিয়ে রেখেছেন আল্লাহ্ তায়ালা, তার কোন ইয়ত্তা তো নেই। মনে পড়ল ট্রেনে তাঁর সহযাত্রীটির কথা, লোকটাকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। আর এই আরেক হরিনাথ, যে কি না পারতপক্ষে কথাই বলতে চায় না! দশটা জিজ্ঞেস করলে একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়। এসব ভাবতে-ভাবতেই নরম গদিতে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন আলম সাহেব।

ঘুম ভাঙল হরিনাথের ডাকে, 'এসে গেছি, বাবু।'

আলম সাহেব দেখলেন একটা বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টমটম। তিনি নামার পর হরিনাথ তাঁর মালামাল বাড়ির বারান্দায় পৌঁছে দিল। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই, লম্বা এক সালাম ঠুকে চলে গেল হরিনাথ।

ও চলে যেতেই আলম সাহেবের মনে হলো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। একবারও ভাল করে হরিনাথের চেহারা দেখা হয়নি। কাল দিনের বেলা লোকটার সাথে দেখা হলে তিনি চিনতে পারবেন তো তাকে? যদি না চিনতে পারেন, তা হলে মনে-মনে কষ্ট পাবে না বেচারা? শত হলেও এই মাঝরাতে তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে অনেক বড় একটা উপকারই করেছে সে। না হয় কখন বাড়ি পৌঁছতেন, আদৌ পৌঁছতে পারতেন কি না, কে জানে। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর মিলুদের বাড়ির দারোয়ানকে ঘুম থেকে ওঠানো গেল। কাঁচা ঘুম ভাঙাতে বড্ড বিরক্ত হয়েছে বেচারা। চোখে-মুখে অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে আলম সাহেবের আপাদমস্তক অনেকক্ষণ ধরে জরিপ করল লোকটা। তারপর ভিতরে গেল বাড়ির লোকজনকে ডাকতে। তাদের ঘুমও সহজে ভাঙানো গেল না। এই শীতের মধ্যে মাঝরাতে গরম কম্বল ছেড়ে উঠতে কারই বা ভাল লাগে? আলম সাহেবের অপেক্ষায় থাকতে-থাকতে কিছুক্ষণ আগে মাত্র তারা বিছানায় গিয়েছে।

যতক্ষণ ওরা কেউ বাইরে বেরিয়ে না এল, ততক্ষণ আলম সাহেবকে বাইরেই

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হলো। দারোয়ান ব্যাটা ঢুকতে দেয়নি তাঁকে, মাঝরাতে তার আরামের ঘুম হারাম করার শাস্তি!

বহুদিন পর আলম সাহেবকে পেয়ে আদর-যত্নের বাড়াবাড়ি করে ফেলল মিলু আর মিলুর জামাই। রীতিমত জোর করেই একের পর এক রেসিপি তুলে দিতে লাগল আলম সাহেবের প্লেটে। বার-বার মানা করেও কোনভাবেই নিস্তার পেলেন না তিনি। যেটাই মানা করেন, মিলু মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'আমি বুঝি কষ্ট করে সব রান্না করিনি?' এরপর কি আর কোন কথা বলার উপায় থাকে? তাই ভীষণ কষ্টে আলম সাহেবকে এই ভালবাসার অত্যাচারটুকু সহ্য করতে হলো। খেতে-খেতে এমন অবস্থা হলো তাঁর, পানি খাবার জায়গাটুকুও রইল না আর পেটে! এতেও যেন মিলুর শান্তি হয়নি! বার-বার বলতে লাগল, কিছুই নাকি খাননি আলম সাহেব!

খাবার টেবিল থেকে উঠতে-উঠতেই ফজরের আজান দিয়ে দিল। তখন আর বিছানায় যাবার কোন মানে হয় না। তাই সবাই মিলে বৈঠকখানায় বসল আড্ডা মারতে। কথায়-কথায় মিলু জিজ্ঞেস করল, 'তা তুমি এত রাতে স্টেশন থেকে এলে কীভাবে, ভাইয়া?'

'আর বলিস না। একটা কিচ্ছু ছিল না স্টেশনে। শেষমেশ একটা টমটম পেলাম বলে রক্ষে।'

'টমটম! কার টমটম?'

'তোদের এই বাড়ির কাছেই নাকি থাকে লোকটা। নাম বলল হরিনাথ। সে-ই তো পৌঁছে দিল আমায়। বড় ভাল লোক। শুধু কথা একটু কম বলে। এত রাতে আনল আমাকে, অথচ একটুও অন্যায্য ভাড়া চাইল না! যা দিলাম, তাতেই খুশি হয়ে সালাম ঠুকে চলে গেল!'

একরাশ বিস্ময় নিয়ে, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল মিলু আর মিলুর জামাই। বিষয়টা চোখ এড়াল না আলম সাহেবের। অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে, মিলু?'

'ইয়ে...মানে...ভাইয়া...হরিনাথ দু'রাত আগে তার টমটমসুদ্ধ পাহাড় থেকে খাদে পড়ে মারা গেছে।'

বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন আলম সাহেব। তাঁর কাছে সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে!

হণ্টেড

নতুন এ বাসাটায় এসে বেশ ভাল সময় কাটছে মিলির। কলেজ থেকে ফিরেই টিভির সামনে বসে যায় সে। একে-একে দেখতে থাকে পছন্দের সবক'টা সিরিয়াল। মা-বাবা কাছে নেই, তাই খবরদারী করারও কেউ নেই। ভাইয়া-ভাবী দু'জনেই চাকরি করেন, তাঁদের ফিরতে-ফিরতে সেই সন্ধ্যা। তাই দিনের পুরোটা সময় একচ্ছত্র স্বাধীনতা ভোগ করে মিলি।

ছেলেবেলা থেকেই এমন একটা স্বাধীন জীবনের প্রতীক্ষায় ছিল ও, অবশেষে এস.এস.সি পাস করার পর সে সুযোগ মিলেছে। গ্রামে ভাল কলেজ নেই, তাই বাধ্য হয়েই তাকে শহুরে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন বাবা। মিলির ভাইয়া-ভাবীর একই শহরে চাকরির সুবাদে, আবাসনের সমস্যাটুকুও যখন আর রইল না, তখন আর আদরের মেয়েকে আগলে রাখার কোন কারণ খুঁজে পাননি বাবা। মেয়ে বলে তো আর তাকে অর্ধ-শিক্ষিত করে ঘরে বসিয়ে রাখতে পারেন না, তাই খুশি মনেই সম্মতি দিয়েছেন তিনি।

মিলির ভাইয়া-ভাবী আগে একটা ছোট বাসায় থাকলেও, মিলি আসার পর এই নতুন বাসাটায় এসে উঠেছেন। বাসাটা এককথায় চমৎকার। ড্রয়িং-ডাইনিং ছাড়াও আলাদা দুটো বেডরুম। দুটোর সাথেই লাগোয়া বারান্দা আর বাথরুম রয়েছে। দেয়ালগুলোয় নতুন চুনকাম করা হয়েছে বেশিদিন হয়নি, এখনও রীতিমত চকচক করছে। তবুও কেন যেন বাসাটা ভাড়া হচ্ছিল না!

একজন ভাড়াটে যা-ও বা এসেছিল, তিনদিনের মাথায়ই নাকি গাঁটরি-বোঁচকা গুছিয়ে বিদায় নিয়েছে! তাই নিতান্ত অল্প ভাড়াতেই বাসাটা পেয়ে গিয়েছিলেন মিলির ভাইয়া। পরের সপ্তাহেই সপরিবারে উঠে এসেছেন এখানে। ইতোমধ্যেই পার করেছেন গোটা দশেক দিন, কোনরকম সমস্যায় পড়তে হয়নি তাঁদেরকে!

দুপুরে খাবার পর কোন একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ে মিলি। আর অপেক্ষায় থাকে বিকেলের। কারণ বিকেলেই পাশের বাসার সুলতানা ভাবী আসে। দু'জনাতে আড্ডা দেয় সেই সন্ধ্যা অবধি।

সুলতানা বয়সে মিলির চেয়ে বছর তিনেকের বড়ই হবে। বিয়ে হয়েছে মাস ছয়েক আগে। একান্নবর্তী পরিবারে বেশ সুখেই ঘরকন্না করছে সে এখন। তার সুবিশাল পরিবারের হরেক সদস্যের নানারকম মুখরোচক কাহিনিই সে প্রতিদিন শোনায় মিলিকে।

মিলিও বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে সেসব। আর আপনমনে ভাবে, কবে তারও

এমন একখানা আলাদা সংসার হবে!

সুলতানার বেশিরভাগ গল্পই অশ্লীল প্রকৃতির। নোংরা কথা বলে বেশ তৃপ্তি পায় সে। তার ধুমসি ননদটা ওড়না গলায় জড়িয়ে কেমন করে ছেলেদের মাথা খারাপ করে, তার উঠতি বয়সের দেবরটা কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তার ভাবীর শরীরের খাঁজ-ভাঁজগুলো জরিপ করে, ভাশুরটা কাজের বুয়ার দেহের প্রতি কেমন পাগলপারা, এসব নিয়েই নিত্য আবর্তিত হয় সুলতানার কথামালা!

তবে সুলতানার গল্পের প্রিয় বিষয় হলো, স্বামীর সাথে তার রাতের আদর-সোহাগের স্মৃতি রোমন্থন! অবলীলায় নির্লজ্জের মত ধারাবিবরণী দিতে থাকে সুলতানা! আর সেগুলো শুনতে-শুনতে কান গরম হয়ে যায় মিলির, কেমন অস্থির-অস্থির লাগে!

সুলতানা অবশ্য মিলির এই উত্তেজনাটা বেশ বুঝতে পারে। তাই আরও রসিয়ে-রসিয়ে বয়ান করে সে সমস্ত উপাখ্যান, আর তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করে মিলির হাঁসফাঁস অবস্থা!

মাঝে-মাঝে কথাচ্ছলে মিলির শরীরের এখানে-ওখানে হাত দেয় সে। মুখে কপট রাগ দেখালেও ব্যাপারটা বড্ড ভাল লাগে মিলির। এমনি এক বিকেলের আড্ডায় মিলি জানতে পারল, কেন তাদের এ বাসাটায় ভাড়াটে পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন ধরে। চোখ বড়-বড় করে সুলতানা বয়ান করল এক গা শিউরে ওঠা কাহিনি। জানা গেল, বহুকাল ধরে কোন এক অশরীরীর বাস এখানে!

অনেকদিন ধরে খালি পড়ে থাকার পর মাস কয়েক আগেই বাসাটার সংস্কার শুরু করেন মালিক ভদ্রলোক। তিনি প্রবাসে থাকায়, এতকাল বাড়িটার কোন যত্নআত্তি নেয়া সম্ভব হয়নি, একরকম খালিই পড়ে ছিল এটা। সংস্কার করার সময় নানা রকম দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় বেশ ক'জন শ্রমিক। তাকে স্বপ্নে বেশ কয়েকবার সতর্কও করা হয় এ বাড়িতে আর না আসার জন্য! লোকে বলতে শুরু করে, দুষ্ট আত্মাদের বসবাস এখানে!

হুজুর, কবিরাজ ডেকেও নাকি এখান থেকে অপ্রাকৃত শক্তিটিকে তাড়ানো সম্ভব হয়নি! তাই মালিক ভদ্রলোক নিজে আর এ বাসায় বসবাস না করে, বাসাটা স্বল্পমূল্যে ভাড়া দিতে চান। কিন্তু এহেন কাহিনি শোনার পর আর কারই বা এমন হানাবাড়িতে ওঠার সাহস থাকে? কম ভাড়ায় পেয়ে যে একজন সাহসী ভাড়াটে এসে উঠেছিল বাড়িটায়, সে-ও তিনদিনের মাথায়ই বিদায় নিয়েছে! যাওয়ার কারণ সে অবশ্য কাউকে বলে যায়নি, শুধু বলেছে এখানে বসবাস করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! এসব শুনে মনের গভীরে একটা ভয় ঢুকে যায় মিলির। তবে কি ওরা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে এসে উঠেছে? সত্যিই কি অতিপ্রাকৃত কোন কিছুর বসবাস আছে এখানে?

সে রাতেই ভাইয়া-ভাবীকে ব্যাপারটা জানাল মিলি। শুনে তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি কখনও কিছু দেখেছ নিজের চোখে? আমরা কেউ তো কিছু দেখিনি! শিক্ষিত মেয়ে এসব গালগপ্পো বিশ্বাস করলে কেমন করে?' চট করে কোন উত্তর দিতে পারে না মিলি, চুপ করে থাকে।

সত্যিই তো, তার নিজের চোখে তো কোনদিন অস্বাভাবিক কিছু পড়েনি! তা হলে?

নিশ্চয়ই সুলতানা ভাবী তাকে ভয় দেখানোর জন্যই এসমস্ত কথা বলেছে। এমনিতেই যে-কোন বিষয় রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করতে তার জুড়ি মেলা ভার। নাহ, এই মহিলাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আপনমনে বকবক করে সুলতানার উপর রাগ ঝাড়তে-ঝাড়তেই সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ল মিলি।

উপদ্রবটা শুরু হলো পরদিন দুপুর থেকে!

কলেজ থেকে ফিরে কিছুতেই আর দরজা খুলতে পারছিল না মিলি! চাবি ঘুরিয়ে দরজা খোলার পরও দরজাটা কেমন গ্যাঁট হয়ে এঁটে রইল! অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও দরজাটা একচুল নড়াতে পারল না ও! যেন ভিতর থেকে কেউ একজন সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরে আছে। কী করবে, কিছুই বুঝতে না পেরে ভাইয়াকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিল মিলি। মোবাইল ফোনটা বের করে যেই না ভাইয়ার মোবাইলে কল দিতে যাবে, অমনি তার চোখের সামনে আলতো করে খুলে গেল দরজাটা! কীভাবে খুলল ওটা? অথচ এতক্ষণ বলপ্রয়োগ করেও ওটাকে খুলতে পারেনি মিলি!

ভয়ে-ভয়ে ঘরের ভিতরে পা রাখল ও। ভীত চাহনিতে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখল। যদিও ঠিক কী খুঁজছে, সেটা তার নিজেরও জানা নেই! অবশ্য অস্বাভাবিক কোনকিছুই তখন চোখে পড়ল না তার।

শেষপর্যন্ত নিজে-নিজেই একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করাল মিলি। হয়তো তালাটা ঠিকমত না খুলেই দরজায় ধাক্কা দেয়া শুরু করেছিল ও। পরে কোনভাবে হয়তো তালাটা খুলে যায়, আর দরজাটাও সহজেই উন্মুক্ত হয়! যদিও ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত হলো না, তবুও মনে বেশ খানিকটা বল ফিরে পেল ও। ভূত-প্রেতে তার মোটেও বিশ্বাস নেই, কেবল কল্পনার জগতেই তাদের অস্তিত্ব আছে! রগরগে হরর কাহিনি পড়েও সে কদাচিৎই ভয় পায়!

হালকা নাস্তা করে টিভি দেখতে বসে যায় মিলি। মায়ের বানিয়ে দেয়া তেঁতুলের আচার সাবাড় করতে-করতে রিমোটের বাটন টিপতে থাকে। দিনটা রবিবার হওয়ায়, তার পছন্দের সিরিয়ালগুলোর বেশিরভাগেরই আজ অফ-ডে। সপ্তাহের ছয়টা দিন টানা সম্প্রচার করে এই একটা দিন বিশ্রাম নেয় সিরিয়ালওয়ালারা। অবশ্য এই ক্ষতিটা তারা পুষিয়ে দেয় ভাল-ভাল সিনেমা প্রচার করে।

চ্যানেল ঘোরাতে-ঘোরাতে হঠাৎ একটা হরর মুভি পেয়ে গেল মিলি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে থাকে ও, যদিও আজকালকার হরর মুভিগুলো দেখলে তার ভয়ের চেয়ে হাসিই বেশি পায়!

হঠাৎ তাকে অবাক করে দিয়ে পর্দার ছবিটা একটা জায়গায় এসে পুরোপুরি স্থির হয়ে রইল! পর্দায় ভেসে উঠেছে কুৎসিত কদাকার এক পিশাচের মুখ। স্থির দৃষ্টিতে ওটা তাকিয়ে আছে মিলির চোখের দিকে। নিষ্প্রাণ চোখগুলোয় কেমন

এক অশুভ ছায়া!

অকারণেই বুকটা কেঁপে উঠল মিলির। চটজলদি রিমোট টিপে চ্যানেলটা পরিবর্তন করতে চাইল। কিন্তু যতই বোতাম চাপা হোক না কেন, রিমোটটা কিছুতেই আর কাজ করে না! টিভি স্ক্রিন থেকে কিছুতেই অদৃশ্য করা গেল না সেই ভয়ঙ্কর মুখটাকে। কী হলো রিমোটটার? ব্যাটারি শেষ হবার আর সময় পেল না বুঝি? রাগের চোটে রিমোটটাকে প্রচণ্ড জোরে মাটিতে আছড়ে ফেলল মিলি। তারপর ছুটে গেল টিভির সামনে, সরাসরি সুইচ টিপেই চ্যানেল চেঞ্জ করবে বলে।

ভীষণ রকম অবাক হলো মিলি, টিভির সুইচগুলোও কাজ করছে না! এমনকী টিভি অফ করার সুইচটা টেপার পরও দিব্যি স্ক্রিনে ভেসে রয়েছে সেই ভয়ানক পিশাচের চেহারা!

আর কোন উপায় না পেয়ে মিলি ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলল টিভিটার বিদ্যুতের তার। যাক, এবার নিশ্চয়ই মুক্তি মিলবে। কিন্তু মিলির বিস্ময়ের বুঝি তখনও কিছুটা বাকি ছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই চলছে টিভিটা এখন! পর্দায় এখনও ভাসছে সে ভয়াল পিশাচের মুখটা! আরও বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে এখন ওটাকে, যেন এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে পর্দা ভেদ করে!

আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল মিলি। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে যে-কোন সময়।

ঠিক তখনই আচমকা টিভিটা বন্ধ হয়ে গেল! অদৃশ্য হয়ে গেল ভুতুড়ে অবয়বটা।

বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে হাসছিল নাকি ওটা? নাকি সবটাই মিলির চোখের ভুল?

এরপর আর কিছুতেই একা থাকার সাহস রইল না মিলির। চটজলদি গিয়ে পাশের বাসা থেকে সুলতানাকে টেনে নিয়ে এল। সবকিছু শুনে সুলতানার চোখমুখও শুকিয়ে গেল। কথা দিল, মিলির ভাইয়া-ভাবী না আসা পর্যন্ত মিলির সাথেই সময় কাটাবে সে। এরপরও অনেকটা সময় লেগে গেল মিলির পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে। বুকের ধুকপুকানি কমতেই চাইছে না তার! সাহস করে টিভিটা আবার ছাড়ল সুলতানা। নাহ, ভয়ের কিছু নেই পর্দায়। খবর পড়ছে সুন্দরী সংবাদ পাঠিকা, প্রায় আড়াইশ' জন মানুষ নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে মালয়েশিয়ার একটি বিমান।

দুপুরে বাথরুমে গোসল করতে গিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল মিলির। বার-বার মনে হচ্ছে, কেউ যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে! মেয়েদের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকলে তারা সেটা বুঝতে পারে। এ অদ্ভুত ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরই তাদের দিয়েছেন।

সুলতানা ভাবী মজা করছে না তো আবার? কিন্তু তা কী করে হয়! সে তো বসে রয়েছে সেই ড্রয়িংরুমে। তা ছাড়া বাথরুমের দরজাটাও তো ভিতর থেকেই বন্ধ করা।

চট করে তার চোখ গিয়ে পড়ল পিছনের আধখোলা ছোট জানালাটার দিকে।

বাসার পিছনের ওদিকটায় জংলামতন একটা জায়গা। কিছু বড়-বড় ফলের গাছ, সাথে কিছু কাঁটাঝোপে ভরা। ওদিকটায় লোক চলাচলের পথ নেই, তাই আলো-হাওয়ার জন্য ছোট্ট এই জানালাটা খোলাই রাখা হয়। ঠিকমত হাওয়া না খেললে, গোসলখানা অল্পদিনেই কেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়।

ওখানে গাছের আড়ালে লুকিয়ে কোন দুষ্ট ছেলে উঁকি দিচ্ছে না তো? নগ্ন নারীদেহ দেখার লোভ উঠতি বয়সী ছেলে-ছোকরাদের বেশ ভাল রকমই থাকে। তাদেরই কেউ হয়তো এই ভরদুপুরে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে লাইভ শো দেখার ফন্দি করছে!

হাত বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল মিলি। তারপরও তার অস্বস্তিটা বিন্দুমাত্রও কমল না! চটজলদি কোনরকমে গায়ে পানি ঢেলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

মনের গভীরে ভয়টা আবারও দানা বেঁধে উঠেছে তার। নিরুপায় হয়ে সুলতানাকে রাতটাও তার সাথে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করতে বাধ্য হলো মিলি।

মিলি ভেবেছিল, স্বামীকে ছাড়া রাত কাটাতে কিছুতেই রাজি হবে না সুলতানা। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে নিমিষেই সম্মতি জানাল সুলতানা! এ ক'দিনেই মিলিকে ভালবেসে ফেলেছে সে, তাই তার অনুরোধ ফেলতে পারেনি।

সে রাতে শুকনো মুখে ভাইয়া-ভাবীকে সবকিছু খুলে বলল মিলি। শুনে তাঁরা যথারীতি অট্টহাসি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন মিলির আশঙ্কাকে! তাঁদের ধারণা, অতিরিক্ত হরর বই পড়তে-পড়তেই এ অবস্থা হয়েছে মিলির। আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে সুলতানা ভাবীর কাছ থেকে শোনা যতসব গাঁজাখুরি গপ্পো। হরর বই পড়ায় ক'দিনের জন্য ইস্তফা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো তাকে।

তাদের সাথে কথা বলার মুহূর্তগুলোতে মিলির বারংবার মনে হলো, তারা ছাড়াও কামরায় আরও কেউ উপস্থিত আছে! যে কান পেতে শুনছে তাদের কথোপকথন, জানতে চাইছে কী তাদের সিদ্ধান্ত! ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মিলির শরীর। ভাইয়া-ভাবীর উপহাসের ভয়ে, একথা আর তাদের জানাল না সে। বিষণ্ন মুখেই নিজের রুমে ফিরে এল।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয় কেটে গিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সে। সুলতানার মজার-মজার সব নোংরা চুটকি শোনার পরও মন ভার করে রাখবে, এমন সাধ্য কার আছে?

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মিলির। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারল না, ঠিক কী কারণে ঘুমটা ভেঙেছে তার। পাশে তাকাতেই দেখতে পেল, বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সুলতানা। এলোমেলো চুলে মুখের অনেকটা ঢাকা পড়ে আছে। গল্প করতে-করতে কখন যে দু'জনে ঘুমিয়ে গেছে, সেটা নিজেরাও জানে না।

মশারীও দেয়া হয়নি, ইচ্ছেমত মশা কামড়াচ্ছে এখন। মশার কামড়েই কি ঘুম ভাঙল? তাই হবে হয়তো।

ঘুম-ঘুম চোখে উঠে মশারী টানাল মিলি। নিজে মশার কামড় খেতে রাজি আছে ও, তবে মেহমানকে খাওয়াতে রাজি নয়। আবার বালিশে মাথা রাখতেই

শুনতে পেল বাথরুমের ট্যাপ থেকে টপ-টপ করে পানি পড়ছে। এ মধ্যরাতের নীরবতায়, বড্ড বেশি কানে লাগছে শব্দটা। কে ছেড়েছে ট্যাপ? সুলতানা ভাবী? তাই হবে। কারণ তার জানার কথা নয়, এ ট্যাপটার মাথাটা একটু জোরে ঘোরাতে হয়, না হয় জল ঝরা বন্ধ হয় না। হয়তো ঘুমের ঘোরে জলদি টয়লেট সেরে এসে শুয়ে পড়েছে, ভাল করে আর নল বন্ধ করার দিকে খেয়াল করেনি।

কিছুক্ষণ বালিশে কান চেপে রেখে ঘুমানোর বৃথা চেষ্টা করল মিলি। নাহ্, আওয়াজটা একেবারে মাথায় এসে আঘাত করছে। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গেল ও। লাইট জ্বালল না, পাছে সুলতানার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। বেচারি বেশ আরাম করে ঘুমোচ্ছে, দেখতে মায়া লাগছে ভীষণ।

ট্যাপ বন্ধ করে ফেরার পথেই দড়াম করে আছাড় খেল মিলি! যতটা না ব্যথা পেল, তারচেয়েও বেশি লজ্জা পেল ও। ভাগ্যিস কেউ দেখে ফেলেনি। এতবড় মেয়ে কেমন করে আছাড় খায়?

দরজার কাছে এসে ভীষণ অবাক হলো মিলি। কিছুতেই খুলছে না দরজাটা! এদিক-ওদিক নব ঘুরিয়ে বারংবার চেষ্টা করল, কিছুতেই কিছু হলো না! ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। হাতলে হাত রেখে চেষ্টা করে চলল ও। মনে-মনে আশা করছে, সকালের মতই দৈবক্রমে খুলে যাবে ওটা!

কিন্তু বিধি বাম!

আচমকা কিছু একটা শক্ত করে তার পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল! হড়হড় করে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল বাথরুমের মাঝামাঝি জায়গায়। তীব্র আতঙ্কে পুরোপুরি পাথর হয়ে গেল মিলি। পরমুহূর্তেই কেউ একজন পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে। শক্ত বাঁধনে চাপা পড়ল তার নাকমুখ। নিমিষেই শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায় দিগ্বিদিক্ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল ও। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না! মুক্তি মিলল না বজ্রকঠিন সে বন্ধন থেকে! হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়তেই সীমাহীন ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল মিলির দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়! সে দেখতে পাচ্ছে সকালের সেই ভয়ঙ্কর মুখটাকে! ওটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার পিছনটাতে। প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইল মিলি, কিন্তু পারল না। মুখ দিয়ে কেবল গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দই বেরোল না তার! চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুজল, গাল বেয়ে নেমে গেল আরও নীচে।

আয়নায় তখন হেসে উঠেছে মুখটা, সকালেও ঠিক এমনি করেই হেসেছিল ওটা। ভুল দেখেনি মিলি। পরিতৃপ্তির সে হাসি বড্ড কুৎসিত, বড্ড ভয়ঙ্কর। তার রাজ্যে কোন অনাহূতের ঠাঁই নেই, বাঁচতে দেবে না সে!

প্রিয় পাঠক, কোন এক মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যদি শুনতে পান বাথরুমের ট্যাপ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে, একা-একা ছুটে যাবার আগে, আরেকবার ভেবে দেখবেন কি?

উপহার

ব্যাপারটার শুরুটা ছিল বেশ মজার।

এক ঝুম বৃষ্টির রাতে আশপাশে কোথাও একটা বিকট শব্দের বাজ পড়ল। সেই শব্দে চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল রনির। কীসে ঘুম ভেঙেছে, সেটা বুঝতে পেরে আবারও ঘুমানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু বিধি বাম, কিছুতেই আর ঘুমবুড়ির দেখা মিলল না! শেষমেশ বিরক্ত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সে। জানালা খুলে বৃষ্টি দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পর পরই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর মুহূর্তেই সামনের বিশাল মাঠটা ফকফকা আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। পরক্ষণেই তার পিছু ধাওয়া করে আসছে গগনবিদারী কান-ফাটানো আওয়াজ! তখন দু'হাতে কান দুটো চেপে ধরতে হচ্ছে রনিকে। তবে বিজলীর রহস্যময় আলোয় মাঠের মধ্যখানে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ বুড়ো গাছটাকে দেখতে বেশ লাগছে। রনির যদি একখানা ডিজিটাল ক্যামেরা থাকত, তা হলে সে এখন নির্ঘাত গাছটার একটা ছবি তুলে রাখত। কিন্তু নেই যখন, কী আর করা যাবে? তাই ঈশ্বর প্রদত্ত দুটো ৫৭৬ মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা দিয়েই প্রাণভরে সৌন্দর্য উপভোগ করে চলল সে।

খানিক বাদেই বৃষ্টির সাথে ঝড়ো হাওয়াও বইতে লাগল জোরেশোরে। দমকা বাতাসের তোড়ে জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে রনির গায়ে। তার আবার ঠাণ্ডার ধাত আছে, অতি অল্পতেই বেজায় সর্দি লেগে যায়। তাই বাধ্য হয়েই জানালার কবাটগুলো লাগিয়ে দিতে হলো তাকে।

পড়ার টেবিলে বসে ডাইরি আর কলমটা টেনে নিল রনি। এ দুটো কেবল আজই উপহার পেয়েছে সে। সকাল-সকাল কুরিয়ারের লোকেরা পৌঁছে দিয়ে গেছে বাসায়। তবে উপহারদাতার নাম জানা নেই তার! অবশ্য বাসার সবার ধারণা, বড়মামাই পাঠিয়েছেন এগুলো। মাঝে-মাঝেই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে সবাইকে চমকে দিতে ভালবাসেন তিনি। গত একমাস ধরেই গোটা পৃথিবী সফর করে বেড়াচ্ছেন, বাসার কারও সাথে যোগাযোগ রাখছেন না মোটেও! তাঁর সাফ কথা, পারিবারিক কোনরকম দুশ্চিন্তা ভ্রমণের সময় বহন করতে চান না তিনি! নিশ্চিন্ত আর নির্ভারই যদি না থাকা গেল, ভ্রমণের পরিপূর্ণ তৃপ্তিটা কি আর পাওয়া যাবে?

রনিরও ধারণা বড়মামাই তাকে ডাইরি আর কলমটা পাঠিয়েছেন। রনিকে ভীষণ ভালবাসেন তিনি। এ বাসায় বেড়াতে এলে কখনও খালি হাতে আসেন না,

কিছু না কিছু নিয়ে আসেনই তাদের জন্য। মামা ছাড়া রনিকে উপহার পাঠানোর মত আর তো কেউ নেইও!

ডাইরি লেখার অভ্যাস কস্মিনকালেও ছিল না রনির। তাই ডাইরিতে কী লিখতে হয়, সেটাও জানা নেই তার! অবশ্য স্কুলের একটা ডাইরিতে তাকে রোজই ক্লাসের পড়া টুকে আনতে হয়। তবে এই ডাইরিটাতে সে নিশ্চয়ই ক্লাসের পড়ার কথা লিখতে যাবে না, তাই না? লালরঙা ডাইরিটা আর সাদা-কালো জেব্রার মত নকশাকাটা কলমটা এতটাই সুন্দর যে, দেখলেই কিছু একটা লিখতে ইচ্ছে করে। অদ্ভুত অমোঘ একটা টান, মনের কোন গহীনে যেন এর উৎপত্তি!

ডাইরির প্রথম পাতাটা খুলে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল রনি। চারধারেই কেমন অদ্ভুত সুন্দর বিজাতীয় আঁকিবুঁকি, মাঝখানে লেখার জন্য এক চিলতে শুভ্র জমিন। গোটা-গোটা অক্ষরে লিখল রনি: কাল আমি স্কুলে যেতে চাই না।

লেখা শেষে, লাইনটার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই হেসে কুটি কুটি হলো সে। এমন অদ্ভুত একটা কথা সে কেন লিখতে গেল? তার ভাল করেই জানা আছে, স্কুলে তাকে যেতেই হবে। স্কুল কামাই দেয়ার কোন অজুহাতই ধোপে টিকবে না মোটেও। ওর আম্মু যা জাঁদরেল, একটু এদিক-ওদিক হলেই পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে ফেলবেন। তবুও লেখাটার দিকে তাকিয়ে কেন যেন খুব তৃপ্তি পেল সে।

ডাইরিটা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বাজ পড়ার শব্দ কমে এসেছে। তবে বৃষ্টি ঝরার বিরাম নেই এখনও। দেখতে-দেখতে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল রনি!

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে রনি ভীষণ অবাক হলো। ঘরের সবাই ইতোমধ্যে জেগে গেছে, সবার মুখেই কেমন একটা থমথমে ভাব! সাধারণত এত সকালে এ বাড়ির কারও ঘুম ভাঙে না। শুধু তার মা জেগে উঠে সবার জন্য নাস্তা তৈরির আয়োজন করেন। অবশ্য কাজের বুয়া মনার মা-ও এসময় তাঁকে সাহায্য করে। এরপর জেগে ওঠেন বাবা, তারও পরে ঘুম ভাঙে সোমা আপুর। জনি ভাইয়ার ঘুম ঠিক কখন ভাঙে, সেটা রনির জানা নেই। কারণ সকালে উঠেই রনিকে তড়িঘড়ি স্কুলে চলে যেতে হয়। স্কুল শেষে একটা কোচিং ক্লাস করে বাসায় ফিরতে-ফিরতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। তখন কখনওই জনি ভাইয়াকে বাসায় পাওয়া যায় না। অবশ্য শুক্রবার অথবা অন্যান্য ছুটির দিনে তাকে দুপুর অবধি ঘুমাতে দেখে রনি!

যা হোক, এই সাতসকালে আচমকা সবার জেগে ওঠার কারণ অবশেষে জানতে পারল রনি। গ্রামের বাড়িতে তার দাদাভাই মারা গেছেন। তাদের সবাইকে এখনই গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা দিতে হবে। স্কুলে যাবার বদলে তাই গ্রামে যাবার জন্য তৈরি হতে হলো রনিকে! আরেকদিন কী এক কারণে যেন রনিদের স্কুল একদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। শহরের সব স্কুল খোলা, শুধু তাদেরটাই বন্ধ! অপ্রত্যাশিত এ ছুটি পেয়ে রনি অবশ্য যারপরনাই খুশিই হলো। কিন্তু সকাল গড়াতেই তার খুশির রেশ ধীরে-ধীরে উবে যেতে লাগল।

বাড়িতে একা-একা সে করবেটা কী? মা-বাবা দু'জনেই অফিসে গেছেন, আপুটাও স্কুলে। বসে-বসে যে টিভিতে একটু কার্টুন দেখবে, সে উপায়ও নেই! জনি ভাইয়া টিভি রুমে ঘুমাচ্ছে। আওয়াজে তার ঘুম ভাঙলে কিলিয়ে ভূত ছাড়াবে রনির। বাইরে গিয়ে যে একটু দৌড়ঝাঁপ করবে, সে সুযোগও নেই। বিকেল ছাড়া বাইরে বেরোনো সম্পূর্ণ নিষেধ তার জন্য। ইস, কবে যে ভাইয়ার মত বড় হবে আর সমস্ত নিষেধাজ্ঞাগুলো শিথিল হবে!

ঘরে যেসব গল্পের বই ছিল সবক'টাই পড়া হয়ে গেছে তার। পুরানোগুলো পড়ে কি আর তেমন একটা মজা পাওয়া যায়? সোমা আপুটা থাকলেও না হয় দু'জনে মিলে খেলা করে দিব্যি সময় কাটানো যেত।

আনমনেই ড্রয়ার থেকে ডাইরি আর কলমটা বের করল রনি। একটা নতুন পাতা বের করে লিখল: ইস, আপুটা যদি এখন বাসায় থাকত!

ঠিক তখনই জানালায় দুটো চড়ুই পাখি এসে বসল। চট করে ডাইরিটা রেখে উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল রনি। পাখি ভীষণ পছন্দ তার, আর চড়ুই হলে তো কথাই নেই! চড়ুই মোটেও মানুষকে ভয় করে না, উল্টো সবসময়ই মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। আর কী সুন্দর ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়ায় এখানে-সেখানে। এদেরকে ভাল না লেগে উপায় আছে?

পরক্ষণেই কলিংবেল বেজে উঠলে, দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল রনি। সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল, যখন দেখল দরজার বাইরে সোমা দাঁড়িয়ে আছে। সোমার নাকি বেজায় পেট ব্যথা করছে, তাই স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে আগে-আগে। বাসায় আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তার পেট ব্যথা জাদুমন্ত্রবলে ভাল হয়ে গেল। তারপর দু'ভাইবোন মিলে হরেক রকম খেলায় চেঁচিয়ে গোটা বাড়ি মাথায় তুলল। মাঝে অবশ্য জনির ধমকে কিছুক্ষণ চুপ ছিল, তবে সে বেরিয়ে যেতেই চেঁচামেচি আবারও শুরু হয়ে গেল পূর্ণোদ্যমে!

চৈত্র মাসের এক দুপুরে রনির খুব ইচ্ছে করছিল একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে। বাবা-মা অফিসে, বাসায় থাকলে তাঁদের কাছে বায়না ধরা যেত। জনি ভাইয়া অবশ্য বাসায়ই আছে, তবে তার কাছে টাকা চাইবার সাহস নেই রনির মোটেও। ফ্রিজের পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের বৃথা চেষ্টা সে করেছে কিছুক্ষণ আগেই। কিন্তু কোকের তৃষ্ণা কি আর পানিতে মেটে?

মন খারাপ করে উপহার পাওয়া ডাইরি আর কলমটা বের করল রনি। আজকাল এগুলোই তার পরম বন্ধু হয়ে উঠেছে। ডাইরিটা যে তার মনের ইচ্ছা পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এতদিনে সে এটা বেশ বুঝতে পেরেছে। তবে ঠিক কী উপায়ে ব্যাপারটা ঘটে, সেটা জানা নেই তার। খুব বেশি কিছু সে লেখেও না ডাইরিটাতে, পাছে ডাইরিটার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়!

একটা নতুন পৃষ্ঠা বের করে সে লিখল: একটা কোক যদি পেতাম!

লেখা শেষে সে চুপটি করে বিছানায় শুয়ে রইল। তার বার-বার মনে হচ্ছে, আজকের ইচ্ছেটা কিছুতেই পূরণ হবার নয়! ভাবতে-ভাবতেই চোখে ঘুম নেমে এল তার। ঠিক তখনই জনি ভাইয়া এসে ওর রুমে ঢুকল। রনির হাতে একখানা

একশ' টাকার কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দিয়ে ভাইয়ার জন্য একটা পঞ্চাশ টাকা দামের মোবাইল কার্ড আনতে বলল। বাকি ভাংতি টাকাটা থেকে রনি চাইলে একখানা কোক অথবা আইসক্রিম খেতে পারে, এটা শোনার পর খুশিতে কেবল ডিগবাজি খাওয়া বাকি রাখল সে! দৌড়ে নয়, রীতিমত উড়ে চলে গেল দোকানে। একটু দেরি হলেই যেন দোকানের সমস্ত কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে!

এক বিকেলে ঝুম বৃষ্টি নামল। মহল্লার ছেলে-পেলেরা এই বাদলার মধ্যেই ফুটবল খেলায় নেমে গেছে। কাদাপানিতে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করার মত সুখ আর কীসেই বা আছে?

রনিরও ভীষণ ইচ্ছে করছে তাদের দলে যোগ দিতে, কিন্তু মায়ের ভয়েই পারছে না সেটা। অতি অল্পতেই তার ঠাণ্ডা লেগে যায়, আর সেটা যদি নিজে ইচ্ছে করে লাগায়, তা হলে আর মায়ের হাত থেকে কোনভাবেই নিস্তার নেই! তাই মন খারাপ করে জানালা দিয়েই অন্যদের খেলা দেখতে লাগল রনি। কিন্তু অমন প্রলোভন চোখের সামনে থাকলে কতক্ষণই বা আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? সে তো আর মহাপুরুষ নয়!

তাই শেষমেশ পরিণতির কথা না ভেবে রনিও দৌড়ে গিয়ে সামিল হলো বৃষ্টিভেজা ফুটবলারদের দলে। ইচ্ছেমত মনের সুখে দাপিয়ে বেড়াল সারা মাঠ। মসজিদের মাগরিবের আজান কানে ঢুকতেই কেবল টনক নড়ল তার! এখন কী হবে? মার কি আজ তাকে খেতেই হবে? দুরু-দুরু বুকে প্রার্থনা করতে-করতে বাড়ি ফিরল সে।

কিন্তু বিধি বাম! এমনিতেই আজ অফিসের একটা ঝামেলা নিয়ে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ছিল রনির মায়ের। তার উপর দরজা খুলে ছেলের অমন কাদামাখা ভূতের রূপ দেখে নিজেকে কিছুতেই আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না তিনি। দমাদম কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন রনির পিঠে!

গোসল সেরে নাস্তা খেয়ে পড়তে বসল রনি। তখনও কান্না পুরোপুরি থামেনি তার। কান্নার দমকে পিঠটা বার-বার ফুলে-ফুলে উঠছে। পড়ার টেবিলে বসেই সে দেখতে পেল লালরঙা ডাইরিটাকে, পাশে পড়ে থাকা নকশাকাটা কলমটাও। অথচ স্পষ্ট মনে আছে, সে এগুলোকে ড্রয়ারে রেখেছিল। কে বের করল এগুলো? আপু? নাকি আম্মু?

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে ডাইরির নতুন একটা পৃষ্ঠা বের করল রনি। তারপর লিখল: পচা আম্মুটাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও!

রনি কল্পনাও করতে পারল না, নিজের অজান্তে কী ভুল সে করে বসেছে। তার মাকে এতদূরেই পাঠানো হবে, যেখান থেকে তিনি আর কোনদিনও ফেরত আসবেন না! চিরকালের জন্য চলে যাবেন, না ফেরার দেশে!

কস্টিউম

নিজের ঘরের জানালার পাশে মন খারাপ করে বসে আছে পল। কিছুই ভাল লাগছে না তার। কেমন করে ক্যাথি এমন ব্যবহার করল পলের সাথে? কীভাবে পারল ও? এতটুকুও খারাপ লাগেনি ওর?

আজ হ্যালোইনের রাত। ছেলেমেয়েরা নানারকম কিম্ভূতকিমাকার কস্টিউম পরে চকোলেট শিকারে বের হবে। হেসে খেলে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াবে অনেক রাত অবধি। তাই সকাল-সকালই ক্যাথির দোরগোড়ায় ছুটে গিয়েছিল পল। তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আজ রাতে একসাথে বেড়াতে বের হবার জন্য। ক্যাথি সেই আহ্বানে সাড়া তো দিলই না, উল্টো যাচ্ছেতাই ব্যবহার করল পলের সাথে। সাফ জানিয়ে দিল, পলের মতন বেঁটে মানুষ তার পছন্দ নয় মোটেও। সে আজ ঘুরতে বের হবে জিমের সাথে। শুধু এটুকু বলেই থেমে থাকেনি ক্যাথি, পলের মুখের উপরই দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছে সদর দরজাটা। আগ্রহে কিছুটা সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল পল, অল্পের জন্য তার নাক-মুখ থেঁতলে যাবার হাত থেকে বেঁচে গেছে।

এতটা অপমান অকারণে কেউ কাউকে করে? সত্যিই ও খানিকটা বেঁটে, কিন্তু এতে ওর নিজের দোষ কোথায়? জিম ক্লাসের সবচেয়ে লম্বা ছেলেটার নাম। বাস্কেটবল সে দুর্দান্ত খেলে, সেটাও ক্যাথি খুব পছন্দ করে। পাশে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেয় জিমকে। উচ্চতার কারণেই পল বাস্কেটবল একটুও ভাল খেলতে পারে না। সর্বশক্তি দিয়ে লাফিয়ে উঠেও সে কোনমতেই ঝুড়িটার নাগাল পায় না। কিন্তু তাতে কী? সে কি প্রতিবছর গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথম হয় না? ক্লাসের আর কোন ছেলেটা তার মত ভাল গণিত বোঝে? যে-কোন গণিতের সমস্যাই পল মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে ফেলে। স্কুলের সমস্ত টিচার তাকে খুব আদর করেন। এর বুঝি কোন মূল্য নেই ক্যাথির কাছে? না, নেই। সেটা ভালই জানা আছে পলের। এজন্য সে আরও বেশি কষ্ট পায়। নিজেকে বড্ড অযোগ্য মনে হয়। সর্বক্ষণই মনে হতে থাকে, তার কোন দামই নেই এ জগতে।

কিন্তু আজকের মত দুঃখ আর কখনও পায়নি বেচারা। ক্যাথির বাসা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই নীরবে কেঁদে চলেছে সে। কাঁদতে-কাঁদতে চোখজোড়া রীতিমত ফুলিয়ে ফেলেছে। তবুও তার মনের ভার এতটুকুও যেন লাঘব হচ্ছে না। কান্নার দমকে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তার। মাঝে-মাঝে মন চাইছে জানালা

দিয়ে লাফিয়ে নীচে পড়ে মরে যেতে! দেবে নাকি একটা লাফ? ঠিক তখনই দাদীর ডাক শুনতে পেল পল। পলের নাম ধরে একনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছে বুড়ি, থামবার নামটিও করছে না। পল জানে, যতক্ষণ দাদীর সামনে গিয়ে না দাঁড়াবে, এ চিৎকার থামবার নয়। তাই কোনরকম চোখ মুছেই সে দাদীর কাছে ছুটে গেল। দাদীর ঘরে আসতে তার এতটুকুও ভাল লাগে না। বুড়ি ঘরটাকে সবসময় অন্ধকার করে রাখে। পুরো ঘরময় কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ। কিছুক্ষণ থাকলেই একেবারে মাথা ধরে যায়। তাই দাদীর ফুটফরমায়েশ শেষ হওয়া মাত্রই ওঘর ছেড়ে চলে আসে পল। কখনও দাদীর সাথে খোশগল্প করার জন্য বসে থাকে না।

কিন্তু আজ দাদীর ঘরে ঢুকে পলকে বেশ অবাক হতে হলো। পুরো ঘরটা ঝলমল করছে আলোয়। সেই বিশ্রী মাথাধরা গন্ধটাও অনুপস্থিত! তার বদলে ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ। দাদীকেও আজ কেমন যেন প্রাণবন্ত লাগছে, অন্যান্য দিনের মত মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ি নয়!

ইশারায় পলকে বুড়ি বিছানার ধারে বসতে বলল। পল বিছানায় না বসে ঘরের একমাত্র রকিং চেয়ারটায় বসল। বসেই সামনে পিছনে দোল খেতে লাগল, এটা তার প্রিয় একটা কাজ।

'কাঁদছিলে কেন, পল?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল বুড়ি।

চমকে উঠল পল। বুড়ি জানল কী করে যে সে কাঁদছিল?

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। জোরগলায় বলল, 'কই? কাঁদিনি তো! কাঁদব কেন?'

'তা হলে তোমার চোখজোড়া কি এমনি-এমনিই লাল আপেলের মতন হয়ে আছে?' ফিক করে হেসে ফেলল বুড়ি।

ও আচ্ছা, ব্যাপার তা হলে এই! তার চোখ দেখেই বুড়ি বুঝে গেছে যে সে কাঁদছিল। সে আরও ভাবতে শুরু করেছিল, বুড়ির কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা জন্মাল কি না আবার!

দাদীর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না পল। নীরবে রকিং চেয়ারে দোল খেতে লাগল।

তাই দেখে বুড়ি আবার বলল, 'হ্যালোইনের জন্য পোশাক কেনা হয়েছে, পল? কী কিনলে এবার তুমি? পুরানো ভূত, নাকি ভ্যাম্পায়ারের কস্টিউম?'

এই রে...সেরেছে! কী জবাব দেবে পল এই প্রশ্নের? হ্যালোইনের জন্য কস্টিউম ঠিকই কিনেছিল পল। তবে কোন ভ্যাম্পায়ার কিংবা ভূতপ্রেতের নয়, সুন্দর একটা রাজকুমারের পোশাক। ওটা পরলে পলকে নির্ঘাত রূপকথার ডালিমকুমারের মতই দেখাত। কিন্তু নেই আর ওটা এখন, ফেলে দিয়ে এসেছে পল! ক্যাথির ওখান থেকে ফিরে এসে রাগে-অভিমানে প্যাকেটসুদ্ধ নিয়ে ফেলে এসেছে ডাস্টবিনে। ঠিক করেছিল আজ রাতে আর বেরই হবে না ঘর ছেড়ে। কী হবে একা-একা ঘুরে? আর ঘুরতে-ঘুরতে যদি ক্যাথির মুখোমুখি হয়ে যায়, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে পল? তারচেয়ে বরং ঘরেই থাকবে সে, আজ আর বাইরে

গিয়ে কাজ নেই।

দাদীকে তো আর এসব কথা বলা যায় না, তাই এবারেও মুখে কুলুপ এঁটে রইল পল। শুধু তার চেহারাটা আগের চাইতেও বিষণ্ন হয়ে গেল।

'নতুন পোশাকগুলো ফেলে দিলে কেন, পল?'

চমকে দাদীর দিকে তাকাল পল। আমতা-আমতা করে বলল, 'তুমি জানলে কী করে?'

মুচকি হাসল বুড়ি। তারপর বলল, 'তুমি যখন ওগুলো ফেলতে বাইরে গেলে, আমি তখন জানালাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।' ইঙ্গিতে ঘরের একমাত্র জানালাটা দেখাল বুড়ি।

পল হাসার চেষ্টা করল বটে, তবে হাসিটা ঠিকমত ফুটল না। উল্টো চেহারাটা কেমন যেন বোকা-বোকা হয়ে গেল। বুড়ি এরপর পলকে স্বাভাবিক করতে, আর কোন প্রশ্ন না করে পুরানো দিনের গল্প জুড়ে দিল। একথা ওকথার পর পলের দাদার প্রসঙ্গ এল। তার গল্প করতে গিয়ে অজান্তেই চোখ ভিজে উঠল দাদীর। তারপরও থামল না বুড়ি, গল্প বলার নেশায় পেয়েছে যেন আজ তাকে! আগ্রহ নিয়েই সব শুনল পল। তার দাদার কথা এর আগে কোনদিন কেউ বলেনি তাকে। অবশ্য বলার মত এই দাদী ছাড়া আর কেউ নেইও তার। তার বাবা-মা সেই ছোটবেলাতেই কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, সে বড় হয়েছে আয়াদের কাছে। জানা যায়, আজ তার দাদার মৃত্যুবার্ষিকী। বহু বছর আগে এক হ্যালোইনের রাতেই মারা গেছেন তিনি। মারা গেছেন না বলে অবশ্য গায়েব হয়ে গেছেন বলাটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ হ্যালোইনের সে রাতে, সেই যে তিনি কস্টিউম পরে বেরিয়েছিলেন, আর কোনদিনও ফিরে আসেননি! এরপর আর তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বুড়ির কথা শেষ হলে ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন গুমট হয়ে গেল। একটা চাপা বিষাদের সুর যেন বেজে চলেছে ঘরের প্রতিটি কোণে। বিমর্ষ পলের কাছে সেটা অসহ্য ঠেকল। সে ওখান থেকে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়াল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বুড়ি বলে উঠল, 'একটু দাঁড়াও, সোনা। আজ রাতে কী পরবে বলে ভাবছ তুমি?'

পল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমার কাছে এখন হ্যালোইনের কোন কস্টিউম নেই। ভাবছি আজ আমি বাইরে কোথাও যাব না। রাতটা টিভিতে কার্টুন দেখেই কাটিয়ে দেব।'

'উৎসবের রাতে ঘরে বসে থাকা কোন কাজের কথা নয়, সোনা। পুরানো পোশাক পরতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

'মানে?'

'মানে, তোমার দাদার সেই রাতের হ্যালোইনের কস্টিউমটা যদি পরতে চাও...'

আগ্রহে চকচক করে উঠল পলের চোখ। বুড়িকে কথা শেষ করতে দিল না সে। মাঝপথেই চেঁচিয়ে বলল, 'ওটা এখনও আছে তোমার কাছে? কিন্তু কী করে

সম্ভব? ওই দিন তো কস্টিউমটা পরেই বের হয়েছিলেন দাদা!'

পলের উত্তেজনা দেখে হেসে ফেলল বুড়ি। নাতির মন ভাল হয়ে গেছে বুঝতে পেরে বেশ খানিকটা প্রশান্তিও পেল।

'না, ঠিক ওটা নেই। তবে ওটার মতই অবিকল আরেকটা আছে। হ্যালোইনের আগের রাতে সস্তায় ছাড় পেয়ে একইরকমের দুটো কস্টিউম কিনে এনেছিল সে। তার ইচ্ছে ছিল, আমরা দু'জন ওগুলো পরে এক সঙ্গে বেড়াতে বের হব। তবে অতিথিরা জলদি চলে আসায়, আমার আর সেদিন বের হওয়া সম্ভব হয়নি। সে কস্টিউমটা আমি আজও রেখে দিয়েছি যত্ন করে।'

খুশিতে লাফিয়ে উঠল পল। 'শিগ্গিরই ওটা আমাকে দাও, দাদী। আজ রাতে আমি ওটাই পরতে চাই।'

হাসিমুখে উঠে গিয়ে দেয়াল আলমারিটা খুলল বুড়ি। তারপর নীচের তাক থেকে সুন্দর একখানা অয়েলস্কিনে মোড়ানো প্যাকেট বের করে দিল পলের হাতে। পল সেটা নিয়ে এক ছুটে চলে এল নিজের ঘরে। হ্যালোইনের পোশাক অন্য কাউকে আগে-আগে দেখাতে নেই, তা হলে ওটা পুরানো হয়ে যায়। যদিও পোশাকটা দাদী আগেই দেখে ফেলেছে, কিন্তু তাতে কী? নিয়ম তো নিয়মই।

চটজলদি প্যাকেটটা খুলে ফেলল পল। ভিতর থেকে যে কস্টিউমটা বের হলো, তা দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল ও।

ভয়ঙ্কর বীভৎস একখানা কস্টিউম! তাকালেই ভয়ে গা রি-রি করে ওঠে। সম্ভবত এটা পুরানো আমলের মায়া নেকড়ে সাজবার পোশাক। আজকালকার কোন দোকানেই এরকম কোন কস্টিউম দেখেনি পল। খুশিতে কেবল নাচতে বাকি রাখল ও। তার পোশাক হবে সবার চেয়ে আলাদা, সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর। সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে না তাকিয়ে পারবে না কিছুতেই! কিছু ছেলেমেয়ে তো হিংসায়ই একেবারে জ্বলে-পুড়ে মরে যাবে। এহেন ভয়ঙ্কর পোশাক ওদের কারও কাছেই থাকবে না, একথা পল হলপ করে বলতে পারে। আর হ্যালোইনের রাতে যার কস্টিউম যত ভয়ঙ্কর তার মজাও তত বেশি। মানুষকে ভয় পাওয়ানোতেই তো যত আনন্দ! এই পোশাক নিয়ে সে যদি হালুম করে কারও সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হলে নিঃসন্দেহে ওই মানুষটার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে।

অধীর আগ্রহে রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল পল। ক্যাথির অপমানের কথা সে প্রায় ভুলেই গেছে, উল্টো ক্যাথিকে কীভাবে ভয় দেখাবে সেই পাঁয়তারা কষতে লাগল মনে-মনে। হায়রে, রাতটা আসতে এত দেরি করছে কেন?

সন্ধ্যার পর-পরই বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল পল। এর মাঝে একবার দাদীর রুম থেকেও ঘুরে এল। ঘুমিয়ে পড়েছে বুড়ি, কড়া ওষুধের প্রভাবে সন্ধ্যা নাগাদই শুয়ে পড়ে সে। না হয় এরপর আর ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই, সারাটা রাত জেগে কাটাতে হয়। হাত-মুখ ধুয়ে চটজলদি কস্টিউমটা পরে নিল পল। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল তার। এটা কি সত্যিই সে? কী ভয়ঙ্কর, কী বীভৎস!

আচমকা চমকে উঠল পল। কস্টিউমটা যেন জীবন্ত, ওটা পলের শরীরের

সাথে এঁটে বসে যাচ্ছে! মুখোশটা যেন আর মুখোশ নেই, বাড়তি চামড়া হয়ে তার চেহারার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে! হতভম্ব পল অনুভব করল, তার গোটা দেহজুড়ে লোম গজাচ্ছে! হাত-পায়ের নখগুলো নিমিষেই হয়ে উঠেছে বিশাল আর ধারাল! গোটা শরীরটা ফুলেফেঁপে হয়ে উঠছে বিশালাকার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ওটা আর পল রইল না, ভয়ানক এক দানবে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ওটা আর এখন মানুষের মত দু'পায়ে দাঁড়িয়ে নেই, নেকড়ের মতই চার হাত-পায়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে। চোখগুলো জ্বলছে আগুনের গোলার মত, শ্বদন্ত আর নখগুলোয় আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে প্রতিক্ষণে! ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরে পড়ছে অবিরাম, যেন আজন্ম ক্ষুধার্ত এক দানব ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়!

ধীরে-ধীরে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল ওটা। ঠিক তখনই দেখা গেল দূরে ক্যাথি হেঁটে আসছে। রাজকুমারীর কস্টিউমে ঠিক রাজকুমারীর মতই সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে। ভ্যাম্পায়ারের কস্টিউম পরা থাকলেও, সাথের লম্বা ছেলেটা যে জিম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওদেরকে দেখা মাত্রই ভয়ানক ক্রোধে রক্ত হিম করা এক গর্জন ছাড়ল দানবটা। সে চিৎকারে গভীর ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে জেগে উঠল পলের দাদী। ঘুম জড়ানো চোখে জানালায় দাঁড়িয়ে বুড়ি দেখল, লনের উপর দিয়ে ভয়ানক গতিতে বাইরে ছুটে যাচ্ছে এক বিশালাকার উন্মত্ত নেকড়ে! এটা দেখামাত্রই চোখ থেকে ঘুমটুম সব এক নিমিষে পালিয়ে গেল তার।

সে রাতে ক্যাথি আর জিমকে চিরে ফালাফালা করে ফেলেছিল দানবটা। তারপর পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলের দিকে। তবে দিন তিনেকের বেশি সেখানে বাঁচেনি ওটা। জলাতঙ্ক হয়ে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে ধুঁকে-ধুঁকে মারা গেছে।

পলের দাদী বুঝতে পেরেছিল সবই, কিন্তু তখন আর তার কিছুই করার ছিল না। মুখ খোলেনি বুড়ি, তাই সবাই জানল, সে রাতে পলও নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিজে ডাইনী হওয়া সত্ত্বেও দাদা-নাতিকে রক্ষা করতে না পারার আক্ষেপ সে বয়ে বেড়িয়েছে আমৃত্যু!

নরসুন্দর

মনটা বেশ খারাপ সুব্রত ঘোষের। দীন দুনিয়া কিছুই ভাল লাগছে না তার! চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আয়নায় নিজের চেহারার দিকেই একমনে তাকিয়ে আছে সে। ভগবান কেন তাকে বানানোর সময় আরেকটু যত্ন নিয়ে বানালেন না? কীসের এত তাড়াহুড়ো ছিল শুনি? একটু বেশি সময় নিয়েই না হয় খেটেখুটে খানিকটা রূপবান করে মর্ত্যে পাঠাতেন! সে নিজে তো কখনও জলদি দুনিয়ায় আসার জন্যে আন্দোলন করেনি! তা হলে কেন কোনমতে একটা লামছাম গড়ন দিয়েই পোঁদে লাথি মেরে তাকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া? চেহারা আর গায়ের রঙ আরও খানিকটা উজ্জ্বল হলে, আজ এইদিন দেখতে হত না তাকে!

লোকে তাকে নরসুন্দর বলে। ক্ষুর-কেঁচি দিয়ে কেটে-চেঁছে মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেয়াই তার কাজ। অন্যকে যে অক্লান্তভাবে দিনরাত সুন্দর করার চেষ্টা করে চলেছে, তার নিজের বুঝি সুন্দর হতে ইচ্ছে করে না?

তবে সুব্রতর আজকের মন খারাপের কারণ ঠিক চেহারার কমতিটুকুই নয়, আরও বেশি কিছু! গায়ের কালো রঙ আর বেবুনের মত চেহারার জন্য সে উঠতে বসতে রোজ মানুষের টিপ্পনী শোনে, এতদিনে এসব দিব্যি সহ্য হয়ে গেছে। স্ত্রী মালাও রোজ দু'বেলা নিয়ম করে এ নিয়ে কথা শোনায় তাকে! অথচ সুব্রত কি মালাকে জোর করে বিয়ে করেছিল? মোটেও না। উল্টো মালার বাবাই তার পিছনে মণ্ডল ঘটককে লাগিয়ে রেখেছিল রাতদিন। এমনকী বিয়ের পণ হিসেবে এই সেলুনটাও শ্বশুরেরই উপহার দেয়া। বিয়ের আগে সুব্রত গোপালদা'র দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করত। এক ছুটির দিনে চুল কাটাতে এসেই সুব্রতর সাথে প্রথম আলাপ হয় মালার বাবার। সহজ সরল ছেলে হিসেবে সুব্রতকে বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর দস্যিমেয়ের জন্য এমন আলাভোলা ছেলেই তিনি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলেন কি না! গোবেচারা কোন জামাই না পেলে তাঁর মেয়ে যে দশদিনের মাথায়ই বাপের বাড়ি ফেরত আসবে, সে কথা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে-ই বা জানত!

যা হোক, সুব্রতর মন খারাপের কারণ, আজ সকালেই সে মালাকে খারাপ একটা কাজ করতে দেখে ফেলেছে। খারাপ বলতে শুধু খারাপ নয়, বেশ ভাল রকমেরই খারাপ, রীতিমত ক্ষমার অযোগ্য! অবশ্য বহুদিন ধরেই লোকের মুখে মালাকে নিয়ে নানারকম কানাঘুষা শুনে আসছিল সুব্রত। তবে তাতে সে

কোনদিনও কর্ণপাত করেনি। লোকের কাজই হচ্ছে মানুষের নামে কুৎসা গেয়ে বেড়ানো! কেউ কোনদিন শুনেছে যে লোকে জনে-জনে কারও সুনাম করে ফিরছে? লোকে কষ্ট করে শুধু দুর্নামটুকুই ছড়াতে ভালবাসে! এই সেলুনেই তো রোজ তাকে নানাজনের নামে রাজ্যের কুকথা শুনতে হয়! সুব্রত জানে, এগুলো কখনও বিশ্বাস করতে হয় না। কারণ যাঁর সম্পর্কে এসব কথা বলা হয়ে থাকে, সাধারণত তিনি সামনে এলেই নিন্দুকেরা পুরো ভেজা বিড়াল হয়ে যায়, যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে পারে না! চিরকাল এসবই দেখে এসেছে সুব্রত। তাই এসব অহেতুক প্যাঁচালে কর্ণপাত করেনি কস্মিনকালেও!

কিন্তু আজ সকালে নিজের চোখে যা দেখতে হলো, তা কী করে অবিশ্বাস করে? অবশ্য যা দিনকাল পড়েছে, নিজের চোখের উপরও পূর্ণ আস্থা রাখা দায় এখন!

রোজ সকালে বেশ ভোরে-ভোরেই বাড়ি থেকে দোকানে চলে আসে সুব্রত। দুপুরের আগে আর বাড়িমুখো হয় না। কাজ করতে-করতে বেলা গড়ালে, এক দৌড়ে গিয়ে স্নান সেরে সাফসুতরো হয়ে নেয়। তারপর দু'মুঠো মুখে গুঁজেই আবার দোকানে ছুট লাগায়। দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যায়।

আজ মনের ভুলে নতুন কেঁচিটা বাড়িতে ফেলে এসেছিল সে। যদিও দোকানে পা রেখে ওটার কথা মনে পড়েছিল তার, তবুও অতটা পথ পাড়ি দিয়ে আবার বাড়িতে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না কিছুতেই। পুরানো কেঁচিটা দিয়েই দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্যায় পড়ল সুলতান গায়েনের জটবাঁধা চুলগুলো কাটতে গিয়েই! কিছুতেই সেটা পুরানো আধভোঁতা কেঁচি দিয়ে কাটা সম্ভব ছিল না। সন্ধ্যায় চৌধুরী বাড়িতে গানের মজলিশ আছে সুলতানের, তাই চুলগুলো খানিকটা সাইজ করা জরুরি ছিল তার। গায়েনের বারংবার অনুরোধেই তাকে দোকানে বসিয়ে কেঁচিটা আনতে বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল সুব্রত।

বাড়িতে গিয়ে মালাকে কোথাও খুঁজে পায়নি সে। ভেবেছিল মালা হয়তো নদীতে জল আনতে গেছে, তাই ড্রয়ার থেকে কেঁচিটা নিয়েই দোকানে ফিরে আসছিল সে। কিন্তু প্রতিবেশী আলম বেপারীর কাচারিঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ ভিতর থেকে মালার হাসির শব্দ শুনতে পায় সে! প্রথমে বেশ খানিকটা অবাক হলেও, প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে পরাজিত হয়ে বেড়ার ফোকরে চোখ রাখতে বাধ্য হয় সুব্রত। ভিতরের দৃশ্য দেখে রীতিমত হতভম্ব হয়ে যায় সে, হাত-পা অবশ হয়ে আসে তার! কিছুক্ষণ সেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মূর্তির মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছুটতে-ছুটতে দোকানে ফেরত আসে। তার শরীর তখন ঘেমে নেয়ে একাকার, কিছুতেই মনের গভীরে ওঠা ঝড় সামাল দিতে পারছিল না সে! নিজেকে যতই স্বাভাবিক রেখে কাজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করুক না কেন, আখেরে লাভ হয় না কিছুই। অন্যমনস্ক হয়ে কাজ করতে গিয়ে সুলতান গায়েনের লম্বা চুলের অনেকখানি কেটে ফেলে! ভয়ানক চটেছে সুলতান। সুব্রতকে শাসিয়ে গেছে খুব করে, সামনের যাত্রাপালায়

সুব্রতর ফালতু কাজের হাতের দুর্নাম করে গান বাঁধবে! সুব্রতর সব গ্রাহককে রতন শীলের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না সে! গায়েনদের প্রধান আকর্ষণই তো এই লম্বা চুল, সেটাই যদি না থাকল, তবে আর রইলটা কী?

সুলতান বিদায় নেবার পরও কাজে মন দিতে পারেনি সুব্রত। এর ওর গাল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়েছে একাধিকবার! আজ একদিনে যত গালমন্দ সে লোকের মুখ থেকে শুনেছে, তার গোটা জীবনেও এতটা শুনেছে কি না সন্দেহ!

আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ কী মনে করে যেন চেয়ার ছেড়ে উঠল সে! তারপর আলমারির সবচেয়ে নীচের ড্রয়ারটা খুলল। ভিতর থেকে বের করে আনল একটা দোমড়ানো মোচড়ানো, যৌনরোগের টোটকা চিকিৎসার বিজ্ঞাপন! তারপর শান্ত হয়ে বসে কাগজটা মন দিয়ে পড়তে লাগল। যতই পড়ে ততই অবাক হয় সুব্রত! হায়, ভগবান! প্রায় সবগুলো লক্ষণই তো তার সাথে একে-একে মিলে যাচ্ছে!

সুব্রতর জানা নেই, এধরনের বিজ্ঞাপনগুলোয় অতি স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোকেও অতিমাত্রায় রঙ চড়িয়ে অস্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এগুলো পড়লে প্রতিটি লোকই নিজেকে যৌনরোগী ছাড়া ভিন্ন কিছু মনে করে না। বিজ্ঞাপনটা পড়তে-পড়তে সুব্রত মালার পক্ষ নিয়ে কিছু যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে লাগল! মালাকে সে নিজে সুখী করতে পারেনি, এজন্যই হয়তো মালা...

কিন্তু কখনও তো মালা এ নিয়ে কোন অভিযোগ করেনি, উল্টো একমাত্র বিছানাতেই সে সুব্রতর খানিকটা প্রশংসা করত। আদর সোহাগের পর মালার চোখেমুখে কোনদিন পরিতৃপ্তি ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পায়নি সে! তা হলে?

ঠিক তখনই আলম বেপারীকে সেলুনের দিকে আসতে দেখল সুব্রত। চট করে হাতের কাগজটা দলামোচড়া করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিল সে। তারপর হাসিমুখে আলম বেপারীকে স্বাগত জানাল। জানা গেল, ক্ষৌরি করতে এসেছে আলম। দুপুরে দাওয়াত আছে তার পাশের গাঁয়ে, বাচ্চু মিয়ার ছেলের সুন্নাতে খৎনা আজ।

আলমের চোখেমুখে স্পষ্ট একটা উপহাস খেলা করছে। আয়নার ভিতর দিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে এমনভাবে সুব্রতর দিকে তাকাল সে, যেন জগতের সবচেয়ে আহাম্মক লোকটা স্বয়ং তার সামনে হাজির! তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে পরম প্রশান্তিতে চোখ মুদল। পরক্ষণেই শেভিং ক্রিমের ফেনায় তার গোটা মুখটা ভরিয়ে তুলল সুব্রত। হাতজোড়া অল্প-অল্প কাঁপছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভীষণরকম কষ্ট হচ্ছে তার।

দাড়ি কাটার ফাঁকে চুপটি করে থাকবে, আলম সেরকম বান্দা নয় মোটেই। অনর্গল বকে চলল সে। চালের ব্যবসায় প্রতিনিয়ত তার কতটা উন্নতি হচ্ছে, ঘুরে ফিরে সেকথাই বলছে বার-বার। এসব কথার মাঝখানে আচমকা বলে উঠল, 'তোর ছিঁড়া লাগাম দিয়া এমুন পাগলা ঘোড়াডারে ক্যামনে বাইন্ধা রাখস দেহি?'

সুব্রত কাজ থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে আলমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে

নির্বোধের মত শুধায়, 'মানে?'

'তোর জরুর কথা কইতাসি, ব্যাটা বেকুব। খাসা মাল!' বলেই আয়নার ভিতর দিয়ে সুব্রতর উদ্দেশে চোখ টিপল বেপারী। তারপর খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কিছুক্ষণ অশ্লীল ভঙ্গিতে হেসে, আবার চোখ মুদল।

ততক্ষণে মাথায় পুরো রক্ত চড়ে গেছে সুব্রতর। অসহ্য রাগে গোটা পৃথিবীটাকে দুমড়ে-মুচড়ে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার। চট করে তার চোখ যায় আলম বেপারীর উন্মুক্ত কণ্ঠনালীর দিকে! দেবে নাকি ব্যাটার গলায় ক্ষুর বসিয়ে জোরসে একটা টান? ভাবতে-ভাবতেই মনস্থির করে ফেলে সুব্রত! যা হয় হোক, পরে দেখা যাবে!

অকম্পিত হাতের মুঠোয় চেপে ধরা ধারাল ক্ষুরটা ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলে লক্ষ্যের দিকে।

ছায়াশ্বাপদ

ইতোমধ্যেই অন্তত পাঁচ কাপ চা গেলা হয়ে গেছে কামালের। এমন না যে দোকানদার আবুল মিয়া খুব ভাল চা বানায়, আবার এমনও না যে কামাল চা বিশে একটা পছন্দ করে, তারপরও তাকে কাজটা করতে হয়েছে! গত দু'ঘণ্টা ধরে সে আবুল মিয়ার ঝুপড়ি চা দোকানটার সামনের বেঞ্চিতে ঠায় বসে আছে। ব্যং দোকানটার একখানা সিট যেহেতু সে দখল করে রেখেছে, অন্তত কয়েক কাপ চা না খেলে দোকানির চলবে কেন? অবশ্য শুধু চা-ই না, গোটা কয়েক সিগারেটও খেয়েছে সে। মনের গভীরের সব দুশ্চিন্তা ধোঁয়ার সাথে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে তবে সে চেষ্টা যে খুব একটা সফল হয়নি, সেটা তার বিতৃষ্ণ চেহারার দিকে এক পলক তাকালে সহজেই বোঝা যায়!

বেঞ্চিটা একটা মোটা নারিকেল গাছের কাণ্ডের সাথে লাগোয়া। চুরি ঠেকাতে গাছটার সাথে বেঞ্চের পায়াগুলো বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। শক্ত বাঁধন না থাকলে কোন এক ভবঘুরে নেশাখোর যে এক রাতের মধ্যেই গোটা বেঞ্চিটা বেমালুম গা করে দেবে, এ ব্যাপারে অবশ্য বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশও নেই। তাই আবুল মিয়া সামান্যতম ঝুঁকিও নেয়নি। একটা বেঞ্চ হারালে সে ধকল সামলানো সহজ না মোটেও। তবে দোকানির ঝুঁকি কমলেও, ঝুঁকি বেড়েছে গ্রাহকের! প্রতি বছর সারা পৃথিবীজুড়ে অন্তত শ'তিনেক লোক মাথায় নারিকেল পড়ে মারা যায় কি না!'

চোখ-মুখ বিকৃত করে হাতের ষষ্ঠ চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে আছে কামাল। আবুল মিয়া চায়ে আর কিছু দিক বা না দিক, ইচ্ছেমত চিনি ঢালতে মোটেও কার্পণ্য করেনি! চা তো না যেন চিনি গোলা গরম শরবত! অথচ বাজারে চিনির দাম কম নয় মোটেও। গেল সপ্তাহেই কোন একটা ক্যাবল চ্যানেলে চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়ে এক মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলার হাহাকারসর্বস্ব সাক্ষাৎকার দেখে মন ভার হয়ে গিয়েছিল কামালের। তবে তার বিরক্তির কারণ, চায়ে অতিরিক্ত চিনি দেয়া নয়, এই দুর্মূল্যের বাজারে চায়ে খানিকটা বাড়তি চিনি পেলে মন্দ কী? তবে আবুল মিয়া শুধু চিনি বেশি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, গোটা কয়েক পিঁপড়া ফ্রি দেয়াটাও নিজের দায়িত্ব মনে করেছে! মরা পিঁপড়াগুলো যেভাবে সরের মত চায়ের উপর ভাসছে দেখলেই রীতিমত গা গুলাচ্ছে। এ চা খাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় কামালের পক্ষে। আবুল মিয়ার ছানাবড়া চোখের সামনেই কাপের পুরোটা চা মাটিতে ঢেলে দিল কামাল। তারপর তাকে আরও খানিকটা হতভম্ব করে দিয়ে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল! পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে দেখে নিল একবার

এগারোটা বেজে গেছে, অথচ এখনও আসল না নিজাম!

বন্ধু নিজামের অপেক্ষাতেই এখানে বসে আছে কামাল, অবশ্য যদি নিজামকে আদৌ বন্ধু বলা যায়! হাড়কিপটে এই বানচোতের কাছে হাজার তিনেক টাকা পাওনা তার। কিন্তু বহু বলে-কয়েও আজ অবধি তার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা যায়নি। অনেক নাকানিচুবানি খাওয়ানোর পর শেষতক আজ টাকাটা ফেরত দেয়ার জন্য রাজি হয়েছে সে! সকাল নয়টার দিকে আবুল মিয়ার চায়ের দোকানে আসতে বলেছে কামালকে। নয়টা পেরিয়ে বেলা বারোটা বাজতে চলল, অথচ এখনও তার টিকিটুকুরও দেখা মিলল না।

সত্যিই টাকাটা ভীষণ প্রয়োজন এখন কামালের। পকেটের দুমড়ানো একশ' টাকার নোটটাই শেষ সম্বল তার! মেসের ভাড়া বাকি পড়েছে গত দু'মাসের, বাড়িতেও পাঠানো হয়নি ফুটি কড়ি! পাঠাবেই বা কীভাবে? চাকরিই তো নেই তার! বিনা অজুহাতে তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে, একথা তো আর বাড়িতে জানাতে পারে না সে! জানিয়ে অবশ্য লাভও নেই বিশেষ, দুশ্চিন্তা করা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে ওদের! এ বাজারে নতুন একটা চাকরি পাওয়া আর সোনার হরিণ পাওয়ার মধ্যে যে বিশেষ একটা পার্থক্য নেই, এ ব্যাপারটা জানা আছে সবারই। তারপরও কামালের পরিবারের বিশ্বাস, সব পরীক্ষায় তার যে দুর্দান্ত রেজাল্ট, তাতে একগাদা চাকরি সবসময় কামালের হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকে, শুধু বেছে নেবার অপেক্ষায়! এদেরকে বাস্তবতা বোঝাতে যাওয়া আর উলুবনে মুক্তো ছড়ানো একই কথা, তাই বোঝানোর চেষ্টাও কখনও করে না কামাল। পণ্ডশ্রম করে লাভই বা কী?

ঠিক তখনই কামালের মোবাইলে একটা মেসেজ এল। অতি আগ্রহী হয়ে ফোনটা বের করলেও, মেসেজটা দেখে রাগে-ক্ষোভে তার চোখ-মুখ আরও বিকৃত হয়ে গেল! নিজাম পাঠিয়েছে, আজ আসতে পারবে না সে, কামালের সাথে পরে নাকি যোগাযোগ করবে! সাথে-সাথেই নিজামের ফোনে কল ব্যাক করল কামাল। কিন্তু লাভ হলো না কোন। মেসেজ পাঠিয়েই মোবাইলটা বন্ধ করে দিয়েছে হারামিটা! রাগে কাঁপতে-কাঁপতে আবুল মিয়ার চা-সিগারেটের মূল্য পরিশোধ করল কামাল। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল আপন মনে। কোথায় যাবে, কী করবে কিছুই জানা নেই তার। মাথা কাজ করছে না ঠিকমত। নিজামের কাছে পাওনা টাকাটার উপর অনেকখানি নির্ভর করে ছিল ও। দুপুরের খাবারের টাকা পর্যন্ত নেই ওর কাছে এখন, কী করে জোগাড় হবে সেটাও জানা নেই!

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ সামনে দেখতে পেল একটা নেড়ি কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে রাস্তার ধারে। কোন কিছু না ভেবেই ধাঁ করে একটা বিকট লাথি বসিয়ে দিল কামাল কুকুরটার শরীরে! রাগ ঝাড়ার জন্য অবলা প্রাণীর বিকল্প নেই, তা সে সবাক নারীই হোক কিংবা কোন মূক পশুই হোক।

আচমকা বেমক্কা লাথি খেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে গেল কুকুরটার। ভীষণ ভয় পেয়ে চোখ খুলেই দৌড় শুরু করল ওটা। অকুস্থল থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালাতে পারলেই বাঁচে যেন।

কিন্তু বিধি বাম! ঠিক তখনই রাস্তা ধরে একটা দ্রুত গতির বাস যাচ্ছিল। আর কুকুরটা দৌড়ে রাস্তা পেরোতে গিয়ে সরাসরি একেবারে বাসটার নীচে গিয়েই পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই দৈত্যাকৃতির টায়ারগুলোর নীচে একদম চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেল ওটা! বাসটা চলে যাবার পর দেখা গেল রাস্তার সাথে একেবারে মিশে আছে কুকুরটার দেহ।

আশপাশের লোকজন এক পলক ফিরে তাকাল বটে, পরক্ষণেই আবার যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। একটা বেওয়ারিশ নেড়ি কুত্তার মৃত্যুতে কার কী আসে যায়? কিন্তু কামাল হতবিহ্বল হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে বেশ কিছুক্ষণ। পুরো ঘটনাটা ঘটে গেছে এক ঝলকেই। মুহূর্তেই ঝরে গেছে একখানা তাজা প্রাণ, হোক না সেটা একটা কুকুরের! এমন কিছু হতে যাচ্ছে, সেটা কল্পনাতেও ছিল না তার! মনটা আরও বেশি বিষণ্ন হয়ে গেল কামালের। চুপচাপ হাঁটতে লাগল ফুটপাত ধরে। মাথার উপর আগুন ঢালছে সূর্য, শরীর যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে, সেদিকে খেয়ালও নেই তার!

এরই মধ্যে কেটে গেছে বেশ ক'টা দিন। এ ক'দিনে কামালের জীবনে ঘটে গেছে গুটি কয়েক ইতিবাচক পরিবর্তন। নতুন একটা চাকরি পেয়েছে সে, আগের চাকরির চেয়েও ঢের ভাল। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, বেতন আকাশছোঁয়া। শুধু তাই নয়, বসবাসের জন্য তাকে অফিস থেকে একটা বাংলো টাইপের বাড়িও দেয়া হয়েছে! যদিও বাড়িটা শহর থেকে খানিকটা দূরে। তবে এতে কামালের অসুবিধা হয় না মোটেও। কারণ অফিসের গাড়ি প্রতিদিনই তাকে সকালে ঘর থেকে তুলে নেয়, আবার অফিস শেষে বাড়ি পৌঁছে দেয়। গ্রামের বাড়িতে খবর পাঠিয়েছে সে, কয়েকদিনের মধ্যেই মা-বাবা, ভাই-বোনেরা চলে আসবে এখানে। দৈনন্দিন খরচাপাতি সামলানোর জন্য আর কোন ভাবনা নেই তার, মোটা বেতনে সবকিছুই দিব্যি সামলে নেয়া যায়। তবে মানসিকভাবে খুব একটা স্বস্তিতে নেই সে! একা কোথাও হাঁটতে গেলেই মনে হয়, ছায়ার মত কে যেন সবসময় অনুসরণ করে চলেছে তাকে! অবশ্য পিছন ফিরে কখনও কাউকে দেখতে পায়নি সে। তারপরও তার অস্বস্তির কোন ব্যত্যয় ঘটে না! দু'একবার পিছনে হাঁপানোর শব্দও শুনতে পেয়েছে সে! মনে হয়েছে কেউ একজন যেন হাঁটার তালে-তালে মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলছে! অবশ্য শতভাগ নিশ্চিত না হতে পারায়, নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকেই দোষারোপ করেছে সে বারংবার!

সেদিন কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে বেশ রাত করে ফেলল কামাল। এমনিতে সকালে অফিস থাকায় খুব একটা রাত জাগা হয় না তার। তবে পরদিন ছুটি থাকায় নিজেকে বিছানায় নেবার খুব একটা চেষ্টা করেনি সে। হঠাৎ ভীষণ সিগারেটের তেষ্টা পেল তার। অথচ গোটা ঘর খুঁজেও আধখানা সিগারেটের দেখা পাওয়া গেল না! মাঝরাতে সিগারেটের তেষ্টা কতটা ভয়ঙ্কর, সেটা শুধু ধূমপায়ীরা ছাড়া আর কেউ কখনও বুঝতেও পারবে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই সিগারেট আনতে বেরোতে হলো তাকে। মোড়ের মোতালেবের চা দোকানটা সারারাত খোলা থাকে,

এটাই ভরসা।

নিন্দুকেরা অবশ্য বলে গভীর রাতে নেশার সামগ্রী বিক্রি করে মোতালেব। ভীষণ লাভজনক হওয়ায় নেশাখোরদের সওদার জন্যই রাতভর খোলা থাকে তার দুয়ার। তবে এ নিয়ে কোনরকম মাথাব্যথা নেই কামালের। যে-কোন সময় সিগারেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে, এটাই বা কম কী?

সিগারেট নিয়ে ফিরতে বেশিক্ষণ লাগল না কামালের। প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে মূল বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই ভয়ঙ্কর একটা গরগর শব্দে পিলে চমকে উঠল তার! কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা? পরক্ষণেই জবাব মিলল। বাড়ির লনের ঝোপগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিকটদর্শন প্রাণীটা!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কামাল দেখল, সেই মরা কুকুরটা! তবে আকৃতিতে আর স্বাভাবিক কুকুর নেই মোটেও, পুরোদস্তুর বাঘ হয়ে গেছে যেন! গায়ে এখনও বসে আছে বাসের চাকার স্পষ্ট দাগগুলো! গভীর ক্ষতগুলো থেকে পুঁজ ঝরে-ঝরে পড়ছে, অজস্র পোকা কিলবিল করছে। তাকালেই বমি চলে আসছে রীতিমত!

কুকুরটার রক্তলাল দু'চোখে খুনের নেশা! ভয়ঙ্করদর্শন শ্বদন্তগুলো ঝিলিক মারছে ল্যাম্পপোস্টের আলোয়! ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরে পড়ছে একনাগাড়ে।

তীব্র আতঙ্কে হাত-পা অবশ হয়ে এল কামালের। নিজের অজান্তেই এক পা দু'পা করে পেছাতে-পেছাতে একসময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তার। আর পিছানোর কোন সুযোগ নেই!

আচমকা রক্ত হিম করা গর্জন ছেড়ে কামালের দিকে ছুটে এল ওটা!

পরক্ষণেই কামালের অন্তিম আর্তনাদে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা!

আলেয়া

দুপুরের পর থেকেই ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে উঠল কামাল। কাজে-কর্মে কিছুতেই আর মন বসছে না তার। দেহ-মনে অদ্ভুত এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছে সে। আদিম প্রবৃত্তির টান চিরকালই বন্য আর রহস্যময়!

তাই পিয়ন হুমায়ূন মিয়া যখন বড় সাহেবের রুম থেকে একগাদা ফাইল এনে রাখল কামালের টেবিলে, যারপরনাই বিরক্ত হলো সে। কোথায় সে মনে-মনে ভেবে বসে আছে, আজ অফিস থেকে জলদি বেরিয়ে যাবে, আর আজই কি না এই ঝামেলা! বিক্ষুব্ধ মন নিয়েই নীরবে কাজ করতে লাগল কামাল। কিছু করার নেই তার, সে নিরুপায়।

অফিসে নতুন বস এসেছেন গেল সপ্তাহে। এই সাত দিনের মধ্যেই তিনি অধীনস্তদের মনে বেশ সফলভাবেই বস-ভীতি জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। ইতোমধ্যেই সবার জানা হয়ে গেছে, তিনি কাজ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝেন না। তেলবাজদের দু'চোখে দেখতে পারেন না। তিনদিনের মধ্যেই অফিসের শ্রেষ্ঠ তেলবাজ শহিদুলকে বান্দরবান বদলি করে দিয়ে, তিনি সেটা প্রমাণও করেছেন! তাই বড় সাহেবকে ভয় পেলেও, মন থেকে অশ্রদ্ধা করে না কেউই। অফিস টাইমে কাজে গাফিলতি করে আড্ডা দেয়ার কথা কল্পনাতেও আসে না আর কারও! প্রাক্তন আড্ডাবাজরা এ নিয়ে প্রায়ই আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অবশ্য কাজে ফাঁকি না দিয়েও আড্ডাবাজির জন্য যথেষ্টই সময় পায় সবাই। সকালে দু'ঘণ্টা কাজ করার পর বেলা এগারোটায় পত্রিকা পড়ার জন্য আধ ঘণ্টা অফিশিয়াল ছুটির ব্যবস্থা করেছেন বস। সে সময়টায় পত্রিকা পড়া বাদ দিয়ে ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে আলাপচারিতায় মেতে ওঠাই নিত্যদিনকার রুটিন। দেশের খবর না জানলেও চলে, কিন্তু পরচর্চা না করলে পেটের ভাত হজম হয় নাকি? সেই সাথে লাঞ্চ আওয়ারও পনেরো মিনিট বাড়িয়ে দিয়েছেন বস। যেন কাজ করতে-করতে কেউ একঘেয়েমিতে না ভোগে এবং কাজের ভাল মানও অটুট থাকে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাতের কাজ শেষ হয় কামালের। সামনে স্তূপাকৃতিতে জমে থাকা ফাইলগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। যাক, বাবা, বাঁচা গেল। তড়িঘড়ি করে অফিস থেকে বেরিয়েই বাসার উদ্দেশে হাঁটা শুরু করে। যে মেস বাড়িটিতে সে থাকে, সেটা অফিস থেকে খুব একটা দূরের পথ নয়। সব সময় হেঁটেই যাতায়াত করে কামাল। এটুকু পথ রিকশায় চড়ে পাড়ি দেয়ার বিলাসিতা করার সুযোগ নেই তার!

বাসায় এসে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে গোসল সারে কামাল। শীতল পানির স্পর্শে সারাদিনের শ্রান্তি ধুয়ে যায় নিমিষেই। নিজেকে বেশ চাঙা লাগে তার।

আলমারি থেকে লালরঙা একটা ইস্ত্রি করা শার্ট বের করে পরে নেয়। ভিতরের ড্রয়ার থেকে দামি বডি-স্প্রেটা বের করে খানিকটা গায়ে মেখে নেয়। ছোটবোনের স্বামী দুবাই থেকে এটা পাঠিয়েছে তার জন্য। বিশেষ-বিশেষ দিনেই কেবল এটা ব্যবহার করে কামাল। অন্য সময় নিজের কেনা সস্তা পারফিউমেই কাজ চালিয়ে নেয়।

তৈরি হওয়া শেষে বাইরে বেরিয়ে একটা রিকশা নিল ও। শহরের শেষপ্রান্তে যেতে হবে, এতটা পথ হেঁটে যাওয়া সমীচীন হবে না কোনমতেই। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেলে, বিদেশী সুগন্ধি মাখার মাজেজা আর রইল কই?

শীত আসবে-আসবে করছে। তাই বেলা ছয়টাতেই রীতিমত সাঁঝ ঘনিয়ে এল চারদিকে। খুব হালকা করে নেমে এল কুয়াশার মিহি চাদর। কালিগোলা অন্ধকার নামতে খুব একটা দেরি নেই!

শহরের শেষপ্রান্তে ঘুঙুর নদীর তীরে একটা বুড়ো বটগাছ আছে। রিকশা থেকে নেমে সেটার নীচেই দাঁড়াল কামাল। এখানেই লোকটার সঙ্গে দেখা করার কথা তার। ঘড়ি দেখে নিল ও, ছয়টা দশ বাজে। হাতে এখনও মিনিট বিশেক সময় আছে, সাড়ে ছয়টায় আসার কথা লোকটার।

গতকালই প্রথম লোকটার সাথে পরিচয় হয় কামালের। রোজকার অফিস শেষে বাসায় যাবার ফিরতি পথে কামালের পথরোধ করে দাঁড়ায় সে। নিতান্ত অপরিচিত লোক দেখে প্রথমটায় বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়েছিল কামাল। তা ছাড়া অফিসে সারাদিন খাটুনির পর খেজুরে আলাপ করার মানসিকতাও ছিল না তার। তা ছাড়া ইদানীং এদিকটায় বড্ড ডাকাতি-ছিনতাই হচ্ছে, সে শঙ্কাটাও ছিল মনের গভীরে। তবে লোকটার কথার বিষয়বস্তু ধরতে পেরে, ধীরে-ধীরে আগ্রহী হয়ে ওঠে সে। অনুধাবন করে, লোকটা একজন দালাল। এধরনের বেশ কিছু মানুষজনের সাথে আগেও আলাপ হয়েছে তার। তাদের কথাবার্তার ধরন-ধারণ কিংবা কার্যপ্রণালী বিষয়ে বেশ খানিকটা ধারণা আছে তার। এ লাইনে কামালের অভিজ্ঞতা খুব বেশি না হলেও, নিতান্ত দুধের শিশু বলা যাবে না তাকে কোনমতেই!

কী-ই বা করার আছে তার? অকালে বাবার মৃত্যুর পর সংসারের ভারী জোয়ালটা, বড় ছেলে হিসেবে অবধারিতভাবে তার কাঁধেই এসে পড়েছে। চার বোন আর অসহায় মায়ের জীর্ণ সংসারটাকে টানতে গিয়ে নিজের দিকে তাকানোর ফুরসত মেলেনি কখনও। একে-একে দুই বোনকে বিয়ে দিয়েছে, বাকি দুটোরও বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, সামনের শীতে একসাথেই তাদের বিয়ে দেবার ইচ্ছে কামালের।

কিন্তু এরমধ্যে ঘুঙুর নদীতে বহু পানিই গড়িয়ে গেছে। কামালের বয়সও একজায়গায় থেমে থাকেনি। সংসারের দিকে তাকিয়ে নিজের বিয়ের কথা ভাববার অবকাশ পায়নি ও কখনও। কিন্তু শরীরেরও তো একটা দাবি আছে, নাকি? অমন

জোয়ান মর্দ শরীরটা প্রতিনিয়ত তার চাহিদা জানান দিতে ছাড়বে কেন? তাই বাধ্য হয়েই কামালকে মাঝেসাঝে আগুনে জল ঢালতে হয়!

দালাল লোকটা তাকে জানায়, গ্রাম থেকে নতুন একটা মেয়ে এসেছে। নাম আলেয়া। শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু খরচ চালানোর সামর্থ্য নেই দরিদ্র পরিবারের। তাই বাধ্য হয়েই মেয়েটিকে কিছুটা বাড়তি আয়ের আশায়, নিজের শরীরটাকেই বেছে নিতে হয়েছে বিকানোর জন্য! তবে এ পেশার অন্য নারীদের মত সহজলভ্য হবে না সে, মাসে একটার বেশি কাজ করবে না কিছুতেই। যেহেতু আগে কখনও এ কাজ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করার ইচ্ছে নেই, তাই গ্রাহকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবশ্য কাম্য তার। তাই দালাল লোকটার উপর দায়িত্ব বর্তেছে, মোটামুটি সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রঘরের গ্রাহক জোগাড় করার। আলতু-ফালতু মানুষের সাথে শুতে আপত্তি আছে আলেয়ার।

কামাল যখন একমনে এসব ভাবছিল, ঠিক তখনই আঁধার ফুঁড়ে উদয় হলো লোকটা। ঘড়িতে তখন কাঁটায়-কাঁটায় ছয়টা তিরিশ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের সাথে লোকটার কালো চাদর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই একেবারে কাছে না আসা পর্যন্ত লোকটাকে দেখতেই পায়নি কামাল। হঠাৎ দেখতে পেয়ে খানিকটা চমকে উঠল। গ্রাম্য মহিলাদের মত মাথায়ও চাদর জড়িয়ে নিয়েছে লোকটা। যেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে নাক মুখ বাঁচাতে চায়! অথচ এতটা ঠাণ্ডা পড়েনি মোটেই! পাতলা একখানা শার্ট গায়ে দিয়েও কামালের এতটুকুও শীত লাগছে না!

লোকটা ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'চলেন।' বলেই সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কামালও বিনাবাক্যব্যয়ে লোকটার পিছু নিল। গতকাল একাধিকবার লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব পায়নি কামাল। নাম বলেনি লোকটা! কেন বলেনি কে জানে! পেশাগত গোপনীয়তা? কী জানি, বাপু, তাই হবে হয়তো! অবশ্য বুক ফুলিয়ে পরিচয় দেবার মত কোন পেশা এটা নয়, একথা কামাল ভালই বোঝে।

লোকটা কামালকে একটা দোতলা বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। বাড়িটা বেশ পুরানো, একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ দশা যাকে বলে। এখানে-ওখানে পলেস্তারা খসে পড়ে দেখতে একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা। দেখে মনে হয়, অতিশয় বৃদ্ধ কোন লোক, কোনমতে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে! যে-কোন সময় ভেঙে পড়ার অপেক্ষায়। ভিতরের আসবাবপত্রগুলোরও নিতান্ত নড়বড়ে অবস্থা। পুরো ঘর জুড়ে ধুলোর আস্তরণ। এখানে-সেখানে স্বাধীনভাবে ঝুলছে মাকড়সার ঝুল!

এসব দেখে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল কামাল। দালাল লোকটা এত জায়গা থাকতে ওকে এই হতচ্ছাড়া বাড়িতে আনতে গেল কেন? শহরের কোন আবাসিক হোটেলে গেলেই কি ভাল হত না? মাত্র তো এক ঘণ্টার ব্যাপার!

ঠিক তখনই সিঁড়ির দিকে চোখ পড়ল তার। সাথে-সাথে জায়গায় জমে একেবারে বরফ হয়ে গেল ও! সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে এক অপরূপা নারী। এমন সুন্দরী মেয়ে সে এপর্যন্ত দেখা তো দূরে থাক, কোনদিন কল্পনাতেও আনতে

পারেনি! মানুষ এতটা সুন্দর হয় কী করে?

কাউকে বলে দিতে হলো না, কামাল নিজেই বুঝল, এই মেয়ের নামই, আলেয়া!

চোখে একরাশ কৃতজ্ঞতা নিয়ে দালাল লোকটার দিকে তাকাল কামাল। তাকিয়েই রীতিমত চমকে উঠল! লোকটার চোখদুটো টকটকে লাল। দু'চোখে খেলা করছে কীসের যেন অশুভ ছায়া। নেশা করেছে নাকি লোকটা? এই ভর সন্ধ্যা-বেলাতেই গাঁজার পুরিয়ায় দম দিয়ে এসেছে? নাহ, এরা আর মানুষ হলো না!

কামালের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'এক ঘণ্টা পর আসব আমি।' কামালও মাথা নেড়ে সায় জানাল। লোকটার সাথে এক ঘণ্টার ব্যাপারেই কথা হয়েছে তার। পরক্ষণেই কামালকে সাথে আসার জন্য ইশারা করে, সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে শুরু করল আলেয়া। কালক্ষেপণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই কামালের, তাই চটজলদি আলেয়ার পিছু নিল সে। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠতেই দালাল লোকটার ডাকে তার দিকে ফিরে তাকাল ওরা। আলেয়াকে উদ্দেশ্য করে লোকটা বলল, 'আমার ভাগের কথা মনে রেখো, আলেয়া, পুরোটাই একা সাবাড় করে দিয়ো না যেন!'

কীসের ভাগ? ভাবল কামাল। দালালির কমিশন? তা-ই হবে হয়তো।

কামালকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে ক্যানক্যানে গলায় জবাব দিল আলেয়া, 'তুমি তোমার ভাগ পাবে অবশ্যই। তবে আমার কাজের মাঝখানে কোন ব্যাঘাত যেন না ঘটে।'

পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল কামাল! অমন সুন্দরী একটা মেয়ের কণ্ঠ এতটা বিশ্রী হয় কী করে? তবে এ নিয়ে বেশি একটা মাথা ঘামাল না সে। এখানে সে মেয়েটার সাথে গল্প করতে আসেনি, বিশ্রী গলার আওয়াজে কিছু যায় আসে না তার।

দোতলার যে ঘরটায় আলেয়া কামালকে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আকারে বিশাল। অনেকটা হল রুমের মত। অবাক করা ব্যাপার, গোটা ঘরটায় কোন আসবাবপত্র নেই! শুধু ঘরের মাঝখানে একটা নকশাকাটা পুরানো আমলের বিশাল খাট! যেন সুবিশাল কোন ময়দানের মাঝখানে মঞ্চ সাজানো হয়েছে, যেখানে খানিক বাদেই মঞ্চায়ন ঘটবে এক আদিম নাটকের! খাটের উপরে ছাদ থেকে একখানা কম পাওয়ারের নগ্ন বাতি ঝুলছে। সে আলোয় ঘরের অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটছে না মোটেও। কোনার দিকগুলোতে চাপ-চাপ অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কামালের!

তবে শারীরিক উত্তেজনায় সে ভয় দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আলেয়াকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় গেল ও। দ্রুত বিবস্ত্র হতে লাগল দুই যুবক-যুবতী! অচিরেই মেতে উঠবে প্রাচীন খেলায়!

কামালের বুকে শুয়ে লাজুক স্বরে আলেয়া বলল, 'বাতিটা নিভিয়ে দিই?'

সুইচবোর্ড দরজার পাশে, তাই বাতি নিভাতে বিছানা ছাড়তে গেল কামাল।

কিন্তু আলেয়া বাধা দিল তাকে। আরও জোর করে জড়িয়ে ধরল কামালকে। কামালের খোলা পিঠে বসে যেতে লাগল তার ধারাল নখ। বিছানায় শুয়েই সুইচের দিকে হাত বাড়াল আলেয়া। তারপর কামালের বিস্ফারিত চোখের সামনে হাতটা ক্রমাগত বড় হতে লাগল। ধীরে-ধীরে সেটা আরও বড় হলো! তারপর একসময় নাগাল পেয়ে গেল সুইচবোর্ডের! দপ করে নিভে গেল মাথার উপর জ্বলে থাকা বাতিটা। আর কিছু দেখার সুযোগ নেই কামালের।

প্রেতঘর

বন্ধু মহলে একটা কথা চাউর হয়ে গেছে যে, ভূত-প্রেতের কাহিনির প্রতি আমার বেজায় আগ্রহ। কেউ ভাল কোন বাস্তব কাহিনি শোনাতে পারলে সিঙ্গারা-সমুচার সাথে দু'-এক কাপ চা খাওয়াতেও কার্পণ্য করি না কখনও। কাহিনি যত বেশি জমজমাট, ট্রিটের পরিমাণও ঠিক ততটাই বেড়ে যায়।

তাই বন্ধুত্বের খাতিরেই হোক কিংবা ট্রিটের লোভেই হোক, বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে কিছু অতিপ্রাকৃত কাহিনি শোনায়। বেশিরভাগ সময়ই অবশ্য ছাইপাঁশ গেলানোর চেষ্টা করে, হাড় কাঁপানো ভয়ের কাহিনি খুব একটা পাই না আজকাল। শুভ্র সফেদ কাপড়ে জড়ানো বিশালদেহী ছায়ামূর্তির কথা, বাজার থেকে মাছ নিয়ে ফেরার সময় নাকি সুরে মাছ চাওয়ার কথা, কিংবা সেই মাছ ভাজার পর রান্নাঘরের জানালা দিয়ে কারও হাত বাড়িয়ে দেবার কথা শুনে ভয় লাগবেই বা কেমন করে? কাঁহাতক আর এসব মান্ধাতা আমলের ভূতদের কেচ্ছা শুনে সন্তুষ্ট থাকতে হবে!

এসব গল্প শুনতে-শুনতে মাঝে-মাঝেই আপনার ধারণা হতে পারে, মাছ খাওয়া ছাড়া বুঝি ভূতদের আর কোন কাজকর্ম নেই! কিংবা এই যে দেশ থেকে টেংরা, পুঁটি, পাবদা, চিতল, আড়, বোয়াল, শিং, মাগুর এসব দেশি মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এর পিছনে হয়তো ভূতেরাই দায়ী! তবে আদতে ঘটনা কিন্তু যেমন ভাবছেন তেমন নয়!

যা হোক, মোদ্দা কথা হলো, ভয় পাওয়ার জন্য প্রাণটা আমার রীতিমত আইঢাই করছিল! মাঝরাত্তিরে কানে হেডফোন গুঁজে, একা ঘরে লাইট নিভিয়ে হরর মুভি দেখলে, কিছুটা ভয় আমি ঠিকই পাই। কিন্তু এসব কৃত্রিম জিনিসে কি মন ভরে? আমার চাই রক্ত হিম করা বাস্তব অভিজ্ঞতা। সেই সাথে মুফতে দু'-একটা অশরীরীর দেখা যদি পাওয়া যায়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা!

অবশেষে আমার নিখাদ আকুতি দেখে এক সহৃদয় বন্ধুর খানিকটা দয়া হলো। সে জানাল, আমি চাইলে সে আমার সাথে অপ্রাকৃত সত্তাদের দেখা করিয়ে দিতে পারে এবং এতে যে আমি নির্ঘাত ভয় পাব, তাতেও তার মনে সন্দেহ নেই! তবে এজন্য আমাকে যেতে হবে তাদের বাগানবাড়িতে। যেহেতু অনেক দূরের পথ, তাই যাতায়াত বাবদ আমার বেশ কিছু অর্থকড়ি খরচ হবে, বিষয়টা যেন আমি মাথায় রাখি।

তৎক্ষণাৎ তাকে জানিয়ে দিলাম, কুছ পরোয়া নেই! এ জীবনে কত শত

ফালতু জিনিস দেখতে গিয়ে আক্কেল সেলামী দিলাম, আর এত শখের ভূত দেখতে গিয়ে বুঝি কয়টা পয়সা খরচ করতে পারব না! সাফ বলে দিলাম, খরচের চিন্তা না করে সে যেন যাবার আয়োজন করে। যে-কোন সময় রওয়ানা দেবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত আমি।

এর দু'দিনের মাথায়ই সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম আমি। শাস্ত্রে আছে, শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। আমার বন্ধুটি অবশ্য জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় আমার সাথে যেতে পারল না। নাকি ব্যাটা ভয়ে নিজেই পিঠটান দিয়েছে কে জানে! তবে এতে কোন সমস্যা নেই। বাড়ির কেয়ারটেকারকে সব বলা আছে, থাকা-খাওয়ার কোন রকম অসুবিধা হবে না আমার।

দিনের বেলায় গোটা বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখলাম। বেশ পুরানো, তবে সুন্দর। বনেদী ডিজাইনের একখানা দ্বিতল ভবন। সম্ভবত বন্ধুটির পরদাদার আমলে তৈরি।

বাড়ির সামনের দিকটার নিয়মিত যত্নআত্তি করা হলেও, পিছন দিকটায় অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। জায়গায়-জায়গায় পলস্তারা খসে গিয়ে কঙ্কাল বেরিয়ে রয়েছে। আগাছার দঙ্গলের কারণে হাঁটা দায়, পরিষ্কারের বালাই নেই। বেশ বোঝা যায়, বাড়ির এদিকটায় তেমন একটা আসা-যাওয়া নেই কারও।

বাড়ির কেয়ারটেকার তোরাব আলীর বয়স হয়েছে, চুল দাড়ি সবই সাদা। তিনকুলে কেউ না থাকায়, এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে আছেন বহু বছর ধরে। চোখে ভাল দেখতে পান না, সন্ধ্যার পর প্রায় অন্ধই বলা চলে। কেবলমাত্র উপস্থিতি ছাড়া, তাঁর কাছ থেকে আর তেমন কোন কাজ বোধহয় আশাও করেন না বাড়ির মালিক!

দোতলা বাড়ির নীচতলার একখানা কামরায় থাকেন তিনি। আমার থাকার ব্যবস্থাও নীচতলায় তাঁর পাশের কামরাতেই করা হয়েছে। উপরতলায় রাতে থাকা নিষিদ্ধ! এই নিষেধাজ্ঞার কারণটাও তোরাব আলীর কাছ থেকেই সবিস্তারে জানতে পারলাম আমি। দোতলার সবচেয়ে কোনার ঘরটায় এককালে প্রেতসাধনা করতেন আমার বন্ধুটির দাদা। সময়ে-অসময়ে সেখান থেকে ভুতুড়ে সব চিৎকার শোনা যেত! বড় ভয়ঙ্কর সে আওয়াজ, শুনলেই পিলে চমকে উঠত। তারপর হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে যান তিনি! পুরোপুরি গায়েব হয়ে যান, কোন খোঁজই আর পাওয়া যায়নি তাঁর!

ভয় পেয়ে ঘরটাতে মস্ত বড় একখানা তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁর ছেলে, অর্থাৎ আমার বন্ধুটির বাবা। শুধু তা-ই নয়, দোতলায় যাওয়াও পরিবারের সবার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রেতসাধনা দু'চোখে দেখতে পারেন না তিনি। অবশ্য এরপর উপদ্রব বন্ধ হয়নি মোটেও! এখনও রাতের বেলা ওই ঘরটা থেকে ভেসে আসে রক্ত হিম করা অপার্থিব চিৎকার! কখনও-কখনও ভিতর থেকে দরজার উপর করাঘাতের আওয়াজ!

তোরাব আলীকে জানালাম, আজ রাতেই সেখানে যেতে চাই আমি। শুনে অবশ্য খুব একটা অবাক হলেন না তিনি, আমার আসার কারণটা আগে থেকেই

জানা ছিল কি না!

তবে তাঁর মুখ দেখে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, ব্যাপারটা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন মোটেও। তবে আমাকে কোন বাধাও অবশ্য দেয়ার চেষ্টা করলেন না তিনি! কোন মাথামোটা ছাগল যদি নিজেই নিজের কবর খুঁড়তে অস্থির হয়ে যায়, তা হলে তাঁর কী-ই বা করার আছে? রাতের আহার সমাপ্ত হবার পর আমার হাতে একখানা পুরানো চাবি ধরিয়ে দিয়ে শুতে চলে গেলেন তিনি। বুঝে নিলাম, এটা দোতলার সেই বন্ধ ঘরটারই চাবি। ভিতরে-ভিতরে বেশ খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম। যাক, এতদিনে তা হলে অশরীরী কারও দেখা পেতে চলেছি আমি!

আপন মনে উপরে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছি, ঠিক তখনই শুনতে পেলাম দোতলার বারান্দায় কে যেন পায়চারী করছে! কে? তোরাব আলী কোন কারণে দোতলায় গেলেন নাকি?

ছুটে গেলাম পাশের কামরায়। দেখতে পেলাম তোরাব আলী দিব্যি খাটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। তা হলে উপরে হেঁটে বেড়াচ্ছে কোন্ ব্যাটা? চোর-টোর এল না তো আবার!

পা টিপে-টিপে উঠে এলাম দোতলার বারান্দায়। সিঁড়ির গোড়ায় নিজেকে লুকিয়ে শুধু মাথা বের করে উঁকি দিলাম। কোথাও কেউ নেই, পুরো বারান্দা ফাঁকা!

বাইরে মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, তার ঝলক বারান্দাতেও টের পাওয়া গেল। সে বাতাসে কেমন যেন একটা অপার্থিব গন্ধ ভেসে এল! সত্যিই কি? নাকি সবটাই আমার মনের ভুল?

ধীরে-ধীরে কোনার দিকের বন্ধ কামরাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তালার ফাকরে চাবিটা ঢোকাতেই মনে হলো যেন নিজ থেকেই ঘুরতে শুরু করল ওটা! বহুদিনের অব্যবহৃত তালা অথচ খুলতে একটুও কষ্ট হলো না আমার! মৃদু ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে দু'দিকে সরে গেল দরজার পাল্লা দুটো। কেমন একটা আঁষটে গন্ধ ভক করে এসে লাগল নাকে। নিমিষেই গা গুলিয়ে উঠল আমার। কীসের গন্ধ ওটা? বহুকাল আবদ্ধ থেকে এমন গন্ধ হয়ে গেছে নাকি?

ভিতরে ঢুকে হাতের টর্চটা জ্বাললাম। তোরাব আলী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, দোতলায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। যতবারই সংযোগ দেয়া হয়েছে, কীভাবে যেন সেটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কেটে যায়! তাই অনেকবার চেষ্টা করার পর অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়া হয়েছে। টর্চের আলো এদিক-সেদিক ফেলে যখনই আমি ঘরটা পরখ করতে যাব, অমনি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় রাখা একখানা মোমবাতি আপনাআপনি দপ করে জ্বলে উঠল!

প্রচণ্ড ভয় পেলাম আমি। শ্বাস বন্ধ করে নিজের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, নড়বার সাহসটুকুও নেই তখন আমার! অপেক্ষায় রইলাম অতিপ্রাকৃত কোন সত্তার সাথে সাক্ষাতের!

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও যখন নতুন কোন কিছুই আর ঘটল না, ধীরে-ধীরে খানিকটা সাহস ফিরে পেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে মোমবাতির আলোয় ঘরটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। মাথায় ভাবনা চলছে, কে জ্বালল মোমবাতিটা?

ঘরের মেঝে এবং সবক'টা দেয়ালজুড়ে নানারকম নকশা আর বিচিত্র আঁকিবুঁকির ছড়াছড়ি! যেন দিনের পর দিন এঘরে বসে ষোলোঘুঁটি খেলেছে কোন কিশোর ছেলে! একপাশের দেয়ালজুড়ে বিশাল একটা আয়না ঝোলানো। তার ফ্রেমে দুর্বোধ্য সব প্রাচীন নকশা কাটা! কে মুখ দেখত এই আয়নায়?

ঘরের কোনার দিকটায় মাঝারি আকৃতির একখানা ভয়ঙ্করদর্শন মূর্তি। এই আধো অন্ধকারে সেটা মানুষ নাকি অন্য কোন প্রাণীর প্রতিমা, সেটা স্পষ্ট ঠাহর করা গেল না। মূর্তিটার সামনেই একটা গোল বেদী মতন জায়গা। এখানেই যে নানা উপাচার সাজিয়ে নৈবেদ্য নিবেদন করা হত অপদেবতাকে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চট করে ইতি-উতি মুখ তুলে চাইলাম। চোখ পড়ল দেয়ালে নিশ্চুপ বসে থাকা একটা টিকটিকির উপর। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওটা। টিকটিকিই তো, নাকি তক্ষক ওটা? দৃষ্টি দিয়েই আমার রক্ত শুষে নিচ্ছে না তো ব্যাটা?!

পরক্ষণে আমার পিছনের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই, জায়গায় জমে একেবারে বরফ হয়ে গেলাম। ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার। বহুকষ্টে নিজের উপর অনেকখানি জোর খাটিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলাম পিছন দিকে। কেউ নেই সেখানে! শুধু হাট করে খোলা শূন্য দরজাটা আমার দিকে তাকিয়ে উপহাস করছে যেন!

আচমকা দেয়ালের আয়নাটার দিকে চোখ পড়তেই দু'চোখ বিস্ফারিত হবার উপক্রম হলো আমার! সেটা আর খালি নেই এখন, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন বৃদ্ধ লোক! কেউ বলে দেয়নি আমাকে, তবুও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি, ইনিই আমার বন্ধুটির সেই হারিয়ে যাওয়া দাদা।

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করলেন, যেন আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার! সে আহ্বানে ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না। তবুও তীব্র আতঙ্কের স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে! বুকের খাঁচায় ধড়াস করে লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। যেন পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চাইছে!

আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস রইল না আমার। পড়িমরি করে ছুট লাগালাম। বেরোতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে একটা রাম হোঁচট খেলাম, চিৎপটাং হয়ে পড়লাম মেঝেতে।

সে রাতে কীভাবে যে আমি নীচতলায় নিজের রুমে এসেছিলাম, সেটা নিজেও জানি না! পরদিন সকালে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরলাম। সে রাতে যা-যা ঘটেছে, তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা মোটেও নেই আমার কাছে। শুধু জানি, প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম আমি। সেই সাথে অশরীরীদের সাথে সাক্ষাতের খায়েশও মিটে গেছে চিরতরে!

এরপর থেকে কেউ আমাকে ভূত-প্রেতের গল্প শোনাতে এলে খুশি হবার বদলে প্রচণ্ড বিরক্ত হই আমি। কী দরকার, বাপু, ওদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার?

আমানত

পা টেনে-টেনে কিছুটা খুঁড়িয়ে পথ চলছে মজিদ মিয়া। তার বাড়ি পৌঁছতে এখনও ঢের পথ বাকি। মাঝখানে পাড়ি দিতে হবে অন্তত গোটা চারেক চকের মাঠ। এদিকে সাঁঝ পেরিয়ে রাতের আঁধার গাঢ় হতে চলেছে। কানাভাঙা থালার মত একখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। জোছনার নেশা ধরানো ঘোলা আলোয়, চেনা পথ পাড়ি দিতে মোটেও কষ্ট হচ্ছে না মজিদ মিয়ার! শুধু ডান পায়ের ব্যথাটা বেজায় ভোগাচ্ছে তাকে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

নেহায়েত বাবা-মায়ের দোয়া ছিল বলে বেঁচে ফিরেছে সে আজ, না হয় আর দেখতে হত না! অতবড় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরত আসা কি চাট্টিখানি কথা? ক'জনের ভাগ্য এমন ভাল হয় শুনি? বিড়বিড় করে আরও একবার নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল মজিদ মিয়া।

মনোহরপুর বাজার থেকে বাসে ওঠার সময় ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি, একটু পর তাদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে! জানালার পাশে একখানা সিট বাগিয়ে, বেশ আয়েশ করেই পান চিবুচ্ছিল মজিদ মিয়া। রাস্তায় খাবে বলে চানাবুটওয়ালার কাছ থেকে দু'টাকার চীনাবাদামও কিনে নিয়েছিল সে। সেগুলো অবশ্য পরে আর খাওয়া হয়নি তার। পথের ধুলোয় রক্তে মাখামাখি হয়ে কোথায় সেগুলো এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে কে জানে! মানুষেরই যেখানে খোঁজ মেলা দায়, সেখানে বাদামের খবর আবার কে রাখতে যাবে! বাস ছাড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তার পাশের সিটটা খালিই ছিল। তার পরনের ময়লা লুঙ্গি আর ধূলিমলিন শার্টের জন্যই হোক কিংবা ঘামে ভেজা শরীরের দুর্গন্ধের জন্যই হোক, অফিস ফেরত সাহেবরা কেউ তার পাশে বসতে আগ্রহী হয়নি। এসব দৃশ্য অবশ্য মজিদের নিতান্তই পরিচিত! প্রতি বৃহস্পতিবার হাট থেকে ফেরার পথে নিত্যই এসব দেখে অভ্যস্ত সে! তাই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে এক মনে পাটনা থেকে আনা রাম ছাগলগুলোর মত শব্দ করে পান চিবিয়ে যাচ্ছিল সে। ড্রাইভার বাস ছেড়ে দেয়ার পরমুহূর্তেই মজিদ তার পাশের সিটের সহযাত্রীটির দেখা পেল। চলন্ত বাসে দৌড়ে এসে উঠতে গিয়ে ভদ্রলোক যে কসরৎ দেখালেন, এ থেকে সহজেই বোঝা গেল যে, একাজ তাঁকে প্রায়শই করতে হয়! শুধু তা-ই নয়, চলন্ত বাসে ওঠার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে একজন ওস্তাদ লোক!

বাসের হেলপারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি এসে নিঃসংকোচে মজিদ মিয়ার পাশের সিট দখল করলেন। মজিদ তাঁর দিকে ফিরতেই, ভুবন ভুলানো

এক হাসি দিয়ে সহজেই মজিদের মন জয় করে নিলেন। একটা টিফিন ক্যারিয়ার বগলদাবা করে রেখেছেন, সম্ভবত এটাতে করেই তিনি অফিসে দুপুরের খাবার নিয়ে যান। ভদ্রলোক বেশ সদালাপী মানুষ, তাই অল্পক্ষণেই মজিদের সাথে আলাপ জমে উঠল তাঁর। নিজেই বকে চললেন অনর্গল, তাই গণ্ডমূর্খ মজিদ মিয়ার সাথে আলাপে কোন সমস্যাই হলো না তাঁর! মজিদও মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলল, যেন আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে সম্যক ধারণা রাখে! রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, মহাশূন্য থেকে অশ্বডিম্ব, সবই উঠে এল একে-একে তাদের আলোচনার বিষয় হিসেবে। অল্পক্ষণেই ভদ্রলোকের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা হয়ে গেল মজিদ মিয়ার। ভদ্রলোকের নাম অমিয় ঘোষ। মনোহরপুর বাজারে একখানা বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। এখনও বিয়ে থা করেননি, তাই মা-বাবার সাথে থাকেন অশোকতলা গঞ্জে। অশোকতলা গঞ্জেই এই বাসের সর্বশেষ স্টপেজ।

ভাদ্রমাসের তাল পাকা গরমে সবাই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ভাঙাচোরা রাস্তায়, তার চেয়েও বেশি জীর্ণ বাসের শম্বুক গতির চলনের কারণে, বাইরের হাওয়াও তেমন একটা ঢুকছিল না বাসের ভিতরে। তাই মজিদ মিয়া তার পাশের জানালাটা আরও খানিকটা খুলে দিতে চাইল, যেন বাতাস চলাচলের পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়। তবে বহুদিন পুরোপুরি না খোলায়, জানালার কাচে পুরু ধুলোর আস্তরণ জমে গেছে। তাই শক্ত হয়ে আটকে আছে কাচের পাল্লাদুটো। এক হাতের চেষ্টায় কিছুতেই সেটা খুলতে পারল না সে। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই হাতের বাদামের ঠোঙাটা পাশের ভদ্রলোককে ধরতে বলল মজিদ মিয়া। অমিয় ঘোষ সেটা হাত বাড়িয়ে ধরতেই সিটের উপর রীতিমত দাঁড়িয়ে পড়ল মজিদ মিয়া। তার পেটা শরীরের প্রচণ্ড শক্তির কাছে অবশেষে হার মানতে বাধ্য হলো জানালার কাচ! ঝটকা দিয়ে পুরোটা জানালা খুলে গেল। সেই সাথে একঝলক বাতাস এসে জুড়িয়ে দিল সবার দেহ-মন। আরাম করে আবারও সিটে গা এলিয়ে বসে পড়ল মজিদ মিয়া। দু'জনের মুখই তখন প্রশান্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে।

ঠিক তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটল। বাসটা তখন সবেমাত্র মধুখালির লোহার ব্রিজটা পেরিয়ে এসেছে। এদিকটায় রাস্তাটা আরও বেশি এবড়ো-খেবড়ো। রাস্তার দু'পাশে অপ্রশস্ত খাল। এই খালের পানি দিয়েই নিজেদের জমিতে সেচ দেয় এলাকার কৃষকেরা। এখানে এসেই বাসটা হঠাৎ ব্রেকফেল করল! হেলপার থেকে সদ্য ড্রাইভার হিসেবে নাম লেখানো মিজানের পক্ষে আর কিছুতেই সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলো না। দানবের মত গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে এদিক-ওদিক লাগামছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত মাথা দোলাতে লাগল বাসটা। তারপর ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার একপাশের খালে গিয়ে পড়ল। নিমিষেই অনেকখানি তলিয়ে গেল পানিতে। ছাদটা পুরোপুরি ডুবে যাবার পর, শুধু চাকাগুলো ভেসে রইল পানির উপর। সেগুলো তখনও ভয়ানক গতিতে ঘুরেই যাচ্ছিল। নিজের চোখের সামনেই চেনাজানা পৃথিবীটাকে উল্টে যেতে দেখেছিল মজিদ মিয়া। এরপর আর কিছু মনে নেই তার। চেতনা ফিরে পেয়ে নিজেকে পানিতে ডুবন্ত

অবস্থায় আবিষ্কার করল সে। কে যেন তার পা ধরে টেনে বাইরে বের করার চেষ্টা করছে, তবে মজিদের শার্ট কিছু একটাতে আটকে থাকায় বের করতে পারছে না কিছুতেই! এদিকে বাতাসের জন্য মজিদের ফুসফুস রীতিমত আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিয়েছে। আর কিছুক্ষণ পানির নীচে থাকলেই, এমনিতেই মরে যেত মজিদ মিয়া। তাই বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল সে। কীসে তার শার্ট আটকে আছে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার দিকে নজর দিল। ফিরে তাকিয়েই যা দেখল, তাতে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তার।

তার শার্ট খামচে ধরে আছেন অমিয় ঘোষ! তবে ভদ্রলোক বেঁচে নেই আর। পাশের সিটের ভাঙা লোহার ডাণ্ডাটা তাঁর দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। পেট দিয়ে ঢুকে, পিঠ ছেদ করে বেরিয়ে আছে, কোঁচ দিয়ে শিকার করা মাছের মতন! ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে লালচে করে দিয়েছে চারপাশের পানি।

অমিয় ঘোষের চেহারার অবস্থা আরও বীভৎস! কীসের আঘাতে অমন হয়েছে, কে জানে! ভারী কিছুর চাপ খেয়ে পুরো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে নাক-মুখ! চেনার উপায় নেই আর একদম। ডান চোখটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেকটা। সুতোর মত চিকন কিছু একটাতে ভর করে ঝুলছে এখনও, একেবারে খসে পড়েনি! পানিতে এদিক-ওদিক দুলছে ওটা!

দ্বিতীয়বার তাঁর দিকে তাকানোর সাহস হলো না মজিদ মিয়ার। এক ঝটকায় অমিয় ঘোষের মুঠো থেকে শার্টটা ছাড়িয়ে নিল সে। এরপর আবারও জ্ঞান হারাল! পরক্ষণেই তাকে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে এল উদ্ধারকারী লোকেরা। রাস্তার পাশের ঘাসে চিত করে শুইয়ে দিল। স্বাভাবিকভাবে দম নিচ্ছিল সে, তাই লোকজন আশ্বস্ত হলো, বেঁচে যাবে লোকটা!

প্রায় মিনিট বিশেক পর জ্ঞান ফিরে পেল মজিদ মিয়া। যাত্রীদের উদ্ধারকাজ তখনও চলছে। অবশ্য এখন যাদের বের করে আনা হচ্ছে, তাদের কেউ আর জীবিত নেই, সবাই লাশ হয়ে গেছে। মজিদের আশপাশে ঘাসের উপর শুয়ে আছে অসংখ্য মৃত মানুষ। যারা মরেনি, তাদের পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে। জমায়েত হওয়া মানুষের মুখে কানাঘুষা শুনতে পেল মজিদ, পুলিশ আসছে। মুহূর্তেই পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল মজিদ মিয়া। পুলিশি ঝামেলায় পড়তে চায় না সে কিছুতেই! তাই পুলিশ আসার আগে যে করেই হোক, মানে-মানে কেটে পড়তে চায় সে। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা! এ প্রবাদ যে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি, সেটা মজিদ মিয়ার চেয়ে বেশি আর কে জানে?

গতবছরের আশ্বিন মাসে রমিজের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। মজিদ মিয়াসহ গ্রামের ছেলে-বুড়োরা মিলে জনা তিনেক ডাকাতকে পাকড়াও করে ফেলল বেড় দিয়ে। এরপর যখন পুলিশ এল, শহর পরিচিত বলে, মজিদ মিয়াকেই যেতে হলো পুলিশের সাথে থানায়। এরপর থানার বড়বাবুর নানারকম উদ্ভট প্রশ্নবাণে রীতিমত নাজেহাল হয়েছে সে! কিছু মাল পানি খেয়ে তিনি মজিদ মিয়ার সামনেই ডাকাতদের ছেড়ে দিলেন! এর কারণ জানতে চাইলে, বড়বাবু এমন প্যাঁচ খেললেন যে, পারলে মজিদকেই হাজতে ঢুকিয়ে দেন আরকী! মজিদ সেদিন

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে, কোনমতে থানা থেকে পালিয়ে এসেছিল। সেই যে পুলিশের প্রতি একটা প্রকট ভয় মজিদের মনের গহীনে দানা বেঁধেছে, ত বোধকরি কস্মিনকালেও আর কাটবার নয়!

তাই পুলিশ আসার কথা শুনেই মজিদ মিয়া পালাবার প্রয়াস পেল। উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক লাশের মুখ দেখার ভান করতে-করতে একসময় সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। এরপর ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে সেই যে ছুট লাগিয়েছে তার গাঁয়ের পথে, আর একবারও পিছনে ফিরে তাকানোর সাহস করেনি সে! হেঁটে-হেঁটে মাইল দুয়েক পার হবার পর, দূরে পুলিশের সাইরেন শুনতে পেয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুকে একদলা থুতু ছিটিয়েছে। যাক, বাবা, বাঁচা গেল!

সেই থেকে টানা চলার উপরই আছে মজিদ মিয়া। আহত পা-টা ব্যথায় টনটন করলেও কোথাও থামেনি সে। একেবারে বাড়িতে গিয়েই বিশ্রাম নেবে।

খেতের মাঝের আইলগুলো দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। দু'পাশে ধানের খেত। ফসলগুলো সবে পাকতে শুরু করেছে, বাতাসে তারই মিষ্টি গন্ধ ভাসছে জোছনার আলো ভেঙে-ভেঙে পড়ছে গাছগুলোর মাথায়। এখানে-ওখানে গাঢ় ছায়া। অনেক দূরে-দূরে বাড়িগুলোতে ছটা-ছটা আলোর মতই টিমটিম করে জ্বলছে হয়তো কোন কুপি কিংবা হারিকেন। দূর থেকে দেখলে জোনাকির আলো ভেবে ভুল হয়! এ গ্রামে পল্লীবিদ্যুৎ রয়েছে। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টাই লোডশেডিং চলতে থাকে! শহরের মানুষদের আলোতে রাখতে বেশির ভাগ সময় অন্ধকারেই থাকতে হয় গ্রামের মানুষদেরকে! তাই গ্রামবাসীকে এখনও প্রাচীন পিদিমের উপরই নির্ভর করতে হয় আঁধারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বেলায়।

অদূরেই একটা আম গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে ডেকে উঠল একটা রাতজাগা পাখি। বড় ভয়ঙ্কর সে ডাক। অতি সাহসীদেরও বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয় নিমিষেই। গ্রামের লোকেরা ডাকে—যমকুলি! বলা হয়, এ পাখি মৃত্যুর খবর নিয়ে আসে! এর ডাক শোনার কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর খবর শোনা অবশ্যম্ভাবী!

আমতলা পার হতে গিয়ে অকারণেই বুকটা কেঁপে উঠল মজিদ মিয়ার। জলদি পা চালাল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জায়গাটা অতিক্রম করতে চায়। পরক্ষণেই পিছনে একটা হাঁক শুনতে পেয়ে চমকে উঠল মজিদ মিয়া। ফিরে তাকাল। দেখল, চকের পথ ধরে কে যেন তারই মত পা টেনে-টেনে আসছে! মজিদ মিয়া তাকাতেই হাত নাড়ল লোকটা, ইশারায় থামতে বলল। মজিদ মিয়া দাঁড়াল। এই পথে রাতের বেলায় একজন সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না। কথা বলতে-বলতে দু'জনে হাঁটলে, চোখের পলকে ফুরিয়ে যাবে পথ।

কিন্তু কে লোকটা? মুন্সী বাড়ির মুন্সী চাচা? চাচা অবশ্য মাঝেসাঝে হাটে যান। নাকি মাঝি বাড়ির তোরাব? রাত-বিরেতে মাছ মারার শখ আছে তোরাবের। একখানা ডিঙি নৌকা নিয়ে প্রায়ই গভীর রাতে বেরিয়ে পড়ে মধুর বিলে! সে বলে, রাতেই নাকি বড় মাছ ধরতে সুবিধা!

মজিদ মিয়া এসব ভাবতে-ভাবতেই লোকটা একেবারে কাছে চলে এল। আমতলার ছায়া থেকে বেরিয়ে মজিদ মিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোলাটে জোছনার আলো পড়ল লোকটার চেহারায়। মুহূর্তেই তাকে চিনতে পারল মজিদ মিয়া! লোকটার নাক-মুখ কীসের আঘাতে যেন থেঁতলে গেছে! ডান চোখটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে ঝুলছে। শরীরে একখানা লোহার রড এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিঁধে রয়েছে! তাই ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে! কাটা ঠোঁট দিয়ে বহুকষ্টে খানিকটা হাসার চেষ্টা করল লোকটা! এতে চেহারাটা আরও কদাকার হয়ে উঠল!

অমিয় ঘোষ! মজিদ মিয়ার বাসের সহযাত্রী!

কিছু না বলে হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। হাতে একখানা বাদামের ঠোঙা ধরা! তৃতীয়বারের মত সেদিন জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মজিদ মিয়া।

ঘোলাটে জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। মাথার উপর হঠাৎ আবার ডেকে উঠল রাতজাগা পাখিটা–যমকুলি!

রঙ বদল

অফিস থেকে ফিরে কাউচে গা এলিয়ে দিলাম। তারপর রিমোট টিপে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলের বইমেলার অনুষ্ঠানগুলো দেখতে লাগলাম। মনের গহীনে কোথায় যেন একটা দুঃখবোধ জাগছে। ঢাকায় থাকলে প্রতিদিন না পারলেও সপ্তাহে অন্তত তিন-চার বার তো যাওয়া হতই। ঢাকার বাইরে পোস্টিং হওয়ায়, এবছর একটিবারের জন্যও মেলার মুখ দেখা হয়নি আমার! অথচ ফেব্রুয়ারি মাস এই শেষ হয়ে এল বলে। যে বস আমার বদলির কাগজে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁর চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলাম আরেকবার।

আহা, নতুন বইয়ের গন্ধ, স্টল থেকে স্টলে ঘুরে বেড়ানো, রাজ্যের ধুলোয় মাখামাখি হয়ে দিন শেষে ক্লান্ত দেহে গুটিকতক পছন্দের বই বগলদাবা করে ঘরে ফেরা, সেই অনুভূতির তুলনা কোথায়?

চাকরিটা ছেড়েই দেব কি না, মনে-মনে সে সম্ভাবনাটা আরেকবার খতিয়ে দেখলাম। ফলশ্রুতিতে দুঃখবোধটা আরও খানিকটা বাড়ল বৈ কমল না! আমার রোজগারে যাদের পেট চলে সেসব দুঃখী মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল!

আমার চোখের কোণটাও বোধকরি খানিকটা ভিজে উঠেছিল। সেই জল টলোমলো চোখ দিয়েই আমি তেলাপোকাটাকে দেখলাম! দেখামাত্রই মেজাজটা মহাখাপ্পা হয়ে গেল। এই বিশ তলার উপরের ফ্ল্যাটে এল কী করে হারামিটা? এদের যন্ত্রণায় আমি কি শেষ পর্যন্ত স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না!

তেলাপোকা জীবটাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। উঁহুঁ, মেয়েদের মত তেলাপোকা দেখলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠি, ব্যাপারটা সেরকম নয় কিন্তু! তেলাপোকা আমি ভয় পাই না মোটেও, এদের প্রতি আমার যে অনুভূতি, সেটা স্রেফ ঘৃণা। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ঘৃণাটা একরকম বাড়াবাড়ি পর্যায়েরই বটে। অবশ্য ঘৃণা না করে আর উপায়ই বা কী? কোন্ 'ভাল'-টা আছে এদের মধ্যে শুনি?

এমন সর্বভুক প্রাণী পৃথিবীতে আর আছে ক'টা? যা পায় সবই খায় এরা। এমনকী কমোডের ময়লা পর্যন্ত বাদ দেয় না! ওয়াক থু! ডাইরিয়া, টাইফয়েড, জণ্ডিস সহ আরও কত শত রোগ যে এরা ছড়িয়ে বেড়ায়, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে?

সারা গায়ে কেমন বিচ্ছিরি বিটকেলে গন্ধ, যেখানটায় যায় সেখানে আর বহুক্ষণ পা বাড়ানোর কোন উপায় থাকে? খাবার টেবিল, মিটসেফে ঘুরে-ঘুরে কত

খাবার যে এরা নোংরা করছে তার তো কোন হিসেবই নেই।

তেলাপোকা মারার জন্য আমি কী না করেছি? কিলিং পাউডার থেকে শুরু করে স্প্রে, অ্যারোসল সবই একে-একে ফেইল মারল! কিছুতেই তাদেরকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা গেল না! কয়েকটা যদি মরে তবে সে জায়গা পূরণের জন্য রাতারাতি যেন আরও শ'খানেক জন্ম নেয়।

শেষমেশ খুলনা থেকে এক তান্ত্রিকের মন্ত্র পড়া তাবিজ পর্যন্ত আনিয়েছিলাম! ঘরের কোনায়-কোনায় শোভা পাচ্ছিল টিনের চকচকে তাবিজগুলো। তান্ত্রিকের কথামত তাবিজ ঝুলানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ঘর থেকে সবক'টা তেলাপোকা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে যাবার কথা। কিন্তু কীসের কী! তাবিজ আর তেলাপোকা দুটোই বহাল তবিয়তে ঘরে সহাবস্থান করতে লাগল! শেষতক অবশ্য তাবিজকেই বিদায় নিতে হয়েছিল।

তেলাপোকার প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়েই সম্ভবত কোন এক মনীষী বলেছিলেন, 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকাটি এখনও টিকিয়া রহিয়াছে!' এরা লোপ পাবেই বা কী করে? ঈশ্বর বড় বেশি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন এদের প্রতি! যুগ-যুগ ধরে টিকে থাকতে যা-যা দরকার তার সবকিছুই একেবারে উজাড় করে দিয়েছেন এদেরকে। সম্ভবত গোটা নরক ভর্তি তেলাপোকায়! জাহান্নামের আগুনের উত্তাপও এদের কিছুই করতে পারবে না বলেই মনে হচ্ছে!

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পা যেখানে মাত্র দুটো, সেখানে তেলাপোকার কি না ছয়টা, পুরোপুরি তিনগুণ! মানুষের দুটো হাতের বদলে এদের দেয়া হলো চারটে ডানা, এখানেও দ্বিগুণ! পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝার জন্য মাথার সামনে আবার দু'খানা অ্যান্টেনাও আছে। আর বংশবৃদ্ধির যে গতি, তার কথা না হয় নাই বা বললাম! তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানটা মনে হয় চোখে! মানুষের যেখানে সর্বসাকুল্যে মোটে দুটো অক্ষি, সেখানে তেলাপোকার রয়েছে দুটো পুঞ্জাক্ষি! যার একেকটিতেই পুঞ্জিভূত রয়েছে দু'হাজার করে ওমাটিডিয়াম নামের অক্ষি। তেলাপোকাদের রক্তও আবার মানুষের মত লাল নয়, সাদা। নাম হিমলিম্ফ। গোটা শরীরটাও আবার মোমের মত কিউটিকেলে আবৃত। এত-এত সুবিধা পেয়ে 'পেরিপ্লানেটো অ্যামেরিকানা' চিরকাল টিকে থাকবে না তো কি 'হোমো সেপিয়েন্স' টিকে থাকবে?

চাচাতো ভাই সেলিমের পরামর্শেই এই বিশ তলা অ্যাপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ তলায় ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আরশোলার মোটেও সাধ্য নেই এত উপরে ওঠার! কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তার ধারণা পুরোপুরি অমূলক। ঠিকই ওরা পৌঁছে গেছে এখানে।

তেলাপোকাটা যখন আমাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে, আমার সামনেই টি টেবিলের পায়া বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, মাথায় পুরোপুরি রক্ত চড়ে গেল আমার। কোনকিছু না ভেবেই হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেললাম ওটাকে। ছাড়া পাওয়ার জন্য হাতের মুঠোয় কিলবিলিয়ে উঠল, কিন্তু কিছুতেই ছাড়লাম না আমি। ওটাকে ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য ইতোমধ্যেই মানসিকভাবে তৈরি হয়ে

গেছি! এইচ.এস.সি-তে পড়ার সময় তেলাপোকা নিয়ে ব্যবহারিক ছিল বেশ কিছু। তখন তেলাপোকা দেখলেই কেমন ঘিনঘিন করত, ধরতে গেলে তো রীতিমত গা গুলিয়ে উঠত! আজ কিন্তু মোটেও তেমনটা লাগছে না আমার! হয়তো মনের গভীরে ফেনিয়ে ওঠা ক্রোধই বাকি অনুভূতিগুলোকে ক্ষণিকের জন্য ভোঁতা করে দিয়েছে।

প্রথমেই এক ঝটকায় ছিঁড়ে দিলাম মাথার অ্যান্টেনা দুটো। দেখি এবার হারামিটা পরিবেশের খবর কী করে পায়! তারপর বেশ খানিকটা সময় নিয়ে চারটে ডানার দুটো ছিঁড়ে ফেললাম। উড়বার পথও বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের জন্য ওটার। তারপর একে-একে ভেঙে দিলাম সবক'টা পা! স্বাভাবিকভাবে আর কোনদিনও হাঁটা হবে না ওটার! এবার ছেড়ে দিলাম ওটাকে মেঝেতে। হৃদয়ের গভীরে একটা পৈশাচিক উল্লাস টের পাচ্ছি!

আমাকে অবাক করে দিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওটা চলে গেল খাটের তলায়। অথচ আমার ধারণা ছিল, মরণ না আসা পর্যন্ত এখানেই পড়ে থাকবে ওটা!

টিভির পর্দায় চোখ পড়তেই ভুলে গেলাম ওটার কথা। একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার দেখাচ্ছে। আমার জানার সুযোগ হলো না, অনেক-অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিল তেলাপোকাটা। তবে, এতটা কষ্ট পেয়ে না মরলেই বোধহয় ভাল হত!

এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল আমার। অন্যান্য দিন বিকেলের মধ্যেই ফিরি, তবে আজ ভিজিটর থাকায় সময়ের কিছুটা হেরফের হলো। শরীর এমনিতেই সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত ছিল, তার উপর যখন দেখলাম অ্যাপার্টমেন্টের লিফটটা নষ্ট, মনটাও একেবারে দমে গেল তৎক্ষণাৎ। এখন আমাকে হেঁটেই বিশ তলার সিঁড়ি ভাঙতে হবে। মনে-মনে বিরামহীনভাবে সেলিমের উদ্দেশে খিস্তি করতে-করতে উপরে উঠতে লাগলাম। তাকে এখন হাতের কাছে পেলে ঠাটিয়ে একখানা চড় মারতাম আর জিজ্ঞেস করতাম, আরশোলা বিশ তলায় উঠতে পারে না এই খবর কোন্ গর্দভ দিয়েছে তাকে!

বিশ তলা পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকেই বিছানায় শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম, আর একবিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসলাম। গোসল করে কিছু একটা মুখে দিতে হবে। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে সেই কখন থেকেই।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিঞ্চিৎ অবাক হলাম, রুমটাকে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে! তবে পরিবর্তনটা ঠিক কোথায় হয়েছে, সেটা ধরতে পারছিলাম না কিছুতেই। অনেকক্ষণ লাগল আমার গোলমালটা আবিষ্কার করতে। দেয়ালের রঙ! ঘরের দেয়ালগুলোর রঙ ছিল হালকা গোলাপি, এখন সেটা খয়েরিমতন একধরনের রঙ হয়েছে! কখন ঘটল এই রঙ বদল? বাড়িওয়ালা কি তবে আজ দিনের বেলায় নতুন করে রঙ করিয়েছেন? মানলাম তাঁর কাছে চাবি আছে, তাই বলে আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে ঢোকাটা কি তাঁর ঠিক হয়েছে? এত জলদি

কাজটা শেষই বা করলেন কীভাবে!

নতুন রঙের একটা ফোঁটাও পড়ে নেই মেঝেতে কোথাও! যারা কাজটা করেছে নিজেদের কাজে ভীষণ দক্ষ বোঝা যাচ্ছে। ঘরে নতুন রঙের এতটুকু গন্ধও নেই! অবশ্য এতক্ষণ টের পাওয়া না গেলেও, এখন কেমন একটা বিটকেল গা গুলানো গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে!

ও কী! দেয়ালের রঙগুলোর মধ্যে ঢেউ খেলে গেল নাকি! খিদের চোটে ক্লান্ত চোখে ভুলভাল দেখছি না তো? পরক্ষণেই প্রকৃত সত্য বুঝতে পেরে ভয়ে-আতঙ্কে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার! শ্বাস-প্রশ্বাস রীতিমত বন্ধ হবার উপক্রম! নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই!

ভুল দেখিনি আমি। দেয়ালে নতুন কোন রঙও করা হয়নি। দেয়াল জুড়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে হাজার-হাজার তেলাপোকা। নাকি কোটি-কোটি? একটু পর-পর তাদের ক্ষণিকের নড়ে ওঠাতেই ঢেউ খেলে যাচ্ছে গোটা দেয়াল জুড়ে।

মনের গভীর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'পালা, শোভন, জলদি পালা এখান থেকে।'

এ সতর্কবাণী মুহূর্তেই আমাকে সচেতন করে তুলল। পায়ে-পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম দরজার দিকে। খুব আস্তে নড়াচড়া করছি, যেন আরশোলাগুলো কোনরকমেই বিরক্ত না হয়! বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা এমনভাবে লাফাচ্ছে, যেন পাঁজরের সবক'টা হাড় আজ গুঁড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না!

পৌঁছে গেলাম দরজার কাছটায়, আর এক পা এগোতে পারলেই হাতল ছুঁতে পারব। তারপর এক ঝটকায় দরজা খুলে পগারপার হতে কতক্ষণই বা লাগবে আর!

ঠিক তখনই নড়ে উঠল দেয়ালের তেলাপোকার চাদর! মুহূর্তেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ-কোটি তেলাপোকা, ঠিক যেন একটা ঘূর্ণিঝড়ের মত! স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমি, দেহের সবক'টা ছিদ্রপথ দিয়ে অবলীলায় ভিতরে ঢুকে পড়ছে ওরা! অবর্ণনীয় কষ্টে গড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে।

প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু একবিন্দু শব্দও বের হলো না গলা দিয়ে। বাতাস ঢোকার কিংবা বেরোনর কোন পথ আর খোলা নেই, বোঝাই হয়ে গেছে তেলাপোকায়! একসময় আমার চোখ দুটোও চলে গেল ওদের দখলে! তারপর সব অন্ধকার!

নেক্রোপলিস

ফরিদ নামের লোকটা এলাকাবাসীর কাছে একটা জলজ্যান্ত রহস্যের আধার। নিজের চারপাশটায় ফরিদ স্বেচ্ছায় যে দেয়ালটা টেনে দিয়েছে, তার ওপাশটা দেখার সুযোগ হয়নি কারও। প্রথম প্রথম দু'-একজন যে কৌতূহলী হয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারেনি তা নয়। তবে অচিরেই তারা ক্ষান্ত দিয়েছে সে চেষ্টায়। কী দরকার বাপু সেধে-সেধে বিপদ ডেকে আনার?

ফরিদের দিকে তাকালেই কেমন ভয়-ভয় করে। ঠাণ্ডা চোখজোড়া যেন অন্তরাত্মায় ছাপানো লিপিসুদ্ধ পড়ে ফেলে! অকারণেই গা শির-শির করে ওঠে, বুক ধড়ফড় করে! তাই লোকজন আজকাল আর তেমন একটা ফরিদকে ঘাঁটায় না, নিজের মতন থাকতে দেয়। ও ব্যাটা যদি নিজে থেকেই দিনরাত কবরস্থানে পড়ে থাকতে চায়, তা হলে কারই বা কী আসে যায়?

ফরিদ পেশায় সরকারি বিশাল কবরস্থানটার দারোয়ান। বহুকাল আগে থেকেই চাকরিটা করে আসছে সে। কাজও তেমন কিছু নেই, শুধু নতুন কোন মরদেহ কবর দেয়া হলে তার নাম-ঠিকানা রেজিস্ট্রি বুকে এণ্ট্রি করা। আর মাঝে-মাঝে খন্তা কোদাল দিয়ে কবরগুলোর আলগা মাটিগুলোকে বিন্যস্ত করে দেয়া। কিংবা মনে চাইলে নিড়ানি দিয়ে এখানে-ওখানে গজিয়ে ওঠা আগাছাগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। বলতে গেলে সারাটা দিনই একরকম অবসরে কাটে ফরিদের।

আগে কবরস্থানের লাগোয়া বস্তিতেই থাকত ফরিদ আর তার বউ জোলেখা। সারাদিন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ঘরে বসে কাগজের ঠোঙা বানাত। সে ঠোঙা দোকানগুলোতে বেচে বেশ ভালই সংসার চলত ওদের। মাঝে মধ্যে ফরিদ গিয়ে কবরস্থানে একটা চক্কর দিয়ে আসত। কাজ তো ওখানে তেমন কিছু নেই তার, নতুন কেউ মরলেই যা খানিকটা ব্যস্ততা। ওই সময়টায় জোলেখা একাই ঠোঙা বানানোর কাজ চালিয়ে যেত।

তখন কিন্তু ফরিদ মোটেও আজকের মত অসামাজিক ছিল না। বরঞ্চ পাড়ার লোকের কাছে তাদের দু'জনার এই পরিবারটির বেশ জনপ্রিয়তাই ছিল বলা যায়। যে-কোন উৎসব পার্বণে তাদের ডাক পড়ত। কারও বাড়ির বড় মেয়েটার কান ফুঁড়িয়েছে? ডাকো ফরিদ আর জোলেখাকে। কারও বাড়িতে হয়তো একমাত্র ছেলের খৎনা করা হয়েছে কিংবা ছেলেমেয়েদের আকিকা অনুষ্ঠান, খোঁজ পড়ত ফরিদ দম্পতির। আর বিয়ের মত বড় আয়োজন হলে তো কথাই নেই,

অবধারিতভাবে দাওয়াত পেত তারা স্বামী-স্ত্রী।

উঠানের কোনায় হোগলা বিছিয়ে একপাল মহিলাকে সঙ্গী করে সুর করে গীত গাইত জোলেখা। বড্ড সুন্দর ছিল তার গলা, শুনলেই কেমন যেন প্রাণ জুড়িয়ে যেত। আড়ালে আবডালে অনেকেই আফসোস করেছে, বড় ঘরের মেয়ে হলে এতদিনে সারা দেশময় নাম ছড়িয়ে পড়ত জোলেখার। আর ফরিদ? জোলেখার গানের তালে-তালে সে তখন পুরো উঠানময় উদ্দাম নৃত্যে ব্যস্ত। লুঙ্গি গোঁজ দেয়া সুঠাম দেহের ফরিদের সে উন্মত্ত নৃত্যও কোন অংশে কম উপভোগ্য ছিল না। ওরা দু'জনে মিলে আসর মাতিয়ে রাখতে পারত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই ফরিদ আর আজকের ফরিদকে কিছুতেই মেলাতে পারে না এলাকার বাসিন্দারা। আপনমনে মাথা নেড়ে আফসোস করে সবাই, অজান্তেই তাদের বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

অনেকের ধারণা ফরিদের এই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে জোলেখা গার্মেন্টসের চাকরিতে যোগ দেয়ার পর থেকেই। ফরিদের দারোয়ানগিরির বেতন আর তাদের দু'জনার সম্মিলিত ঠোঙা বেচা টাকায় তাদের দিন খারাপ যাচ্ছিল না মোটেও। সেই সাথে উৎসব পার্বণের উপরি আয় তো ছিলই। কিন্তু জোলেখা একদিন গোঁ ধরল, গার্মেন্টসে কাজ করবে সে। ঠোঙা বানানো নাকি আর ভাল লাগে না তার। তা ছাড়া গার্মেন্টসের কাজে মাস শেষ হলেই যে নির্দিষ্ট বেতনের নিশ্চয়তা, সেটা কি আর ঠোঙা বানানোর কাজে পাওয়া যায়? প্রথম দিকে গাঁইগুঁই করলেও, জোলেখার ক্রমবর্ধমান জেদের কারণে শেষ অবধি রাজি হতে বাধ্য হয় ফরিদ। পরদিন থেকেই জোলেখা গার্মেন্টসে যেতে শুরু করে।

তবে ক'দিনের মধ্যেই জোলেখার গার্মেন্টসে কাজে যাবার ব্যাপারে অতি আগ্রহের কারণটা খোলসা হয়। পাশের ঘরের মণ্টু মিয়া! সে আগে থেকেই ওখানে কাজ করত, জোলেখাকে ফুসলানোর পিছনে মূল অবদান তারই।

অনেকদিন থেকেই জোলেখা আর মণ্টু মিয়ার ব্যাপারে কানাঘুষা শুনে আসছিল ফরিদ। তাদের দু'জনার দহরম মহরমের খবর এক কান দু'কান করতে-করতে পুরো বস্তি রাষ্ট্র হয়ে গেছে, গোপন নেই আর! পাড়ার উঠতি বয়সের বখে যাওয়া ছেলে ছোকরারা বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে প্রকাশ্যেই আজকাল এ নিয়ে আলোচনা করে।

বিরক্ত ফরিদ বেশ কয়েকবার এ নিয়ে জোলেখাকে জিজ্ঞেস করে। তবে জোলেখা কোনদিনও কিছু স্বীকার করেনি। উল্টো কেঁদে কেটে একাকার করেছে, না হয় ভীষণ তেজে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে। চিৎকার করে বলেছে, 'আপনে আমারে অবিশ্বাস করেন?' ফরিদ আর কথা বাড়ায়নি, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কী দরকার শুধু-শুধু ঘরে অশান্তি ডেকে আনার?

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি এতে। একরাতে একযোগে গায়েব হয়ে যায় জোলেখা ও মণ্টু মিয়া। সবার ধারণা, তারা দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে সংসার পেতেছে। উত্তাল প্রেম কি আর কোন বাধা মানে?

সেদিন ফরিদকে কেউ কাঁদতে দেখেনি, এমনকী বিন্দুমাত্র আফসোসও সে

করেনি জোলেখার জন্য! শুধু সেদিন থেকেই সে বস্তি ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে কবরখানার কোনার ঝুপড়ি ঘরটায়। সারাদিন সে ওখানেই থাকে। কারও সাথে কোনরকম কথা বলে না, কেউ আগ্রহ করে বলতে গেলেও সাড়া দেয় না, চুপ করে থাকে। একজোড়া পাথুরে চোখের দিকে তাকিয়ে কী আর আলাপ চালানো যায়? একা-একা লোকটা কেমন করে বেঁচে আছে, কে জানে!

কেউ মারা গেলে সেটা লোক মারফত ফরিদকে জানানো হয়। এক টুকরো কাগজে মৃতের নাম-ঠিকানা লিখে পাঠানো হয়, ফরিদ সেটা রেজিস্ট্রি খাতায় টুকে নেয়। পুরো কাজটা হয় নিঃশব্দে, কোনরকম বাক্য বিনিময় ছাড়াই। তারপর গোর-খোদকেরা কবরস্থানে যায়, নির্ধারিত স্থানে কবর খোঁড়া শুরু করে। তাদের সাথেও কোন কথা বলে না ফরিদ, শুধু তার ঝুপড়ি ঘরের দাওয়ায় বসে চুপটি করে চেয়ে থাকে।

সেদিন সকালে মারা গেল পশ্চিম পাড়ার জিলানী চেয়ারম্যান। দীর্ঘকাল ক্যান্সারে ভুগে অনেক কষ্ট সহ্য করে অবশেষে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে বেচারা। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকার ঘরে ঘরে শোকের বদলে কেমন একটা চাপা খুশির আমেজ লক্ষ করা গেল! বাইরে যদিও মুখটাকে যথাসাধ্য গোমড়া করে রাখার ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি করছে না কেউই, কিন্তু ভিতরের বাঁধভাঙা আনন্দ চোখে-মুখে গোপন থাকছে না কারোরই।

জিলানী চেয়ারম্যান খুব অত্যাচারী লোক ছিল। এর-ওর জায়গা জমি অন্যায়ভাবে জবরদখল করার ব্যাপারে জুড়ি ছিল না তার। এমন অত্যাচারী একজন মানুষের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যদিও স্বাভাবিকভাবেই সবার খুশি হওয়ার কথা, তবে লোকজনের আনন্দের কারণ শুধু এটুকুই নয়, আরও বেশি কিছু ছিল!

শহর থেকে জিলানী চেয়ারম্যানের বিত্তশালী ছেলেরা দল বেঁধে ছুটে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, বাবার আত্মার শান্তির জন্য তারা সপ্তাহব্যাপী মেজবানের আয়োজন করবে। পাড়ার সবাইকেই সেখানে দু বেলা পেটপুরে খেতে দেয়া হবে। দিন সাতেক আর কারও ঘরে উনুন জ্বালানোর প্রয়োজন পড়বে না!

এহেন খবরে একদল নিম্নবিত্ত মানুষের খুশি না হয়ে উপায় কী? ঘরে-ঘরে কেন জিলানী চেয়ারম্যানের মত সোনার ছেলে জন্ম নেয় না, এ নিয়েই আফসোস জুড়ে দিয়েছে কেউ-কেউ!

চেয়ারম্যানের কবরের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হলো একটা ঝাঁকড়া গাব গাছের তলায়। পাড়ার মাতব্বরেরা মিলে রীতিমত মিটিং করেই জায়গাটা নির্ধারণ করেছে। গাছটা সবসময় ছায়া দেবে, রোদে কষ্ট হবে না চেয়ারম্যান সাহেবের।

জায়গাটা জংলামতন হয়ে ছিল, বহুকাল কবরস্থানের ওদিকটায় নতুন কাউকে কবর দেয়া হয়নি। তবে গোর-খোদকের দল সহসাই জায়গাটা ফকফকা পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর শুরু করল কবর খোঁড়ার কাজ। নিজেদের মেধার সবটুকু কাজে লাগিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তারা তৈরি করল এযাবৎকালের তাদের দ্বারা সৃষ্ট সবচাইতে সুন্দর কবরটা!

চেয়ারম্যান সাহেবকে তো আর যেনতেন ভাবে খোঁড়া কবরে শোয়ানো যায় না! তা ছাড়া চেয়ারম্যানের ছেলেদের দেয়া পারিশ্রমিকের অংকটারও তো একটা ওজন আছে, নাকি?

যারা-যারা কবরটায় এক নজর উঁকি দিল, তারা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, এত সুন্দর কবর তারা কেউ এর আগে দেখেনি। শুনে গর্বে ফুলে উঠল গোর-খোদকদের বুক, একের পর এক বিড়ি ধরিয়ে অতীতের গপ্প করতে লাগল তারা। খুশির ঠেলায় ফরিদকেও একখানা বিড়ি সেধে বসল একজন। তবে ফরিদের ভয়াবহ ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে নিমিষেই আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল লোকটা। তড়িঘড়ি ওখান থেকে সরে পড়ল সে।

জিলানী চেয়ারম্যানের লাশের সৎকার করতে-করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কবর দেয়া শেষ হওয়া মাত্রই দেখতে-দেখতে খালি হয়ে গেল গোটা কবরস্থান এলাকা। সবার মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন তাড়া লক্ষ করা গেছে, কখন তারা গিয়ে চেয়ারম্যান বাড়িতে পৌঁছবে। আজ রাত থেকেই মেজবানির আয়োজন করা হয়েছে, বিকেলেই জবাই করা হয়েছে গোটা কয়েক গরু। আগে-আগে না গেলে পরে যদি খাবারে টান পড়ে?

মেজবানি বিষয়ক কানাঘুষা সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, সবাই যারপরনাই আনন্দিত হয়েছে। দিকে-দিকে প্রশংসার রোল উঠেছে, যেমন ছিল বাপ তেমন যোগ্য হয়েছে তার ছেলেরাও। এই পরিবারের সবাইকে আল্লাহ্ তায়ালা শুধু ধনই না,-মনও দিয়েছেন।

সবাই খুশি, শুধু ফরিদের মুখটা বেজার। সে শুকনো মুখে ঠায় বসে রইল তার ঝুপড়ির দাওয়ায়।

রাত আরেকটু গভীর হলে, সে ধীরে-ধীরে পা বাড়াল চেয়ারম্যানের কবরটার দিকে। ফরিদের খুশি হবার অবশ্য তেমন কোন কারণও নেই। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে, চেয়ারম্যানের শরীরে কি আর রসকষ আছে নাকি কিছু? অমন শুকিয়ে যাওয়া চিমসে দেহটা খেয়ে, কী মজাই বা আর পাবে ফরিদ!

ওটা খাওয়া আর পুরানো শুকনো হাড় চিবোনো তো ধরতে গেলে প্রায় একই। তাজা তাগড়া কোন জোয়ান শব পেলে না হয় খুশি হবার মত একটা ব্যাপার ছিল।

গাব গাছটার কাছে আসতেই বীভৎস হাসি ফুটে উঠল ফরিদের মুখে। মনে পড়ে গেল তার সেই প্রথম রাতের কথা। সেদিনই প্রথম এ এলাকায় এসেছিল সে। গাব গাছটার মগডালে বসে ভাবছিল, কোন্ কবরটা থেকে লাশ খাওয়া শুরু করবে, কোন্টা একটু বেশি তাজা। পা ঝুলিয়ে দিয়েছিল দূরের শিমুল গাছটায়। ঠিক তখনই দেখতে পেল, গাছের তলায় এসে হাজির হয়েছে দু'জন নরনারী। অর্ধনগ্ন জোলেখা আর মন্টু মিয়া সে রাতে নিজেদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, উপরের দিকে তাকানোর ফুরসত মেলেনি কারও। অথচ একবার মুখ তুলে চাইলেই ওকে দেখতে পেত ওরা। সেক্ষেত্রে হয়তো প্রাণটাও বেঁচে যেত ওদের। কিন্তু আদিম খেলায় মত্ত থাকায়, হুঁশ জ্ঞান পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল তাদের।

শুকনো লাশ বাদ দিয়ে, জোলেখা আর মণ্টু মিয়াকে দিয়েই সেদিন উদরপূর্তি করেছিল ও। এর কিছুক্ষণ পরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত হন্তদন্ত হয়ে সেখানে হাজির হয় গোরস্থানের আসল দারোয়ান ফরিদ। জোলেখা আর মণ্টুকে এদিকেই আসতে দেখেছিল সে। আজ হাতেনাতে ধরতে চায় সে ওদের।

কিন্তু ফরিদ ওই রাতে এদিকে না এলেই ভাল করত। মরতে হলো তাকেও।

তারপর থেকে ফরিদের বেশে এখানেই আছে ও। জায়গাটা ওর বেশ পছন্দ হয়েছে।

ছোটলোকের এলাকা। একবার গর্ত করে সেঁধিয়ে দিয়ে গেলে আর কেউ খবর নেয় না তেমন একটা, লাশটা আছে নাকি নেই! কবরের উপরে ইট-বালু-সিমেণ্ট দিয়ে পাকাও করে না বাড়তি খরচের ভয়ে। তাই সহজেই মাটি খুঁড়ে বের করে ফেলা যায় লাশগুলো। একমনে চেয়ারম্যানের কবরের মাটি সরাতে থাকে ফরিদ। খানিক বাদেই নাগাল পেয়ে যায় সদ্য গেড়ে যাওয়া দেহটার। জিলানী চেয়ারম্যানের কাফনের কাপড়টা বেশ দামী, ছিঁড়তে বেগ পেতে হলো তাকে। ভাল কাপড় কেনার জন্য চেয়ারম্যানের ছেলেদের উদ্দেশে গোটা দুই গাল দিয়ে, আবারও নিজের কাজে মন দেয় ফরিদ।

রিপিটার

মুখ ব্যাদান করে কাউন্টারে বসে আছে মিক কার্টার। সেই বিকেল থেকে তুষার ঝরছে, এখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলেও থামবার নামটিও করছে না! বাইরের গুমট প্রকৃতির মত মনটাও ভার হয়ে আছে মিকের। এই বেলায় একজন খদ্দেরও জোটেনি, ফুটোকড়িও আমদানি হয়নি দোকানে। মন ভাল থাকেই বা কেমন করে?

এমনিতেই পুরানো অ্যান্টিক শপগুলোর বেহাল দশা, ক্রেতা নেই তেমন একটা। আজকালকার বাজারে প্রায় সবারই তো নুন আনতে পান্তা ফুরায়, শৌখিনতার সুযোগ কোথায়?

বড় সংগ্রাহকরা মিকের মত ছোট দোকানগুলোয় পায়ের ধুলো দেন না কখনও, তাঁরা সরাসরি ডিলারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেন দুষ্প্রাপ্য সব অ্যান্টিক জিনিস। তবুও কোনমতে খেয়ে পরে দিন চলেই যায়, জীবন চালানো কঠিন হলেও অসম্ভব নয় মিকের মত দোকানীদের। অল্পবিস্তর যেটুকু বেচাকিনি হয়, সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তারা।

তা ছাড়া যারা এই পেশায় আছে, প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে অ্যান্টিকের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। এই পুরানো জিনিসগুলোই তাদের বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি জোগায়, নেশাতুর করে তোলে। এ পেশা থেকে সরিয়ে নিলে নিঃসন্দেহে তাদের কাছে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন মনে হবে! তাই তো পুরানো জিনিসে বোঝাই জরাজীর্ণ এই দোকানগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয় কিছু মানুষের জীবনজীবিকা। আশপাশেরি সবক'টি দোকান ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নামতেই যে যার দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাড়ির পথ ধরেছে দোকানীরা। গোটা মার্কেটে কেবলমাত্র মিকের ঘুপচি দোকানটাই এখনও খোলা। চিরকুমার মিকের জন্য ঘরে অপেক্ষায় নেই কোন সুন্দরী রমণী, তাই ফেরার তাড়াও নেই তার। এরচেয়ে বরং যতক্ষণ দোকানে থাকে ততক্ষণই সময়টা ভাল কাটে মিকের। ছোটবড় অ্যান্টিকগুলোকে বড্ড আপন মনে হয়।

একা-একা বসে থাকতে-থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠল মিক। কাঁহাতক আর নির্বিকার বসে থেকে তুষারপাত দেখা যায়? ও যখন দোকান বন্ধ করে ঘরে ফেরার কথা ভাবছে, ঠিক তখনই এল লোকটা।

দুমড়ানো মোচড়ানো একখানা পুরানো ওভারকোট গায়ে লোকটার, তাতেও আবার গোটা কয়েক তালি দেয়া। গলার মাফলারটা শেষ কবে যে ধোয়া হয়েছে,

সে কথা কেবলমাত্র ঈশ্বরই জানেন! মুখে একগাদা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, কোনদিন ক্ষুরের ছোঁয়া পেয়েছে বলে মনে হয় না!

লোকটা কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা বোটকা গন্ধ ভক করে এসে ধাক্কা মারল মিকের নাকে। খানিকটা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে। মনে-মনে লোকটার পিণ্ডি চটকাচ্ছে, ব্যাটা খবিশ কোথাকার। গোসল নামের ব্যাপারটার কথা বোধহয় জানাই নেই ব্যাটার!

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল লোকটা। তারপর ওভারকোটের ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা ময়লা কাপড়ের পুঁটলি বের করে আনল।

মনের গভীরে সন্দেহ দানা বাঁধল মিকের, হাবভাব বিশেষ সুবিধের নয় লোকটার। কোথাও থেকে চুরি-টুরি করে আনেনি তো কিছু? মুখে অবশ্য নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখল সে। দেখাই যাক না ব্যাটার পুঁটলির প্যাঁচের ভিতর থেকে কী বেরোয়। সাধারণত চোর-ছ্যাঁচড়রাই তার কাছে রাতের দিকে জিনিসপত্তর বেচতে আসে। এদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বেশ ভাল মালামাল সহজেই বাগিয়ে নেয়া যায়। এ লাইনে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় এটাই দেখে এসেছে মিক। গভীর রাত অবধি তার দোকান খোলা রাখার এটাও একটা কারণ বটে!

মালের প্রকৃত মালিকানা নিয়ে কক্ষনো মাথা ঘামায় না সে, দেখে কেবল জিনিসটার গুণমান। মাল চোরাই কি না, তাতে তার কী আসে যায়? চোরাই হলেই বরঞ্চ খানিকটা বেশি লাভের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কারণ চোরদের ধরা পড়ার ভয় থাকে, তাই তারা যত দ্রুত সম্ভব মালামাল হস্তান্তর করে কিছু নগদ অর্থ বাগিয়ে নিতে চায়। তাদের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সুযোগটাই সবসময় কাজে লাগায় মিক!

লোকটার পুঁটলি থেকে বেরোল একখানা পুরানো আমলের টেবিল ঘড়ি। ছোট, গোল। এককালে হয়তো রঙটা সোনালিই ছিল, তবে কালের ধকলে এখন সেটা কিছুটা কালচে হয়ে গেছে। কাঁটাগুলো স্থির হয়ে আছে, অর্থাৎ পুরোপুরি অচল, সঠিক সময় জানানোর মুরোদ নেই আর। পিছন দিকটায় দুটো চাবি, এদিক-ওদিক ঘোরানো যায়। এদের সাহায্যেই এককালে ঘড়িটাকে সচল রাখা হত। এহেন ঘড়ি খুব একটা দুর্লভ নয়, তাই বাজারে কদরও তেমন নেই। তা ছাড়া সংগ্রাহকরা খোঁজে সচল ঘড়ি, অথচ এর অবস্থা দেখে মনে হয় না যে একে আর কোনদিনও চালানো যাবে।

মিকের চেহারায় স্পষ্ট অনাগ্রহ দেখতে পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল আগন্তুক। তড়িঘড়ি করে বলল, 'ঘড়িটা চীনের একটা সমাধি থেকে পাওয়া।'

অবশ্য এতেও খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হলো বলে মনে হয় না! আগের মতই ঝিম মেরে রইল মিক।

চীনের সমাধি থেকে পাওয়া ঘড়ি এমন কোন মহার্ঘ বস্তু নয় যে, শুনেই তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে হবে। আজকাল হরহামেশাই এগুলো পাওয়া যাচ্ছে, যার বেশিরভাগই অবশ্য শেষপর্যন্ত নকল প্রতিপন্ন হয়। তাই বারংবার ঠক খেয়ে

গ্রাহকরাও চীনের ঘড়ির প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে।

অবশেষে লোকটা তার ঝুলির সেরা বোমাটা ফাটাল! 'ঘড়িটা সোনার তৈরি।'

এবারে কাজ হলো। ঝট করে সোজা হয়ে বসল মিক কার্টার। আগ্রহ নিয়ে ত বাড়াল ঘড়িটার দিকে। হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাল করে নেড়েচেড়ে পরখ রল। তারপর আগন্তুকের অনুমতি নিয়ে ঘড়িটাসুদ্ধ গিয়ে ঢুকল দোকানের ছনের কামরাটায়। মিকের নিজস্ব ছোট গবেষণাগারটা ওখানেই।

খুব তাড়াতাড়িই ফিরে এল মিক, দু'চোখে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মিথ্যে লনি লোকটা, ঘড়িটা আদতেই পুরোদস্তুর সোনার তৈরি। অবশ্য ভিতরে-তরে খানিকটা হতাশাও বোধ করছে মিক। ঘড়িটা রাখা সম্ভব হবে না তার ক্ষ, অত নগদ টাকা নেই আজ দোকানে। সারাদিন বিক্রিই হয়নি তেমন কিছু, কবে কোত্থেকে?

বিনয়ের সাথে সেকথাই লোকটাকে জানাল সে। সেই সাথে তার সময় নষ্ট রার জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করল। তৎক্ষণাৎ মিককে অবাক করে দিয়ে অবিশ্বাস্য ম মূল্যেই ঘড়িটা বেচতে রাজি হয়ে গেল লোকটা! মিকের প্রশ্নের জবাবে নাল, আজ রাতেই নগদ টাকাটা দরকার তার, তাই যা পায় তা-ই সই! আর হেতু অন্য সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো ই।

মিক তখন পরদিন সকালে এসে বাকি টাকাটা নিয়ে যেতে বলল লোকটাকে। ব লোকটা জানাল, তা আর সম্ভব নয় কোনমতেই! আজ রাতেই চিরতরে এই হর ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে!

খানিকটা অবাক হলেও ব্যাপারটা নিয়ে আর তেমন বাড়াবাড়ি করল না ক। কেউ যদি সস্তায় তার কাছে কিছু বেচতে চায়, তা হলে সে বাধা দেবে ন? দোকানে যেটুকু ছিল, সবটুকু নগদ অর্থই সে তুলে দিল লোকটার হাতে। তেও অবশ্য ঘড়িটার প্রকৃত দামের দশ ভাগের এক ভাগও পরিশোধ করা সম্ভব লা না!

যাবার সময় লোকটা বলল, 'খুব বেশি সময় ঘড়িটা নিজের কাছে রাখতে য়ো না, মিস্টার! যত দ্রুত পার, কোন নির্বোধের কাছে বেচে দিয়ো। জানো া, নির্বোধদের কৌতূহল কম থাকে, তাই তারা বেঁচে থাকে মেলা দিন!' বলেই াকটা চলে গেল, চকিতেই হারিয়ে গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন তুষারঢাকা পথে!

কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে বসে রইল মিক। একথা বলে গেল কেন লোকটা? ড়টা কি চোরাই মাল? এজন্যই কি বেশিক্ষণ নিজের কাছে রাখতে মানা করল? ধুর ছাই, চোরাই মাল হলেই বা কী আসে যায় তার! এসবের থোড়াই রোয়া করে এই মিক কার্টার। পরদিন সকালেই ঘড়িটা নিয়ে বসল মিক। ছনের চাবিদুটো আচ্ছামতন ঘুরাল। যদি দৈবক্রমে ঘড়িটা চালু হয়ে যায়, ই আশায়। কিন্তু যারপরনাই হতাশ হতে হলো তাকে, প্রাণের কোন স্পন্দনই খা গেল না ওটার মধ্যে!

তবে গুঁতোগুঁতি করতে গিয়ে নীচের দিকে ছোট-ছোট দুটো নব আবিষ্কার

করল মিক। কী কাজ এদের?

অবশ্য একটায় হাত রেখে খানিকটা মোচড় দিতেই ও বুঝে গেল কী জন্য বানানো হয়েছে এটাকে। ঘড়ির কাঁটাগুলো ঘুরিয়ে সময় সমন্বয় করা হয় এর সাহায্যে।

মুচকি হেসে নিজের হাতঘড়িটার সাথে সময় মিলিয়ে ঠিক করে দিল মিক। সকাল নয়টা। কথায় আছে, প্রতিটা নষ্ট ঘড়িও দিনে অন্তত দুইবার সঠিক সময় দেখায়! সে হিসেবে এখন অন্তত সঠিক সময় দেখাচ্ছে ওটা!

আরেকটা নব দিয়ে ভিতরের ছোট একটা বাড়তি কাঁটা ঘোরানো যায়। সেকেণ্ড, মিনিট এবং ঘণ্টার কাঁটাগুলোর রঙ সোনালি হলেও, এই বাড়তি কাঁটাটার রঙ লাল। কী কাজ হয় এটা দিয়ে? অ্যালার্ম নাকি? বাব্বাহ্!

হাসতে-হাসতেই আপনমনে সাত সংখ্যাটার উপর কাঁটাটা এনে রাখল মিক। সকাল সাতটায় সাধারণত ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে, ডিনারও করে সন্ধ্যা সাতটায়! দেখা যাক, মান্ধাতা আমলের অচল ঘড়িটা কী কর্তব্য পালন করে!

নবটা থেকে হাতটা সরাতেই আচমকা ঘড়িটার পিছন দিকের একটা অংশ ভিতরের দিকে দেবে যেতে শুরু করল! বেরিয়ে পড়ল ছোট্ট একটা গোপন কুঠুরি!

স্তম্ভিত মিক সেখানে একখানা গোল করে মোড়ানো কাগজ দেখতে পেল। কীসের কাগজ এটা? পুরানো কোন রাজরাজড়ার লুকানো ধনভাণ্ডারের গোপন নকশা নয়তো?

অতি সাবধানে কাগজটা খুলল মিক। কালের আবর্তে কাগজটা একেবারে জরাজীর্ণ, নাজুক হয়ে আছে। একটু এদিক-সেদিক হলেই ছিঁড়ে যাবে, এমন দশা!

কাগজটা খোলার পর মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে গেল মিকের। বিজাতীয় ভাষায় কীসব যেন লেখা ওতে! লেখা না বলে অবশ্য কিছু এলোমেলো আঁকিবুঁকি বলাই ভাল। এর মর্ম উদ্ধার করে কার বাপের সাধ্য! তবে কি সাতরাজার ধন হাতের মুঠোয় এসেও অধরাই রয়ে যাবে? হতাশায় রীতিমত মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তার। গোমড়া মুখে সেখানেই বসে রইল মিক।

পরক্ষণেই কী একটা মনে পড়ায় চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার! আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে। প্রফেসর জোসেফ! কাছেই থাকেন ভদ্রলোক। পৃথিবীর বহু ভাষার উপর তাঁর অগাধ দখল। বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষার উপর। প্রায়ই ভদ্রলোক ভাষা বিষয়ক বক্তৃতা করতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সম্মেলনে যান। তাঁর কাছে গেলে নিশ্চয়ই একটা উপায় মিলবে।

দেরি করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পেল না মিক। তক্ষুণি ছুটে গেল প্রফেসর সাহেবের ডেরায়। কপাল ভাল তার, আরেকটু দেরি হলেই প্রফেসর জোসেফ বেরিয়ে পড়তেন, ভার্সিটিতে ক্লাস আছে তাঁর।

কাগজটা দেখে বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় হয়ে গেল প্রফেসর সাহেবের। ভাষাটা বহু প্রাচীন হলেও মোটেও অপরিচিত নয় তাঁর কাছে।

‘এ কাগজটা তুমি কোথায় পেলে, মিক? বহুকাল আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া চীনের একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল এটা। এদের কিছুই তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুরো সম্প্রদায় রহস্যজনকভাবে বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছিল!’

জবাব দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল মিক। সোনার ঘড়িটার কথা কি প্রফেসর সাহেবকে বলাটা ঠিক হবে? যদি সত্যিই কোন গুপ্তধনের ব্যাপার থেকে থাকে, তা হলে যদি ভদ্রলোক এর ভাগ চেয়ে বসেন?

তাই আপাতত তাঁকে ঘড়িটার কথা না জানানোই মঙ্গল মনে করল মিক। বলল, ‘পুরানো এক বস্তা মালের চালানের নীচে পেয়েছি, প্রফেসর সাহেব। লেখাগুলো দেখে কৌতূহল হলো, তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম। যদি বলে দেন, ঠিক কী লেখা আছে কাগজটায়, তা হলে মনে খানিকটা শান্তি পাব, এই আরকী!’

অবিশ্বাস করলেন না প্রফেসর জোসেফ। তাঁর জানা আছে মিকের অ্যান্টিক ব্যবসার কথা। টুকিটাকি দুয়েকটা পছন্দের জিনিস তিনি নিজেও কিনেছেন মিকের দোকান থেকে। দোকানটা ছোট হলেও বেশ সমৃদ্ধ।

‘এখন তো কাজটা করতে পারব না, মিক, দুঃখিত। আমাকে এখনই একটা জরুরী ক্লাস নিতে ভার্সিটি যেতে হবে। তা ছাড়া বহুকাল ভাষাটার চর্চাও করা হয় না, তাই বিভিন্ন রেফারেন্স ঘেঁটে-ঘেঁটে তবেই অনুবাদটা করতে হবে। ব্যাপারটা বেশ সময়সাপেক্ষ। তুমি বরং সন্ধ্যার দিকে একবার এসো, একসাথে চা খাব আমরা। আশা করি এরমধ্যে কাজটাও হয়ে যাবে।’

অপেক্ষায় থাকার ব্যাপারটা ভাল লাগল না মিকের। তবে আপাতত তার আর কিছু করারও নেই। তাই প্রফেসর সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মত বিদায় নিল ও।

সারাটা দিনই একরকম অস্থিরতার মধ্যে কাটল তার! কী লেখা আছে কাগজটায়, এটা না জানা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না সে। অবশেষে সত্যিই কি কপাল খুলতে চলেছে তার? আচমকা ধনী লোক হয়ে গেলে কী করবে সে এত টাকা দিয়ে? প্রথমেই প্রাচ্যের দেশগুলো ভ্রমণে গেলে কেমন হয়?

অপেক্ষার প্রহর যত দীর্ঘই হোক না কেন, একসময় সেটা ঠিকই শেষ হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ প্রফেসর জোসেফের বাসার সদর দরজায় পৌঁছে গেল মিক।

তাকে হরেক পদের নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। তবে অতিরিক্ত উত্তেজনায় কিছুই তেমন খেতে পারল না ও। সামান্য কিছু মুখে গুঁজেই এক কাপ চা টেনে নিল।

অবশেষে বললেন প্রফেসর সাহেব, ‘কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য হলেও, শেষ করতে পেরেছি আমি। অনেকদিন পর তোমার বদৌলতে একটা বিলুপ্ত ভাষার চর্চা আবার করার সুযোগটা পেলাম। এজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মিক।’

মিকের অবশ্য তখন এসব সৌজন্য উপভোগের মত অবস্থা নেই, উত্তেজনায় কিছুটা সামনে ঝুঁকে এল সে। ‘কোন গুপ্তধনের ব্যাপারে কিছু কি বলা আছে

কাগজটায়?'

খানিকটা অবাক হলেন প্রফেসর জোসেফ! মিক কি তা হলে কোন ধনরত্বে হদিস পাবার আশায় ছিল? 'তোমাকে হতাশ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, মিব তবে কাগজটায় তেমন কোন কিছু লেখা নেই। বরঞ্চ বলা আছে, একটা অদ্ভু ঘড়ির কথা। যেটা সে যুগের তান্ত্রিকরা কালো জাদুতে প্রায়ই ব্যবহার করত।'

ভিতরের গভীর হতাশা কিছুতেই বাইরে চাপা দিতে পারল না মিক। মুখচে বিকৃত করে সোফায় হেলান দিল। উত্তেজনা কেটে যেতেই ভীষণরকম ক্ল লাগছে তার।

প্রফেসর জোসেফ বলে চললেন, 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানরা ঘড়িটাকে বলত ডে ওয়াচ! অসম্ভব রকমের ক্ষমতাবান ছিল ঘড়িটা। অনেকেরই প্রাণ নিয়েছে ওট একটা লাল কাঁটায় সময় বেঁধে দিয়ে শত্রুর বাড়িতে রেখে আসলেই হলো। বা কাজ ঘড়িটা নিজেই সেরে নিত। ঠিক করে দেয়া নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণ নিয়ে নি গৃহকর্তার! বড় বীভৎস ছিল সে মৃত্যু!'

হঠাৎ কী একটা মনে পড়ায় আতঙ্কে জমে গেল মিক! লাল কাঁটাটা আ সকালে নিজ হাতে ঘুরিয়ে সে সাতটায় রেখেছিল। আর ঘড়িটা এখন তারই ঘে আলমারিতে রাখা আছে! গুরুত্বপূর্ণ ভেবে, দোকান থেকে এনে বাড়িতে রেখেছি ওটা মিক। এতকাল পরও কি ঘড়িটার প্রাণ নেবার ক্ষমতা বহাল আছে?

জবাব পেতে অবশ্য খুব একটা দেরি হলো না। প্রফেসর সাহেবে বিশালাকার দেয়াল ঘড়িটা ঢং-ঢং করে সাতটা বাজার সংকেত দিল। পরক্ষণে বিস্মিত প্রফেসরের চোখের সামনে মিকের গোটা দেহটা দ্রুত নীল হয়ে গেল মিকের জিভটা আর চোখদুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এখনই! ঘড়ঘ শব্দ বেরোতে শুরু করল তার গলা দিয়ে। যেন এখনই কোন ধারাল অস্ত্র দি জবাই করা হয়েছে তাকে। দেখতে-দেখতে তার শরীরের কয়েক জায়গায় ফে গিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল গোটা দেহটা! ঠিক এমনি করেই চৈত্রের প্রচ দাবদাহে ফেটে চৌচির হয়ে যায় ফসলের মাঠ। ফোয়ারার মত রক্ত ঝরতে শু করল ফাটলগুলো দিয়ে!

মৃত্যুঘড়ি বহুকাল বাদেও তার ক্ষমতা জাহির করতে ছাড়ল না! তা তালিকায় যুক্ত হলো আরেকটি নাম—মিক কার্টার!

নীল পাহাড়ে

ঘড়িতে সকাল নয়টা বেজে পনেরো মিনিট হতে চলল। হিসেব মতে বেশ অনেকক্ষণ আগেই সকাল হয়ে গেছে, তবে বাস্তবতা হলো সূর্যমামার দেখা মেলেনি এখনও! কুয়াশার চাদরে মোড়া পাহাড়গুলোর দিকে তাকালে কেমন যেন অপার্থিব মনে হয় সবকিছু। শিশিরসিক্ত প্রকৃতি যেন আরও বেশি সবুজ, আরও বেশি সতেজ। একবার তাকিয়েই চট করে চোখ ফেরানো দায়!

এলাকাটা রাঙামাটি জেলার, বিলাইছড়ি। থানার সামনের বারান্দায় পাতা একখানা বেঞ্চে বসে গল্প করছেন দু'জন পুলিশ অফিসার। দু'জনের হাতেই ধূমায়িত চায়ের কাপ, সেই সাথে জ্বলন্ত সিগারেট। এমন হিম সকালে উষ্ণ চায়ের সাথে নিকোটিন মিশ্রিত ধোঁয়ার কোন জুড়ি নেই!

সাধারণত এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে অফিসারদের বদলি করা হয় তাদের অতীত কোন কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ! কোন অফিসারের উপর এলাকার প্রভাবশালী এম পি সাহেব রুষ্ট হয়েছেন? পাঠিয়ে দাও অফিসারকে রাঙামাটি! গডফাদারের কোন অস্ত্র বা ড্রাগের চালান আটক করেছে কোন বোকা অফিসার? পাঠিয়ে দাও খাগড়াছড়ি! প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই-এর ছোট শালার দাদুর বন্ধুর দূর সম্পর্কের নাতিকে কোন নিষিদ্ধ পল্লী থেকে পাকড়াও করেছে কোন আহাম্মক অফিসার? পাঠিয়ে দাও তাকে বান্দরবান!

এগুলোই যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে উঠেছে আজকাল! তবে সত্যিকার অপরাধের শাস্তিস্বরূপও কাউকে-কাউকে পাঠানো হয় এসব এলাকায়। ভাল খারাপ সব মহলেই আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই কোনমতেই। এসব নিয়েই আলাপ চলছিল দুই অফিসারের মধ্যে।

জাভেদ সাহেব গতকালই কেবল জয়েন করেছেন এই থানায়। তবে সাদেক সাহেব আছেন প্রায় মাস তিনেক ধরে। অচিরেই শহরে বদলি হয়ে যাবার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী তিনি। এখানে-ওখানে বেশ চেষ্টা তদবির করছেন। মনে হচ্ছে এযাত্রা কাজটা হয়েই যাবে। এই বিজন প্রান্তরে এসে, বউটাকে মিস না করলেও ছোট শালীকে খুবই মিস করেন তিনি!

'আমার কথা তো শুনলেন, জাভেদ ভাই। ঘুষ চেয়ে বসেছিলাম স্বয়ং স্পিকারের শালার কাছেই! এরপর আর এখানে না এসে উপায়ই বা কী? এবার আপনার কথা বলেন শুনি। আপনাকে বাঁশ দিল কার শালা?' বলেই মুচকি হেসে চোখ টিপলেন সাদেক সাহেব।

হো-হো করে হেসে উঠলেন জাভেদ সাহেব। 'তা, ভাই, বাঁশটা কিন্তু সত্যি এক শালাই দিয়েছে! তবে স্পিকারের নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। মন্ত্রী ব্যাটা বিয়েও করেছে গোটা পাঁচেক! তাই তার এই শালাটা যে তার কোন্ স্ত্রীর ভাই, এটা সঠিক জানা নেই আমার!'

হাসিতে যোগ দিলেন সাদেক সাহেবও। 'তা কী চেয়েছিলেন তার কাছে?'

'কিচ্ছু চাইনি রে, ভাই! উল্টো তার দিতে চাওয়া ঘুষ নেইনি বলেই আজ আমি এখানে। তার সবচেয়ে বড় মদের গুদামটা জব্দ করে সিলগালা করে দিয়েছিলাম। আমাকে যখন লাখ দুয়েক টাকা অফার করল, সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে সুদ্ধ হাজতে পুরে দিলাম! বিকেল নাগাদই অবশ্য সে ছাড়া পেয়ে গেল! আর দিন তিনেকের মধ্যে আমি হাতে পেয়ে গেলাম ট্রান্সফার অর্ডার!'

'আপনি মানুষটা, ভাই, বেশি সরল-সোজা। আজকের জামানায় এমন মানুষ অচল, ভাই।' বললেন সাদেক সাহেব।

'একটা অচল ঘড়িও কিন্তু দিনে অন্তত দু'বার সঠিক সময় দেখায়, সাদেক ভাই।' হেসে বললেন জাভেদ সাহেব।

'তা অবশ্য মন্দ বলেননি। কিন্তু কী জানেন, কাটার জন্য মানুষ আগে সোজা গাছগুলোকেই বেছে নেয়! না হয় হয়তো আপনাকে আজ এখানে বসে থাকতে হত না।'

হাসি মুছে গেছে সাদেক সাহেবের মুখ থেকে। জাভেদ সাহেবও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে সায় জানালেন। ঠিক তখনই একটা সবুজ রঙের পুরানো ধাঁচের জিপগাড়ি এসে থানার সামনে থামল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ড্রাইভারের সিটের পাশের দরজাটা। একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক চট করে নেমে এলেন গাড়ি থেকে। চোখেমুখে কেমন একটা উদভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁর! নেমেই দ্রুত হেঁটে, কিংবা বলা ভাল দৌড়ে, চলে গেলেন থানার ভিতরে। বারান্দায় বসা লোক দু'জনকে একদম লক্ষই করলেন না যেন! ভিতরে গিয়ে ডিউটি অফিসারের ডেস্কের সামনে গিয়ে কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়ালেন। যেন গোপন কোন কিছু বলতে এসেছেন। তারপর ফিসফিস করে কী-কী যেন বকে চললেন একনাগাড়ে! অফিসার শুনছে কি শুনছে না, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও নেই তাঁর! বলা শেষে অফিসারকে পাল্টা কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন!

বারান্দায় বসে থাকা জাভেদ সাহেব এবং সাদেক সাহেব চায়ের কাপ হাতে নিয়েই ভিতরে চললেন। কী বৃত্তান্ত, জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে তাঁদের। জানা গেল, ভদ্রলোক গতকাল সারাদিন পর্বতের গহীনে ক্যাম্পিং করে সন্ধ্যায় ফিরতি পথ ধরেছিলেন। পথে আচমকা গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় তাঁর। এরপর গতরাতে যখন নীল পাহাড়ের পাশের রাস্তা ধরে আসছিলেন, হঠাৎ দেখতে পান পথের পাশেই কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে! এতরাতে এমন বিজন এলাকায় একাকী কারও দাঁড়িয়ে থাকা ভীষণ অবাক করে তাঁকে। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে থাকায় মানুষটার চেহারা দেখতে পাননি তিনি। তবে মাথার

লম্বা চুল দেখে মেয়েলোক বলেই মনে হয়েছে তাঁর কাছে। তবে অবাক করা ব্যাপারটা হলো, দৈহিক গড়নটা ছিল একটা ছয়-সাত বছরের বাচ্চার মতন! তবে এত ছোট বাচ্চার এত লম্বা চুল হওয়াটাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়! কিছুই যেন ঠিক মিলছিল না। তার উপর নীল পাহাড়ের আশপাশে বহু মাইল জুড়ে কোন লোক-বসতিও তো নেই! এমনকী আদিবাসীরাও এলাকাটা কেন যেন এড়িয়ে চলে। হঠাৎ করেই অজানা ভয় ভদ্রলোককে গ্রাস করে ফেলে! তাই গাড়ি না থামিয়েই ওখান থেকে চলে এসেছেন তিনি। তারপর একটানা কোথাও না থেমে এতটা পথ ছুটে এসেছেন। ফেরার পথে তাঁর বার-বার মনে হয়েছে, কে যেন তাড়া করে ফিরছে তাঁকে! রিয়ারভিউ মিররে বেশ কয়েকবার নাকি ওই লম্বা চুলের মানুষটাকে দেখেছেন তিনি। তবে সেটা তাঁর মনের ভুল কি না, সে ব্যাপারে তিনি নিজেও খুব একটা নিশ্চিত নন।

সব শোনার পর জাভেদ সাহেব বললেন, তাঁদের পক্ষ থেকে অবশ্যই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত। জাভেদ সাহেবকে অবাক করে দিয়ে তাঁর কথা শুনে একযোগে হেসে উঠলেন সাদেক সাহেব এবং ডিউটি অফিসার! হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জাভেদ সাহেব, বুঝতে পারছেন না তিনি হাসির কী বললেন! পরে জানতে পারলেন, এমন অভিযোগ গত দু'মাসে অন্তত গোটা দশেক এসেছে। প্রতিবারই পুলিশ দিনের বেলা গিয়ে জায়গাটায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে এসেছে। তবে বলাই বাহুল্য যে, প্রতিবারই তাদেরকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে! সামান্যতম চিহ্নও পাওয়া যায়নি ওই রহস্যময় বাচ্চা মেয়েটার। তাই এ ব্যাপারে আর সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না।

'দিনে না পাওয়া গেলে, রাতে যাব। যেহেতু প্রতিবারই বাচ্চাটাকে রাতের বেলা দেখা গেছে, তা হলে রাতে গেলে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যেতে পারে ওখানে।' বললেন জাভেদ সাহেব।

তাঁর কথা শুনে বাকিরা চোখ কপালে তুললেন। বিস্মিত হয়ে বললেন সাদেক সাহেব, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জাভেদ ভাই? রাতের বেলা নীল পাহাড়ে যাব কি পিতৃপ্রদত্ত প্রাণটা খোয়াতে?'

'কেন? কী এমন হবে রাতে গেলে?'

'ওই এলাকাটা ভাল না মোটেও, ভাই। এই অঞ্চলের মানুষজন সন্ধ্যার পর আর ওদিকটা মাড়ায় না কেউই! এমনকী আদিবাসীরাও না! বোকা টুরিস্টদের রাতের বেলা ওদিকে থাকতে নিষেধ করে নোটিশ দেয়া আছে শহরের এখানে-ওখানে। কথাটা সবাই মেনে চলে সাধ্যমত। যে দুয়েকজন নিষেধ অমান্য করে, তাদের কেউ-কেউ এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পায় স্বচক্ষে। ওদিকটায় বেশ কিছু মানুষ অপঘাতে মারাও গেছে, যাদের মৃত্যুর কারণ আমরা আজ অবধি আবিষ্কার করতে পারিনি!'

'বলেন কী!'

'এজন্যই বলছি, ভাই, রাতে যাবার চিন্তা ভুলেও মাথায় আনবেন না। আমাদের কাজ চোর-ছ্যাঁচড় ধরা, কিন্তু ভূত-প্রেতের পিছু নিয়ে কাজ নেই

আমাদের।'

'এ যুগে ভূত-প্রেত বলতে কিছু আছে নাকি, ভাই? কী যে বলেন! হয়তো অপরাধীরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে ওই এলাকাটা থেকে দূরে রেখে কোন অনৈতিক কাজের আখড়া খুলে বসেছে সেখানে। জায়গাটা তো এমনিতেও বর্ডারের খুবই কাছে। তা ছাড়া জনগণের নিরাপত্তা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। সে দায়িত্বে গাফিলতি করলে চলবে কেন? আমাদের উচিত রাতে তদন্ত করে দেখা এবং রাস্তাটা সবার জন্য নিরাপদ করতে সচেষ্ট হওয়া!'

'আমরা এসবে নাই, ভাই! আপনার বেশি ইচ্ছে হলে আপনি একা তদন্ত করেন। আমি, ভাই, বড্ড ভীরু মানুষ!' হেসে বললেন সাদেক সাহেব। সেই সাথে চোখ টিপতেও ভুললেন না।

মুচকি হাসলেন জাভেদ সাহেব। তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে, কী আর করা! আপনারা কেউ যেতে না চাইলে আমি একাই যাব না হয়!'

ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ল। ডিউটি অফিসার এবং সাদেক সাহেব, দু'জনেই ধরে নিলেন যে জাভেদ সাহেব নিশ্চয়ই একা এই দুরূহ কাজ সম্পাদনের সাহস করবেন না! তবে তাঁরা জানতেন না যে, তাঁদের ধারণাটা পুরোপুরি ভুল ছিল!

রাত বারোটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে বেরোলেন জাভেদ সাহেব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন নীল পাহাড়ের কাছের রাস্তাটায়। কুয়াশা যেন আরও ভারী হয়ে পড়ছে এখন! কয়েক হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট ঠাহর করা যায় না, এমনই ঘন। শীতটাও অন্যান্য দিনের চেয়ে খানিকটা বেশিই মনে হলো জাভেদ সাহেবের কাছে। আনমনেই গলার মাফলারটা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিলেন তিনি। চঞ্চল চোখদুটো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্দেহজনক কোনকিছুর খোঁজে! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আশপাশে চোরাচালান দলের আস্তানা না থেকেই পারে না!

পরক্ষণেই হেড লাইটের আলোয় ধরা পড়ল রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তিটির অবয়ব! সকালের ভদ্রলোকের বর্ণনার সাথে হুবহু মিল পাওয়া গেল। নিজে থেকে বানিয়ে-বানিয়ে গুল মারেননি তিনি।

রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অনড় হয়ে। মাথার পিছনে ছড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল। অথচ শরীরের গড়ন দেখলে দিব্যি শিশু বলে ভ্রম হয়! কী এটা? নড়ছে না কেন? কাকতাড়ুয়া নাকি? আপনমনেই ভাবলেন জাভেদ সাহেব। হেডলাইট জ্বেলে রেখেই গাড়ি থেকে নামলেন। হোলস্টার থেকে খাপমুক্ত করে পিস্তলটা নিয়ে নিলেন ডান হাতে। তারপর পা টিপে-টিপে এগোতে লাগলেন অদ্ভুত আকৃতিটার দিকে।

দূরের পাহাড়ের কোন একটা গুহায় একটা শেয়াল ডেকে উঠল তারস্বরে। কুয়াশা মিশ্রিত বাতাসে ভর করে শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে। অকারণেই বুকটা কেঁপে উঠল জাভেদ সাহেবের। গায়ের পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে সেই কখন! ধীরে-ধীরে ছায়ামূর্তিটির একেবারে কাছে পৌঁছে গেলেন জাভেদ সাহেব।

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, এতটাই কাছে!

আচমকা জাভেদ সাহেবের দিকে ফিরে তাকাল ওটা! চোখের জায়গায় শূন্য কোটর, কঙ্কালের মত মুখ। মুহূর্তেই তীব্র আতঙ্কে জায়গায় জমে বরফ হয়ে গেলেন জাভেদ সাহেব! দু'চোখ পুরোপুরি বিস্ফারিত তাঁর, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে যেন! গলার কাছটায় কী যেন একটা আটকে আছে, দম নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! পা দুটো যেন দেহের ভার রাখতে চাইছে না আর কোনমতেই! যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বার অপেক্ষায়! একেবারে অন্তিম মুহূর্তে বোধোদয় হলো, সবার নিষেধ উপেক্ষা করে এখানে আসাটা মোটেও উচিত হয়নি তাঁর!

ডেসটিনি

বাবুল সাহেবের অদ্ভুত বাতিকটার ব্যাপারে তাঁর আশপাশের মানুষজন বেশ আগে থেকেই ওয়াকিবহাল। কেউ তাঁর আশঙ্কাটিকে সামান্যতম গুরুত্বও না দেয়ায়, অনেকদিন ধরেই বেশ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আছেন তিনি। বিষয়টা হয়তো তেমন গুরুতর কিছু নয়, তবে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মত হালকাও নিশ্চয়ই নয়, তাই না? মানুষগুলো তো আর এমনি-এমনি অক্কা পায়নি। ব্যাপারটা হলো, বাবুল সাহেবের কেবলই মনে হয় যে, ওনার মৃত্যু হবে মাথায় নারিকেল পড়ে। পত্রিকার পাতায় একবার পড়েছিলেন যে, প্রতি বছর অন্তত শ'তিনেক মানব সন্তান পটল তোলে মাথায় নারিকেল পড়ে! সেই থেকেই অমন অদ্ভুত চিন্তাটা একেবারে তাঁর ঘিলুতে গেঁথে গেছে। তাঁর কাছের লোকজন এ ব্যাপারে তাঁকে বোঝাতে-বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়েছে। একজন বয়স্ক মানুষের সাথে কাঁহাতক আর বাদানুবাদ করা যায়? উনি তো আর দুধের শিশু নন!

তাই এই ভ্রম নিয়েই বসবাস করছিলেন বাবুল সাহেব। তবে চাকরির বদলির সুবাদে নোয়াখালীর উকিলপাড়ায় বাসা নেবার পর থেকে তাঁর এই ভ্রান্তিটা এক লাফে বেড়ে গেল বহুগুণে! এমনিতেই নোয়াখালীতে নারিকেল গাছের সংখ্যা অনেক বেশি, এখানে-সেখানে মাথা তুলে তারা ঠায় দাঁড়িয়ে। তার উপর, অফিসে যাবার রাস্তাতেই যদি একখানা বুড়ো গাছ কোমর বাঁকিয়ে একেবারে মাথার উপর এসে ঠাঁই নেয়, তা হলে কেমনটা লাগে? বাবুল সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গাছের ডাব-নারিকেলের আঘাতেই ঘটনাটা ঘটবে! রোজ সকাল-বিকাল তাঁকে বহনকারী রিক্সাটা যখন গাছটার নীচ দিয়ে যায়, তখন চোখে-মুখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি! তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে, এই বুঝি একখানা শেলসম নারিকেল ছুটে এসে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল! তাঁর বুক একনাগাড়ে ধুকপুক করতে থাকে, রক্তচাপ বেড়ে যায়। জায়গাটা পার হবার পরও অনেকক্ষণ লেগে যায় পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে। ততক্ষণে ঘেমে নেয়ে একেবারে বিতিকিচ্ছি অবস্থা হয়ে যায় তাঁর!

প্রতিদিন দু'বার করে অমন মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে কারই বা ভাল লাগে! তাই অবশেষে বাবুল সাহেব সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন, বাসা বদলে ফেলবেন অচিরেই। অফিসের করিৎকর্মা পিয়ন, ইকরামুলকে দায়িত্ব দিলেন নতুন একখানা বাড়ি খুঁজে দেয়ার জন্য। পইপই করে বারংবার বলে দিলেন, যাওয়া-আসার রাস্তায় কোন নারিকেল গাছ থাকা চলবে না কোনমতেই। বাকি সবদিকে

উনি ছাড় দিতে একপায়ে খাড়া, শুধু এই একটা বিষয়েই খেয়াল রাখতে হবে ভাল করে।

ইকরামুল বাসা খুঁজে যায়, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত বাসাটির আর কিছুতেই খোঁজ মেলে না! মিলবেই বা কী করে? নারিকেল গাছে সয়লাব চারপাশ। তবু হাল ছাড়ে না সে, বড় সাহেবের সুনজরে আসার এমন সুযোগ হাতছাড়া করার কোন ম্যানে হয় না!

এক সন্ধ্যায় বসার ঘরের সোফায় শরীর এলিয়ে টিভি দেখছিলেন বাবুল সাহেব। সান্ধ্য খবরগুলো দেখা তাঁর রোজকার রুটিন। ঠিক তখনই বাড়ির দারোয়ান মকবুল সুখবরটা নিয়ে আসে! রাস্তা পাকা করার জন্য মোড়ের বাঁকা নারিকেল গাছটা কাটতে এসেছে পৌরসভার লোকজন। বাবুল সাহেবের নারিকেল গাছ ভীতির কথা মকবুলের কাছেও আর গোপন নেই ততদিনে! আদতেই ভীষণ খুশি হলেন বাবুল সাহেব। রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে সুসংবাদটা জানাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না! তারপর একখানা শার্ট গায়ে চড়িয়ে, তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়লেন স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখার জন্য। ব্যাপারটা নিজের চোখে না দেখতে পারলে পরিতৃপ্তি পাবেন না তিনি কোনমতেই!

ইতোমধ্যেই অবশ্য ঘটনাস্থলে বেশ কিছু লোকজনের জটলা দেখা যাচ্ছে। গাছটাকে গোল করে ঘিরে ধরে একমনে কাঠুরেদের কাজ দেখছে সবাই। সেই সাথে ক্ষণে-ক্ষণে নানারকম মন্তব্য করছে। মন্তব্যগুলো শুনলে যে কারও মনে হবে, এরা সবাই গাছ কাটার ব্যাপারে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী! জীবনটা তারা এই ব্যাপারে গবেষণা করেই কাটিয়েছে যেন!

ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে রীতিমত বেগ পেতে হলো বাবুল সাহেবকে, কেউই নিজের অবস্থান ছাড়তে রাজি নয়! তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না, এত লোকের এখানে জটলা করার কারণটা কী! কোন কাজ-কর্ম নেই এদের? গাছ কাটাও কি এভাবে ভিড় করে দেখার মত একটা জিনিস! নাকি এরাও এতদিন তাঁর মত গাছটা নিয়ে ভয়ে ছিল?!

একেবারে কাছে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত কাঠুরেদের করাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন বাবুল সাহেব। করাতের প্রতিটি টানের সাথে-সাথে তাঁর আততায়ীটির অবলুপ্তি ঘটছে, এটা ভাবতে গিয়ে ক্ষণে-ক্ষণেই ভীষণ পুলকিত হয়ে উঠছেন তিনি! আহা, আজ তাঁর কতই না আনন্দের দিন!

খানিক বাদেই রাস্তায় একটা শোরগোলের মতন শুনতে পেলেন মিসেস বাবুল। জানা গেল, ঠিকমত কাটা শেষ হবার আগেই মাঝখান থেকে মড়মড় করে ভেঙে পড়েছিল বুড়ো নারিকেল গাছটা! আর পড়বি তো পড়, একেবারে ভিড়ের উপরই পড়েছিল। গোটা কয়েক মানুষ বেশ ভালরকম আহত হয়েছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা রীতিমত আশঙ্কাজনক, তাকে চটজলদি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। মনে-মনে কিছুক্ষণ বেচারার জন্য আফসোস করে, আবারও রান্নায় মনোযোগ দিলেন মিসেস বাবুল। ভাবতে লাগলেন, ডালে কি আরও খানিকটা

লবণ দেবেন? কেমন কম-কম আনুনা লাগছে না?

তাঁর জানা নেই, হাসপাতালে নেয়া মানুষটা স্বয়ং বাবুল সাহেব! তাঁর এটাও জানা নেই, হাসপাতালে নেবার পথেই মারা গেছেন তিনি, কর্তব্যরত চিকিৎসক এই মুহূর্তে তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট লেখায় ব্যস্ত!

বাবুল সাহেবের এতদিনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়েছে! ডাব কিংবা নারিকেল পড়ে নয়, তাঁর মৃত্যু হয়েছে গোটা গাছটাই ভেঙে পড়ে!

শেষমেশ ডালে আরও খানিকটা লবণ দিয়েই দিলেন মিসেস বাবুল। লবণ কম হলে, চেঁচামেচি করে পুরো বাড়ি মাথায় তোলেন বাবুল সাহেব!

নেমেসিস

গত দু'দিন ধরে টানা পথ চলছে মরগান। কেবলমাত্র ঘোড়াকে বিশ্রাম দেবার জন্য বারকয়েক থামা ছাড়া, সময় নষ্ট করেনি মোটেও। এই বিজন প্রান্তরে ঘোড়াটা মারা পড়লে, সে-ও মারা পড়বে, এটা ভালই জানা আছে তার। তাই ঘোড়ার শক্তি সাশ্রয় করতে গিয়ে, মাঝে-মাঝে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নিজেও হাঁটছে সে রুক্ষ বালির উপর দিয়ে। মরুভূমিটা লম্বায় প্রায় নব্বই মাইলের মত হবে। এতটা পথ পাড়ি দিতে গিয়ে ইতোমধ্যেই তার পানির ক্যান্টিনগুলো শেষ হবার পথে। অচিরেই পানি না পেলে কপালে বেশ দুর্ভোগ আছে নিশ্চিত। রাতের বেলাতেও পথ চলা থামায়নি মরগান। অথচ এমন তাড়াহুড়ো করার কোন কারণই নেই। প্রথম দিকে আকাশের তারা দেখেই পথ চিনে এগোচ্ছিল। পরে হাতের বামদিকে কিছুটা দূরে একটা সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়াকেই নিশানা বানিয়েছে। এখন দিনের আলোয় মরুভূমির বিশাল সাদা প্রান্তরে একখানা ক্ষুদ্র কালো বিন্দুর মতই দেখাচ্ছে ওকে। ট্র্যাকটা পুবের দিক থেকে বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে পশ্চিমে এসে, আবার উত্তরে মোড় নিয়েছে।

সূর্য-রশ্মিগুলো যেন একেকটা আগুনের বর্শার মতই এসে বিঁধছে ওর গায়ে। সূর্যটা আরও খানিকটা মাথার উপর উঠে এলে, মরুভূমির সাদা বালি একেবারে লোহা গলানোর ব্লাস্ট ফারনেসে পরিণত হলো! দিগন্তের দৃশ্যগুলো আর স্থির নেই মোটেও, ক্রমাগত কাঁপছে যেন সবকিছু!

তীব্র আলোর মধ্য দিয়ে, হ্যাটের ব্রিমের তলা দিয়ে চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল মরগান। আশ্বস্ত হলো, পাহাড়গুলো আর খুব একটা দূরে নেই। খানিকটা ছায়া অচিরেই মিলবে, ভাগ্য ভাল থাকলে পানিও।

উঁচু পাহাড়ের ধারে ছোট টিলাগুলোর কাছে এসে একটা অস্পষ্ট ট্রেইল চোখে পড়ল তার। ছড়ানো পাথর, রোদে পোড়া ঘাস আর গ্রিজউডের ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে গিরিখাতের দিকে। ট্রেইলটার চেহারাই বলে দিচ্ছে, তেমন একটা ব্যবহার হয় না ওটা। তবু মরুভূমি ছেড়ে ওটা ধরেই চলার সিদ্ধান্ত নিল মরগান। দেখতে চায়, কোথায় তাকে নিয়ে যায় এটা! তা ছাড়া জলদি কোথাও পৌঁছবার তাড়াও তো নেই তার!

আইনের লোক তার নাগাল পেয়ে যাবে, এমন ভয় করছে না সে মোটেও। ডেপুটি শেরিফ রবার্ট নচকে খুন করার পর পাসির যে দলটা পিছু নিয়েছিল, তারা বহু আগেই তার ট্র্যাক হারিয়ে ফিরতি পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে। রিজের উপর

আয়েশ করে দাঁড়িয়ে, নিজে তাদের যাওয়া লক্ষ করেছে মরগান। রোদেপোড়া ব্যর্থ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতি করুণা বোধ করেছে সে, পরিতৃপ্তির হাসি হেসেছে প্রাণভরে। নিজের ধূর্ততার প্রশংসা করেছে বারংবার।

দু'দিন আগে মরুভূমির বুকে ও যা করে এসেছে, সেকথাও জানার কথা নয় কারও। কোন প্রমাণ ছেড়ে আসেনি সে। এতটুকু সতর্কতা তার আছে বলেই এই আউট-ল জীবনটা এতকাল ধরে কাটাতে পারছে সে।

মরুভূমিতে পথ চলতে-চলতেই ওয়াগনটার দেখা পেয়ে গিয়েছিল মরগান। চারটা খচ্চর টানা একখানা ওয়াগনে চড়ে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিল এক হোমস্টিডার পরিবার। স্বামী-স্ত্রীর সাথে ছিল তাদের গোটা জীবনের সমস্ত সঞ্চয়।

সে রাতটা নেস্টর পরিবারটির সাথেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মরগান। তখনও অবশ্য মনে কোনরকম দুরভিসন্ধি জাগেনি তার। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে স্বামী-স্ত্রীকে প্রেম করতে দেখে নিমিষেই যেন মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল তার! সুন্দরী যুবতীটির অর্ধনগ্ন দেহ তার মনের পশুটিকে জাগিয়ে তুলেছিল পুরোপুরি। বহুদিন নারীদেহের স্বাদ না পাওয়া অভুক্ত পশুটিকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কিছুতেই! একটা বন্য জন্তুর মতই হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে মেয়েটির উপর।

চোখের সামনে এসব দেখলে কোন স্বামী কি চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে? না, স্বামী বেচারাটি বসে থাকেওনি! হাত বাড়িয়েছিল নিজের রাইফেলটির দিকে।

কিন্তু অস্ত্রে অনভ্যস্ত একজন খেটে খাওয়া মানুষ একজন দাগী আসামীর সাথে পারবে কেন? কোল্টের দুই গুলিতেই বেচারার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয় মরগান! তারপর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকা অসহায় মেয়েটির উপরই নিজের কুৎসিত লালসা চরিতার্থ করে সে! কাজ সমাধার পর, তাকেও বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণ খুঁজে পায়নি। কী দরকার ঝামেলা বয়ে বেড়ানোর?

পরিবারটির এতদিন ধরে তিল-তিল করে জমানো টাকার থলেটা স্যাডল ব্যাগে পুরে, মরগান যখন ওই জায়গাটা ত্যাগ করল, স্বামী-স্ত্রীর লাশগুলো ওখানেই পড়ে রইল মড়াখেকো কোন জানোয়ারের প্রতীক্ষায়!

বড় একটা বোল্ডার পেরোতেই শহরটা হঠাৎই চোখে পড়ল মরগানের। টিলাগুলোর আড়ালে থাকায় এতক্ষণ ঘুণাক্ষরেও ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি! এদিকে কোন শহর আছে, এটা কোনদিনও শোনেনি সে! তা হলে আচমকা এল কোত্থেকে ওটা? নাম কী ওটার? নাকি মরুভূমি ছেড়ে কেউ কখনও এই ম্রিয়মাণ ট্রেইল মাড়ায়নি বলে এতকাল ধরে গোপন ছিল ওটার কথা!

যাই হোক, আপনমনে নিজের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করল মরগান। এই ট্রেইলে না এসে মরুভূমি ধরে চললে, আরও কতটা সময় বিনা বিশ্রামে পথ চলতে হত, খোদা মালুম!

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে, যত দ্রুত সম্ভব শহরটাতে পৌঁছতে চায়।

শুষ্ক গলায় হুইস্কি ঢালার জন্য তার আর তর সইছে না কোনমতেই।

সতর্কভাবে শহরে ঢুকল মরগান। টানটান হয়ে আছে স্নায়ু, হোলস্টারের ফিতা ঢিলে করে বাঁধা। যে-কোন বিপদ মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণ তৈরি সে।

কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ করল না তাকে, সামনের রাস্তাটা পুরোপুরি ফাঁকা! অবাক চোখে চারদিক জরিপ করতে-করতে শহরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে।

এই ভরদুপুরে রাস্তায় মানুষজন না থাকা অবশ্য তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয় পশ্চিমের শহরগুলোতে। এসময়টা লোকে ঘরের কোনায় কিংবা সেলুনের ভিতরে বিশ্রাম নিতেই পছন্দ করে। কোন অস্বাভাবিকতা নেই ফলস ফ্রন্টের দালানগুলোর গঠনেও। তবে চারদিক যেন স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই নীরব!

ধূলিমলিন রাস্তায় কোন ঘেয়ো কুকুর চোখে পড়ছে না। হিচিং রেইলগুলোও খাঁ-খাঁ করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে পা ফেলছে না কোন ঘোড়া! কোন বাড়ির চিমনিতে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না, দালানগুলোর ভিতর থেকে ভেসে আসছে না কোন বেহেড মাতালের অসংলগ্ন চিৎকার। বোর্ডওয়কগুলোতে মচ-মচ শব্দ তুলছে না কোন পাঞ্চারের পুরানো বুট।

সহসা মনের গভীরে কু ডেকে উঠল মরগানের! কী করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। শেষমেশ অবশ্য কৌতূহলেরই জয় হলো! হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে, সেলুনের দিকে পা বাড়াল সে। তার হাতের ঠেলায় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল ব্যাটউইং ডোর, সতর্কতার সঙ্গে ভিতরে পা রাখল সে। ফাঁকা সেলুন, কেউ নেই ভিতরে!

বারের পিছনের তাকে সারি-সারি মদের বোতল শোভা পাচ্ছে। পোকার চিপস আর অগোছাল তাসের পেটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে! বাতাসে ভাসছে চুরুট আর হুইস্কির কড়া গন্ধ। ছাদ থেকে নেমে আসা বাতিগুলোর উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক, কিন্তু কোন মানুষজন নেই! গেছে কোথায় লোকজন?

বেশিক্ষণ অবশ্য ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ পেল না সে। চোখের সামনে এতগুলো মদের বোতল থাকলে, তৃষ্ণার্ত কারও পক্ষে স্বাভাবিক ভাবনা-চিন্তা করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

র‍্যাক থেকে একটা রাই হুইস্কির বোতল নামাল মরগান। তারপর গ্লাসে চার আঙুল পরিমাণ ঢেলে, সাগ্রহে চুমুক দিল। কুলকুচি করে মুখের ভিতরের বালিগুলোসহ কোঁত করে পেটে চালান করে দিল সবটুকু তরল। তারপর আবারও হাত বাড়াল বোতলের দিকে। কয়েক পেগ পেটে পড়তেই, শান্ত হয়ে বসে পরিস্থিতি বিচার করার প্রয়াস পেল সে। ধীর পায়ে হেঁটে, সেলুন থেকে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। পায়ে হেঁটেই গোটা শহরটা ঘুরে দেখতে লাগল সে। অতটা বড় নয় শহরটা, হেঁটে দেখতে তেমন একটা কষ্ট হওয়ার কথা না। শেরিফের অফিস, লিভারি স্টেবল, জেনারেল স্টোর, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কামারশালা, জেল হাউস, ব্যাংক...সব খালি! জনমানবের কোন চিহ্নও নেই কোথাও!

কী ঘটেছে আসলে এখানে? ইণ্ডিয়ান রেইড?

কিন্তু অনেক খুঁজেও খুনোখুনির চিহ্ন দেখতে পায়নি সে কোথাও! তা ছাড়া ইণ্ডিয়ানরা হলে অবশ্যই লুটতরাজ করত। অথচ দেখা যাচ্ছে, মালপত্তরগুলো বহাল তবিয়তেই রয়েছে এখনও!

এমনকী জেনারেল স্টোরের র‍্যাকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও সাজানো রয়েছে যথাস্থানে! ইণ্ডিয়ানরা এগুলো অন্তত রেখে যেত না কোনমতেই!

তা হলে?

সহসা একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মরগানের মাথায়।

গোল্ডরাশ!

হ্যাঁ, এটাই একমাত্র জবাব হতে পারে।

আশপাশের কোথাও নিশ্চয়ই নতুন কোন স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া গেছে, অমনি শহরের সবক'টা লোক নিজেদের ঘর-বাড়ি সব ফেলে, ওয়াগন নিয়ে ছুটেছে সোনার খোঁজে! সবারই জানা আছে, সোনা পেলে রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটানো যাবে পশ্চিমের যে-কোন সমৃদ্ধ শহরে।

চকিতেই শয়তানী বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মরগানের মনে! ব্যাংকের কী অবস্থা?

প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকল সে শহরের একমাত্র পাথুরে দালানটার ভিতরে। উপরে রঙচঙা সাইনবোর্ড ঝুলছে, স্টার ব্যাংক। ব্যাংকের ভল্ট খুঁজে পেতে বেশি একটা সময় লাগল না তার। সিক্সগানের এক গুলিতেই উড়ে গেল তালা। ডালা খুলে ভিতরে উঁকি দিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না মরগান কিছুতেই! থরে-থরে ডলার সাজানো, এককোণে সারিবদ্ধভাবে পড়ে রয়েছে কিছু সোনার বার! এগুলো ফেলে কী করে গেল ব্যাংকার লোকটা? গোল্ডরাশ মানুষের মাথা কতটা খারাপ করে দেয়, এসব ভাবতে-ভাবতেই কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল মরগানের ঠোঁটের কোণে।

মোটেও সময় নষ্ট করল না সে। কখন আবার লোকজন ফিরে আসতে শুরু করে, তার কোন নিশ্চয়তাই নেই! তার অভিজ্ঞতা বলে, বেশিরভাগ গোল্ডরাশ যতটা দ্রুত শুরু হয়, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়! লোকের মোহভঙ্গ হতে সময় লাগে না তেমন একটা। কপালভাঙা গান শুনতে-শুনতে আপন ডেরায় ফেরত আসে অভাগা লোকজন!

একখানা বড় স্যাডলব্যাগে ডলার আর সোনার বারগুলো ভরে নিল মরগান তারপর রাস্তায় নেমে এসে দ্রুত ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। এখনই শহর ছাড়তে চায় সে, এই টাকা দিয়ে বাকি জীবনটা অনায়াসে ফুর্তি করে কাটানো যাবে।

চোখ তুলে সামনে তাকাতেই ভীষণরকম চমকে উঠল মরগান। চারপাশ কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে, কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ! অথচ খানিকক্ষণ আগেও দাবদাহের কারণে রাস্তায় দাঁড়ানো রীতিমত দায় ছিল! একরত্তি মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না গোটা আসমান জুড়ে! ব্যাংকের কাজটা শেষ করতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগেনি তার। এই অল্প সময়ে কী করে এমন আমূল বদলে গেল প্রকৃতি?!

শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইতে শুরু করল। চেপে ধরার আগেই দমকা হাওয়ার তোড়ে উড়ে চলে গেল মরগানের মাথার হ্যাট। ধুলোর ঝড়ের কারণে চোখ খোলা রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

আচমকা একযোগে বন্ধ হয়ে গেল শহরের সবক'টা দালানের দরজা-জানালা! রীতিমত আঁতকে উঠল মরগান, কে বন্ধ করল ওগুলো?! ঠিক তখনই সামনে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার। কারা যেন ধীর লয়ে হেঁটে আসছে সামনের পথ ধরে! আরও খানিকটা কাছে আসার পর দেখা গেল, আরোহীবিহীন পাঁচটা বিশাল কালো ঘোড়া পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে! ঢোক গিলে পিছনে তাকিয়েও একই দৃশ্য দেখতে পেল মরগান! ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে!

আতঙ্কে জায়গায় জমে বরফ হয়ে গেল সে। ঘোড়াগুলোর চালচলনে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মরগানের চোখে ধরা না পড়লেও, আরোহী অবশ্যই আছে তাদের পিঠে! কারা এই গোস্ট রাইডার?

সামনে-পিছনে দু'দিক থেকেই আচমকা তার দিকে উড়ে এল দশটা ল্যাসোর ফাঁস! নিমিষেই মাথা গলে নীচে নেমে বুক আর পেটের কাছটায় শক্ত করে এঁটে বসল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে বন্দি হলো মরগান! তারপর তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল ওরা।

প্রচণ্ড ভয়ে কখন যে নিজের তলপেট খালি করে দিয়েছে, এটা মরগান নিজেও জানে না! রেকাব বেয়ে রুক্ষ মাটির বুকে পড়তে লাগল ফোঁটায়-ফোঁটায় উষ্ণ তরল। নিজের অজান্তেই চোখ বন্ধ করে ফেলল মরগান। এমন আতঙ্ক সহ্য করার সামর্থ্য নেই আর তার। খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে নিজেকে একটা ফাঁসির মঞ্চে আবিষ্কার করল সে! গলায় নেমে এসেছে একখানা মোটা দড়ির ফাঁস, ঘাড়ের কাছটায় শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে গিঁট! যে-কোন সময় পায়ের তলার পাটাতন সরে যাবে, জীবনাবসান ঘটবে এক মানুষরূপী পশুর। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার গোস্ট রাইডারদেরকে দেখতে চাইল মরগান। কাউকে চোখে পড়ল না তার! আবারও চোখ মুদল। জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় পাপ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। চিৎকার করে উঠল মরগান! এই নরক যন্ত্রণা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়, ততই ভাল!

উখিনী

এক

আমার বৈঠকখানাটা খুব একটা ছোট নয়, বেশ বড়ই বলা চলে। ঘরের একধা দুই সেট সোফা বসিয়ে রেখেছি, আরেক পাশে দেয়াল ঘেঁষে পেতে রেখেছি ভা তোষকের বিছানা। তাতে সুন্দর করে সাজানো গোটা কয়েক বাহারি রঙে কুশন। মেঝে জুড়ে বিছানো রয়েছে দামী, পুরু, ভিনদেশী কার্পেট।

একখানা টোটকা ব্যবসা থেকে আজকাল জলের মত পয়সা কামাচ্ছি, তা খরচও করছি দেদারসে। ছোটবেলা থেকেই আমি বেশ শৌখিন প্রকৃতির। বলতেন, 'খোকা, তোর অনেক পয়সা হবে ঠিকই, তবে তুই সেটা ধরে রাখ পারবি না। তোর পয়সা, তোর নিজের ভোগে লাগবে না বেশিদিন।'

দেখা যাচ্ছে, মায়ের সব কথা সত্যি হয়নি। দিব্যি আমি সুখে শান্তি ভোগদখল করে চলেছি নিজের কামানো কাঁচা পয়সাগুলো। যা হোক, ঘরটায় জ বিশেক লোক একসাথে বসে দিব্যি আরাম করে আড্ডা দেয়া যায়। আর এ মুহূর্তে আমরা আছি সাকুল্যে চারজন মানুষ। নরেন বাবু, আমার বন্ধু মাসুন, নরে বাবুর কলিগ সঞ্জয় দেবনাথ আর অতিথিসেবক হিসেবে স্বয়ং আমি। বৃহস্পতিবা তাই কারোরই ঘরে ফেরার খুব একটা তাড়া নেই। তা ছাড়া বাইরে প্রচণ্ড ঝ তুফান শুরু হয়েছে, তাই চাইলেই যে কেউ হুট করে চলে যেতে পারবে, ব্যাপার এমনও নয়।

আষাঢ় মাস আসতে এখনও দিন কয়েক বাকি রয়েছে, এরমধ্যে বৈশা কিছু রয়ে যাওয়া কালবৈশাখী, সেই সাথে আষাঢ়ের কিছু আগাম ঢল, দু'য়ে মি রীতিমত তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে। জ্যৈষ্ঠের এ সময়টায় প্রচণ্ড রকম গরম পড়ার ক অথচ বৃষ্টি-বাদলা কোত্থেকে খুঁজে-খুঁজে সাথে করে খানিকটা শীত নিয়ে এসে দেখা যাচ্ছে, নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রকৃতির অনীহা কেবল বেড়েই চলেছে।

আমার এ ঘরটায় অবশ্য প্রায়ই বন্ধুবান্ধবের মজলিস বসে। নানা বিষয় নি আলাপ আলোচনা হয়, কখনও মতের মিল হয়, কখনও বা অমিল হলে সেটা নি বচসা হয় কিছুক্ষণ। তবে আজ আমরা একটু বেশিই প্রফুল্ল আছি মনে হচে তার একটা বড় কারণ সম্ভবত আমার বউ, জয়ার অনুপস্থিতি! সে গেছে ব বাপের বাড়ি বেড়াতে, সাথে নিয়ে গেছে আমার একমাত্র মেয়েটাকে। তাই ব চলে, আজ আমি একেবারেই ঝাড়া হাত-পা। আড্ডা জলদি খতম করার নী তাগাদা হিসেবে, একটু পর-পর জয়ার শান্ত পায়ের টহল সহ্য করতে হচ্ছে ন

কিংবা আচমকা তার জ্বলন্ত চোখের সাথে চোখাচোখি হয়ে আঁতকে ওঠার ভয়টাও নেই!

জয়া অবশ্য বাইরের লোকজনের সামনে মুখে এক চিলতে হাসি ধরে রাখে সবসময়। তবে হাসিটা যে মেকি, সেটা ধরতে অতিথিদের কারোরই খুব একটা কষ্ট হয় না। তারা বুঝতে পারুক, সম্ভবত জয়ার ইচ্ছেও সেটাই। তবু ওরা আসে এখানে আড্ডা মারতে, জয়ার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই আসে। না এসে করবেটাই বা কী? প্রত্যেকেরই খুব স্পষ্ট জানা আছে, তাদের নিজেদের বাড়ির অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ বৈ ভাল নয়। জয়া অন্তত মুখের উপর কাউকে কোনদিন কিছু বলে বসেনি, তাদের নিজেদের বউদের উপর এই বিশ্বাসটুকুও রাখা সম্ভব নয়।

কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ কেটে, ঝাল-ঝাল করে মুড়ি-চানাচুর মাখানো হয়েছে। সাথে খানিকটা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে গ্রাম থেকে সদ্য পাঠানো খাঁটি সরিষার তেল। সে তেলের যা ঝাঁজ, নাকের ভিতর দিয়ে গিয়ে টং করে মাথায় ধাক্কা দেয়। মুঠোভরা মুড়ি-চানাচুর, গোগ্রাসে গিলে চলেছি আমরা। এ মুহূর্তে আমাদের দেখলে যে কেউ ভেবে নেবে, আমরা বুঝি বহুদিনের ক্ষুধার্ত। অন্যদের চেয়ে জলদি খাওয়ার এক ছেলেমানুষি প্রতিযোগিতায় মত্ত সবাই, যেন একটুখানি দেরি হলেই ভাগে কম পড়বে! অথচ মুড়ি-চানাচুর কোনটারই কমতি নেই ঘরে, চাইলেই আরও খানিকটা মাখানো যাবে। কিন্তু সে নিশ্চয়তাও আমাদেরকে জলদি হাত চালানো থেকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। সত্যি বলতে, এভাবে কাড়াকাড়ি করে খাওয়াটা বেশ ভালই উপভোগ করলাম আমরা। সবার মধ্যেই একেকটা চিরশিশু বসবাস করে, কথাটা বোধ করি মিথ্যে নয়।

ফ্রিজ থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা কোক আর চারটে গ্লাস নিয়ে এলাম। মামুন খানিকটা দূরে সরে গিয়ে জানালার পাশটায় বসল। তারপর সিগারেট ধরাল। ও ছাড়া এ ঘরে উপস্থিত আর কারও ধূমপানের অভ্যাস নেই। আমাদের অসুবিধার কথা ভেবেই জানালার কাছে সরে বসেছে সে।

আড্ডা জমে উঠল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের দেখা হয়, কথা হয়, তবু যেন আমাদের কারও গল্প ফুরায় না। একেকজন যেন একেকটা কল্পকথার ডিপো, অফুরন্ত কাহিনির আধার।

এমন ঝড়-বাদলের রাতে গল্প যে অবধারিতভাবে ভূত-প্রেতের দিকেই যাবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে, দাদী-নানীর কাছ থেকে শোনা, মান্ধাতা আমলের ভূতেরাও উঠে এল আমাদের আলোচনার টেবিলে। আহা, কত রকমের ভূতদের সাথেই না সখ্যতা ছিল আমাদের ছোটবেলায়। আজকালকার ছেলেপেলেরা কখনও সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। ফেসবুক-টুইটারের এ যুগে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের দিকে নজর দেবার সময় কোথায় ওদের? তবে কোন এককালে যদি ভূতেরাও অনলাইনে দক্ষ হয়ে ওঠে, তখন হয়তো নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা ওদের আবারও বরণ করে নেবে। গল্প করবে ওদের নিয়ে, একে অন্যের সাথে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেবে।

'পিশাচদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই উকিনীদের।' হঠাৎ করে

বলে উঠলেন নরেন বাবু।

নিজের আসনে খানিকটা নড়ে-চড়ে বসলাম। ঠিকঠাক শুনতে পেলাম তো? উখিনী! এরা আবার কারা? কখন নাম শুনেছি বলেও তো মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। কিছুক্ষণ স্মৃতির ঝাঁপিটা উল্টে-পাল্টে খুঁজে দেখলাম। উঁহুঁ, এমন কোন নাম নেই তাতে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'উখিনী আবার কী চিজ, নরেন বাবু?'

ভদ্রলোক খানিকটা অবাক হলেন। সবচেয়ে বেশি ভয় পাওয়ানো ভূতদের নামও শুনিনি আমি, ব্যাপারটা তাঁর জন্য ঠিক সুখকর নয়। হতাশ গলায় বললেন, 'আপনি উখিনীদের নাম শোনেননি?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম। নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে খানিকটা লজ্জাও পেলাম। অবশ্য ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না, তাই তাদের শ্রেণীবিভাগ আমার জানা থাকার কথাও নয়। তারপরও মনে হচ্ছে, এ নামটা হয়তো আমার জানা থাকা দরকার ছিল। পরক্ষণেই মুখ তুলে তাকালাম মামুনের দিকে। তার চোখে-মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়, অর্থাৎ ও ব্যাটাও উখিনীদের সাথে পরিচিত নয়। আজই প্রথম নাম শুনেছে সম্ভবত। মনের ভার খানিকটা লাঘব হলো, যাক বাবা, আমিই তা হলে ভূত-পাঠের একমাত্র খারাপ ছাত্র নই।

'উখিনীরা সত্যিই ভয়ঙ্কর, সেলিম সাহেব,' এবার বলে উঠলেন সঞ্জয় দেবনাথ।

ভদ্রলোক কথা একেবারেই কম বলেন। আমাদের আড্ডায় বেশিরভাগ সময়ই তিনি মনোযোগী শ্রোতা, কদাচিৎই আলাপে অংশ নেন। তিনি শুধু নরেন বাবুর কলিগই নন, তাঁদের দু'জনের বাড়িও এক এলাকায়। পটুয়াখালীতে সুন্দরবনের কাছাকাছি এক প্রত্যন্ত গ্রামে।

'উখিনীদের এতটা ভয় পাওয়ার কারণটা কী?' জিজ্ঞেস করল মামুন সিগারেট শেষ করে, আমার পাশে এসে বসেছে সে। নরেন বাবু এবং সঞ্জয় দেবনাথ বসেছেন ঠিক আমাদের উল্টোদিকের সোফাটায়।

ঠিক তখনই আচমকা বিদ্যুৎ চলে গেল। বাইরে কাছাকাছি কোথাও বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই ভেসে এল নরেন বাবুর ভয় মেশানো কণ্ঠস্বর। 'কারণ, উখিনীরা কাউকে ছাড়ে না। তাদের কবল থেকে আজ অবধি কোন মানুষ বেঁচে ফিরে আসেনি!'

দুই

চার্জলাইটটা খুঁজে পেতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল আমার। জয়া না থাকলে এ ঝামেলাটা হয়, কিছুই খুঁজে পাই না সহজে। সাধারণ একটা জিনিস জোগাড় করতেও রীতিমত নাকানি-চুবানি খেতে হয়! তখন বউটাকে সত্যিই অনেক মিস

করি।

আই.পি.এসটা নষ্ট হয়েছে গত পরশু। জয়া নেই, তাই ওটা সারাবার গরজও নেই আমার। ও থাকলে ঠিকই আমাকে গুঁতিয়ে মিস্ত্রি খুঁজে আনতে পাঠাত।

লাইটটা জ্বেলে দিতেই বৈঠকখানার অন্ধকার কেটে গেল অনেকখানি। অবশ্য ক্ষণে-ক্ষণেই বিজলীর আলোয় পুরো ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠছে। খোলা জানালা দিয়ে দমকা বাতাসের সাথে-সাথে খানিকটা বৃষ্টির-ছিটাও আসছে, তাও ওগুলো বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না কারও। বরঞ্চ এ আবহাওয়াটা আমরা রীতিমত উপভোগ করছি বলা যায়। ঝড়-তুফানের উন্মত্ত রাত, লোডশেডিং, তার উপর ভূতের গল্প! আহা, দুর্দান্ত কম্বিনেশন।

'উখিনীরা কাউকে ছাড়ে না, কথাটার মানে কী, নরেন বাবু?' সোফায় হেলান দিতে-দিতে বললাম।

মৃদু কাশি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন নরেন বাবু। 'অন্যান্য পিশাচদের পাল্লায় পড়লে মানুষ অনেক সময় বেঁচে ফিরে আসে। বেঁচে যাওয়া ভাগ্যবানদের মুখ থেকে প্রেতদের সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য জানা যায়। কিন্তু উখিনীদের কবলে পড়ে আজ অবধি প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি কেউ। জীবন্ত মানুষ শিকার করে বড্ড মজা পায় ওরা।'

'বেঁচে ফিরে না আসলে, ওদের কথা জানল কীভাবে মানুষ?' ফোড়ন কাটল মামুন।

'আমাদের অঞ্চলের পুরানো দিনের মানুষরা প্রায়ই ওদের দেখা পেত। দূর থেকে দেখেই অবশ্য প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসত ওরা। উখিনীদের চলাচলের গতি খুব একটা বেশি নয়, বেশ শ্লথ। তাই আগেভাগে দেখতে পেলে পালিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না। কেবল ওদের ঘেরের মধ্যে না পড়লেই হলো। তবে রাত্রিবেলা ভুলক্রমে ওদের এলাকায় চলে গেলে, বাঁচবার আর কোন উপায়ই থাকত না। ঘিরে ধরে, ঠিকই মেরে খেয়ে ফেলত। বয়স্ক মানুষদের মুখ থেকেই আমরা ছোটবেলায় উখিনীদের কথা শুনতাম। তবে একসময় ওদের ব্যাপারে যে-কোন আলোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় গ্রামে। কারণ ছোটরা অনেক ভয় পেত। তা ছাড়া গ্রামের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডগুলোও ব্যাহত হত এই উখিনীভীতির কারণে। পুরানো আমলের অনেক পুঁথিতেও সবিস্তারে ওদের নৃশংসতার বর্ণনা আছে। আমি নিজে ওদেরকে কখনও সরাসরি না দেখলেও, ওদের বসবাসের এলাকাটা দূর থেকে দেখেছি। ভিতরে যাওয়ার সাহস হয়নি কখনও আমার। যদিও আমার বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে উখিনীদের হাতে।'

'একটু বিস্তারিত বলবেন কি?' আগ্রহী গলায় বললাম আমি। উখিনীদের ব্যাপারে প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। কিংবা বলা যায়, নরেন বাবু আমাকে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছেন। অশ্রুতপূর্ব এ দানবদের ব্যাপারে জানবার জন্য প্রাণটা রীতিমত আইঢাই করছে আমার। লম্বা একটা দম নিলেন নরেন বাবু। তারপর শুরু করলেন, 'উখিনীরা মূলত বনে বাস করে, গাছের উপর। তবে সব ধরনের গাছে নয় অবশ্যই। উপকূল অঞ্চলের একধরনের বিশেষ গাছই আবাস

হিসেবে পছন্দ ওদের। জনশ্রুতি আছে, প্রাচীনকালে ওরা গাছই ছিল। বনভূমির বিশাল একটা এলাকায় ছড়িয়ে থাকে গাছগুলো, ওটাই ওদের এলাকা। উখিনীরা কখনও একা থাকে না, দল বেঁধে থাকে সবসময়। দিনের আলোয় কখনও তাদেরকে দেখা যায় না। রাতের আঁধারে কোন শিকার তাদের এলাকায় পা রাখলেই হলো, তার আর বেঁচে ফেরার কোন উপায় থাকে না। শিকার হিসেবে অবশ্য সব ধরনের জীবন্ত প্রাণীই পছন্দ ওদের। মরা প্রাণী খায় না ওরা কখনও। তবে জীবন্ত প্রাণী ছাড়া আরেকটা বিশেষ খাবার তাদের খুবই পছন্দ বলে শোনা যায়। সেটা হলো, পশু-পাখির মল, বিশেষ করে গরুর গোবর! গরুর গোবরের লোভেই নাকি ওরা অতীতে গভীর রাতে দল বেঁধে লোকালয়ে হানা দিত।'

'বলেন কী!' আঁতকে উঠল মামুন।

'হ্যাঁ। সঞ্জয় এবং আমি যখন খুব ছোট, তখনও একবার রাতের আঁধারে গাঁয়ে হানা দিয়েছিল ওরা।'

'ঘটনাটা জলদি বলুন, নরেন বাবু। দয়া করে আমাদের সহ্য শক্তির পরীক্ষা নেবেন না।' হেসে বললাম আমি।

'সে রাতে আমি বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিলাম। তবে সঞ্জয় জেগে উঠেছিল। সে-ই আপনাদেরকে এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবে, সেলিম সাহেব।'

আমরা তিনজনই একযোগে তাকালাম সঞ্জয় দেবনাথের দিকে। ভদ্রলোক খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন মনে হচ্ছে। আগেই বলেছি, তিনি স্বল্পভাষী। কথা বলার চেয়ে শুনতেই বেশি পছন্দ করেন। তবে এবার বেশ বুঝতে পারলেন, এ গল্পটা তাঁকে বলতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। হয়তো স্মৃতি হাতড়ে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করছেন। বহু পুরানো কথা, চট করে মনে করা সহজ নয়। খানিক বাদেই মুখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। ভদ্রলোকের চোখের তারার ভয়ের ছায়াটা নজর এড়াল না আমাদের। যেন সে রাতের ভয়াবহ ঘটনাটা দিব্যি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সেটা যে তাঁর জন্য সুখকর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হচ্ছে না আমাদের।

তিন

'তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম। তারপরও সে রাতটা আমার মাথায় গেঁথে আছে পুরোপুরি। সে রাতে কী যে সীমাহীন আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করেছিল, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ করে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় আমার। চোখ মেলে দেখি, আমি ঠিক বিছানায় শুয়ে নেই। আমাকে বুকের কাছটায় জাপটে ধরে খাটের মধ্যখানে বসে আমার মা ঠকঠক করে কাঁপছেন। তাঁর চোখে-মুখে তীব্র আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেয়ে, আমিও ভীষণ ভয় পেয়ে

যাই। কোন প্রশ্ন না করে চুপটি করে তাঁর কোলে বসে থাকি। কানে আসছিল গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত চিৎকার, পুরো গ্রামটাই এ মধ্যরাতে জেগে উঠেছে যেন। আবালবৃদ্ধবনিতা, সেই সাথে গবাদিপশুগুলোর সম্মিলিত চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। একবার ভাবলাম, গ্রামে ডাকাত পড়েছে নাকি? পরক্ষণেই অবশ্য ভাবনাটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে বাধ্য হলাম। এর আগেও গ্রামে বহুবার ডাকাত পড়েছে, এর আগেও মধ্যরাতে গ্রামবাসীদের চিৎকারে ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু সে চিৎকারের সাথে আজকের আর্তনাদের অনেক তফাৎ। পোষা প্রাণীগুলোও তখন এমন ভয়ার্ত নিনাদ জুড়ে দেয়নি। মাকেও এর আগে কোনদিন এমন ভয়ে কাঁপতে দেখিনি। বরঞ্চ প্রতিবার রামদা হাতে নিয়ে দস্যু রানী ফুলন দেবীর মতই ডাকাত মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতেন তিনি।

'আমাদের শোবার ঘরটার পিছন দিকটায় একটা ছোট্ট জানালা আছে, ওটা দিবারাত্রি একরকম খোলাই থাকত। কারণ, ওদিকেই আমাদের গোয়ালঘর। গরুগুলোকে পাহারায় রাখতে হয়, না হয় রাত-বিরেতে কোন পশুচোর দিব্যি সেগুলো নিয়ে সটকে পড়বে। পশুচোরের অভাব নেই আমাদের ওদিকটায়।

'গোয়ালঘর থেকে আমাদের দুধেল গাইটার রক্ত হিম করা চিৎকার শুনতে পেলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ওটা তার অন্তিম আর্তনাদ। যে-কোন কারণেই হোক, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে ওটা। বাছুরটার চিৎকার থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো, সম্ভবত ইতিমধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে ওটার। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, মা কেন ওদেরকে দেখতে যাচ্ছেন না? পরক্ষণেই অদ্ভুত একধরনের গোঙানির শব্দ ভেসে এল গোয়ালঘরটা থেকে। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার, গায়ের সরক'টা লোম দাঁড়িয়ে গেল নিমিষেই। তখনও জানি না কীসের গোঙানি ছিল ওটা, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, আমার চেনা কিছু নয় ওটা। ভয়ঙ্কর অশুভ, অপার্থিব কোন কিছু। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম মেঝেতে ঘষটানোর আওয়াজ। যেন ভারী কিছু একটা মেঝেতে ঘষটে-ঘষটে চলেছে মাটির উপর দিয়ে।

'আচমকা ওদিকের আধখোলা জানালার কবাটগুলো ঝটকা দিয়ে পুরোপুরি খুলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠলেন মা। চট করে এক হাতে চেপে ধরলেন আমার চোখদুটো, যেন আমি ওটাকে দেখতে না পাই। পরক্ষণেই জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। আমার তখনও জানা নেই, কী দেখে এতটা ভয় পেলেন মা। তবে তাঁর হাত সরিয়ে সেদিকে তাকানোর সাহস হলো না আমার কোনমতেই। তাঁর বুকে মুখ গুঁজে অনড় পড়ে রইলাম। বাইরে তখন ধীরে-ধীরে কমে আসছে হৈ-হল্লা, হট্টগোল।

'বাবা এবং বাড়ির অন্য পুরুষেরা ঘরে ফিরে এলেন ভোররাতের দিকে। প্রচণ্ড পরিশ্রম আর তীব্র আতঙ্কে, তাঁদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। চেহারার দিকে তাকানোর উপায় নেই আর। পানির ছিটা দিয়ে মায়ের জ্ঞান ফেরানো হলো। হুঁশ ফিরে পেয়েই দাদীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। দাদী এতক্ষণ পাশের ঘরেই ছিলেন, এখন সবার সাড়া পেয়ে উঠে এসেছেন।

মুরুব্বীদের উত্তপ্ত আলোচনা থেকে বারবার একটা শব্দই কানে আসছিল, উখিনী!

'পরে জানতে পারলাম, একদল উখিনী একযোগে গাঁয়ের গোয়ালঘরগুলোতে হানা দিয়েছিল। চেটেপুটে গোবর খাওয়ার পর, গরুগুলোকেও মারতে শুরু করে দানবগুলো। নির্বোধদের এতটুকু বোধশক্তি নেই যে, কেবলমাত্র বেঁচে থাকলেই ওদের জন্য আরও গোবর উৎপাদন করতে পারবে পশুগুলো। পশুহত্যা শুরু হতেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে চেঁচামেচি করতে-করতে বাইরে বেরিয়ে আসে গ্রামবাসী। শক্তসমর্থ পুরুষেরা জ্বলন্ত মশাল, সেই সাথে গ্রাম্য পুরোহিতদের মন্ত্রপূত পবিত্র পানির ঘড়া নিয়ে আক্রমণ করে উখিনীদের। সবার সম্মিলিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পালাতে বাধ্য হয় উখিনীর দল। নিজেদের এলাকা না হওয়ায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি পিশাচগুলো। তবে গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে নিজেদের বনে ঢুকতেই, নিমিষেই গায়েব হয়ে যায় ওরা।

'পরদিন সকালে গ্রামের যুবকেরা প্রাণ বাজি রেখে উখিনীদের জঙ্গলে ঢুকেছিল ওদের মারতে। কৃষকরা নিজের সন্তানের চেয়ে কম ভালবাসে না তাদের গবাদিপশুকে। এতগুলো বোবা প্রাণীর মৃত্যু, স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি কেউ। তাই প্রাণের পরোয়া করেনি তখন। কিন্তু সারাদিন তন্ন-তন্ন করে খুঁজে একটা উখিনীর দেখাও পাওয়া যায়নি। অবশ্য দিনের বেলাতে ওদেরকে দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। সন্ধ্যা নামার আগেই সবাই ফিরে এঁসেছিল গ্রামে। অহেতুক একগুঁয়েমি করে নিজের প্রাণটা হারানোর কোন মানেই হয় না। রাতের বেলা ওদের এলাকায় গিয়ে ওদের সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়।

'এই হলো গিয়ে উখিনীদের গ্রাম আক্রমণের কাহিনি। এরপর অবশ্য আর কোনদিন ওদের দ্বারা লোকালয় আক্রমণের খবর শোনা যায়নি।'

'কেবল একজন একগুঁয়ে লোক রাতের আঁধারে উখিনীদের খোঁজে গিয়েছিল, সেলিম সাহেব। আমার আপন চাচা।' সঞ্জয় দেবনাথ থামতেই ভারী গলায় বলে উঠলেন নরেন বাবু।

তাঁর গলার বিষণ্ণতার সুর আমাদেরও ছুঁয়ে গেল। চট করে কোন কিছু বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। জানি, মুডের মত হলে ঘটনাটা উনি নিজেই বলবেন।

চার

মৃদুস্বরে বলতে শুরু করলেন নরেন বাবু। 'আমার চাচা তখন টগবগে যুবক, রক্ত গরম। আমাদের ষাঁড় কালুকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন তিনি। নিজ হাতে খাওয়াতেন, গোসল করিয়ে দিতেন, ওটার সাথে আপনমনে কথাও বলতেন। কালুর মৃত্যু তিনি কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। দিন-রাত বিষণ্ন হয়ে থাকতেন, কারও সাথে কথা বলতেন না। এরপর একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন, কালুর মৃত্যুর প্রতিশোধ

নেবেন। রাতের বেলা যাবেন উখিনীদের জঙ্গলে, খুঁজে বের করবেন ওই পিশাচদের। যে কয়টাকে সামনে পাবেন, পুড়িয়ে মারবেন মশালের আগুনে, কিংবা মন্ত্রপূত জলের ছিটায়। আমার বাবা-মা, বুড়ো দাদী, এমনকী গ্রামের সমস্ত ছেলে-বুড়োই তাঁকে বাধা দিল। মাথা থেকে এহেন উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে পরামর্শ দেয়া হলো তাঁকে। সবার বাধার মুখে চুপ মেরে গেলেন চাচা। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে তখন অন্য চিন্তা চলছে, সেটা কেউই বুঝতে পারেনি তখন।

'একরাতে তিনি সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল আর এক ঘড়া মন্ত্রপূত পবিত্র জল নিয়ে চলে গেলেন উখিনীদের জঙ্গলে। এরপর আর কোনদিনও ফেরত আসেননি। পরদিন সকালে অনেক মানুষ গিয়ে খুঁজেছিল তাঁকে সেখানে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা গেল তাঁর মশালটা, এর খানিকটা দূরে পাওয়া গেল মন্ত্রপূত জলের ঘড়া, কাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। শুধু আমার চাচার কোন হদিস মিলল না আর।

'তাঁর শোকে পাগলের মতন হয়ে গেলেন আমার বুড়ো দাদী। কিছুদিনের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন তিনি। জোড়া-শোক সামাল দিতে না পেরে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমাদের নিয়ে পাশের গাঁয়ে গিয়ে বাসা বাঁধলেন বাবা। পুরানো অভিশপ্ত গাঁয়ে তাঁর আর মন টিকছিল না কিছুতেই। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকেই ওই গ্রাম ছেড়ে অন্যখানে চলে যায়। ধীরে-ধীরে পুরো ফাঁকা হয়ে যায় গ্রামটা। এখন ওখানে জংলামতন হয়ে গেছে, গ্রাম আর নেই। অবশ্য পুরানো বাড়িঘরের কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়ে গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।'

'এরপর আর উখিনীদের কবলে পড়েনি কেউ কোনদিন?' জানতে চাইল মামুন।

'পড়েনি আবার! কিছুদিন পর-পরই কেউ না কেউ হারিয়ে যেত ওই জঙ্গলে। আমাদের গ্রামের মানুষজন জঙ্গলটা সম্পর্কে সচেতন ছিল, কিন্তু দূর-গাঁয়ের সবাই তো আর ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানত না। জানলেও কেউ-কেউ অতিরঞ্জন ভেবে ঠিকমত পাত্তা দিত না হয়তো। তাদেরই কেউ হয়তো কাঠ কাটতে কিংবা মধু আহরণ করতে গিয়ে সন্ধ্যা অবধি থেকে যেত ওই বনে। অসচেতনতার মূল্য দিত প্রাণ দিয়ে। তা ছাড়া জলদস্যুরাও মাঝে-মাঝে লুকিয়ে থাকতে আসে সেসব জঙ্গলে। ওদের কেউই আর জ্যান্ত ফেরে না কোনদিন। তবে দল বেঁধে লোকালয় আক্রমণ করেনি আর কখনও উখিনীরা। সম্ভবত সেবার গ্রামবাসীদের হাতে অপদস্থ হওয়ায়, মনুষ্য-বসতি সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা জন্মে গেছে ওদের মনে। তাই আর ওমুখো হয় না হয়তো।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে উখিনীরা। ওদের নিয়ে তো ভালমতন গবেষণা হওয়া দরকার। আজকালকার তথাকথিত ভূত বিশেষজ্ঞরা উখিনীদের খবর পাচ্ছে না কেন, কে জানে!' হাসতে-হাসতে বললাম আমি।

মুচকি হাসলেন নরেন বাবু। 'কে বলল আপনাকে যে, ওদের নিয়ে গবেষণা হচ্ছে না?'

হতভম্ব হয়ে গেলাম নরেন বাবুর কথা শুনে। 'মানে? সত্যিই হচ্ছে নাকি?'

'হুম। রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা বিলেতে ফেরত গবেষকরাই ব্যস্ত আছেন ওদের নিয়ে গবেষণায়। শেষ যেবার গ্রামে গিয়েছিলাম, তখন শুনেছিলাম আমাদের পুরানো গাঁয়ের জায়গাটায় একটা ঝুপড়িমতন বানিয়ে থাকেন লোকগুলো'। তবে তাঁদের বর্তমান হালহকিকত জানা নেই আমার।'

'বলেন কী! কারা এরা?' উচ্চস্বরে বলে উঠল মামুন।

'তা ঠিক জানি না। তবে শুনেছি ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করেছেন দু'জনেই। তবে এদেশেরই মানুষ, জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, দুটোই বাংলাদেশে। আমার সাথে দেখা হয়নি কখনও। তবে দেখা করার ইচ্ছে সত্যিই আছে আমার। হাজার হোক, ভূত-প্রেত নিয়ে গবেষণা করছেন ওনারা, তাঁদের কাছে হয়তো উখিনীদের বিষয়ে নতুন কিছু জানতে পারব। হয়তো জানা যাবে, উখিনীরা আসলে কী, কেমন তাদের জীবনযাত্রা!'

'তা হলে চলুন না, একদিন যাই সবাই মিলে,' মুখ ফসকে হঠাৎই বলে ফেললাম কথাটা। উপস্থিত সবাই একযোগে তাকাল আমার দিকে। দৃষ্টিতে স্পষ্ট অবিশ্বাস!

পাঁচ

চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বলা আমার একটা কথায়, তিন তিনজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ একবাক্যে সায় জানাবে এবং কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে সত্যিই উখিনীদের এলাকায় যেতে রাজি হবে, এটা আমি কল্পনাও করিনি। তবে বাস্তবে ঠিক তা-ই হলো।

দল বেঁধে আমরা চলে এলাম নরেন বাবু এবং সঞ্জয় দেবনাথের গ্রামের বাড়িতে। ওঁরা দু'জনেই নানারকম সত্যি-মিথ্যা বলে নিজেদের অফিস থেকে দিন কয়েকের জন্য ছুটি নিয়েছেন। মামুন বিরাট বড়লোক বাবার একমাত্র ছেলে, কোন কাজকর্মের বালাই নেই। তার সারাবছরই অখণ্ড অবসর, তাই আলাদা করে ছুটি নেবার প্রয়োজন পড়েনি।

আমিও আমার ম্যানেজারের কাঁধে ব্যবসার বোঝাটা চাপিয়ে দিয়ে সটকে পড়েছি। ম্যানেজার লোকটা খুবই বিশ্বস্ত, কোনরকম সমস্যা হবার কথা নয়। তা ছাড়া বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়লে, আমার সাথে মোবাইলে সহজেই শলা-পরামর্শ করে নিতে পারবে সে। আমিও দরকার পড়লে দিতে পারব জরুরি নির্দেশনা।

তবে বাসা থেকে ছুটি পেতে খুব বেগ পেতে হয়েছে আমাকে, জয়া খুব আপত্তি করছিল। বুড়ো বয়সে এ কী ভীমরতি হয়েছে, এসব বলে-টলে বেশ চেঁচামেচি করছিল। তবে খাঁটি গিনি সোনায় গড়ানো একজোড়া কানের দুল ভোজবাজির মত তার সব রাগ বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে। খোদার দরবারে

লাখো-কোটি শুকরিয়া, নারীর হাত থেকে নিস্তার পাবার এই একখানা সুযোগ অন্তত রাখবার জন্য। তা নইলে, জগতে বিবাহিত পুরুষরাই সম্ভবত সবচেয়ে অসহায় প্রাণী!

নরেন বাবুদের গ্রামটা এদেশের অন্য দশটা গ্রামের মতই, খুব একটা তফাৎ নেই। ছবির মত সুন্দর, পরিপাটি, সবুজ। সাগর খুব একটা দূরে নয়, তাই সারাক্ষণই তাজা হাওয়া বয়ে চলেছে। ঘরদোরের অবস্থা যতখানি সঙ্গিন হবে ভেবেছিলাম, ততখানি নয়। নরেন বাবুর বাবা-মা গত হয়েছেন বহুকাল আগে। তারপর তিনিও শহরে পাড়ি জমিয়েছেন জীবিকার সন্ধানে। তাই দেশের বাড়ির ভিটেমাটি পাহারা দেবার মত কেউ ছিল না তখন। পরে তাঁর এক গরিব পিসতুতো ভাই সপরিবারে এসে উঠেছেন এখানে। তিনিই এতকাল দেখে রেখেছেন সমস্ত বিষয়-আশয়।

লোকটাকে খুব ভাল লাগল আমার। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলেও ভদ্রলোক আত্মসম্মানে বলীয়ান। আমাদের আপ্যায়নের সামান্যতম ত্রুটিও যেন না হয়, সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। বারান্দার লাগোয়া দুটো ঘর খুলে দিয়েছেন আমাদের থাকার জন্য। সাফসুতরো করে চৌকিতে পেতে দিয়েছেন শীতল পাটি। তাতে পিঠ রাখলেই শরীরটা জুড়িয়ে যায়, ইচ্ছে জাগে চিরকাল এখানেই থেকে যাবার।

এখানে এসে আমার চেয়েও বেশি উচ্ছ্বসিত হয়েছে মামুন। বার-বার বলছে, 'মাটির ঘরের গন্ধটা কত চমৎকার, খেয়াল করেছিস? কেমন একটা মায়া-মায়া আবেশ আছে না?'

প্রথম-প্রথম জবাব দিতাম তার কথার। কিন্তু একই কথা কাঁহাতক আর ভাল লাগে? তাই এখন তার এসমস্ত কথার জবাবে মুখে কেবল এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তুলি, বাক্য খরচ করার কষ্টটুকু আর করি না।

গৃহস্বামী ভদ্রলোক আমাদের খাবার-দাবারের জন্য এলাহি কারবার করছেন। আমাদের কোন বারণেই কর্ণপাত করবেন না, এমন পণ করে নিজের সর্বোচ্চটুকু উজাড় করে দিচ্ছেন। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ফেরার পথে ভদ্রলোককে খুব ভাল কিছু উপহার দিয়ে যাব। দুটো হালের বলদ আর একখানা দুধেল গাই হলে কেমন হয়? খেয়াল করেছি, তাঁর গোয়ালঘরটা খালি, কোন গরু নেই। অথচ আশপাশের প্রায় সবারই অন্তত দু'-একটা করে রয়েছে।

হ্যাঁ, এটাই করতে হবে। এ এলাকায় গরু ছাড়া জীবনধারণ করা বেশ কষ্টকর। হয়তো অভাবের তাড়নায় বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন আগেরগুলো। ভদ্রলোক হয়তো সহজে কিছু নিতে চাইবেন না, তাঁর বেজায় আত্মসম্মান। তখন জোর করেই গছিয়ে দিতে হবে তাঁকে উপহারগুলো। প্রয়োজনে নরেন বাবুর সাহায্য নিতে হবে, তাঁকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে, না নিয়ে পারবেন না ভদ্রলোক। এমন দিলখোলা মানুষের জন্য কিছু করতে পারাটাও তো শান্তির।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গেলাম নরেন বাবুদের পুরানো গ্রামটা একনজর দেখতে। বেশ দূরের পথ, হাঁটা ছাড়া গতি নেই। চাইলে অবশ্য মোষের পিঠে

চড়ে যাওয়া যায়। তবে আমরা ব্যাপারটাতে অনভ্যস্ত হওয়ায়, নিজের পায়ের উপর নির্ভর করাটাই ভাল মনে করলাম। কষ্ট বাঁচাতে গিয়ে মোষের গুঁতোয় প্রাণ হারানো কিংবা পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়ার কোন মানে হয় না।

পৌঁছে দেখলাম, গ্রামটা সত্যিই আর গ্রাম নেই, পুরোপুরি জঙ্গল হয়ে গেছে। মানুষ চলাচল না থাকায়, আগাছা জন্মে একাকার হয়ে আছে এখানে-সেখানে। পুরানো ভাঙা দালানগুলোর কাঠামো ঢেকে দিয়েছে উপকূলের বাড়ন্ত ঝোপঝাড়। বেশিরভাগ ঘরেরই চালা নেই। হয় ঝড়-তুফানে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, নয়তো পুরানো বাসিন্দারা নিজেরাই খুলে নিয়ে গেছে যাবার সময়।

চারপাশে তাকিয়ে কেমন যেন বিচিত্র একটা অনুভূতি হলো। একসময় এখানে অসংখ্য মানুষের বসবাস ছিল, এখন কেউ কোথাও নেই। মৃত একটা গ্রাম, মনটা কেমন ছটফট করে উঠল। আর একটা মুহূর্তও সেখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আমার। তারপরও আমরা গেলাম গ্রামটার পশ্চিম দিকটায়। ওদিকেই আবাস গেড়েছে বিলেত ফেরত গবেষকের দলটা।

তাঁদের বাসভবন দেখে চমৎকৃত হলাম। কাঁচা হলেও, বেশ অদ্ভুত সুন্দর একটা আদলে ঘরটা গড়েছেন দুই গবেষক। দূর থেকে দেখতে একটা ছোট্ট প্যাগোডার মতই মনে হচ্ছিল আমাদের কাছে। বেশ আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে গেলাম আমরা।

তবে কপাল মন্দ, দেখা পেলাম না ওঁদের। আমাদের সাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওঁদের স্থানীয় চাকরটা। জানাল, ওঁরা শহরে গেছেন নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। বিকেল নাগাদই ফিরে আসার কথা।

পরদিন সকালে আবার আসব জানিয়ে, ফিরতি পথ ধরলাম আমরা। ফেরার আগে, গাঁয়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে একপলক তাকালাম উখিনীর জঙ্গলের দিকে। গাঢ় সবুজে ছাওয়া একটা বিশাল অঞ্চল। ওখানে কি সত্যিই লুকিয়ে আছে একপাল মৃত্যুদূত?

ভাবতেই কেমন যেন শিরশির করে উঠল ঘাড়ের কাছটা। আজ আর যাওয়ার সময় নেই, প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। তবে কাল দিনের আলোয়, অবশ্যই যাব আমরা উখিনীদের আস্তানায়। কাছ থেকে দেখতে চাই ওই নিষিদ্ধ অঞ্চল। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বরাবরই একটু বেশি কি না।

ছয়

সে রাতে আড্ডায় বসলাম বাইরের বারান্দাটায়। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে সবক'জনাই আরাম করে পদ্মাসনে বসেছি। সবার সামনে, মাঝখানটায় রাখা আছে বাটি ভরা পাটালি গুড় আর একধামা মুড়ি। কারও ইচ্ছে হলেই গুড়-মুড়ি খেতে পারবে। মৃদু বাতাস বাইছে, আকাশে পূর্ণ চাঁদ। মাতাল করা জোছনায়

ভেসে যাচ্ছে চরাচর। স্বভাবকবি মামুন, বার-বারই চোখ তুলে তাকাচ্ছে চাঁদের পানে। এদিকটায় বিদ্যুতের অবস্থা শোচনীয়। দিনের বেশিরভাগ সময়ই তার দেখা পাওয়া যায়নি, এখনও নেই! তবে অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই বিদ্যুতের অভাবটা অনুভূত হচ্ছে না কারও। বরঞ্চ এই আধো অন্ধকারটাই বেশি পরিতৃপ্তি দিচ্ছে। আমাদের সাথে আড্ডায় যোগ দিয়েছেন নরেন বাবুর পিসতুতো ভাইটিও। কথায়-কথায় উখিনীদের ব্যাপারটা উঠল, সাথে-সাথেই দেখলাম তাঁর মুখটা হাঁড়ির তলার মত কালো হয়ে গেছে! কারণটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক কি খুব বেশি ভয় পান ওদের? অবশ্য প্রশ্নের জবাবটা পেতে খুব একটা অপেক্ষা করতে হলো না আমাকে। মৃদুস্বরে জানালেন, আমরা আসার মাত্র কয়েকদিন আগেই পোষা গরুগুলোকে হারিয়েছেন তিনি উখিনীদের হাতে। সেই সাথে নিজের আদরের ছোট ছেলেটাকেও!

চট করে তাকালাম নরেন বাবুর মুখের দিকে। কিন্তু তাঁর আর সঞ্জয় দেবনাথের হতভম্ব চেহারাই বলে দিল, খবরটা তাঁদের কাছেও নতুন। অবশ্য এজন্য নরেন বাবুকে খুব একটা দোষও দেয়া যায় না। এমনিতেই বহু বছর ধরে এদিকটায় আসা হয়ে ওঠে না তাঁর, তা ছাড়া এদের মোবাইল ফোন না থাকায় সহজে যোগাযোগও রাখতে পারেন না নরেন বাবু।

মৃদু স্বরে ভাইকে শুধালেন, 'কী হয়েছিল? বল তো।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'ছেলেটা এমনিতেই একটু বেশি চঞ্চল ছিল, ভাই। দিনের বেলা প্রায়ই এদিক-ওদিক চলে যেত, কারও বারণ শুনত না। এ নিয়ে ওর মা প্রায়ই বেদম পেটাত ওকে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি, কিছুতেই তাকে ঘরে বেঁধে রাখা যেত না। যখন-তখন উখিনীদের বনেও চলে যেত সে। ওখানে নাকি সহজেই গুলতি দিয়ে পাখি মারা যায়, পাখি শিকারের বড্ড নেশা ছিল ছেলেটার।

'বনের পাশের মাঠটার ঘাসগুলো বেশ ঘন আর তাজা। কেউ ওদিকটায় গরু চরায় না বলে বাড়তে পেরেছে নির্বিবাদে। প্রায়ই ওখানটায় গরু নিয়ে চলে যেত ছেলেটা। বলত, অমন ঘাস আর নেই কোথাও, গরুগুলো খুব তাড়াতাড়ি মোটাতাজা হয়ে যাবে।

'প্রথম-প্রথম বাধা দিতাম আমরা, কিন্তু সবসময়ই সন্ধ্যার আগে ফিরত বলে শেষটায় ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার মা-ও খুব একটা রা করত না আর। আমি থাকি নানা ফন্দি ফিকিরে ব্যস্ত, আমার এতদিকে নজর রাখার সময় কোথায়, বলেন?

'আমাদের নিজেদের গাফিলতিতেই ছেলেটাকে হারালাম আমরা। ভগবানকে দোষারোপ করারও উপায় নেই!' বলতে-বলতে গলা ধরে এল তাঁর, চোখের কোনায় চিকচিক করছে অশ্রু।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবারও শুরু করলেন, 'ঘটনার দিনও গরুগুলোকে নিয়ে ওই অভিশপ্ত মাঠটায় গিয়েছিল ছেলেটা। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেও যখন ও ফিরে এল না, মনের ভিতর ভয় ঢুকে গেল আমাদের। লোকজন

নিয়ে খুঁজলাম মাঠটায় গিয়ে। কিন্তু পেলাম না ওকে, গরুগুলোকেও না। মনে খানিকটা আশা হলো, হয়তো পাশের গাঁয়ে ওর নানাবাড়িতে চলে গেছে। তড়িঘড়ি করে লোক পাঠানো হলো ওখানে। কিন্তু মাঝরাতে ব্যর্থ হয়ে খবর নিয়ে এল লোকটা, ওখানে যায়নি ওরা। বুঝতে আর বাকি রইল না কারও, কী ঘটেছে। পরদিন সকালেই সবাই মিলে গেলাম উখিনীর বনে। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও পেলাম না আমার ছেলেটাকে, গরুগুলোকেও না। তবে একজায়গায় পড়ে থাকতে দেখলাম তার হাতের গুলতিটা, তার একটু দূরেই পড়ে আছে সাদা গরুটার গলায় ঝোলানো ঘন্টাটা। সবকিছু তখন জলের মত পরিষ্কার সবার কাছে। শুধু একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছিল না, সন্ধ্যার পরেও ওখানে কেন রয়ে গিয়েছিল ছেলেটা! হয়তো কোন পাখির পিছু নিয়ে অনেকটা ভিতরে চলে গিয়েছিল, সময় মত বের হয়ে আসতে পারেনি আর। কিংবা পাখির দিকে এতটাই মনোযোগ ছিল যে, সূর্যের দিকে খেয়ালই ছিল না হয়তো। এই পাখি শিকারই তার জন্য কাল হলো, নিজেই অন্যের শিকারে পরিণত হলো আমার অবুঝ ছেলেটা।'

ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। দরজার ওপাশ থেকেও নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। ওঁর স্ত্রীও সম্ভবত আমাদের আলোচনা শুনছিলেন পর্দার আড়াল থেকে। নিজের সন্তানের মৃত্যুর কথা শুনতে গিয়ে কোন মা-ই বা নিজের আবেগ সামলাতে পারবেন? আমার বুকটাও মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ বেয়ে কখন নোনা জলের ঢল নেমেছে, সেটা নিজেও জানি না।

সে রাতে আমরা কেউই ঠিকমত খেতে পারলাম না। ভদ্রলোক যদিও খাওয়ার জন্য বারংবার জোর করছিলেন, তবুও মুখে কিছু রুচল না আমাদের।

শক্ত বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে, জানালা দিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকালাম। একটুকরো কালো মেঘ ক্ষণিকের জন্য ঢেকে দিয়েছে চাঁদটা, গোটা পরিবেশটাই কেমন যেন অশুভ লাগছে।

উখিনীর বনে, ওরা নিশ্চয়ই এখন জেগে উঠেছে। গভীর অন্ধকারে নিজেদের উদরপূর্তির জন্য শিকারে নেমেছে। কে হবে ওদের পরবর্তী শিকার? কোন জেলে? নাকি কোন কৃষক? নাকি হতভাগ্য কোন এক পর্যটক?

আমাদের কাছ থেকে এ মুহূর্তে খুব বেশি দূরে নেই ওরা! কাল আমরা যাব ওদের আরও কাছে, একেবারে ওদের নিজেদের আস্তানায়। অবশ্য তখন দিনের আলো থাকবে, জেগে থাকবে না ওরা।

তারপরও কেন যেন অকারণেই গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল হঠাৎ।

সে রাতে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখলাম আমি। একটু পর-পরই ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছিল। রাতের শেষ অংশটা একরকম বসেই কাটিয়ে দিলাম বলা যায়।

অবশেষে ভোর হলো, মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসছে। এ এলাকার বেশিরভাগ বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও, ক'ঘর মুসলমান পরিবারও বসবাস করে এখানে। মিলেমিশে বেশ সুখেই জীবনযাপন করছে এখানকার লোকজন। সবার কাছে আতঙ্কের একটাই নাম–উখিনী!

সাত

সকাল-সকালই রওয়ানা হলাম উখিনীর বনের উদ্দেশে। নরেন বাবু এবং সঞ্জয় দেবনাথের ইচ্ছে ছিল আরেকটু বেলা বাড়ার পর যাবেন। কিন্তু মামুন আর আমার অতিউৎসাহের কাছে শেষমেশ হার মানতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে গাইড হিসেবে যাচ্ছে নরেন বাবুর ভাতিজা, তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের বড় ছেলে। ছোট ছেলেটি অকালে মারা যাওয়ায়, এই ছেলেটিই এখন তাঁদের একমাত্র সন্তান। ভদ্রলোকের নিজেরও অবশ্য আমাদের সাথে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুপুরের খাবারের জোগাড়যন্ত্র করতেই থেকে যেতে হলো তাঁকে। জানি, বারণ করলেও শুনবেন না, তাই আমিও তাঁকে কিছু বলা একরকম ছেড়েই দিয়েছি। যতই মানা করি না কেন, উনি ঠিকই খাওয়ার সময় তাঁর সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু হাজির করবেন। ভেবে রেখেছি, যাবার সময় ওঁদের অলক্ষে বেশ কিছু নগদ অর্থও রেখে যাব। টাকাটা কাজে লাগবে তাঁদের।

জঙ্গলটা বেশ দূরে। যেতেও হচ্ছে নানারকম ঝোপঝাড় আর খানাখন্দের মধ্য দিয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এদিকটায় একেবারেই লোক চলাচল নেই। মাঝে অবশ্য বুনো পশুদের একটা পায়েচলা পথ পেয়েছিলাম। কিন্তু একটা ডোবার কাছে এসে, সে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, উখিনীদের জঙ্গলে বন্য পশুদেরও যাতায়াত নেই খুব একটা।

বনটায় পৌঁছুতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লেগে গেল। এতটা হাঁটার অভ্যাস নেই কারও, শহুরে নাগরিক জীবন রীতিমত অথর্ব করে তুলেছে আমাদের। তাই এটুকু হেঁটেই পায়ে খিল ধরে গেল সবার। শুধু নরেন বাবুর ভাতিজার কিছুই হয়নি, সে দিব্যি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের সামনে। খানিকটা ধাতস্থ হতেই, বনটার দিকে ভাল করে তাকালাম। তাকিয়েই রীতিমত চমকে উঠলাম! এগুলো কী গাছ? এমন অদ্ভুত গাছ তো কোনদিনও দেখিনি! আকার-আকৃতিতে একেকটা গাছ বিশাল, যেন আকাশ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে সবক'টা। একটা আরেকটা থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাঝখানে খুব একটা ফাঁক নেই। প্রতিটা গাছ থেকে নেমে এসেছে মোটা-মোটা সর্পিল লতা, একে অন্যের সাথে জড়িয়ে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু রীতিমত রুদ্ধ করে দিয়েছে ওরা। যেন হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা দানব।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাছগুলোর বয়স অনেক। বাকলগুলো একধরনের শ্যাওলায় ঢাকা। অনেকটা মাছের আঁশের মত পুরো গাছটাকে আবৃত করে রেখেছে ওগুলো। গাছগুলো থেকে কেমন যেন একটা আঁষটে গন্ধও আসছে। নাকে লাগলেই গা গুলিয়ে উঠছে রীতিমত। প্রতিটা গাছের উপরেই ঝুপড়ি মতন হয়ে আছে, যেন ওখানে বাসা বেঁধেছে কোন জংলী জানোয়ার। ওগুলোতেই কি

থাকে উখিনীরা? ভয়ের শীতল একটা স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। নিজের অজান্তেই ঢোক গিললাম, যেন এতেই বেমালুম গিলে ফেলতে পারব ভয়টাকে। গাছের পাতাগুলোও কেমন অদ্ভুত লম্বাটে, অনেকটা নারিকেল গাছের পাতার মত। মাথার কাছটায় এতটাই ঘন হয়ে জন্মেছে যে, ওগুলোর জন্য সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না ভিতরে। তাই এই দিনের বেলাতেও বনের ভিতরকার অন্ধকার খুব একটা কম নয়। রীতিমত গা-ছমছমে একটা পরিবেশ, যেন এখনই ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে কিছু একটা।

সবচেয়ে বেশি অবাক হলাম গাছগুলোর শ্বাসমূল দেখে। নীচে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে এখানে-ওখানে। সাধারণত সাগর-ঘেঁষা বনভূমিতেই এধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, জোয়ারের সময় ওইসব বনভূমি পুরোপুরি নোনাজলে তলিয়ে যায়, তাই বেঁচে থাকার জন্য এই বিশেষ ধরনের মূলের প্রয়োজন হয় ওই অঞ্চলের গাছেদের। কিন্তু এ জঙ্গল জোয়ারের পানিতে ডোবে না কখনও, তা হলে এদের শ্বাসমূলের দরকারটা কী?

মনে-মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, বসবাসের জন্য উপযুক্ত গাছই বেছে নিয়েছে উখিনীরা। ওদের কথা জানা না থাকলেও, এ বনে আসলে এমনিতেই যে কারও বুক কাঁপার কথা। আর এখন তো বক্ষ-পিঞ্জরে রীতিমত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। শুধু চুপচাপ দেখতে লাগলাম ভাল করে। নরেন বাবু পই-পই করে বলে দিয়েছেন, যেন জঙ্গলের ভিতর এসে কোন ধরনের কথাবার্তা বলা না হয়। অহেতুক শব্দ করে উখিনীদের জাগিয়ে তোলার কোন মানেই হয় না। কয়েক বছর আগে, কয়েকজন জেলে, বিকেলের দিকেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল উখিনীর বনে। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরছিল ওরা। যেহেতু তখনও দিনের আলো অবশিষ্ট ছিল, তাই উখিনীর বনের ভিতর দিয়েই শর্টকাটে গাঁয়ে পৌঁছুতে চেয়েছিল ওরা। আর নৌকার মাঝিরা খালি নৌকা নিয়ে সাগরের লম্বা পথ ধরে গ্রামে ফিরেছিল।

কিন্তু মাঝিরা বহাল তবিয়তে ফিরে এলেও, ওই হতভাগ্য জেলের দল আর কোনদিনও ঘরে ফিরতে পারেনি। মাছের গন্ধ, নাকি বাড়তি মাছ ধরতে পারার খুশিতে জেলেদের করা উল্লাস, ঠিক কী কারণে দিনের বেলাতেই উখিনীদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, এটা জানা নেই কারও। পরদিন সকালে খুঁজতে এসে, জেলেদের মাছ ধরার খালি ডুলা আর জাল মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে, আসল ঘটনা বুঝতে আর বেগ পেতে হয়নি কাউকে। চকিতেই বুঝে গিয়েছিল সবাই, কাদের কাজ ওটা!

উখিনীর জঙ্গলে মিনিট বিশেকের মত ছিলাম আমরা। এ সময়টা আমার কাছে মনে হয়েছিল অন্তত এক যুগ! সময় যেন স্থির হয়ে ছিল ওখানটায়। বাইরে বের হবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম সবাই।

অনর্গল কথা বলতে-বলতে এগিয়ে চললাম গবেষকদের কুঁড়ের দিকে। অল্পক্ষণ কথা বলতে না পেরেই যেন রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে সবাই। এমনকী

স্বল্পভাষী সঞ্জয় দেবনাথের মুখেও যেন খই ফুটতে লাগল!

আট

গবেষকদের কাছ থেকে বেশ অমায়িক ব্যবহারই পেলাম আমরা। দু'জনেই স্টাডিরুমে ছিলেন, তবে তাঁদের চেহারা দেখে মনে হলো না, আমাদের দেখে অখুশি হয়েছেন। এই বিজন গাঁয়ে একা-একা থাকছেন বহুদিন ধরে, শহুরে মানুষ পেয়ে ওঁরা বরঞ্চ কিছুটা স্বস্তিই পেলেন। আশপাশের গাঁয়ের লোক, কোন এক অজ্ঞাত কারণে এঁদেরকে এড়িয়ে চলে। সম্ভবত এঁদের ভূত-প্রেত নিয়ে কাজকারবার গ্রামের মানুষের ঠিক পছন্দ নয়। একমাত্র ফুটফরমায়েশ খাটার লোকটাকেও নাকি জোগাড় করতে হয়েছে বহুদূরের একটা গ্রাম থেকে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়ে, আগের কাজের জায়গা থেকে রীতিমত ভাগিয়ে আনা হয়েছে তাকে! আশপাশের কেউ এখানে থেকে এঁদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি। অথচ চাকরটা হলফ করে বলল, এ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছুর মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে এখানে। দু'বেলা রান্না করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করতে হয় না তাকে, বেশ সুখেই আছে সে এখানে। আগের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজে আর ফেরত যাবার ইচ্ছে নেই তার।

আমরা উখিনীদের ব্যাপারে আগ্রহী শুনে যারপরনাই অবাক হলেন দু'গবেষক। তবে তারচেয়েও বেশি হলেন আনন্দিত। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন, শহুরে মানুষ এখানে বেড়াতে এসে শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরেই বুঝি দেখা করতে গেছি। কিন্তু ঢাকা থেকে আমাদের এতদূর ছুটে আসার প্রধান কারণই যে উখিনীরা, এটা শুনে তাঁরা রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন। কল্পনাও করেননি, ভূত-প্রেতের ব্যাপারে এতটা আগ্রহ থাকতে পারে কারও।

খুলে বলতে লাগলেন উখিনীদের ব্যাপারে সবকিছু। অনেকগুলো মোটা-মোটা বই, পুরানো নথিপত্র বের করে দেখাতে লাগলেন। কিছু বুঝতে পারলাম, কিছু পারলাম না। তারপরও বেশ আগ্রহ নিয়েই সবকিছু উপভোগ করতে লাগলাম আমরা।

এরমধ্যে চা-নাস্তা দিয়ে গেল চাকরটা। চা খেতে-খেতে গল্পের ছলে, জেনে নিতে থাকলাম আমরা উখিনীদের ব্যাপারে অজানা হরেক তথ্য। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, যখন জানতে পারলাম, এদেশে নয়, তাঁরা উখিনীদের ব্যাপারে প্রথম জানতে পেরেছেন ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়! সেখানকার একজন স্বনামধন্য প্রফেসর, তাঁর লেকচারে সর্বপ্রথম উখিনীদের ব্যাপারে বিস্তারিত বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি লণ্ডনের একজন প্রখ্যাত ভূত-বিশেষজ্ঞও বটে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে। এরমধ্যে কয়েকটি ইণ্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারও হয়েছে। তাঁর

লেকচারের মোহনীয় ভঙ্গির কারণেই উখিনীদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এই দুই তরুণ গবেষক। সেই অধ্যাপকের কাছ থেকে আরও বেশি তথ্য জানার জন্য তাঁর কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান করেন। তারপর যখন গবেষণার এক পর্যায়ে জানতে পারেন, বাংলাদেশের পটুয়াখালীর এক প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উখিনীদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে, দু'জনের আগ্রহই এক লাফে তুঙ্গ স্পর্শ করে। নিজের দেশে গবেষণার সুযোগ তাঁরা ছাড়বেন কেন? তাই দু'জনেই গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেন, বিলুপ্তপ্রায় ভূত-প্রেত গোষ্ঠীকে।

শুনতে অবাক লাগলেও, একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা তাঁদের স্পন্সর হিসেবে এগিয়ে আসে এবং রিসার্চের সমস্ত ব্যয়ভার বহনের প্রস্তাব দেয়। তাঁদের অর্থ সাহায্য নিয়েই এই দুই গবেষক নানা প্রজাতির ভূত-প্রেতের পিছু নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সর্বশেষ উখিনীদের খোঁজে এসে আবাস গেড়েছেন এই বিজন গাঁয়ে।

গবেষণা এগিয়ে চলছে পুরোদমে। ইতোমধ্যেই তাঁদের লেখা উখিনী বিষয়ক দুটো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ওয়ার্ল্ড প্যারানর্মাল ম্যাগাজিনে। সেই ম্যাগাজিনটির একটি কপিও বের করে আমাদেরকে দেখালেন ওঁরা।

সবকিছু দেখেশুনে অবশ্য বিস্ময় বাড়ল বৈ কমল না আমাদের। এই আজ সকালেও, ঢাকা থেকে এক অবাস্তব পিশাচের দেখা পাওয়ার জন্য সব কাজকর্ম ফেলে এতদূর ছুটে আসাটাকে রীতিমত পাগলামি মনে হচ্ছিল আমার কাছে! এখন দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমারা আমাদের চাইতেও বড় পাগল! ভূত-প্রেত নিয়ে রীতিমত মহাযজ্ঞ চলছে ওদের ওখানে।

দুই গবেষক আমাদের বলে চললেন, আমরা শুনতে লাগলাম উখিনীদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব কাহিনি।

উখিনীদের আদি জন্মস্থান এ উপমহাদেশে নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোর কোন একটায়! উখিনীরা আগে পুরোপুরি গাছই ছিল, পরবর্তীতে বনদেবতা মুরঙের আশীর্বাদে পিশাচ হয়েছে। দ্বীপগুলোর আদিবাসীরা তখন নিয়মিত বনদেবতা মুরঙের পূজা করত। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য প্রায়ই জ্যান্ত প্রাণী বলি দিত। তাদের উপর বেজায় সন্তুষ্ট ছিলেন বনদেবতা মুরঙ।

একবার ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয় দ্বীপগুলোতে। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায় অজ্ঞাত এক রোগে। এ ঘোর দুর্যোগের সময় কারও আর মনে থাকে না বনদেবতার আরাধনার কথা। মহাখাপ্পা হয়ে যান দেবতা, দ্বীপবাসীর উপর চরম প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত নেন। দেবতার বর পেয়ে, দ্বীপের কিছু গাছ রাতারাতি পিশাচ হয়ে যায়। তারা চলতে-ফিরতে শুরু করে অন্যান্য প্রাণীদের মত। টপাটপ গিলতে থাকে সামনে যাকে পায় তাকেই! রীতিমত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে দেবতার এই অনাসৃষ্টি, উখিনীরা। উপায়ান্তর না দেখে দ্বীপবাসীরা নতজানু হয়ে মুরঙের কাছে ক্ষমা চায়। তাদের আহাজারিতে দেবতার মন নরম হয়, তিনি উখিনীদের ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে দেন; এরপর থেকে কেবল অন্ধকারেই তারা জেগে উঠতে পারে, আলোতে তাদের ক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা

হয় না আদিবাসীদের। দিনটা কোনরকমে কাটলেও রাতের আঁধারে নিয়মিত লোকালয়ে হানা দিতে শুরু করে উখিনীর দল। পেটে তাদের রাক্ষুসে খিদে লেগেই আছে। কিছুতেই যেন সে ক্ষুধা মিটবার নয়!

সারারাত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে, ভোরের দিকে ফিরে যেত ওরা জঙ্গলে। ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে থাকে ওই দ্বীপটার জনসংখ্যা। প্রায় সবাই-ই প্রাণ দিয়েছে উখিনীদের হাতে, আর কিছু ভাগ্যবান মানুষ পালিয়ে যেতে পেরেছিল আশপাশের দ্বীপগুলোতে। একসময় একেবারে শেষ হয়ে যায় দ্বীপটার লোকবসতি।

কিন্তু খাবার ছাড়া ওই দানবেরা বাঁচবে কীভাবে? তাই তারাও ক্ষুধার তাড়নায় রাতের আঁধারে সমুদ্রে ভেসে পাড়ি দিতে থাকল এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে। উজাড় হতে থাকে একের পর এক দ্বীপের মানুষ।

একসময় ব্যাপারটা দক্ষিণের দেশগুলোর সরকারের নজরে আসে। এমনিতেই আদিবাসীদের প্রাণের মূল্য নেই ওদের কাছে, তার উপর প্যানিক ছড়িয়ে পড়বার ভয়ে খবরটা ধামাচাপা দেয় দেশগুলোর সরকার। তবে একেবারেই নির্বিকার থাকেনি ওরা। পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দোহাই দিয়ে একের পর এক দ্বীপের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় ২৩৩টি দক্ষিণের দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এরপর নৌবাহিনীকে নামানো হয় উখিনী নিধন অভিযানে। দাবানল লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় দ্বীপগুলোর পুরো বনভূমি। আশ্রয় হারিয়ে প্রাণের তাগিদে উখিনীরা তখন ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্র পথে। একেকটা দল চলে যায় একেকটা মহাদেশে। তারই মধ্যকার ক্ষুদ্র একটা দল সম্ভবত আবাস গেড়েছে এখানে। বঙ্গোপসাগর দিয়েই যে ওরা ভেসে এসেছে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই।

গবেষণা প্রায় শেষ করে এনেছেন ওঁরা, এখানে উখিনীদের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে। এলাকাটা ভাল করে ম্যাপ করা হয়ে গেলেই ওঁরা রিপোর্ট জমা দেবেন। একটা কপি পৌঁছে যাবে এদেশের সরকারের কাছেও। তখন সম্ভবত সেনাবাহিনীর একটা অভিযান চালানো হবে। পুড়িয়ে দেয়া হবে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের বনভূমি। তখন উখিনীরা এ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও নির্ভয়ে আবার কাজকর্ম করতে পারবে।

তাঁদের বর্ণনা শেষে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা। বিস্ময়ে রীতিমত পাথর হয়ে গেছি। হঠাৎ পাওয়া তথ্যগুলো হজম করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে আমাদের। নরেন বাবু কিংবা সঞ্জয় দেবনাথের অবস্থাও অবশ্য আমাদের চেয়ে খুব একটা সুবিধের নয়। আশৈশব যে উখিনীদের গল্প শুনে এসেছেন পুরানো মানুষদের কাছ থেকে, যাদের ভয়াল কাণ্ডকীর্তি বাধ্য হয়ে চাক্ষুষও করেছেন কিছুটা, তাদের যে এমন একটা বৈচিত্র্যময় ইতিহাস থাকতে পারে, সেটা তাঁদের কল্পনাতেও ছিল না! বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন দু'জনেই।

অবশেষে ঘোর কাটতেই, গবেষকদ্বয়কে তাঁদের মূল্যবান সময়ের খানিকটা আমাদেরকে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। নরেন বাবুদের বাড়িতে

ফেরার পথে বলতে গেলে তেমন কোন কথাই হলো না আমাদের মধ্যে।

নয়

দুপুরে খাওয়ার পর যথারীতি বারান্দায় বসে গল্প-গুজব করছিলাম আমরা। গৃহকর্তা ভদ্রলোক গেছেন স্থানীয় বাজারে টুকিটাকি জিনিসপত্র সওদা করতে। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তখন কেবল একটাই ছিল—উখিনী। একটু পরেই দেখলাম, নরেন বাবুর পিসতুতো ভাই বাজার সেরে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে আরেকজন লোক, তার সাজসজ্জা কিম্ভূতকিমাকার। ভদ্রলোক নতুন আগত মানুষটির সাথে আমাদের সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানা গেল, লোকটা একজন তান্ত্রিক, পাশের গাঁয়ে বসবাস করে। লোকটার নামটাও বেশ অদ্ভুত, ভোম কাপালিক!

আমি বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ করলাম তাকে। সাধারণত তান্ত্রিক বললে লোকের চোখের সামনে যেরকম একখানা অবয়ব ফুটে ওঠে, তার সাথে ভোম কাপালিকের খুব একটা অমিল নেই। পুরানো আমলের চৌকিদারদের মত বাহারি গোঁফ, প্রায় বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। কালো একখানা আলখাল্লায় নিজেকে আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছে। মাথায় ভাল করে পেঁচানো একটা উঁচু পাগড়ি, তাতে বিজাতীয় কারুকাজ। পিঠে একখানা ঝোলা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ ভারী ওটা। হয়তো তন্ত্র-মন্ত্র করার জন্য সমস্ত উপাচার নিজের সাথে নিয়েই ঘোরে ভোম কাপালিক।

আমাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে, মেঝের উপরেই বসল লোকটা। তারপর মুখ তুলে তাকাল আমাদের দিকে। লোকটার দু'চোখে অশুভ কীসের যেন একটা ছায়া, তাকালেই অস্বস্তি লাগে।

ধূর্ত একটা হাসি দিয়ে আলাপ শুরু করল লোকটা। 'আপনারা উখিনী দেখতে আসছেন এখানে?'

জবাব দেবার আগে খানিকটা সময় নিলাম আমি। তারপর বললাম, 'জী না। ঠিক উখিনী দেখতে আসিনি। ওরা কোথায় থাকে, শুধু সে জায়গাটা দেখতে এসেছি।'

'দেখা হয়েছে?'

'হুম।'

'এতদূর থেকে আসলেন, আর শুধু তাদের আস্তানা দেখেই চলে যাবেন! ওদেরকে দেখতে মন চায় না বুঝি?'

খানিকটা থতমত খেয়ে গেলাম। এ কী বলছে লোকটা! মুখে বললাম, 'আমরা চাইলেই তো আর হবে না। তা ছাড়া কাজটা তো বিপজ্জনকও বটে।'

খিক-খিক করে বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে উঠল লোকটা, 'বিপদের কোন সম্ভাবনাই নাই, আমি দেখাতে পারব আপনাদেরকে উখিনী।'

'সত্যি বলছেন?' চিৎকার করে উঠল মামুন। নরেন বাবু আর সঞ্জয় দেবনাথের চেহারা ফ্যাকাসে।

'জী, জনাব। সত্যি বলছি। আপনারা চাইলেই উখিনী দেখাতে নিয়ে যেতে পারি আমি। জঙ্গল থেকে কোন একটাকে ধরে নিয়ে আসব, আপনারা দূরে দাঁড়িয়ে কেবল একপলক চোখের দেখা দেখবেন।'

'কীভাবে সম্ভব করবেন আপনি এটা? এ তো রীতিমত অবাস্তব একটা প্রস্তাব।' উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন নরেন বাবু।

'আমার গুরু জয়সিংহ কাপালিক, তিব্বত থেকে উখিনী বশীকরণ মন্ত্র শিখে এসেছিলেন। গুরু মরার আগে, আমারেও সেটা শিখিয়ে গেছেন। তবে শুধু মন্ত্রতে কাজ হয় না, অনেক রকম কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয়। এতদিন আমি সেসব সাধনা করেছি। গতরাতেই কেবল সিদ্ধি পেলাম।

'আজ আষাঢ় মাসের প্রথম দিন। শনির মিনাগকা রেখাও আছে একেবারে চন্দ্র বরাবর। কেবল আজকের রাতেই ফল দেবে উখিনী বশীকরণ মন্ত্র। এরপর আবার এমন একটা দিন পেতে অপেক্ষা করতে হবে কম করে হলেও চারটা বছর!'

'উখিনী বশ করলে কী লাভ হবে?' জানতে চাইলেন সঞ্জয় দেবনাথ।

'বোকার মত কথা বলেন কেন? এদের ক্ষমতা আপনার জানা নাই?' খেঁকিয়ে উঠল ভোম কাপালিক। 'তাদের কাছ থেকে জল-স্থল সব জায়গায় চলাচলের কৌশল জেনে নেয়া যাবে। উভচরের মতই ক্ষমতা থাকবে তখন আমার! আমার কথায় ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা অন্যের উপর, ইচ্ছে করলে ওদের দিয়ে গোটা দুনিয়া শাসন করা যাবে। যা-যা প্রয়োজন হবে, সবকিছুই জোর করে আদায় করা যাবে। কে তখন আমার সামনে চোখ তুলে কথা বলার সাহস করবে?' চোখে-মুখে কুৎসিত একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল লোকটা। ঘৃণায় গা রি-রি করে উঠল আমার। সত্যিই যদি লোকটা উখিনীদের বশ করার ক্ষমতা পেয়ে যায়, প্রথম হামলাটা সম্ভবত সে এই গ্রামের নিরীহ মানুষদের উপরই করবে।

তবে পরেরটা পরে দেখা যাবে, তাকে সামলানোর একটা ব্যবস্থা করাই যাবে সবাই মিলে। এখন যদি লোকটা আমাদের উখিনী দেখাতে পারে, তা হলে ক্ষতি কী? আমাদের এই সফরটাকেও তখন পরিপূর্ণ সফর হিসেবে অভিহিত করা যাবে।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'দেখতে চাই উখিনী, ব্যবস্থা করুন আপনি।'

নরেন বাবু এবং সঞ্জয় দেবনাথ চমকে তাকালেন আমার দিকে, গৃহকর্তা ভদ্রলোকের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। শুধু মামুন হাসি-হাসি মুখ করে চেয়ে রইল আমার দিকে। সে ভালই জানত, এ সিদ্ধান্তই নেব আমি। কোন সন্দেহ নেই, সে-ও আমার সাথী হবে উখিনী দর্শনে। অনেক বুঝিয়েও কিছুতেই আমাদের নিরস্ত করতে পারলেন না নরেন বাবু। আমরা ঠিকই অনড় রইলাম আমাদের সিদ্ধান্তে। সঞ্জয় দেবনাথ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন।

নরেন বাবুর পিসতুতো ভাইটি অবশ্য পুরোপুরি চুপ মেরে গেছেন। হয়তো

বুঝতে পেরেছেন, আমাদেরকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তবে ভোম কাপালিক বার-বার সবাইকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করল। বারংবার আওড়াতে লাগল, এতে ভয়ের কিছুই নেই, উখিনীরা এখন থেকে তার গোলাম হয়ে থাকবে।

ঠিক হলো, আমরা থাকব উখিনীদের জঙ্গলের বাইরের মাঠটায়, আর সে নিজে বনের ভিতর ঢুকে একটা উখিনী ধরে আনবে। আমাদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা শেষে, ওটাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসবে বনে।

পুরো সময়টাতে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কেবল দেখা ছাড়া আমাদের কোন কাজই নেই। আয়োজনটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, দুশ্চিন্তার কোনরকম অবকাশই নেই।

বিকেলের অপেক্ষায় রইলাম আমরা, সন্ধ্যা নামার আগে-আগেই রওনা হব মাঠটার উদ্দেশে। এরই মধ্যে আমাদের জন্য এক দফা জলখাবার পাঠানো হলো। আমাদের মধ্যে এ নিয়ে খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও ভোম কাপালিক বেশ চেটেপুটেই খেল নিজের ভাগের খাবারটুকু।

দশ

সূর্যের তেজটা কমতেই দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। দলে মানুষজন খুব একটা কম নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম, কেবল মামুন এবং আমিই সঙ্গী হব ভোম কাপালিকের। অন্য কেউ হয়তো যেতে চাইবে না।

তবে আমার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে নরেন বাবু এবং সঞ্জয় দেবনাথও সাথী হলেন আমাদের। এ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দারা ইচ্ছে করেই কেউ গেল না। উখিনীদের দেখলে ছেলে হারানোর শোক মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে আবার। হয়তো ক্রোধের বশেই উল্টো-পাল্টা কিছু করে বসবে, কী দরকার?

আমরা প্রত্যেকে সাথে নিলাম একটা করে মশাল আর এক বোতল করে মন্ত্রপূত জল। যদি কোন বিপদে পড়েই যাই, তখন কাজে লাগবে।

উখিনীর বনের বাইরের মাঠটাতে পৌঁছুতে-পৌঁছুতেই সূর্য ডোবার সময় ঘনিয়ে এল। ওটা তখন রক্তবর্ণ হয়ে পশ্চিম আকাশে, দিগন্তের শেষ প্রান্তে কোনরকমে ঝুলে আছে। সেদিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল। বার-বার মনে হতে লাগল, ওটা ডুবে গেলেই জেগে উঠবে উখিনীরা। আর এবার আমরা আছি ওদের একেবারে হাতের নাগালে।

আমাদেরকে মাঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলে, চটজলদি বনের ভিতর ঢুকে গেল ভোম কাপালিক। ভিতরে গিয়ে সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে যাবার আগেই আরও কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে তাকে।

আমাকে বলেছে, একজায়গায় মাটিতে বৃত্ত এঁকে তার মধ্যখানটায় দাঁড়িয়ে কী সব যেন মন্ত্র আওড়াতে হবে তেরোবার। আরও কী-কী যেন বলতে চেয়েছিল লোকটা। দুর্বোধ্য লাগায়, আমি আর মনোযোগ দিয়ে শুনিনি তার কথাগুলো।

শুনে কী হবে? আমার তো আর উখিনী বশ করে দুনিয়া শাসন করার খায়েশ নেই। ওদেরকে একনজর দেখতে পারলেই খুশি মনে এখান থেকে বিদায় নেব আমি। এ সমস্ত ভূত-প্রেতের সাহচর্য আর ভাল লাগছে না আমার।

সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তে চারদিকটা কেমন নিঝুম হয়ে গেল। কোথাও এতটুকু শব্দও নেই, নড়ছে না কিছুই। হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগেই আমরা দল বেঁধে পাখিদেরকে উখিনীর বন থেকে উড়ে যেতে দেখেছি। ইঁদুর, বেজির মত দুয়েকটা ক্ষুদ্র প্রাণীও হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে মাঠ পেরিয়ে ঢুকে গেছে পাশের বনটায়। তবে কি রাতের বেলা উখিনীদের বনে কোন পশুপাখি থাকে না? এরাও কি তা হলে জানে মূর্তিমান উপদ্রবটার কথা? ওরাও প্রাণভয়ে দিনের আলো থাকতে-থাকতেই কি পালিয়ে যায়?

টুপ করে সূর্যটা ডুবে গেল, চারপাশে নেমে এল আঁধারের এক নিশ্ছিদ্র চাদর। আমরা ক'টা দোপেয়ে প্রাণী, মশাল জ্বেলে দাঁড়িয়ে রইলাম বনের ধারে। এতটুকু বাতাসও নেই, তবুও ক্ষণে-ক্ষণে গা-টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম, উপকূল এলাকা, এজন্যই হয়তো খানিকটা ঠাণ্ডা লাগছে। অথচ ঠিকই জানি, যথেষ্ট গরম পড়েছে আজ সারাদিন, বৃষ্টি হয়নি একটুও, শীত লাগার তো প্রশ্নই আসে না।

হঠাৎ হালকা একটা শব্দে ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। বনের ভিতর থেকে কীসের যেন নড়াচড়ার শব্দ ভেসে আসছে। যেন অনেক ভারী কিছু একটা মাটিতে ঘষটে-ঘষটে হাঁটছে! তা হলে কি জেগে উঠেছে উখিনীরা? ভোম কাপালিক কোথায়? ওদেরকে বশ করতে পারল কি? এক্ষুণি কি কোন একটাকে ধরে আনবে বনের বাইরে?

আচমকা কারও রক্ত হিম করা আর্তনাদ ভেসে এল জঙ্গলের ভিতর থেকে। বুঝতে অসুবিধা হলো না, ওটা কার চিৎকার। কোন সন্দেহ নেই, ওটা ভোম কাপালিকের বুকফাটা আর্তনাদ! বিপদে পড়েছে বেচারা, আমাদের সাহায্য প্রয়োজন তার। কোন কিছু না ভেবেই ছুট লাগালাম বনের দিকে। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে জাপটে ধরলেন নরেন বাবু। অদ্ভুত চেহারা করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, দু'চোখ বিস্ফারিত। 'করছেন কী, মশাই? কোথায় রওনা হলেন পাগলের মত?'

রাগতস্বরে জবাব দিলাম, 'আপনি শুনতে পাননি কাপালিকের চিৎকারটা? হয়তো তার কোন বিপদ হয়েছে।'

নরেন বাবু মনে হচ্ছে খুব অবাক হলেন আমার কথা শুনে। 'শুনেছি। হয়তো নয়, অবশ্যই তার বিপদ হয়েছে। এবং বিপদটা কী, সেটা আমরা সবাই জানি। তার জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা অবশ্যই।'

'আপনাকে যেতে হবে না, নরেন বাবু। আমাকে যেতে দিন। চোখের সামনে একজন মানুষের প্রাণ যাবে, আর আমি বুঝি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখব? তা হয় না, নরেন বাবু। আমি মোটেও অমন মানুষ নই। তা ছাড়া সাথে রয়েছে জ্বলন্ত মশাল আর মন্ত্রপূত জলের বোতল। কোন বিপদ হবে না আমার।' একদমে

বললাম পুরোটা কথা। তারপর তাঁকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুট লাগালাম জঙ্গলের দিকে।

পিছনে তাকালে দেখতে পেতাম, হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন নরেন বাবু এবং সঞ্জয় দেবনাথ। ছুটতে-ছুটতেই টের পেলাম, আমার পাশে ছুটে চলেছে মামুন!

এই অবস্থাতেই মনটা কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল আমার। বন্ধুকে একা বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে, সে-ও সাথী হয়েছে অবলীলায়। পরোয়া করেনি নিজের নিরাপত্তার। এই না হলে বন্ধুত্ব!

বনের ভিতর একটুখানি ঢুকেই একচিলতে খোলা জায়গা চোখে পড়ল। মাটিতে দাগ কাটা দেখেই বুঝতে পারলাম, এখানেই উখিনী বশীকরণ মন্ত্র জপ করছিল ভোম কাপালিক। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। দু'জনের মশালের আলোয়, এদিক-ওদিক প্রাণপণে খুঁজলাম দু'বন্ধুতে। কিন্তু ভোম কাপালিকের টিকিটিরও সন্ধান পেলাম না। শুধু তার ঝোলাটা পড়ে রয়েছে বৃত্তের মাঝখানে, পাশেই পড়ে আছে ক'খানা মানুষের হাড়গোড়। কোন সন্দেহ নেই, নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করার জন্যই এগুলো এনেছিল ভোম কাপালিক।

আচমকা কীসের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। জোড়া মশালের আলোয় যা দেখতে পেলাম, কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না!

এ কী করে সম্ভব! সীমাহীন আতঙ্কে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার।

ঘিরে ফেলা হয়েছে আমাদেরকে চারপাশ থেকে, পালাবার এতটুকু পথও খোলা নেই। ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা আমাদের দিকে। এক ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা দু'জন। দেখতে পাচ্ছি উখিনীদের।

ওই ভয়ালদর্শন গাছগুলোরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায় এদেরকে! অবিকল ওগুলোর মতই দেখতে, একইরকম কুৎসিত। দিনের বেলায় কোথায় লুকিয়ে ছিল ওরা? নাকি এখানেই ছিল, আমাদের সবার চোখের সামনে? রাতের অন্ধকারে, নিশ্চল উদ্ভিদ থেকে সচল পিশাচে পরিণত হয়েছে নাকি ওরা?

কী বীভৎস, কী ভয়ঙ্কর! আতঙ্কে চোখজোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হলো আমার। তারপরও মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদের এগিয়ে আসা দেখতে লাগলাম। সম্মোহিত হয়ে পড়েছি যেন। না তাকিয়েও দিব্যি বুঝতে পারছি, মামুনের অবস্থাও অবিকল আমারই মত। সর্পিল লতাগুলো আসলে উখিনীদের হাত, ওগুলোই এখন বাড়িয়ে রেখেছে সামনের দিকে। যেন আমাদের স্পর্শ পেতে উন্মুখ হয়ে আছে ওরা। দিনের বেলায় যে জায়গাটা ঝুপড়িমতন দেখাচ্ছিল, সেখানেই এখন গজিয়ে উঠেছে ওদের বীভৎস মুখ। মুখ দিয়ে মাদার গাছের কষের মত প্রতিনিয়ত লালা ঝরে পড়ছে। সাপের মত কিলবিলে তিনটে দ্বিখণ্ডিত জিভ, বার-বার সেই কুৎসিত গহ্বরটাতে ঢুকছে আর বের হচ্ছে।

মুখের খানিকটা উপরেই গজিয়ে উঠেছে চারটে করে কুতকুতে লালরঙা চোখ। সেই চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা আমাদের দিকে।

আচমকা যেন এগিয়ে আসার গতিটা অনেকখানি বেড়ে গেল ওদের। যেন নিজেদের মধ্যে অলিখিত প্রতিযোগিতায় নেমেছে ওরা, কার আগে কে ধরবে আমাদের!

নিজের অজান্তেই হাত থেকে খসে পড়ল মন্ত্রপূত জলের ঘড়াটা। আর ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার সাহস হলো না আমার। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বন্ধ করলাম চোখ দুটো।

মায়ের কথা মনে পড়ল। ভুল বলেননি তিনি, বেশিদিন সুখ সইল না আমার কপালে! জয়ার কথা মনে পড়ল, চোখে ভেসে উঠল একমাত্র মেয়েটার মায়াকাড়া মুখটা। আমাকে ছাড়া কেমন থাকবে ওরা? খুব কি কষ্ট হবে ওদের?

ঠিক তখনই প্রথম লতাটা আমার শরীরটাকে পেঁচিয়ে ধরল! নাগাল পেয়ে গেছে ওরা আমার।

গলা ফাটানো আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার বুক চিরে। গোটা দেহটা কেউ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখায়! পরক্ষণেই কানে এল মামুনের অন্তিম আর্তনাদ।

আমাদের চিৎকার নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন নরেন বাবু আর সঞ্জয় দেবনাথ। ওঁরাও কি পাগলের মতন ছুটে আসবেন আমাদের বাঁচাতে? না আসুন, সরে থাকুন নিরাপদ দূরত্বে। বেঁচে থাকুন আরও অনেকগুলো বছর এই অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীর বুকে। উখিনীদের মানুষ শিকারের তালিকায় শেষ দুটো নাম যেন আমাদেরই হয়!

***

অপদেবী

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

অপদেবী

এক

দিনের বেলায় কখনওই ঘুম হয় না জাহিদের। তবে শীতের বিকেলগুলোয় একখানা পাতলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে খানিকক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে নিতে মন্দ লাগে না। পড়ন্ত বেলায় হালকা শীত-শীত একটা ভাব থাকে, রাজ্যের আলস্য যেন দু'হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়। বিছানার মৃদু ওম ছেড়ে কারই বা তখন উঠতে ইচ্ছে করে?

তাই দরজার কড়া নাড়ার শব্দটা ঠিকঠাক শুনতে পেলেও, বিছানায় মটকা মেরে পড়েই রইল জাহিদ। মনে ক্ষীণ আশা, বাইরের মানুষটা হয়তো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে ফিরতি পথ ধরবে। এমনিতে বিকেলের এ সময়টায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কারও আসার কথা নয় তার কাছে। পাড়ার কোনও ইঁচড়েপাকা ছেলে-ছোকরার জন্য এহেন আরামটা বিসর্জন দিতে রাজি নয় ও।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহিদকে সভয়ে বিছানা ছাড়তে বাধ্য করল অনাহূত অতিথি! কারণটা আর কিছুই নয়, সদর দরজাটার ভেঙে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া। অতিথি এখন কড়া ছেড়ে প্রাণপণে দরজার কবাটের উপর দুমাদুম কিল মারছে। কাঠের পুরানো দরজা, কতক্ষণ এহেন অত্যাচার সইতে পারবে, তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে?

রীতিমত দৌড়ে গিয়েই দরজাটা খুলল জাহিদ। অতিথির চাঁদমুখটা নজরে আসতেই মেজাজটা পুরোপুরি খিঁচড়ে গেল তার। হাসিমুখে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশের বাড়ির মিজান সাহেব।

বেশি কথা বলেন বলে এমনিতেই তাঁকে অপছন্দ জাহিদের, আর এখন তো রীতিমত অসহ্য লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে লোকটার বাম গালে ঠাস করে একখানা রামচড় বসিয়ে দিতে। তাতে যদি মনের রাগ খানিকটা কমে। কিন্তু চাইলেই তো আর অন্তরের সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করা যায় না, তাই না? সভ্য সমাজে বাস করতে হলে মানুষের বেশিরভাগ অভিলাষকেই গলা টিপে মেরে ফেলতে হয়। তা ছাড়া লোকটার মাথায় খানিকটা ছিট আছে বলেই ধারণা জাহিদের। পাগলের সঙ্গে বিবাদে জড়ানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

এসব ভাবতে-ভাবতে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে মেকী হাসি ফুটিয়ে তুলল জাহিদ।

'কী ব্যাপার, মিজান সাহেব? হঠাৎ এই অবেলায় আমার কাছে কী মনে করে?'

মিজান সাহেবের হাসির পরিধি আরও খানিকটা বাড়ল। 'একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে, জাহিদ। তুমি লেখক মানুষ, কল্পনাশক্তি ভাল। তুমিই বিষয়টা ভাল বুঝবে। তাই তোমাকে বলতে এলাম।'

বলতে-বলতেই জাহিদকে একরকম ধাক্কা দিয়েই ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি। হন্তদন্ত ভঙ্গিতে গিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলেন বৈঠকখানার সোফার উপর। বিস্মিত জাহিদ ছানাবড়া চোখে তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো।

পছন্দ না করলেও মিজান সাহেবের বাসায় নিয়মিতই যাতায়াত ছিল জাহিদের। এর পিছনে মূল কারণ, মিজান সাহেবের সংগ্রহে থাকা হাজার-হাজার বই, যার অনেকগুলো আবার বেজায় দুষ্প্রাপ্য, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করা। চাইলেই সেগুলো ধার দিতেন মিজান সাহেব, অন্য সংগ্রাহকদের মত গোমড়া মুখে হাস্যকর সব অজুহাত দেখাতেন না কখনও।

ভদ্রলোকের জ্ঞানের পরিধিরও যেন কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এই জীবনে কত বই যে তিনি পড়েছেন, তার কি কোনও ইয়ত্তা আছে নাকি! আজকালকার অনেক বাক্‌পটু অধ্যাপকের চেয়ে নানা বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ঢের বেশি। স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ, বিন্দুমাত্র বয়সের ছাপও পড়েনি তাতে।

কিন্তু এসব নিয়ে ভদ্রলোক যেন ঠিক সচেতন নন। অন্তত তাঁকে আত্মগরিমায় কখনও ভুগতে দেখেনি জাহিদ। উল্টো তাঁর চালচলনে কেমন যেন একটা প্রাচীন আলাভোলা ভাব। দিন-দুনিয়ার কোনও খবরই যেন তাঁর জানা নেই।

তবে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা কখনওই তেমন একটা উপভোগ করে না জাহিদ। ভদ্রলোক জানেন না ঠিক কোথায় থামতে হয়, নিদেনপক্ষে খানিকটা বিরতি নিতে হয়। একবার কথা শুরু করলে একনাগাড়ে নাকে-মুখে খই ভেজে চলেন। সামনের শ্রোতার মনোযোগ আছে কি নেই, উপভোগ করছে নাকি বিরক্ত হচ্ছে, এসবে তাঁর কিছুই যায়-আসে না। জোর করে না থামালে থামতেই চান না, অনর্গল বক্তৃতা চলতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এত কথা একজন মানুষ কীভাবে বলতে পারে, আল্লাহ্ মালুম!

সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যার দিকে তাঁর বড় মেয়েকে পড়াতে যেত জাহিদ। এক ঘণ্টার মত পড়ালেও, তিন-চার ঘণ্টার আগে ও-বাড়ি থেকে কখনও বেরুতে পারত না জাহিদ। বলা ভাল, তাকে বেরুতে দেয়া হত না!

পড়া শেষে বিদায় নেবার ঠিক আগমুহূর্তে কোত্থেকে যেন হাসিমুখে এসে হাজির হতেন মিজান সাহেব। সাধারণ সৌজন্যমূলক কথোপকথনের মাঝখান থেকে ঠিকই তিনি নতুন একটা টপিক খুঁজে বের করতেন। তারপর আর কী? শুরু হত তাঁর বক্তৃতার বুলেট ট্রেন!

বেশিরভাগ সময়ই সেটা থামতে-থামতে রাতের খাওয়ার সময় ঘনিয়ে যেত। টেবিলে খাবার সাজিয়ে তাদেরকে ডেকে পাঠাতেন মিজান সাহেবের স্ত্রী। সবার পীড়াপীড়িতে লজ্জাবনত মস্তকে ডিনারে বসতে হত জাহিদকে। এরপর ফেরার সময় দেখা যেত, জাহিদের হাতে অন্তত দু'-তিনখানা হোঁৎকা সাইজের বই শোভা পাচ্ছে–যার বেশিরভাগই মিজান সাহেবের জোর করে গছিয়ে দেয়া। বাধ্য হয়েই নিতে হত এসব জাহিদকে। মিজান সাহেবের সঙ্গে তর্ক করে কি আর লাভ আছে? নাকি তাঁর সাথে তর্কে জেতা সম্ভব!

ভালই চলছিল সবকিছু। কিন্তু গত সপ্তাহে আচমকা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, ও-বাড়িতে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হলো জাহিদকে।

রোজকার মত সেদিনও পড়ানো শেষে বাড়ি ফেরার এন্তেজাম করছিল সে। ঠিক তখনই হাতে এক বাটি মুড়ি নিয়ে সেখানটায় এসে হাজির হন মিজান সাহেব। হাসিমুখে কুড়মুড় করে মুড়ি চিবুচ্ছেন আর একটু পর-পর বিকট হাঁ করে কামড় বসাচ্ছেন মাঝারি আকারের একখানা পাটালী গুড়ের টুকরোতে।

ইশারায় জাহিদকে বসতে বলে, নিজেও তিনি চেয়ার টেনে বসলেন। মুখভর্তি মুড়িগুলো কোঁৎ করে গিলে নিয়ে ঢক-ঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর আয়েশ করে ঢেঁকুর তুলে, কথা শুরু করলেন ভদ্রলোক। মুড়ির বাটিটা তখনও হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছেন। মনে হয় আহারের পর্বটা পুরোপুরি সাঙ্গ হয়নি তখনও, কেবল সাময়িক বিরতি দেয়া হয়েছে।

'জাহিদ, তুমি কি জানো, আমার দুই মেয়েই যে তোমাকে ভীষণ রকম পছন্দ করে? তারা পড়াশোনা শিকেয় তুলে রেখে রাত জেগে-জেগে তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখে খাতা ভরিয়ে ফেলেছে! বাজারের লিস্টি করতে গিয়ে একটুখানি কাগজ আনতে গিয়েছিলাম ওদের পড়ার ঘরে। তখনই নিতান্ত ভাগ্যগুণে খাতাগুলো আমার চোখে পড়েছে। কবিতাগুলো ওখানে বসেই পড়েছি, তেমন একটা ভাল হয়নি। কাঁচা হাতের আবেগী লেখা। ছন্দের খেলা কিংবা গভীর জীবনবোধের কোনও ছোঁয়া নেই ওগুলোয়। সবক'টাতেই সস্তা প্রেমের নির্লজ্জ বাণীগুলো ঘুরে ফিরে এসেছে বারংবার।'

কথোপকথনের এই পর্যায়ে জাহিদের ছাত্রী, রুবা, এক ছুটে ভিতরে চলে গেল। এতক্ষণ ড্রয়িং রুমের বিশাল টেবিলটার এক কোনায় বসে চুপচাপ অংক কষছিল সে। তার চেহারায় উদ্‌ভ্রান্ত একটা ভাব, দু'চোখ বিস্ফারিত। একটুর জন্য চৌকাঠে হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচল মেয়েটা।

নিজেকে দেখতে না পেলেও জাহিদ স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার অবস্থাও খুব একটা সুবিধার নয়। নিজের কানকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে! এসব কী শুনছে?

রুবা এবং তার ছোটবোন রূপাকে সারাজীবন নিজের বোনের নজরেই দেখে এসেছে ও। কতবার কোলে নিয়ে আদর করেছে, কত-কত চকোলেট সে কিনে দিয়েছে ওদের দু'বোনকে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

পাশাপাশি বাড়ি, তাই বলা যায় একেবারে জাহিদের চোখের সামনেই বড়

হয়েছে ওরা। নিজের বোন না থাকার ব্যাপারটা কোনওদিনও তাকে পীড়া দেয়নি, কারণ ওদেরকেই বোন জ্ঞান করে এসেছে সে এতকাল ধরে। আজকের মত পরিস্থিতি কখনও সৃষ্টি হতে পারে, এটা দুঃস্বপ্নেও কোনওদিন ভাবেনি সে। সবকিছু রীতিমত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তার কাছে!

রুবার পালিয়ে যাওয়া, জাহিদের বজ্রাহত চেহারা, সবই দেখলেন মিজান সাহেব। কিন্তু তাঁর কথা তখনও শেষ হয়নি, আরও খানিকটা বাকি রেখেছিলেন। শান্ত গলায় আবারও শুরু করলেন তিনি, 'প্রেমে পড়া কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়, জাহিদ। প্রেমে পড়ে কবিতা লেখাও খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, সবাই লেখে। যৌবনে আমি নিজেও যে লিখিনি, সে নিশ্চয়তা দিতে পারব না। তা ছাড়া আমার মেয়েরা রাস্তার ফালতু ছেলেদের বদলে তোমার মত একজন সুপুরুষের প্রেমে পড়েছে, এটা নিয়ে বাবা হিসেবে আমার কিন্তু গর্ব করা উচিত। তারা প্রমাণ করেছে, তাদের রুচিবোধ বেশ ভাল। তারা কোনও অগা-মগার প্রেমে পড়েনি। তবে মূল সমস্যাটা কোথায়, জানো? তোমাকে নিয়ে আজকাল ওদের দু'বোনের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি হচ্ছে। আমি শুনে অবাক হয়েছি, অতি সামান্য উসিলাকে কেন্দ্র করে ওরা নাকি এখন কথায়-কথায় চুলোচুলি শুরু করে দেয়! তাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা একরকম বন্ধই বলতে পারো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিজান সাহেব। তাকিয়ে আছেন বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটার দিকে। 'ঘরে সব মিলিয়ে আমরা মোটে চারজন মানুষ। এর মধ্যে দু'জনের যদি দিনের পর দিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকে, তা হলে গোটা পরিবেশটা কেমন গুমট হয়ে যায়, বুঝতে পারছ? অথচ এরাই আমার বাড়িটাকে দিনরাত চেঁচামেচি করে মাথায় তুলে রাখত। এখন আর তাদের মধ্যে সেই উচ্ছলতাটা দেখতে পাই না!'

চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইল জাহিদ। কিছু বলার মত অবস্থায় নেই সে এখন। তাকে ইচ্ছে করেই খানিকটা সময় দিলেন মিজান সাহেব, সেই সঙ্গে গুছিয়ে নিলেন তাঁর পরবর্তী বক্তব্য।

খানিক বাদে আবারও মুখ খুললেন তিনি। 'এ বয়সের প্রেমে আবেগের পরিমাণটা যদিও অনেক বেশি থাকে, কিন্তু তেমন একটা গভীরতা থাকে না। তাই চলতি পথে শক্ত বাঁধ দিয়ে দিলে, নিজ থেকেই নতুন পথ খুঁজে নেয় আবেগের নদী, পুরনো পথের জন্য আর হাহাকার করার ফুরসত মেলে না। আমি এখন ঠিক এটাই করতে চাই। এবং এজন্য এখন তোমার সহযোগিতাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার আমার। আমি জানি, তুমি ওদেরকে বোনের দৃষ্টিতেই দেখ। তাই বিষয়টা নিয়ে নিজেকে কোনওরকম দোষারোপ কোরো না যেন আবার। যা হয়েছে, প্রকৃতির নিয়মেই হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এতে উতলা হবার কিছু নেই। আশা করি, তুমি ক'টা দিন ওদের কাছ থেকে দূরে থাকলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সূর্যের আলোর অভাবে অচিরেই ঝরে যাবে ওদের প্রেমের মুকুল, ফুল হয়ে উঠবে না আর। বুঝতে পারছ তো?

'কথাগুলো হয়তো এভাবে সরাসরি না বলে খানিকটা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলা

উচিত ছিল আমার। তা হলে শুনতে হয়তো এতটা খারাপ লাগত না। কিন্তু জানই তো, পেঁচিয়ে কথা বলার বিদ্যাটা ঠিক আমার আয়ত্তে নেই। তাই যা বলার সোজাসুজিই বলে দিলাম তোমাকে। ঠিক আছে তো, জাহিদ?'

হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সেদিন উঠে দাঁড়িয়েছিল জাহিদ। চলে এসেছিল জম্বিদের মত। ফিরে আসার সময় পিছন থেকে ভেসে আসছিল মিজান সাহেবের আয়েশ করে মুড়ি চিবানোর শব্দ। আগের চেয়ে অবশ্য কুড়মুড়ে আওয়াজটা খানিকটা কম, মুড়িগুলো অনেকটা মিইয়ে গেছে ততক্ষণে।

দুই

দু'জনে মুখোমুখি বসার পরও অনেকটা সময় ধরে চুপ করে রইলেন মিজান সাহেব। বার দুয়েক কথা শুরু করতে গিয়েও থেমে গেছেন, যেন কী বলবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। জাহিদ ভাবছে, আবারও রুবা-রূপার কথা শুরু করবেন না তো উনি? তা হলে আজ বিসমিল্লাহ্‌তেই থামিয়ে দিতে হবে। বিষয়টা নিয়ে আর একটিও বাক্য বিনিময় করার ইচ্ছে নেই তার।

আচমকা যেন ঘরের ভিতর একখানা তাজা বোমা ফাটালেন মিজান সাহেব। 'জাহিদ, গতকাল রাতে আমি একটা কালজয়ী উপন্যাস লিখে ফেলেছি।'

প্রথমটায় খানিকটা চমকে উঠলেও পরমুহূর্তেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল জাহিদের। একজন মানুষ একরাতের মধ্যে কেমন করে আস্ত একখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারে? আর দৈববলে যদি বা লিখেও ফেলে, সেটা কেমন করে কালজয়ী হয়? বর্তমানের পাঠকদের কাছেই তো ওটা পৌঁছতে পারেনি এখন অবধি, তারপর তো কাল জয় করার প্রশ্ন আসবে!

জাহিদের মুখ দেখেই তার মনের ভাব অনেকটা আঁচ করতে পারলেন মিজান সাহেব। তাই তড়িঘড়ি করে নিজেই আবার মুখ খুললেন, 'আসলে লেখাটা এতটাই দুর্দান্ত হয়েছে যে, আমি শতভাগ নিশ্চিত এটা হাজার বছর ধরে পাঠকদের আলোচনায় থাকবে। তা ছাড়া এমনটা ভাবার বিশেষ একটা কারণও আছে কিন্তু। সেই রহস্যময় ব্যাপারটাই তোমার কাছে খোলসা করে বলতে এলাম। যদিও হাতের লেখাটা আমার নিজেরই, তবুও আমার একরত্তি কৃতিত্বও নেই ওটা লেখার পিছনে! শুনতে আজব মনে হলেও, এটাই সত্যি। বিষয়টা নিজের ভিতর চেপে রাখতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। শ্বাস আটকে আসার মতই একটা অনুভূতি। কারও সাথে শেয়ার করতে না পারলে সত্যিই হয়তো দম আটকে মরে যাব আমি। তবে বিষয়টা এতটাই অভূতপূর্ব যে, সবার কাছে চাইলেও ব্যক্ত করার সুযোগ নেই আমার। সবার পক্ষে এটা হজম করা সম্ভব নয় মোটেও। কেউ-কেউ হয়তো পাগলই ঠাওরে বসবে আমাকে! তাই সবকিছু বিবেচনা করে শেষমেশ তোমার কাছেই ছুটে এলাম। বলব? শুনবে তো তুমি?'

হৃদয়ের গহীন অলিতে-গলিতে গরুখোঁজা খুঁজেও মিজান সাহেবের গল্পটা শোনার একটুখানি ইচ্ছে আবিষ্কার করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো জাহিদ। ভদ্রলোক যত অভূতপূর্ব কাহিনি শোনানোর প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকুন না কেন, তা তার মনের উপর কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি।

কিন্তু মিজান সাহেব যে আজ তাকে গল্পটা না শুনিয়ে বাড়ি ফিরবেন না, এটা সে বেশ বুঝতে পারছে। ভদ্রলোকের মুখে কেমন যেন একটা একগুঁয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ফুটে রয়েছে।

তারপরও চোখে-মুখে একটা স্পষ্ট বিরক্তির মুখোশ পরে নিল জাহিদ। মনে ক্ষীণ একটা আশা, শ্রোতার মুখের বিরক্তি দেখার পর হয়তো বক্তার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়বে।

কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি! জাহিদকে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত করে সোফার উপর পা জোড়া তুলে নিয়ে আরাম করে জাঁকিয়ে বসলেন মিজান সাহেব। তারপর বললেন, 'তবে আমার কথার মাঝখানে আবার কোনও কথা বলে বোসো না যেন।'

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল জাহিদের। দাঁত কিড়মিড় করে খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠল, 'আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, মিজান সাহেব, আমার উপর কোনওরকম শর্তারোপ করার মত অবস্থায় নেই আপনি এখন।'

জাহিদের কথায় মিজান সাহেব বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হলেন বলে মনে হলো না। গলার ঝাঁঝটুকুও তিনি হাসিমুখে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে গেলেন। 'কথার মধ্যখানে কেউ কথা বললে আমার আলাপের তালটা কেটে যায়। তুমি তো এটা ভাল করেই জান। এজন্যই মানা করলাম আর কী।'

মনে-মনে বার দুয়েক মিজান সাহেবের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করল জাহিদ। এতে তার ভিতরকার ফুঁসে ওঠা রাগটা খানিকটা কমল বলেই মনে হলো। নিজেও সোফায় হেলান দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। চেষ্টা করব মুখ বন্ধ রাখতে। তো এবার তা হলে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করুন। শুনি আপনার কাহিনি। কী এমন ব্যাপার, যেটা বলার জন্য একেবারে জিয়ল মাছের মতন তড়পাচ্ছেন!'

খানিকটা সামনে ঝুঁকে বসলেন মিজান সাহেব, যেন গোপন কোনও শলা-পরামর্শ করার আছে তাঁর। গলার স্বরও অনেকখানি নামিয়ে নিলেন। তারপর রোবটের ভঙ্গিমায় বলতে শুরু করলেন, 'গতকাল গভীর রাতে রিডিং রুমে বসে আরনেস্ট এফেলোর লেখা "দ্য গড ইজ নো মোর" বইটা পড়ছিলাম। বাসায় তখন কেবল আমিই জেগে আছি, বাকি সবাই ঘুমিয়ে কাদা। বইটা পাঠিয়েছে আমার ছোটভাই, স্পেন থেকে। একটা বিডিং হাউস থেকে কেনা বইটা কেবল গতকাল বিকেলের কুরিয়ারেই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। সাথে একখানা অ্যান্টিক কলমও আছে। কাঠের শরীর, তাতে অদ্ভুত সুন্দর নকশা করা। মাথার দিকটা ধাতুর, সম্ভবত রূপার উপর সোনার প্রলেপ দেয়া। সাথে পাঠানো চিঠিতে আমার ভাই কলমটার কথা কিছু লেখেনি, শুধু বইটার কথাই লিখেছে। ধরে নিয়েছিলাম, সস্তায় পেয়ে ওটাও হয়তো বইটার সাথেই কিনে নিয়েছিল সে।

বহুদিন ধরেই খুঁজছিলাম বইটা। তাই ওটার দিকেই বেশি মনোযোগী ছিলাম, কলমটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি।

'সাধারণত আমি রকিং চেয়ারে দুলে-দুলে খানিকটা আয়েশ করেই বই পড়তে ভালবাসি। কিন্তু এই বইটা এভাবে পড়ার কোনও উপায় ছিল না। কম করে হলেও অন্তত কয়েকশো বছরের পুরনো বই। পাতাগুলো জীর্ণ, জায়গায়-জায়গায় বাঁধাই খুলে গেছে। এখনও যে পড়তে পারা যাচ্ছে, এটাই তো অনেক। তাই টেবিলে রেখে খুব সাবধানে পড়ছিলাম, যেন নাড়াচাড়ায় বইটার আরও বেশি ক্ষতি না হয়ে যায়।

'দুর্দান্ত বই, একেবারে গভীরে ডুবে গিয়েছিলাম। দীন-দুনিয়ার কোনও খবরই ছিল না তখন আমার, ঘড়ির দিকে তাকানোর ফুরসত পাইনি একবারও।

'আচমকা মনে হলো টেবিলের কোনার দিকটায় কী যেন একটা নড়ে উঠল! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, বইয়ের সাথে পাঠানো অ্যান্টিক কলমটা পড়ে রয়েছে ওখানটায়। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, ওখানেই ওটা রেখেছিলাম আমি।

'আবারও বইয়ের পাতায় নাক ডোবাতে যাব, ঠিক তখনই ভয়ানক চমকে উঠলাম। কারণ, কলমটার একটা অস্বাভাবিকতা ততক্ষণে ধরে ফেলেছে আমার মস্তিষ্ক!

'হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম ওটাকে। দেখলাম, নকশাকাটা কাঠের শরীরের পিছন দিকটা জুড়ে রয়েছে বিশাল আকারের একখানা পাখির পালক। মিশমিশে কালো রঙ, খুব মসৃণ। কোন্ পাখির, খোদা মালুম!

'ঈশ্বরের দিব্যি কেটে বলতে পারি, এর আগে পালকটা দেখিনি আমি। অথচ বিকেল থেকে এই পর্যন্ত বেশ কয়েকবার হাতে নেয়া হয়েছে কলমটা। পালকটা একটিবারও চোখে পড়েনি! আজব তো!

'তা হলে ওটা কি কলমটার ভিতরে কোথাও লুকানো ছিল? এখন কোনওভাবে লিভারে চাপ পড়ে গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসেছে? নাকি এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা আছে?

'এসব ভাবতে-ভাবতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলাম কলমটাকে। এখানে-ওখানে টিপেটুপে দেখলাম, গোপন সুইচটার কোনও সন্ধান মেলে কি না। ঠিক তখনই বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল।

'আচমকা আবিষ্কার করলাম, আমার চারপাশ একটা অদ্ভুত রকমের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে! সেটা দেখতে-দেখতে এতটাই ঘন হয়ে গেল যে, আমি আমার হাতে ধরা কলমটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। ধোঁয়ার গন্ধটাও কেমন অচেনা, পৃথিবীর কোনও কিছুর গন্ধের সাথেই মিল নেই ওটার। কী ঘটছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না আমার। সত্যি বলতে প্রথমটায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বোধকরি কয়েক মুহূর্তের জন্য চেতনাও লোপ পেয়েছিল আমার। সেই অপার্থিব ঘোরের ভিতর পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিলাম যেন।

'খানিকক্ষণ বাদেই, আমাকে অবাক করে দিয়ে ধোঁয়ার মেঘটা ধীরে-ধীরে

কটে যেতে শুরু করল। যেন অদৃশ্য কারও হাতের টানে একটু-একটু করে টিয়ে গেল অতিপ্রাকৃত সেই ধূম্রজাল।

'ওটা সরে যেতেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম দিগন্ত-বিস্তৃত একখানা মাঠের ধ্যখানে দাঁড়ানো অবস্থায়। বিশ্বাস করো ব্যাপারটা তখন আমাকে একটুও অবাক রেনি! আমার একটিবারের জন্যও মাথায় আসেনি যে, ওখানে আমার থাকার থা নয়। আমার থাকার কথা, পড়ার টেবিলে, আমার নিজের ঘরে।

'সেই তেপান্তরের মাঠটার যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই ধু-ধু প্রান্তর। গন্তের শেষ সীমানায় গাঢ় অন্ধকারের প্রাচীর। কোথায় যাব, কী করব কিছুই াবতে পারছিলাম না তখন। মাঝখানটায় ঠায় দাঁড়িয়ে ভয়াবহ বর্তমানটাকে হজম রবার বৃথা কসরত করছিলাম কেবল।

'আচমকা প্রান্তরের একধারের প্রাচীর দু'পাশে সরে গিয়ে, একখানা অর্ধ-ালোকিত সরু পথের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করল। কর্কশ একটা ভৌতিক কণ্ঠ পথ্য থেকে জানিয়ে দিল, আমাকে এই পথ ধরেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

'এদিক-ওদিক তাকিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও সেই কণ্ঠস্বরের মালিকের কিটুকুরও দেখা পেলাম না। তবে এটা নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামালাম না, রবে রওয়ানা হয়ে গেলাম। সবকিছুই তখন আমার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে চ্ছিল।

'আঁধারের প্রাচীর ফুঁড়ে আবছা আলোর সুড়ঙ্গপথ, যদিও আলোর উৎসের ানও হদিস মেলেনি। সেই পথটুকুই একটানা পাড়ি দিতে লাগলাম। যাচ্ছি তো চ্ছিই, একঘেয়ে সেই পথের যেন শেষপ্রান্ত বলে কিছু নেই!

'ধীরে-ধীরে ক্লান্তি এসে বাসা বাঁধতে শুরু করল গোটা দেহ জুড়ে। এরই ধ্যে পায়ের তলার ঝুরঝুরে বালি কখন পরিবর্তিত হয়ে পুরনো শুকনো হাড় হয়ে াছে, সেটা খেয়ালও করিনি! প্রতি কদমে-কদমে মুড়মুড় করে ভাঙছিল ওগুলো, ষণ গা গোলানো ব্যাপার। অন্য কোনও প্রাণী, নাকি ওগুলো মানুষেরই হাড়, তা য়ে ভেবে সময় নষ্ট করলাম না একটুও। যা খুশি হোক, কী আসে-যায়!

'যখন প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে, পুরোটা পথ পাড়ি দেয়ার সামর্থ্য াই আমার, এখনই হয়তো লুটিয়ে পড়ব শুকনো হাড়ের স্তূপে, ঠিক তখনই থটা শেষ হয়ে গেল!

'দেখলাম, সেই সূচনার প্রান্তরটার মতই বিশাল একখানা গুহায় এসে াঁছেছি। ওখানে কী দেখতে পেলাম, জান?

'দেখলাম গুহার সবক'টা দেয়ালে থরে-থরে সাজানো রয়েছে হাজার-হাজার ই! একদম মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত, এক তিল পরিমাণ জায়গাও আর খালি ই। যেন কেবল বই দিয়েই তৈরি করা হয়েছে চারপাশের সবক'টা প্রাচীর। থিবীর তাবৎ লাইব্রেরির সমস্ত বইয়ের সংগ্রহ একত্রিত করলেও এর একশো াগের এক ভাগ হবে কি না সন্দেহ।

'জানা-অজানা শত-সহস্র ভাষার, লক্ষ-কোটি লেখকের বইয়ের এক মহাসমুদ্র ন। হতবিহ্বল হয়ে দেখছিলাম সবকিছু, বোধবুদ্ধি পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল

তখন আমার।

'বিস্ময়ের মাত্রা আরও খানিকটা বাড়ল, যখন দেখলাম কিছু-কিছু বই থে
তাজা রক্ত ঝরছে। যেন ওরা প্রাণহীন কোনও জড়বস্তু নয়, সদ্যই যেন নির্মমভা
আহত করা হয়েছে ওদের! আবার কিছু-কিছু বইয়ের ভারী মলাটে লেগে রয়ে
ছোপ-ছোপ রক্তের ছাপ। পুরনো, শুকনো, বিবর্ণ। যেন বহুকাল আগের কোন
এক করুণ ইতিহাস তারা বয়ে চলেছে নিজেদের শরীরে। এতটাই তন্ময় হ
পড়েছিলাম, কখন যে নিজের অজান্তে পিছনের দৃশ্যপটে পরিবর্তন হয়ে গে
সেটা ঠাহর করতে পারিনি। হালকা একটা শব্দ শুনতে পেয়ে চট করে ফি
তাকালাম। তাকিয়েই রীতিমত আক্কেল গুড়ুম হবার দশা হলো আমার। ওদিকে
একখানা বইয়ের তাক অদৃশ্য হয়ে গেছে দেয়ালের কোনও এক গোপ
কুঠুরিতে। সেখানটায় এখন স্থান করে নিয়েছে বিশালকায় এক সিংহাসন, য
মাঝখানটায় ছাইরঙা একখানা ছায়া-অবয়বের অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে অনুভব ক
যাচ্ছে। সিংহাসনের কোণগুলো থেকে মিহি কুয়াশার মত বাষ্প বেরুচ্ছে, সামনে
দিকটায় অদৃশ্য সুতোয় ঝুলছে আঁধারের একখানা কালো পর্দা! তাই ছায়ামূর্তি
আকৃতি কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না আমার কাছে, যেন মূর্তিমান এক বিভ্রম। ত
যেটুকু বুঝতে পারলাম, ঋজু দেহের গড়ন, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো এলোচু
হাতের সংখ্যা যে দুইয়ের বেশি, এটুকুই কেবল বুঝতে পারলাম। তবে সঠি
সংখ্যাটা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি কোনওমতেই। চেহারা দেখতে পাইনি, দেখ
আসলে চাইওনি। কেন যেন মনের গভীর থেকে অনুভব করছিলাম, ওটা দেখ
ভয় পাব আমি। ভীষণ ভয়।

'আচমকা কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঘোরের মধ্যেই আমা
জানানো হলো, আমি এখন একজন অপদেবীর দরবারে, তাঁর নাম জোয়ালা।

'ব্রহ্মাণ্ডের ৩৭ জন অপদেবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে শক্তিশালী
যাঁর ক্ষমতার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। তবে মানুষের সাহিত্য-জগৎ নিয়ন্ত্রণে
দিকেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। অন্য সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তিনি বিশেষ এক
তৃপ্তি পান না। আমাকে জানানো হলো, সভ্যতার আদিযুগ থেকে জগতের না
ভাষায়, নানা বর্ণের, নানা গোত্রের কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর দরবারে ধর
দিয়েছেন। প্রতিভা এবং খ্যাতির পূর্ণতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তাঁর আরাধ
করেছেন।

'তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে প্রতিভাবানরা আরোহণ করেছেন খ্যাতির স্বর্ণশিখরে
আর প্রতিভাহীনরাও সাহিত্য-জগতে নিজেদের জন্য এক চিলতে আসন গ
নিতে সক্ষম হয়েছে।

'তবে এসবের জন্য তাদের প্রত্যেককেই মূল্য দিতে হয়েছে, চড়া মূল্য।

'আবার কখনও-কখনও দেবী জোয়ালা নিজেও কাউকে-কাউকে তু
এনেছেন নিজের দরবারে। যেমনটা আজ আমাকে তুলে আনা হয়েছে। যাদের
সাহিত্যপিপাসু বিশাল একখানা হৃদয় দিলেও, সাহিত্য রচনার সামর্থ্যটুকু দেন
ঈশ্বর, তাদের জন্যই অপদেবী জোয়ালার এহেন বিশেষ ব্যবস্থা! এই তালি

তনি নিজেই তৈরি করে এসেছেন এতকাল ধরে।

'তাদেরকে শর্তসাপেক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব দেয়া হয়। বলা বাহুল্য, ঘোরের মধ্যে াকায় তারা প্রত্যেকেই সেই প্রস্তাব বিনা বাক্যব্যয়েই মেনে নিতে বাধ্য হয়।

'আমার অতিচেনা বেশ কিছু সাহিত্যিকের নামও আমাকে জানানো হলো, ারা দেবী জোয়ালার আরাধনা করে বেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁদের খানপর্বের প্রতিটি ধাপ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো আমাকে। শেষমেশ ামাকেও দেয়া হলো ঠিক তেমনই একটা প্রস্তাব!'

এটুকু বলে থামলেন মিজান সাহেব। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে রাখা জলভর্তি গলাস তুলে নিলেন। ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন সবটুকু তরল। তারপর ারেসুস্থে আবার গিয়ে আসন গাড়লেন সোফার উপর। পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকালেন াহিদের দিকে। যেন তার ভিতরটা পড়ে নিতে চাইছেন।

এ পুরো সময়টায় অবশ্য একেবারে অনড় বসে রইল জাহিদ। দম ফেলতেও যন ভুলে গেছে সে। শুধু তার চোখ দুটো নীরবে অনুসরণ করেছে মিজান াহেবকে। এমন ক্লাইম্যাক্সে এসে বুঝি লোকটার বিরতি নেয়ার সময় হলো? খন শুরু করবে আবার? একবিন্দু আক্কেল যদি থাকত লোকটার!

জাহিদকে অবশ্য খুব বেশি সময় ধরে অপেক্ষায় থাকতে হলো না। এখনও শ্রাতার চেয়ে বক্তার আগ্রহ কোনও অংশে কম নয়। সোফায় বসার খানিকক্ষণ াদেই আবারও মুখ খুললেন মিজান সাহেব।

'আমাকে বলা হলো আমি রাজি থাকলে, আমার হাতেই লিখিত হবে ্যতিক্রম একটি উপন্যাস, যা গঠন এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে হবে নন্যসাধারণ। শব্দের বুনট এবং কাহিনির মায়াজালে বর্তমানের পাঠকদের সেটা াষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নেবে। দিনে-দিনে সেটি পরিণত হবে কালজয়ী একটি ্যাসিকে।

'এটি হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের একটি লেখা, যা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে চনা করেনি কেউই। তাই এটি যে আমাকে অপরিমেয় খ্যাতি এনে দেবে সেটি ার বলার অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া ব্যাপারটা স্বয়ং দেবী জোয়ালাই তত্ত্বাবধান রবেন। অনিশ্চয়তার কোনও সুযোগ নেই এখানে।

'তুমিই বলো, জাহিদ, এমন একটা প্রস্তাব শোনার পর কারই বা মাথার ঠিক াকে? আমি চট করেই বলে বসলাম, আমি রাজি। যে শর্তই দেয়া হোক না কন, আমি সেটা পালন করতে শতভাগ প্রস্তুত।

'এরপরই আমি সেই ভয়াবহ শর্তটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলাম। সত্যি লছি, প্রথমটায় মনে হয়েছিল গোটা আকাশটাই বুঝি আমার মাথার তালুতে ভঙে পড়েছে। কিন্তু তখন আমি খ্যাতির মোহে এতটাই পাগলপারা হয়ে াড়েছিলাম যে, কোনও কিছুর বিনিময়েই আর সেটা হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই তৎক্ষণাৎ আমার সম্মতি জানিয়ে দিতে খুব একটা দ্বিধা করিনি।

'পরক্ষণেই কোনও এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার ডান হাতটা সজোরে াকড়ে ধরল। দেহের সর্বশক্তি কাজে লাগিয়েও একচুল নড়তে পারিনি আমি

তখন।

'একেবারে আমার চোখের সামনেই, যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল লালর বিশাল একখানা পাথরের টেবিল। তার উপর দলিল মতন সবুজ একটা ভা কাগজ। নিজের অজান্তেই ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম টেবিলটার দিকে। ঘোরে মধ্যেই যেন ডান হাতটাও অবলীলায় সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। তখ আমার মনে হচ্ছিল, হাতটার উপর আমার নিজের আদৌ কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই যেন ওটা আমার দেহের কোনও অংশ নয়, নিজেই স্বতন্ত্র একটা প্রাণী!

'হঠাৎ ওটার বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ফিনকি দিয়ে তা রক্ত বেরুচ্ছে ওখান থেকে, ভাল রকমের ব্যথাও করছে। যেন সদ্যই ধারাল কি দিয়ে গভীরভাবে কাটা হয়েছে ওখানকার চামড়া। কিন্তু কেন?

'জবাব মিলল প্রায় সাথে-সাথেই। টেবিলে রাখা সবুজ দলিলটায় টিপস দিতে হলো আমাকে। কালির বদলে কাগজের বুকে এঁকে দিলাম রক্তের ছাপ স্বাক্ষরিত হয়ে গেল অপদেবী জোয়ালার সাথে আমার অপার্থিব কিন্তু অতিমাত্রা বাস্তব এক চুক্তিপত্র!'

আবারও খানিকক্ষণের জন্য থামলেন মিজান সাহেব। তাঁর বুক চিরে বেরি এল একটি দীর্ঘশ্বাস। মেঝের দিক থেকে মুখ তুলে সরাসরি জাহিদের চোখে দিকে তাকালেন তিনি।

'তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইছ, জোয়ালার সাথে আমার চুক্তিপত্রের শর্তটা ক ছিল?'

মুখে কিছু না বলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল জাহিদ। বলা বাহুল্য, তার উত্তরা জানতে খুবই ইচ্ছে করছে। কিন্তু অতি উৎসাহ দেখিয়ে মিজান সাহেবকে প্রশ্ন দেয়ার কোনও মানেই হয় না। শ্রোতার উৎসাহ অনুধাবন করতে পারলে তি হয়তো মূল আলোচনা থেকে সটকে পড়ে নতুন আরেকটা গল্প ফেঁদে বসবেন! ক দরকার?

কিন্তু জাহিদের আশঙ্কা পুরোপুরি অমূলক ছিল। খুব বেশি কিছু আজ আ বলার নেই মিজান সাহেবের। আজকের মিজান সাহেব আর অন্যান্য দিনে মিজান সাহেব এক নন। ভিতরে-ভিতরে অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে, য নাঙ্গা চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। জোয়ালার শর্তটার ব্যাপারে খোলসা করে আজকের আলোচনা মুলতবি করার ইচ্ছে তাঁর।

প্রলম্বিত একখানা দম নিয়ে মৃদুস্বরে বলতে শুরু করলেন আবার, 'শর্তট হলো, আমাকে আমার প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে! এবং প্রাণটা বিসর্জ করতে হবে আমার লেখাটা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাবার আগেই। তবে বইয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোনও দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। কারণ তখন সেটা দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবেন স্বয়ং দেবী জোয়ালা। আমি অন্য কোনও জগ থেকে উপভোগ করব আমার মরণোত্তর সুখ্যাতি আর আমার পরিবার-পরিজনের পাবে গর্ব করে পরিচয় দেবার মতন একখানা বিখ্যাত নাম। জীবনে তো ওদেরকে কিছুই দিতে পারিনি, মরণের পর যদি খানিকটা পুষিয়ে দিতে পারি আর কী।

'সত্যি বলতে, এসব ভেবেই আমি জোয়ালার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলাম। কেবল নিজের মোহের কাছে এত সহজে পরাজিত হবার মতন মানুষ আমি নই মোটেও।

'দলিলটায় সই করার পর-পরই কিছুক্ষণের জন্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি আমি। পরবর্তীতে যখন চেতনা ফিরে পাই, নিজেকে আবিষ্কার করি আমার পড়ার টেবিলেই! দ্য গড ইজ নো মোর বইটার উপর কপাল ঠেকিয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায়।

'সামনেই পড়ে ছিল একখানা হাতে লেখা মাঝারি আকারের পাণ্ডুলিপি! হাতের লেখাটা সন্দেহাতীতভাবে আমার হলেও, ঈশ্বরের দিব্যি করে বলতে পারি, এর একটা বর্ণও আমি নিজে লিখিনি! তুমি বুঝতে পারছ তো, জাহিদ? ব্যাপারটা কতটা অবিশ্বাস্য কিন্তু নিদারুণ বাস্তব?'

মাথা ঝাঁকাল জাহিদ। তারপর অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম মুখ খুলল সে। 'আপনার কাহিনি শেষ হয়েছে? এবার আমি কিছু বলতে পারি?'

'অবশ্যই,' উৎসাহী গলায় বললেন মিজান সাহেব। আগ্রহে চোখজোড়া রীতিমত চকচক করছে তাঁর।

'আপনার কাহিনি সত্যিই চমকপ্রদ। কিন্তু কি জানেন, এর একটি বর্ণও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না যেন আবার।

'তবে তার মানে এই নয় যে, আমি ভাবছি আপনি আমার সাথে গুল মেরেছেন কিংবা মিথ্যে বলেছেন। আমি জানি, আপনি সেরকম মানুষ নন। আমার ধারণা, ঘটনাটা আপনার সাথে ঘটেছে ঠিকই, তবে সেটা বাস্তবে নয়, গভীর ঘুমের মধ্যে। পুরো ব্যাপারটা নিছক একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

'একনাগাড়ে বই পড়তে-পড়তে আপনার চোখ এবং মস্তিষ্ক বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই আপনি টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তার উপর আপনি সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে বাতিল করে দেবার মত সংবেদনশীল একটা বিষয়ের উপর লেখা বই পড়েছিলেন, সেটারও একটা প্রভাব ছিল হয়তো। একদিকে লেখকের স্রষ্টার বিপক্ষে একের পর এক নানারকম কুযুক্তির অবতারণা, অন্যদিকে আপনার ভিতরকার স্রষ্টার প্রতি শাশ্বত বিশ্বাস। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আপনার ভাবনার জগৎকে কিছুটা হলেও এলোমেলো করে দিয়েছিল নির্ঘাত। এই সংঘাতের কারণে আপনার মস্তিষ্ক স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজিত ছিল। সেখান থেকেই আপনার অবচেতন মন তৈরি করেছে স্বপ্নটা। কারণ আপনার ভাবনার বিষয়গুলো একেবারে তরতাজা ছিল, মস্তিষ্কের কোনও ঘুপচিতে থিতিয়ে পড়বার সুযোগ তখনও পায়নি ওরা।

'সব মিলিয়ে স্বপ্নটা এতটাই জীবন্ত ছিল যে, আপনার কাছে মনে হয়েছে পুরো ঘটনাটা শতভাগ বাস্তব। আপনার মনে এই বিশ্বাসটা গেঁথে গেছে যে, আপনি সশরীরেই অপদেবী জোয়ালার দরবার সফর করে এসেছেন। যেহেতু স্বপ্নের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনার স্পষ্ট মনে আছে, তাই বিশ্বাসটা আরও জোরাল হয়েছে। কিন্তু সবকিছুর পরও ওটা একটা স্বপ্নই, মোটেও বাস্তব কিছু

নয়। বুঝতে পেরেছেন, মিজান সাহেব?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে মিজান সাহেবের দিকে তাকাল জাহিদ।

সে ভাবছে তার চমৎকার যুক্তিতে প্রতিপক্ষ এরই মধ্যে নির্ঘাত কুপোকাত হয়ে গেছে। এক্ষণই পরাজয় স্বীকার করে, শান্ত মনে বাড়ির পথ ধরবে।

কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল মিজান সাহেবকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত মনে হচ্ছে না। উল্টো মুচকি-মুচকি হাসছেন তিনি! লোকটা কি পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেল নাকি?

শান্তস্বরে নীরবতা ভাঙলেন মিজান সাহেব, 'তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, জাহিদ। যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষই ঘটনাটা এভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবে। তবে আমার কাছে কিন্তু প্রমাণ আছে, জোয়ালার সাথে চুক্তিটা সত্যিই হয়েছে আমার।'

'কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?' নিজের অজান্তেই গলা খানিকটা চড়ে গেল জাহিদের।

মুখে কিছু না বলে নিজের ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন মিজান সাহেব। বিস্ফারিত নেত্রে জাহিদ দেখল তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলের তাজা ক্ষতটা। ওটা যে খুব বেশি আগের নয়, এটা বুঝতে ডাক্তার হবার কোনও প্রয়োজন নেই।

স্পষ্ট ফুটে রয়েছে বিচিত্র একখানা নকশা। হুবহু পেণ্টাকল নয়, তবে অনেকটাই ওরকম। অত্যন্ত নিখুঁত একটা ক্ষত, কোথাও একরত্তি বাড়তি আঁচড়ও নেই। যেন দক্ষ কোনও কারিগর অনেকটা সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে খোদাই করেছে নকশাটা।

'এটা নিয়ে কী বলার আছে তোমার? সবকিছু যদি স্বপ্নই হবে, তবে এটা এল কোত্থেকে, বলো শুনি। ধরে নাও, এটাই আমার প্রথম প্রমাণ।' মিজান সাহেবের কণ্ঠে খানিকটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত থাকলেও, সেটা এতটাই সামান্য যে সহজেই অগ্রাহ্য করা যায়। ঠিক সেটাই করল জাহিদ। অবশ্য এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অবস্থায়ও নেই সে এখন। ঘটনার আকস্মিকতায় পুরোপুরি বাক্রুদ্ধ হয়ে গেছে সে। কীভাবে তৈরি হলো এই বিচিত্র নকশা?

খানিকক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়লেও খুব তাড়াতাড়িই আবার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ও। ব্যাপারটার বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজতে তার মগজের সবক'টা চাকা ঘুরে চলেছে পূর্ণ গতিতে। কী যেন একটা বিষয় মনে পড়ি-পড়ি করেও ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। মনের পর্দায় আবছা ছায়া ফেলে চকিতেই পালিয়ে যাচ্ছে, ধরা দিচ্ছে না মোটেও। জাহিদ বেশ বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা ব্যাখ্যার জন্য মনের অন্ধকার কোণ থেকে ছায়াটাকে টেনে হিঁচড়ে আলোতে আনা দরকার। এবং সেটা দ্রুততম সময়ের মধ্যেই। আচমকা ছায়াটাকে ধরে ফেলতে পারল জাহিদ। নিমিষেই তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন আলাদীনের চেরাগটা সদ্যই হাতে পেয়ে গেছে সে!

ডক্টর লিসব্যান জিগার এবং তাঁর স্বপ্ন বিষয়ক সপ্তম সূত্র! এটি দিয়েই ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব মিজান সাহেবের ঘটনাটার। স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কারণে বিজ্ঞানী

ফ্রয়েডের পর ডক্টর জিগারই অধুনা বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন বিষয়ক প্রথম এগারোটি সূত্র বিজ্ঞানীদের বিশাল একটি মহল অনুমোদন দিয়েছে বহু আগেই। অন্যদের মধ্যে কেউ-কেউ অবশ্য প্রথমটায় গাঁইগুঁই করেছিল, তবে একেবারে বাতিল বলে উড়িয়ে দেবার সাধ্য হয়নি কারও!

এসব নিয়েই গত ক'টা দিন পড়াশোনা করছিল জাহিদ। কল্পনাও করেনি, এত তাড়াতাড়ি এই জ্ঞান কাজে লাগানোর সুযোগ মিলে যাবে! 'স্বপ্ন বিষয়টাই বড্ড জটিল, মিজান সাহেব,' গম্ভীর গলায় শুরু করল জাহিদ। 'প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস ছিল, ঘুমালে মানুষের সাময়িক মৃত্যু ঘটে! আত্মা মুক্তি পায় দেহপিঞ্জর থেকে, দেহ পড়ে থাকে বিছানায়। আত্মা তখন অবলীলায় ঘুরে বেড়াতে পারে দিগ্বিদিকে। স্থান-কালের কোনওরকম বেড়াজাল নেই আত্মার উপর। তাই কেবলমাত্র আত্মাই পারে অতীত এবং ভবিষ্যতের নানারকম খবর সংগ্রহ করতে। আর সেটা কেবল সম্ভব হয় ঘুমের মাধ্যমেই। কারণ ঘুমালেই সম্ভব হয় স্বপ্ন দেখা, যা আত্মার মহাজাগতিক ভ্রমণ!

'এহেন বিশ্বাসের অবশ্য কারণও ছিল। চোখ মুদলে তারা কখনও স্বপ্নে দেখত তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের, আবার কখনও বা স্বপ্নে দেখতে তাদের শিকারের ভাসা-ভাসা কিছু খণ্ডচিত্র। পুরোটাই আদতে অবচেতন মনের কারসাজি। কিন্তু সেটা বোঝার মত জ্ঞান তখন তাদের ছিল না।

'শুধু তাদেরই বা দোষ দিই কেন! এই আধুনিক যুগেও স্বপ্নের অর্থের পিছনে ছোটার মানুষের কি অভাব আছে? ফুটপাতে সবচেয়ে বেশি যে বইটি বিক্রি হয়, সেটা হলো খাবনামা!

'যা হোক, আসল কথায় আসি। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও নানারকম সূত্রের সাহায্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছেন। সবকিছুই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে, অলৌকিকতার কোনও স্থান নেই এখানে।

'বিখ্যাত স্বপ্ন-বিজ্ঞানী ডক্টর জিগার তাঁর সপ্তম সূত্রে বলেছেন, কখনও-কখনও ঘুম এতটাই গভীর হয়ে যায় যে, তখন স্বপ্ন উৎপাদনে নিয়োজিত মস্তিষ্কের সবক'টা কোষ একটি একক কোষ হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। তখন তারা মিলিতভাবে যে স্পন্দন তৈরি করে, সেটা হতে পারে অনেক জোরাল কিংবা খুবই মৃদু। কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই ভয়াবহ অনুনাদের সৃষ্টি হয়। তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির কাছে স্বপ্নটাকেই বাস্তব মনে হয়। ওটা সাধারণত মস্তিষ্কের এত গভীরে গেঁথে যায় যে, আমৃত্যু ওটা ভোলা সম্ভব হয় না।

'এমন অবস্থায় স্বপ্নদৃশ্যে যদি কোনও দৈহিক পরিবর্তনের ব্যাপার থেকে থাকে, মস্তিষ্কও দেহকে ঠিক সেরকম পরিবর্তন ঘটানোর আদেশ দিয়ে থাকে, যেন স্বপ্নদৃশ্যের তথ্যগুলো ওই ব্যক্তির কাছে শতভাগ সঠিক মনে হয়!

'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, মস্তিষ্কের নির্দেশে দেহ সত্যি-সত্যিই সেসব পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বেশ কয়েকটি কেস নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে এবং বহুদিন ধরে গবেষণা করে ডক্টর জিগার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এটা সম্ভব।

'আমার ধারণা, আপনার ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছে।'

মৃদু হাসলেন মিজান সাহেব। অবুঝ বাচ্চাদের দিকে বড়রা যেমন স্নেহের দৃষ্টিতে তাকায়, তেমন ভঙ্গিতে তাকালেন জাহিদের দিকে। 'ডক্টর জিগারের কেস স্টাডি এবং আমার ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি ফারাক আছে, জাহিদ। সেটা তুমি হয় ঠিকমত খেয়াল করনি, নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গিয়েছ। ডক্টর জিগারের প্রায় সবক'টা কেসের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনগুলো সাধারণত ঘটেছে দেহের ভিতরে, বাইরে নয়। দুয়েকটি বাদে প্রায় কোনওটিতেই রক্তক্ষরণের ঘটনা ঘটেনি। হাড় ভেঙে যাওয়া, লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া, জয়েন্ট ডিসলোকেশন, পেশিতে খিঁচুনি–মূলত এসবই পাওয়া গেছে তাঁর কেসগুলোতে। মাত্র একবার ঘটেছে অন্ধ হয়ে যাবার মত ব্যাপার, সেটিও অপটিক নার্ভ ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে। দেহের বাইরের পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র ত্বক ফেটে গিয়েছে, সেটাও ঘটেছে সর্বসাকুল্যে মাত্র দু'বার। ত্বক চৈত্র মাসের মাঠের মত ফেটে গিয়েছিল, কোনও নির্দিষ্ট নকশা ফুটে ওঠেনি, রক্তক্ষরণও হয়নি।

'অথচ আমার হাতের ক্ষতটার দিকে তাকাও। দিব্যি বোঝা যায়, অত্যন্ত ধারাল কিছু দিয়ে করা হয়েছে কাজটা। এবং ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছে দেহের বাইরের দিক থেকে, ভিতরের দিক থেকে নয়। ক্ষতের ধারগুলোও খুব মসৃণ, নকশাটাও ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। দেহের নিজস্ব মেকানিজমে এহেন ক্ষত তৈরি হওয়া সম্ভব নয় কোনওমতেই। আমি কি ঠিক বললাম, জাহিদ?'

কয়েক মুহূর্ত পুরোপুরি থ মেরে রইল জাহিদ। ডক্টর জিগারের স্বপ্ন-সূত্র সম্পর্কে মিজান সাহেব এতটা বিশদভাবে জানতে পারেন, এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। আবছা ধারণা নিয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে গিয়ে কী লজ্জাটাই না পেতে হচ্ছে এখন! মিজান সাহেবের চোখের দিকেই তাকাতে পারছে না সে, মরমে মরে যাচ্ছে একেবারে।

তবুও পরাজয় মেনে নিতে ভীষণ আপত্তি তার। তাই আলোচনাটা ভিন্ন দিকে মোড় দেয়ার প্রয়াস পেল সে। তাতে যদি কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়।

আমতা-আমতা করে বলল, 'নকশার ব্যাপারটা না হয় আপাতত স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আপনার বাকি কথাগুলো? ওগুলো তো পুরোপুরি অযৌক্তিক, মিজান সাহেব। পৃথিবীতে এমন কোনও সাহিত্যিক কি আছেন, যাঁর জীবদ্দশায় একটি বইও বেরোয়নি, মৃত্যুর পর বেরিয়েছে? সে বইয়ে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনও লেখা! তিনি আবার বিখ্যাতও হয়েছেন! সত্যিই আছেন এমন কেউ?'

কথাগুলো বলে অনেকটা স্বস্তি পেল জাহিদ। একেবারে ঝোপ বুঝে কোপ মারা গেছে। এবার অন্তত মিজান সাহেবের কাছে জবাব দেয়ার মত কিছু থাকবে না। জয় এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

কিন্তু জাহিদকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিজান সাহেব। 'তুমি সুকুমার রায় কে, চেন তো?'

'ওনাকে কে না চেনে! এটা আবার কেমন প্রশ্ন?' রাগত স্বরে জবাব দিল জাহিদ।

মুখের হাসি বিন্দুমাত্রও মলিন হলো না মিজান সাহেবের। 'তুমি কি জান, তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর কোনও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখে যেতে পারেননি? তাঁর মৃত্যুর অল্প ক'দিন বাদেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বইখানা। এরপর আজ অবধি তিনি কতখানি বিখ্যাত, তা নিশ্চয়ই তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। তাই না?'

'কিন্তু ওনার লেখায় নতুন কী পেয়েছি আমরা?' মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত বিমূঢ় জাহিদ খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টাটা করল।

'ননসেন্স রাইম,' মিজান সাহেবের ত্বরিত জবাব। 'ওনার আগে বাংলা সাহিত্যে ননসেন্স রাইম নিয়ে ওভাবে কেউ কাজ করেননি। ওনার ওসব মজার-মজার ছড়াগুলো কিন্তু ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সবার সমান পছন্দ। টিকে থাকবে আরও বহুকাল ধরে স্বমহিমায়।'

চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়েই রইল জাহিদের, যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে ওরা। এই ব্যাপারটা কোনওদিন খেয়ালই করেনি সে। সে শুধু জানত, সুকুমার রায় একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, যাঁর বাবা ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তিনি এ দেশে সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলা প্রচলন করেছিলেন। আর খেলাটা হয়েছিল সম্ভবত কিশোরগঞ্জ জেলার কোনও এক অজপাড়াগাঁয়ের মাঠে।

সুকুমার রায়ের ছেলে, সত্যজিৎ রায় তাঁর বাপ-দাদাদের চেয়েও বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন। জাহিদ নিজেও তাঁর অনেক বড় একজন ভক্ত। তাঁর জীবনী পড়তে-পড়তে, বাবা সুকুমার রায়ের জীবনী বিস্তারিত কখনও পড়াই হয়নি জাহিদের। না হলে কি আর এতদিন ধরে সে ব্যাপারটা সম্পর্কে অন্ধকারে থাকত?

আবারও বলতে শুরু করলেন মিজান সাহেব। 'তারপর ধরো, কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের কথা। তাঁর রচিত গীতিকবিতা, লালনগীতি কতটা জনপ্রিয়, সেটা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ পাঠক তো অনেক পরের কথা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল সহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকরা পর্যন্ত লালনের লেখায় অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর রচিত গীতিকবিতাগুলো ছিল সমসাময়িক যে-কোনও স্বভাবকবির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকী নিজের গুরু সিরাজ সাঁইয়ের কোনও রচনার সাথেও খুব একটা মেলে না। অথচ লালন নিজে ছিলেন অক্ষরজ্ঞানশূন্য একজন মানুষ। তাঁর রচিত কোনও গ্রন্থ তিনি দেখে যেতে পারেননি জীবদ্দশায়।'

তন্ময় হয়ে শুনছে এখন জাহিদ। ঠিক নিরেট পাথরে গড়া একখানা অনড় মূর্তির মতই চুপটি করে বসে আছে সে। শ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে। এদিকে একটানা বলে চলেছেন মিজান সাহেব।

'বেলুচিস্তানের সাহিত্যিক, মুহু জয়াকিমের লেখা "সিনানে আকিল"-এর কথা নিশ্চয়ই শুনেছ? পৃথিবীর ১০৮টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বইটি। এতটা ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ বই, অথচ প্রকাশ পেয়েছে কি না লেখকের মৃত্যুর পর। তাঁর ছোট

মেয়ে হান্না এবং অক্সফোর্ড ফেরত জামাই মিলে বইটা প্রকাশ করে বেলুচিস্তানের বইমেলায়। তারপর বাকিটুকু ইতিহাস।

'তবে মজার ব্যাপার হলো, মুহ্‌ জয়াকিমের আর কোনও সাহিত্য কর্মেরই কিন্তু কোনও হদিস পাওয়া যায়নি! এমনকী নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় লেখা দু'-এক কলম ছড়া-কবিতাও না! যেন সিনানে আকিল-ই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ রচনা!'

'আপনি বলতে চাইছেন, এনারা সবাই অপদেবী জোয়ালার সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন?' ফ্যাসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল জাহিদ। কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে তার, গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চাইছে না কিছুতেই।

জবাবে রহস্যময় একটা হাসি দিলেন মিজান সাহেব। সে হাসির অর্থ, হ্যাঁ অথবা না, দুটোই হতে পারে। ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

চৌকাঠের কাছটায় গিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকালেন। 'সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো আমার পাণ্ডুলিপিটা, জাহিদ। ওটা যদি কখনও তোমার পড়তে ইচ্ছে হয়, আমার রিডিং রুমের টেবিলেই পাবে। ওটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে, আমি সত্যি বলছি নাকি মিথ্যা! ভাল থেকো, জাহিদ। চললাম।'

মিজান সাহেব চলে যাবার পরও বজ্রাহতের মত দীর্ঘক্ষণ অনড় বসে রইল জাহিদ। বিছানায় ফিরে যেতে মোটেও আর ইচ্ছে করছে না।

বাইরে সাঁঝ নেমেছে। খোলা জানালা দিয়ে অবাধে ঘরে ঢুকছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। সেই সঙ্গে মিহি শিশিরের গুঁড়ো। জানালাটা চটজলদি বন্ধ করা দরকার, নয়তো পুরো ঘর জুড়েই কুয়াশা আর ঠাণ্ডার রাজত্ব শুরু হবে। কিন্তু সেদিকে একটুও খেয়াল নেই জাহিদের। ঢুকুক না হয় খানিকটা রহস্যময় শিশিরের দঙ্গল, কী আসে-যায়? গোটা জগৎটাই তো রহস্যের চাদরে মোড়ানো। চাদরের বাইরের জগৎ সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানতে পারে। তারাই কেবল জানতে পারে, যাদেরকে জানতে দেয়া হয়। আর যারা খুব বেশি জেনে যায়, তারা অন্যদের বলার মত সময়-সুযোগ কোনওটাই পায় না।

তিন

সকাল-সকাল কারও মৃত্যুসংবাদ শোনাটা মোটেও সুখকর কিছু নয়, সেটা আপন-পর যারই হোক না কেন। জাহিদ মিজান সাহেবের ইন্তেকালের খবরটা জানতে পারল ভোরবেলায় চোখ খোলার পর-পরই।

প্রথমটায় নিজের কান দুটোকে সে ঠিকঠাক বিশ্বাস করতে পারেনি। গতকাল বিকেলে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দেয়া জলজ্যান্ত মানুষটা রাতারাতি লাশ হয়ে গেল কেমন করে?

জানা গেল, মাঝরাতের দিকে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাঁর। কেউ টের পাবার আগেই সব শেষ, হাসপাতালে নিয়ে যাবার সুযোগটাও মেলেনি। মরে পড়ে ছিলেন তাঁর পড়ার ঘরের মেঝের উপর। ভোরের আগে সেটা কারও চোখে পড়েনি।

সারাটাদিনই কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল জাহিদের। এত মানুষ, এত ব্যস্ততা, তবুও কীসের যেন একটা ভয় আঁকড়ে ধরতে চাইছে তাকে বারংবার। এটা কি মরা-বাড়ির চিরন্তন থমথমে পরিবেশের কারণে? নাকি অবচেতন মন সবকিছুর মূলে অপদেবী জোয়ালার হাত থাকার বিষয়টি মেনে নিতে শুরু করেছে? অনেক ভেবেও প্রশ্নটির কোনও জবাব খুঁজে পেল না জাহিদ।

মিজান সাহেবকে কবর দেয়া হলো বাদ জোহর। এরপর ধীরে-ধীরে লোকজনের ভিড় কমতে শুরু করল। শুধু নিকটাত্মীয়রা রয়ে গেলেন শোকসন্তপ্ত পরিবারটিকে খানিকটা সান্ত্বনা দেবার জন্য।

জাহিদও ফিরে এল নিজের বাসায়। তবে খালি হাতে নয়, মিজান সাহেবের পাণ্ডুলিপিটা ঠিকই বাগিয়ে নিয়েছে সে। চুরি করে আনেনি অবশ্য, মিজান সাহেবের স্ত্রীকে জানিয়েই এনেছে।

যদিও এজন্য খানিকটা মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে, তবে সেটার আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। ও বলেছে, পাণ্ডুলিপিটা ওরই, মিজান সাহেব ওটা পড়তে নিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি, শুধু শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন জাহিদের মুখের দিকে।

শুধু পাণ্ডুলিপি কেন, গোটা ঘরের তাবৎ জিনিসপত্র তাঁর সামনে দিয়ে তুলে আনলেও হয়তো কিছুই বলতেন না তিনি তখন। স্বামীকে অকালে হারিয়ে রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বেচারি।

তবে অনেক খুঁজেও মিজান সাহেবের বর্ণনানুযায়ী কিম্ভূতকিমাকার কলমটা কোথাও খুঁজে পায়নি জাহিদ। হয়তো এই হট্টগোলের সুযোগে অন্য কেউ সেটা পকেটে পুরে সটকে পড়েছে। ছোট জিনিস, সহজেই গাপ করে ফেলা সম্ভব। তাই ওটা নিয়ে বিশেষ একটা মাথা ঘামাল না ও। পাণ্ডুলিপিটাও যে বেহাত হয়ে যায়নি, এটাই অনেক।

রাতের খাবারের পর আয়েশ করে বিছানায় বসল জাহিদ। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা জোড়া মেলে দিয়েছে কম্বলের তলায়। গলায় জড়িয়ে নিয়েছে একখানা উলের মাফলার, আজ ভীষণ শীত নেমেছে।

মিজান সাহেবের কাগজের বাণ্ডিলটাকে কোলের উপর রেখে পড়তে শুরু করল ও। দেখা যাক, রাত জেগে-জেগে দিনের পর দিন কী সব ছাইপাঁশ লিখে পাতা ভরিয়ে রেখেছেন মিজান সাহেব। এ জিনিস তিনি এক রাতে লিখে শেষ করেছেন, এটা শুধু জাহিদ কেন, কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই বিশ্বাস করবে না। ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা না গেলেও, তাঁর স্বপ্নযাত্রার গালগল্পটা বিশ্বাস করারও কোনও মানে হয় না। একসময় ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, এত উতলা হবার কিছু নেই।

সুন্দর হাতের লেখা মিজান সাহেবের, মেয়েদের মত গোটা-গোটা অক্ষর। একটি আরেকটির সঙ্গে জড়িয়ে যায়নি মোটেও। কোনও কষ্ট ছাড়াই বেশ আয়েশ করে পড়া যাচ্ছে। তাই পঠনও এগিয়ে চলেছে বেশ দ্রুত গতিতে।

জাহিদ ভেবেছিল, কিছুক্ষণ পড়ার পরই দু'চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসবে। তারপর কম্বলমুড়ি দিয়ে আরামসে একখানা খাসা ঘুম দেয়া যাবে। কিন্তু সেই আশায় গুড়েবালি! যতই পড়ছে, ততই বিস্ময় বাড়ছে তার। চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে সেই কখন। প্রতিটা নতুন লাইন পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনার পারদের ঊর্ধ্বমুখী চলন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অসম্ভব! এ লেখা কোনওমতেই মিজান সাহেবের হতে পারে না। অদ্ভুত সুন্দর, অভূতপূর্ব, ভীষণ চমকপ্রদ একটা রচনা। ঈশ্বরের দিব্যি কেটে বলতে পারে জাহিদ, এমন ধরনের কোনও লেখা এর আগে কখনও পড়েনি ও।

আদতে রচনাটা কোন্ ঘরানার? গল্প, কবিতা নাকি প্রবন্ধ? নাকি পৃথিবীর তাবৎ ঘরানার সাহিত্যের অপূর্ব এক ফিউশন!

সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয় এক লেখনীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে পুরো বয়ান। পাঠককে কেবল চুম্বক নয়, সুপারগ্লুর মতই বইয়ের পাতায় আটকে রাখার সুনিপুণ এক ফাঁদ যেন এটি! প্রতিটা শব্দই যেন জীবন্ত একেকটি সত্তা, যে-কোনও মুহূর্তে কাগজের পাতা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম!

অথচ পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে ওদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব চোখে পড়বে না পাঠকদের। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনন্যসাধারণ বুনটে কী সুন্দর একখানা সাহিত্যের ইমারত তৈরি করেছে ওরা। সত্যিই অপূর্ব!

কাহিনিরও যেন কোনও তুলনা নেই, ফ্যান্টাসির সমস্ত সীমা-পরিসীমা ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেছে লেখাটায়। যে জগতের বর্ণনা এই রচনায় করা হয়েছে, সেটা কোনও মানব হৃদয়ের পক্ষে সত্যিই কি কল্পনা করা সম্ভব?

পুরো লেখাটা যখন পড়া শেষ করেছে জাহিদ, ঘড়িতে তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। একে শীতের রাত, তার উপর অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। চারদিকে তাই সুনসান নীরবতা, গোটা তল্লাটেই বোধহয় জেগে নেই কেউ এখন। রাস্তার নেড়ি কুকুরের দলও কোনও খড়ের গাদা কিংবা ছাইয়ের স্তূপ খুঁজে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে, একটিকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

দুঃসাহসী কোনও চোর যদি এই পাড়ায় চৌর্যবৃত্তি করতে এসেও থাকে, নিঃসন্দেহে তাকে আজ বুড়ো চৌকিদার, ওসমান চাচার মুখোমুখি হতে হবে না। যৎসামান্য বেতনের লোভে কিছুতেই তিনি আজ রাস্তায় নামবেন না। নির্ঘাত তাঁর ঝুপড়ি ঘরটায় নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন এখন। এহেন ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ালে, বুড়ো হাড়ে সেটা সইবে? সর্দি-গর্মি হয়ে পরকালের টিকেট নিশ্চিত হয়ে যাবে না? ওসমান চাচাকে অতটা বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই।

অথচ এই শীতের মধ্যেও নিজের ঘরে বসে দরদর করে ঘামছে জাহিদ!

উত্তেজনায় রীতিমত টগবগ করে ফুটছে তার ভিতরটা। এতক্ষণ ধরে যা পড়ল, এমনিতেই সেটা হজম করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার উপর নিজের সঙ্গে এখন যুঝতে হচ্ছে তাকে! নিজের ভিতরকার মানুষটার সঙ্গে যদি সংঘাত বেধে যায়, সেটা উপভোগ্য কোনও বিষয় নয় মোটেও।

একদিকে খ্যাতির মোহ, অন্যদিকে বিলুপ্তপ্রায় বিবেকবোধ! কী করবে জাহিদ?

সে নিজে লেখালেখি করে। পাড়ার ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে কয়েকটা লেখা ছাপা হয়েছে জাতীয় পত্রিকাতেও। কিন্তু শত জনম চেষ্টা করলেও যে এহেন একখানা পাণ্ডুলিপি রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, এটা তার চেয়ে ভাল আর কে-ই বা জানে?

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলল জাহিদ। ক্ষয়িষ্ণু বিবেকবোধের উপর টেক্কা দিয়ে আরও একবার জয়ী হলো মানুষের ভিতরকার চিরন্তন নোংরা লোভ। পাণ্ডুলিপিটা জাহিদ নিজের নামেই ছাপাবে!

অক্কা পাওয়া একজন মানুষের নামে ছাপিয়ে, বিখ্যাত হবার এত বড় সুযোগটা হাতছাড়া করার কোনও মানেই নেই। এমন জ্যাকপট জেতার সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা বারণ, অমঙ্গল হয়!

অপদেবী জোয়ালা নামে কেউ যদি সত্যিই থেকে থাকে, আর তাঁর সঙ্গে যদি কোনও চুক্তি হয়েও থাকে, সেটা হয়েছে মিজান সাহেবের সঙ্গে। জাহিদের সঙ্গে জোয়ালার কোনও সম্পর্ক নেই, সুতরাং ওটা নিয়ে ভেবে-ভেবে হয়রান হওয়ারও কোনও যুক্তি নেই। একটা বলপয়েন্ট কলম দিয়ে খুব ভাল করে মিজান সাহেবের নামটা কেটে দিল জাহিদ। তারপর স্পষ্ট করে নিজের নামটা লিখল। খেয়াল রাখল, হাতের লেখাটা হুবহু না মিললেও অন্তত কাছাকাছি যেন থাকে। তারপর হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করল ভাল করে। নাহ্, মিজান সাহেবের নামটা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে কালো কালির তলায়। বোঝার কোনও উপায়ই আর নেই। নিজেকে মনে-মনে উপর্যুপরি বাহবা দিল জাহিদ, সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পেরেছে বলে।

ঠিক তখনই জাহিদের মনে হলো, আড়াল থেকে কেউ যেন লক্ষ্য করছে তাকে! গোটা দেহে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল এক লহমায়। চোখ তুলে এদিক-ওদিক চাইল ও, কিন্তু সন্দেহজনক কোনও কিছুই নজরে এল না। কিন্তু অস্বস্তিকর অনুভূতিটা আছে ঠিক আগের মতই। ঘরের ভিতরকার বাতাসটাও যেন কেমন ভারী হয়ে আছে। স্থির, গুমট।

তাজা হাওয়ার জন্য জানালার কবাট দুটো খানিকক্ষণের জন্য খুলে দিলে কেমন হয়? তাতে গুমট ভাবটা কেটে যাবে না? কিন্তু বাইরে তো প্রচণ্ড শীত নেমেছে আজ। জানালা খুললে তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো ঘর জমে বরফ হয়ে যাবে। তা হলে? তবুও জানালাটা কিছুক্ষণের জন্য খোলাই মনস্থ করল জাহিদ। এই দম বন্ধ করা ভাবটা কিছুতেই আর সহ্য হচ্ছে না তার। ও যখনই বিছানা ছেড়ে নামতে যাবে, ঠিক তখনই আচমকা জানালার পর্দাগুলো সজোরে

নড়তে শুরু করল!

ভীষণ চমকে উঠল জাহিদ। সবক'টা জানালা পুরোপুরি বন্ধ, ঘরে একবিন্দু বাতাসের চলাচলও নেই। তবুও পর্দাগুলো কেঁপে-কেঁপে উঠছে বার-বার! যেন কেউ ওগুলোকে হাত দিয়ে ধরে নাড়িয়ে দিচ্ছে একটু পর-পর। ওগুলোর পিছনে কি কেউ লুকিয়ে রয়েছে? তার অগোচরে ঘরে ঢুকলই বা কেমন করে?

বিস্ফারিত নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইল জাহিদ। কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। ইতোমধ্যেই গায়ের সবক'টা লোম সটান দাঁড়িয়ে গেছে। ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে চলেছে গোটা শরীর জুড়ে। রক্তচাপ বেড়ে গেছে অনেকখানি।

যেভাবে শুরু হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আচমকা বন্ধ হয়ে গেল পর্দা নড়ার ব্যাপারটা। দেখতে-দেখতেই স্থির হয়ে গেল ওগুলো, একেবারে অনড়। যেন চিরকাল ওভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা।

বেশ অনেকক্ষণ খাটের উপর জড়সড় হয়ে বসে রইল জাহিদ। চোখ পর্দাগুলোর দিকে, আবার না নড়তে শুরু করে দেয় ওগুলো! কিন্তু বেশ অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও আর নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ওদের মধ্যে। ধীরে-ধীরে কিছুটা সাহস ফিরে পেল জাহিদ। উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালাটার পাশে। ইতস্তত করতে-করতে আচমকা ঝটকা মেরে তুলে ধরল একটা পর্দা। নেই কিছু ওখানে, পিছনটা পুরোপুরি খালি।

ধড়ে প্রাণ ফিরে এল জাহিদের। হয়তো ঘরে কোনও ইঁদুর-ছুঁচো ছোটাছুটি করছিল, ওদের গায়ে লেগেই কেঁপে উঠেছিল পর্দাগুলো। আর ও কি না এতেই ভয়ে আধমরা হয়ে পড়েছিল! কোনও মানে হয়? ধুর!

আসলে অবচেতন মনের কোণে অপদেবীর ভাবনাটা পীড়া দিচ্ছে। এজন্যই মনটা ছোট হয়ে আছে। নয়তো এত অল্পতে ভয় পাওয়ার মানুষ নয় জাহিদ মোটেও। রাত জেগে-জেগে হরর গল্প পড়া চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ এতেই অভ্যস্ত সে। ন্যূনতম সাহস না থাকলে সম্ভব হত না সেটা কোনওমতেই।

আবার গিয়ে খাটে বসল জাহিদ। পাণ্ডুলিপিটা আরেকবার পড়বে কি না ভাবছে। একবার পড়ে তৃষ্ণা মেটেনি, এমন লেখা অসংখ্যবার পড়া যায়। প্রথম পাতাটা সবে খুলেছে, ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে গেল! যদিও লোডশেডিং কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এই এলাকায় প্রায়ই হয়। তবুও আঁধার নামতেই একটু আগের ভয়টা আবার আঁকড়ে ধরল জাহিদকে।

গাঢ় অন্ধকার, সঙ্গে করে যেন নিয়ে এসেছে তীব্র আতঙ্কের ঝুলি। বার-বার মনে হচ্ছে, এই অন্ধকারেই কোথাও লুকিয়ে আছে ভয়াবহ অশুভ কোনও সত্তা। ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো ওটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে! রক্তলাল চোখে হয়তো চকচক করছে লোভ। বিছানা ছেড়ে নেমে মোমবাতি জ্বালানোর সাহসটুকুও এখন আর নেই তার মধ্যে। যেখানে বসেছিল, সেখানেই চুপচাপ বসে রইল ও। নিঃশ্বাস নিচ্ছে খুব ধীরে-ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে। যেন নিঃশ্বাসের শব্দেও আকর্ষিত হয়ে ছুটে আসতে পারে অন্য জগতের কেউ! হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ কানে এল জাহিদের। অদ্ভুত এক ধরনের গুঞ্জন। যেন অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে

বহুদূরে কোথাও বসে একযোগে খিলখিল করে হাসছে। আর সেই হাসির শব্দ এখন গুমট বদ্ধ বাতাসে ভর করে ভেসে বেড়াচ্ছে গোটা ঘর জুড়ে। খানিক বাদেই সেই হাসির শব্দ পরিণত হলো তীব্র আর্তনাদে! যেন শিশুগুলোকে অমানুষিক নির্যাতন করছে কেউ। প্রতিটা চিৎকারের সঙ্গে মিশে আছে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, তীব্র বিষাদ। তাদের হাহাকারে কেঁপে-কেঁপে উঠছে ঘরের সবক'টা দেয়াল।

সীমাহীন আতঙ্কে পুরোপুরি পাথর হয়ে গেল জাহিদ। প্রচণ্ড একটা চিৎকার তার বুকের গভীর থেকে উঠে এসে গলার কাছটায় আটকে আছে, বাইরে বেরুচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে, সামান্য একটুখানি শব্দ কিংবা যৎসামান্য অঙ্গ সঞ্চালনই এক লহমায় তার মরণ ডেকে আনতে পারে। নিরেট পাথরের মূর্তির মতই ঠায় বসে আছে সে। শুধু বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘন অন্ধকারের দিকে। কীসের আশায়, কে জানে!

আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে, ঠিক এমন যখন অবস্থা, আচমকা বিদ্যুৎ চলে এল। তৎক্ষণাৎ থেমে গেল অপার্থিব সব চিৎকার আর গুঞ্জন। শুধু ঘরের বদ্ধ বাতাসটা আরও খানিকটা ভারী হয়েছে যেন।

সে বাতাসেই একের পর এক দম নিয়ে চলল জাহিদ। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে তার। বহুক্ষণ ধরে তার দম নেয়া একরকম বন্ধই ছিল বলা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে তাই বেশ খানিকটা সময় লাগছে এখন।

নিজেকে ফিরে পেতেই জাহিদ আবিষ্কার করল, তার হাতে বলপয়েন্ট কলমটার বদলে অন্য একটা কলম ধরা! পুরানো, কিম্ভূতকিমাকার। কাঠের শরীরে অদ্ভুতদর্শন নকশা আঁকা।

জাহিদের বোঝার বাকি রইল না, এটাই মিজান সাহেবের সেই হারিয়ে যাওয়া কলমটা। কিন্তু এটা এখানে এল কেমন করে?

ঝটকা দিয়ে হাত থেকে ওটা ফেলে দিতে চাইল জাহিদ। যেন ওটা কোনও কলম নয়, বিষধর একখানা সরীসৃপ। কিন্তু জাহিদকে অবাক করে দিয়ে হাতের সঙ্গে সেঁটে রইল ওটা, কিছুতেই ফেলা গেল না! যেন শক্ত আঠা দিয়ে তার হাতের সঙ্গে ওটাকে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।

আচমকা তার হাতের মুঠোতেই নড়তে শুরু করল ওটা! জীবন্ত সাপের মতই মোচড় খাচ্ছে, দেহ দোলাচ্ছে। এর পর-পরই পরিবর্তনটা শুরু হলো ওটার গোটা দেহ জুড়ে। পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এল বিশাল একখানা পালক। কুচকুচে কালো, মসৃণ। এতটুকু কলমের ভিতরে ওটা ঠিক কোথায় লুকিয়ে ছিল, খোদা মালুম!

জাহিদ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, কলমটার মাথার কাছটায় আবছামতন একখানা চোখ ফুটে উঠেছে। আয়তাকার, কালো, গভীর, একটামাত্র চোখ। জাহিদকে অপরিমেয় আতঙ্কে নিমজ্জিত করে কলমটা যেন হঠাৎ করেই চোখটা টিপে দিল! যেন তার সাথে মজা করছে ওটা।

আর সহ্য করতে পারল না জাহিদ কোনওমতেই। বিকট এক চিৎকার দিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল বিছানা ছেড়ে। বেরিয়ে যাবে এই অভিশপ্ত ঘর থেকে, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

মেঝেতে দাঁড়াতেই আচমকা ওর পা জোড়া কে যেন সজোরে আঁকড়ে ধরল! বিস্ফারিত চোখে জাহিদ দেখল, গোটা মেঝে জুড়ে ধীরে-ধীরে একটা মুখের আদল ফুটে উঠছে। জাহিদের বুঝতে অসুবিধা হলো না, মুখটা কার।

স্বয়ং অপদেবী জোয়ালা এসে হাজির হয়েছেন এই ঘরে, আজ আর বাঁচার কোনও উপায় নেই। ডুকরে কেঁদে উঠল ও। বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা চিরে।

তার পর-পরই মেঝে থেকে একটা গাঢ় ছায়া উঠে এসে গ্রাস করল জাহিদের গোটা অবয়ব। ঠিক তখনই আবারও বিদ্যুৎ চলে গেল, সে রাতে দ্বিতীয়বারের মত।

জাহিদকে আর কখনও পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল তার লাশ। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। বিছানার উপর হাতে লেখা এক গাদা কাগজ। সেই অদ্ভুত কলমটাকে অবশ্য দেখতে পায়নি আর কেউ। চলে গেছে ওটা!

চার

ব্যতিক্রম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী, জনাব মোসলেম হোসেন, রোজকার মতন অফিসে এসেছেন সকাল নয়টায়। তিনি চেয়ারে বসার খানিক বাদেই পিয়ন আলতাফ মিয়া এসে, ডাকে আসা চিঠিপত্র এবং পার্সেলগুলো দিয়ে গেল তাঁর সামনে। সঙ্গে এক কাপ আগুন গরম চা।

কাপে চুমুক দিতে-দিতে একে-একে পার্সেলগুলো দেখতে লাগলেন মোসলেম হোসেন। বেশিরভাগই নতুন লেখকদের পাঠানো পাণ্ডুলিপি। প্রতিদিনই গাদাখানেক করে আসে ওগুলো, বিরক্তিকর। আজকালকার ছেলেপেলেরা কম্পিউটারে দুটো শব্দ পাশাপাশি লিখতে পারলেই নিজেদেরকে লেখক ভাবতে শুরু করে। যতসব অখাদ্য-কুখাদ্য লিখে কাগজ ভরিয়ে, সেগুলো আবার পাঠিয়েও দেয় প্রকাশকের টেবিলে! সত্যিই তাদের সাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

লেখার পর নিজেরা একবার পড়ে দেখে বলেও তো মনে হয় না। কারণ একটিবার পড়লেও তো ওদের বোঝার কথা, এহেন ছাইপাঁশ কিছুতেই ছাপার যোগ্য নয়। তাই না?

নাকি সেটুকু বোঝার সামর্থ্যও নেই ওদের? আচ্ছা, ওরা কি ক্ল্যাসিক সাহিত্যগুলো পড়ে? নাকি ফেসবুক-ব্লগে স্ট্যাটাস পড়েই দিন কাটে ওদের? নষ্ট, একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখনকার প্রজন্ম।

বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা পড়েই টেবিলের পাশে রাখা ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দেন মোসলেম হোসেন। কদাচিৎ দুয়েকটা রেখে দেন, অবসর সময় মনোযোগ দিয়ে পড়বেন বলে। সেগুলোর সিংহভাগও অবশ্য চূড়ান্ত বাছাইয়ে বাদ পড়ে যায়। ব্যতিক্রম প্রকাশনী থেকে লেখা ছাপা হওয়া এত সোজা নাকি?

আজ দ্বিতীয় বাছাই পর্যন্ত যাবার মতন একটা লেখাও পেলেন না মোসলেম হোসেন। মেজাজটা সপ্তমে চড়ে গেল তাঁর। চা-টাও কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে। চিনি বেশি নাকি দুধ কম?

বিরক্ত মুখেই শেষ প্যাকেটটা খুললেন তিনি। হাতে লেখা একখানা পাণ্ডুলিপি। এটা দেখে বিরক্তির ভাবটা আরও খানিকটা বাড়ল বৈ কমল না তাঁর!

এই প্রাগৈতিহাসিক লেখক আবার কোত্থেকে নাযিল হয়েছেন? এখনও বুঝি হাতে লিখে পাঠানোর চল আছে? কম্পিউটার নেই বেচারার? তবে এটা মানতে হবে যে, লেখকের হাতের লেখা বেশ সুন্দর। স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে, একেবারে কম্পিউটার কম্পোজের মতই। একটুও বেঁকে যায়নি কোথাও, পুরোটা পাতা জুড়ে অদ্ভুত সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে একেকটি লাইন।

ও, বাবা! লেখকের নাম নেই কেন?

ভাল করে খেয়াল করে বুঝতে পারলেন, লেখকের নাম ঠিকই ছিল, কিন্তু কালো কালি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে সেটা। তবে একটি নয়, নিদেনপক্ষে দুটো নাম ছিল ওখানটায়। যৌথভাবে লেখা?

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়েই পড়তে শুরু করলেন মোসলেম হোসেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, প্রথম প্যারা পড়ার পরই ফেলে দিতে হবে এটাকে। অখাদ্য না হয়েই যায় না।

কিন্তু পড়া শুরু করতেই তাঁর বিরক্তি ভাবটা দ্রুত কেটে গেল! কুঁচকানো কপালের চামড়া সমান হয়ে গেছে প্রথম কয়েক লাইন পড়ার পরেই! একটানা পড়তে লাগলেন তিনি, পড়তেই থাকলেন।

পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে একেবারে পুরোটা পড়া শেষ করে ফেললেন ঘণ্টা তিনেক সময় লাগিয়ে। এর মধ্যে একটিবারের জন্যও চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি তিনি, একটি ফোনও ধরেননি! সাক্ষাৎপ্রার্থীরা আজ কেউ দেখা পায়নি মোসলেম হোসেনের।

পড়া শেষ হবার পর সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগতে লাগল তাঁর কাছে। কী পড়লেন তিনি এটা!

এটা প্রকাশিত হলে তো চারদিকে শোরগোল পড়ে যাবে। পাঠকরা হুলস্থূল বাধিয়ে দেবে এটা কেনার জন্য। নোবেল-টোবেল পেয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়ে আবার দেখলেন মোসলেম হোসেন। নেই, প্রেরকের ঠিকানাও নেই। তা হলে কি এটা বেওয়ারিশ একটা পাণ্ডুলিপি?

দেরি করা যাবে না, যত দ্রুত সম্ভব ছাপিয়ে ফেলতে হবে এটা। সোনার চেয়েও দামী জিনিস, হাজার-হাজার কপি বিক্রি হবে নির্ঘাত।

বেল বাজিয়ে আলতাফ মিয়াকে ডেকে পাঠালেন মোসলেম হোসেন। কম্পোজ সেকশনে নিয়ে চটজলদি ওটাকে কম্পোজ করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

আলতাফ মিয়া চলে গেল। বেয়ারিং চিঠির মত কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফেরতও চলে এল। বিনীতভাবে জানতে চাইল, লেখকের নামের জায়গাটা খালি, ওখানে কার নাম হবে?

খেঁকিয়ে উঠলেন মোসলেম হোসেন, 'আমার লেখা, কার নাম হবে আবার? গাধা কোথাকার।'

কাঁচুমাচু মুখে দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল পিয়ন বেচারা। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিলেন মোসলেম হোসেন। পরক্ষণেই গুনগুন করে নিজের প্রিয় একটা গান গাইতে শুরু করলেন। আজ বহুদিন পর মনটা বেজায় ভাল তাঁর, খুব খুশি-খুশি লাগছে। ঠিক তখনই তাঁর পিছনের দেয়ালে একটা বীভৎস মুখ ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল! দেবী জোয়ালা ভোলেননি তাঁর চুক্তির কথা! ৩৭ জন অপদেবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো আর সবচেয়ে শক্তিশালী যিনি, তাঁর কি আর ভুলোমনা হলে চলে?

৩৭ অত্যন্ত রহস্যময় একটা সংখ্যা, যা দিয়ে ১১১, ২২২, ৩৩৩, ৪৪৪, ৫৫৫, ৬৬৬, ৭৭৭, ৮৮৮, ৯৯৯ সবক'টাকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

মোসলেম হোসেনের মৃত্যুসংবাদটা দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিকেই ফলাও করে প্রচার করা হলো। প্রকাশকদের সংঘ তিনদিনের শোক ঘোষণা করল, এই তিনদিন কোনওরকম নতুন বইয়ের কাজকর্ম করা হবে না। শোকসভার বক্তারা বিমর্ষ গলায় বার-বার বললেন, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মোসলেম হোসেন বড্ড অকালেই চলে গেলেন। তাঁর এই মহাপ্রয়াণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা বাংলা সাহিত্য। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন।

প্রিয় পাঠক, পাণ্ডুলিপিটা এখন ঠিক কার কাছে আছে, সেটা আর জানা যায়নি! তবে ওটা কিন্তু প্রকাশিত হবে, অবশ্যই হবে। এবং সেটা হবে মিজান সাহেবের নিজের নামেই। আপাতত আমার মত আপনারাও চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষায় থাকুন...

মৃত্যুপুরী

এক

কাউন্টির একেবারে শেষ মাথার শহর, ফগসিটি। এরপর কয়েকশো মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় আর কোনও লোকালয় নেই। ওক-পাইনের জঙ্গল, বিরান প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত আর খানাখন্দের রাজত্ব।

মাঝে-মধ্যে অবশ্য আড়ালে-আবডালে দু'একটা নিঃসঙ্গ পুরানো কেবিন অথবা হাড় বেরিয়ে পড়া রুগ্ন জরাজীর্ণ শ্যাক চোখে পড়ে। আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো কোনও ওয়ান্টেড আউট-ল অথবা পোড় খাওয়া বুড়ো কুগার শিকারিরাই ওগুলো মাঝেসাঝে ব্যবহার করে। শহরে ঢুকবার কিংবা বেরোবার স্বীকৃত পথ একটাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াল এক উপত্যকার ভিতর দিয়ে সরু, রুক্ষ, বিবর্ণ একখানা গিরিপথ।

আগে দু'সপ্তাহে একবার করে একটা স্টেজ কোচের চলাচল ছিল। কয়েক মাস ধরে সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। ফগসিটিতে যাত্রী তেমন একটা মেলে না। তাই এই রুটে প্রচুর লোকসান গুণতে হয়েছে কোম্পানিকে। কাঁহাতক আর নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে লাইন চালানো যায়? এভাবে চলতে থাকলে ব্যবসা লাটে উঠতে সময় লাগবে না। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই এই রুটে স্টেজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। সহসা আবার চালু হবে, তেমন কোনও সম্ভাবনাও নেই। কী লাভ?

যৌবন ফুরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এক শহর ফগসিটি। আশপাশের গোটা চৌহদ্দিতে কোনও র‍্যানশার নেই। র‍্যাঞ্চ দূরে থাক, দু'একটা নেস্টর পরিবার পর্যন্ত নেই কাছেপিঠে।

সুদূর অতীতে বিশাল এক রুপোর খনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল শহরটা। রুপোর শেষ শিরাটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবার পরপরই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল শহরটার ভবিষ্যৎ। কিন্তু বিস্ময়করভাবে আজও টিকে আছে শহরটা, ধুঁকতে-ধুঁকতে হলেও।

পরিবার-পরিজনহীন কিছু ছন্নছাড়া মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে এখানে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য আছে ভাসমান দেহপসারিণীর দল।

বাইরের লোক নিয়মিতই আসে শহরে। যারা আসে, তাদের বেশিরভাগই আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য ফগসিটি বস্তুতই

আদর্শ শহর। কদাচিৎ তাদের পিছু নিয়ে আসে টেক্সাস রেঞ্জাররা। অথবা কারও মাথার দাম আকাশছোঁয়া হলে, তাদের খোঁজে আসে বাউণ্টি হান্টাররা।

সবাইকেই স্যালুনে গলা ভেজাতে হয়, দু'বেলা মুখে খাবার দিতে হয়, রাতে শোবার জন্য প্রয়োজন হয় বিছানার, ঘোড়ার জন্য প্রয়োজন হয় দানাপানি। আর সব কিছুর জন্যই খরচ করতে হয় গাঁটের পয়সা। তাই পরিমাণে খুব অল্প হলেও, বাইরের অর্থকড়ি নিয়মিতই আসে শহরে। এখনও শহরটা মরে না যাওয়ার সম্ভবত এটাই একমাত্র কারণ।

নামে ফগসিটি হলেও, কুয়াশা কখনওই তেমন একটা জ্বালাতন করে না শহরটাকে। বরঞ্চ অনেক এলাকার চেয়ে শীতের প্রকোপে এখানে অনেকটা কমই বলা চলে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে, কুয়াশার পরিবর্তে আতঙ্কের একখানা চাদর আচ্ছাদন করে রেখেছে শহরটাকে।

সাতসকালে ঘুম ভেঙে শহরবাসী আবিষ্কার করল, স্যালুনের সামনের হিচিং রেইলগুলো খালি! আস্তাবলের প্রতিটা খোপও শূন্য, রীতিমত খাঁ-খাঁ করছে। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও পুরো শহরে একটা ঘোড়ারও দেখা মিলল না।

এমনকী ঘোড়াগুলো কোন্ পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার কোনও ট্র্যাকও নেই! যেন বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ফগসিটির সবক'টা ঘোড়া!

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-হতাশায় নিজেদের চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল শহরের এক দঙ্গল ঘাগু লোক। প্রত্যেকেই বিস্ময়ে হতবাক, এতবড় ঘোড়াচোরের দল এল কোত্থেকে? বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ না করে, কোনও ট্র্যাক না রেখে, এতগুলো ঘোড়াকে গাপই বা করে দিল কেমন করে? ক'জন ছিল দলটায়? কারা ওরা? শন মাইকেলের দল? নাকি স্বয়ং ভ্যানগগ সদলবলে এসে হানা দিয়েছিল রাতের আঁধারে? হিসেব মিলছে না কিছুতেই। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে হতাশার পারদ তর-তর করে বেড়েই চলেছে। কী হবে এখন?

নিষ্ঠুর পশ্চিমে ঘোড়া ছাড়া বেঁচে থাকার কথা কল্পনাও করা যায় না। কোনও সন্দেহ নেই, ভয়ানক একটা ফ্যাসাদে পড়েছে ফগসিটিবাসী। বাইরে থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত শহরের সীমানাতেই আটকে থাকতে হবে প্রতিটি মানুষকে। গতর নাড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কোনও জো নেই। যাবে কী করে? বাহনই তো নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে ভিড় ঢের বেশি হলো শহরের একমাত্র স্যালুন, ফগ প্যালেসে। নামেই কেবল প্যালেস, আসলে ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকা জরাজীর্ণ একখানা দালান ছাড়া বেশি কিছু নয় ওটা। বাইরের রঙজ্বলা সাইনবোর্ডটা ভিতরের লণ্ঠনগুলোর মতই পুরানো। চেয়ার-টেবিলগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। বড্ড নড়বড়ে ওগুলো, কখন যে লোকজনসুদ্ধ ভেঙে পড়ে, কে জানে! খদ্দেররা বসতে গেলে কিংবা উঠতে গেলেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ করে ওরা, বুড়ো শরীরে আর সইছে না, বাপু, এবার আমাদের রেহাই দাও।

কিন্তু রেহাই পাবার বদলে আজ বাড়তি বোঝা কাঁধে চেপেছে ওদের। প্রতিটি

টেবিল আজ কানায়-কানায় পূর্ণ, অন্যান্য দিন ওগুলো বলতে গেলে খালিই পড়ে থাকে।

হাতে কোনও কাজ না থাকায় শহরসুদ্ধ লোক এসে হাজির হয়েছে আজ স্যালুনে। বলা বাহুল্য, ঘোড়াগুলোর আচমকা গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়েই কথা বলছে সবাই। সঙ্গে চলছে বোতলের পর বোতল খুলে গলা ভেজানো। সার্ভ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে বেচারা তরুণ বারটেণ্ডার।

তার ঘর্মাক্ত মুখখানা দেখে মায়া হওয়ায় শেষতক আর গা এলিয়ে বসে থাকতে পারেনি স্যালুন মালিক, টিম। দোতলার নিজের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাশবাক্সের সামনে বসেছে। টাকা দেয়া-নেয়া ছাড়া কাজ অবশ্য বিশেষ কিছু করছে না সে। শুধু হাতের ময়লা ন্যাকড়াটা দিয়ে একটু পর-পর মেহগনি কাঠের বারটাকে চকচকে করার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে! আর কান খাড়া করে সবার কথা শুনছে।

এ টেবিল, ও টেবিল থেকে ভেসে আসছে পশ্চিমের যত বিখ্যাত চোর-ডাকাতদের নাম। প্রত্যেকেই নিজের প্রস্তাবিত নামের পক্ষে জোর গলায় যুক্তি দিচ্ছে। যুক্তিতর্কের খেলায় আলোচনা জমে গেছে পুরোপুরি। এসব শুনতে বড্ড ভাল লাগছে টিমের। কাজটা যে-ই করে থাকুক, তাদেরকে আরও একবার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না সে! না জানিয়ে উপায়ই বা কী? একসঙ্গে এত খদ্দের গত কয়েক বছরেও কি দেখেছে ফগ প্যালেস?

চোরের দলকে ইচ্ছেমত শাপশাপান্ত করতে-করতে সময়টা বেশ দ্রুতই কেটে যাচ্ছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে পেটে কয়েক পেগ মদ পড়ায়, প্রায় সবক'জনই হয়ে উঠেছে একেকজন বীরপুরুষ। তাদের মধুমাখা গালির শৌর্যবীর্য থেকে রক্ষা পাচ্ছে না চোরদের মা-বোনেরাও! কে জানে, এসব শুনতে পেলে হয়তো চোরেরা লজ্জায় নিজেদের দু'কান নিজেরাই বেশ করে মলতে শুরু করে দিত! ঘোড়াগুলোও যে ফিরিয়ে দিয়ে যেত না, একথাও জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। এহেন অশ্রাব্য গালির বহর সহ্য করা নিতান্ত চাট্টিখানি কথা নয়।

তবে আচমকা সব শোরগোল ছাপিয়ে শোনা গেল বিকট একখানা চিৎকার!

নিমিষেই থেমে গেল সমস্ত কোলাহল।

যদিও বেহেড মাতাল হতে এখনও ঢের বাকি, তবুও খানিকটা সময় লেগে গেল সবার ধাতস্থ হতে। কেউ-কেউ নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে দিল নিজের পিস্তলের দিকে। সহজাত রিফ্লেক্স। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ তৈরি!

সহসা সবাই অনুধাবন করল, চিৎকারটা বাইরে কোথাও হয়নি, হয়েছে এই চার দেয়ালের ভিতরেই! এবং সেটা করেছে বুড়ো এড স্টার্ক। যে কি না কোনার দিকের একটা ভাঙা টেবিলে একাই একখানা হুইস্কির বোতল বাগিয়ে বসে আছে।

বয়সে বুড়িয়ে গেলেও তার গলার জোর যে এখনও এতটুকুও কমেনি, সেটা সে সদ্যই সবার কাছে প্রমাণ করেছে। তার ভয়ানক চিৎকারটা শহরের শেষ মাথায় প্লেজার হাউসের মেয়েরাও শুনতে পেয়েছে, এটার পক্ষে বাজি ধরার

লোকের অভাব হবে না এখন এই ঘরে। তবে বাজি ধরার জন্য বিপক্ষে কাউকে পাওয়া যাবে কি না সেটাই প্রশ্ন। এড স্টার্ক যখন বুঝতে পারল, ঘরের সবক'টা চোখ তার দিকেই তাকিয়ে আছে, বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতেই হাতের বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। সবার পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছে সে এবং এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। দেয়ালে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসল সে। তারপর ধীরে-সুস্থে বোমাটা ফাটাল, উচ্চারণ করল ভয়াল এক নাম! বিগ ব্ল্যাক!

পরক্ষণেই পাল্টে গেল ঘরসুদ্ধ লোকের চেহারা। বুড়োদের চেহারায় ভর করল নিখাদ আতঙ্ক, মধ্যবয়স্কদের চেহারায় একরাশ বিস্ময় আর অপেক্ষাকৃত তরুণদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল অজস্র প্রশ্ন।

পিনপতন নীরবতা ভেঙে আবারও বলল এড স্টার্ক, 'আমি শতভাগ নিশ্চিত, এটা বিগ ব্ল্যাকের কাজ।'

কথাটা খুব একটা জোরে বলেনি সে। তবে দরজার কাছে মেঝেতে বসা মুচি ছেলেটাও সেটা স্পষ্ট শুনতে পেল। অথচ কানে খাট বলে সকাল-বিকাল গালমন্দ শুনতে হয় তাকে।

'কে এই বিগ ব্ল্যাক? কোনও দস্যু সর্দার? নামও তো শুনিনি এর আগে কখনও!' প্রথম প্রশ্নটা ভেসে এল অল্পবয়সী এক ছোকরার মুখ থেকে।

গতকালই প্রথম শহরে এসেছে সে। কার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়ে এসেছে, কে বলতে পারে। পেশাদার গানফাইটারদের মতন উরুর দু'পাশে খানিকটা নিচু করে দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ সে। দু'চোখে রাজ্যের কুটিলতা খেলা করছে। চলাফেরায় ড্যামকেয়ার একটা ভাব, যেন ঝামেলা করার জন্য মুখিয়ে আছে সারাক্ষণ।

পশ্চিমের প্রতিটি বাড়ন্ত কিশোরকে সবক দেয়া হয়, এ ধরনের মানুষজনের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। বুদ্ধিমান লোক পারতপক্ষে এদেরকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের আয়ু বাড়িয়ে নেয়।

জবাবটা শীতল কণ্ঠেই দিল এড স্টার্ক। 'বিগ ব্ল্যাক কোনও চোর-ডাকাত নয়। বিগ ব্ল্যাক একটা অভিশাপের নাম। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। কিংবদন্তীর প্রেত!'

অন্য অনেকের মতই কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল প্রশ্নকর্তা। তারপর ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমাদের সাথে মস্করা করছ না তো? মদের নেশাটা কাটিয়ে দেয়ার অপরাধে চাইলে এই মুহূর্তেই তোমাকে বুটহিলে পাঠিয়ে দিতে পারি আমি। আগেভাগে সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু, ইয়ার্কি করার খায়েশ থাকলে, এখনই ক্ষান্ত দাও।'

মৃদু হাসল এড স্টার্ক। মনে-মনে হাসছে হো-হো করে! ছোকরার ধারণাও নেই কার সঙ্গে কথা বলছে সে। ডেঁপো ছোকরার বয়সের চেয়ে অন্তত ডজনখানেক বেশি মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে তার হাতে। তাদের বেশিরভাগকেই অবশ্য মানুষ হিসেবে গণ্য করার কোনও উপায় নেই। কীটস্য কীট একেকটা আউট-ল, হিংস্র পশুর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না ওরা।

বলতে গেলে পুরো জীবনটাই কেটেছে বাউন্টি হান্টিং করতে-করতে।

আজকালকার নব্য গানফাইটারদের মত পিস্তলে দাগ কাটার অভ্যাস থাকলে, ক'দিন পরপরই তাকে পিস্তল বদলাতে হত। নয়তো আঁচড় কাটার মতন নতুন জায়গা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে যেত আইভরি বাঁধানো পিস্তলের বাটে।

গরম রক্তের ওই তরুণের হাত হোলস্টারের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই তার দেহে বাম হাতের সিক্সগানের সবক'টা গুলি সেঁধিয়ে দিতে পারবে এড স্টার্ক। আর সিক্সশুটারটা যদি ডান হাতে থাকে, সবক'টা গুলি লাগবে দেহের একটা মাত্র বিন্দুতে, ঠিক কপালের মাঝ বরাবর!

তবে অকারণে কাউকে খুন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। তাই যুবকের কথার উত্তাপ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল সে। শকুনের দৃষ্টিতে ঘরের এ মাথা ও মাথায় নজর বুলাল একবার। তারপর আবার যখন মুখ খুলল, তার ভরাট গলার বয়ান স্পষ্ট শুনতে পেল ঘরের প্রতিটি লোক।

'আমি নিজেকে একজন ভাল ট্র্যাকার বলেই জেনে এসেছি এতদিন। মানুষ, গরু এবং ঘোড়ার ট্র্যাক চিনতে শুরু করেছি হাঁটতে শেখার পরপরই। পাহাড়ি হরিণকে ট্র্যাক করে শিকার করেছি বহুবার। বাদ যায়নি নেকড়ে, কুগারও। সেই আমিই গতকাল রাতে গায়েব হয়ে যাওয়া এতগুলো ঘোড়ার ট্র্যাক আবিষ্কার করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছি। না আমাদের নিজেদের ঘোড়ার, না তথাকথিত রহস্যময় ঘোড়াচোরদের, কারোরই না! কোন্ পথে ওরা এল, শহরসুদ্ধ লোকের সবক'টা ঘোড়া হাতিয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়েই বা গেল কোন্ পথে, তার সামান্যতম চিহ্নও চোখে পড়েনি আমার। যেন জাদুবলে ঘোড়াগুলোকে রাবার দিয়ে মুছে দিয়েছে কেউ দৃশ্যপট থেকে! ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী অশুভ কেউ!'

দম নেয়ার জন্য কথায় খানিকটা বিরতি টানল সে। তারপর বলল, 'তবে আমি বিশ্বাস করি, দক্ষতার শেষবিন্দু বলে কিছু নেই। তাই আমার চেয়েও সেরা ট্র্যাকার থাকা সম্ভব, খুবই সম্ভব। এমনকী এখানে, এই জনাকীর্ণ ঘরের ভিতরেও থাকতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ট্র্যাকার। তাই আমি জানতে চাই, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ, যে দক্ষ ট্র্যাকার হিসেবে সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছ?'

সহসা প্রশ্নটার জবাব মিলল না। ঘরভর্তি লোক ইতিউতি ঘাড় ফেরাতে লাগল। নিজের চেয়ে দক্ষ আরেকজন ট্র্যাকারের খোঁজ করছে সবক'টা অনুসন্ধানী চোখ।

আচমকা স্যালুনের মধ্যখানের টেবিল থেকে কথা বলে উঠল একজন মাঝবয়সী লোক। লোকটার মাথার উপর ঘোলা কাচের একখানা লণ্ঠন ঝুলছে। ঝাপসা আলোয় তার গালের উপর লেপটে থাকা লালচে দাড়িগুলো রীতিমত চকচক করছে। দু'চোখের তারায় বুদ্ধির ঝিলিক, পিছনে একখানা পরিণত মস্তিষ্কের ইঙ্গিত দেয়। চওড়া কাঁধ, পেটানো শরীর। কপালের ডানপাশে পুরানো একটা কাটা দাগ। নিঃসন্দেহে বুনো পশ্চিমের আরেকজন পোড় খাওয়া লড়াকু মানুষ।

'আমি স্যাম টার্লি। পরিচিত মানুষেরা অবশ্য আমাকে "ভালচার" বলে

ডাকে। সবাই বলে আমার দৃষ্টি নাকি ঠিক শকুনের মত, কিছুই নজর এড়ায় না। এ পর্যন্ত যতগুলো আউটফিটে কাজ করেছি, সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, আমার মত ট্র্যাকার ওরা এ জীবনে আর দেখেনি। আর আমি সাধারণত আমার বন্ধুদের কথা বিশ্বাস করি।'

'তোমার বন্ধুদেরকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ, আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না, স্যাম,' হেসে বলল এড স্টার্ক। 'তুমিও যেহেতু অন্য সবার মতই নিজের ঘোড়া হারিয়েছ, তাই আমি ধরে নিলাম, স্বপ্রণোদিত হয়েই তুমি লাপাত্তা হয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোর ট্র্যাক খোঁজার চেষ্টা করেছ। তাই নয় কি?'

'ঠিক তাই,' সায় জানিয়ে মাথা নাড়ল স্যাম টার্লি।

'তো? কী পেলে? এ ব্যাপারে আমাদেরকে তোমার মতামত জানাও, বন্ধু।'

'কিছুই পাইনি। একদম কিছুই না। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও, তোমরা সবাই জানো, এটাই সত্যি। স্যালুন এবং হোটেলের হিচিং রেইল, দুটো জায়গাই আমি অনেকটা সময় নিয়ে পরীক্ষা করেছি। বেশিরভাগ ঘোড়া এ দুটো জায়গাতেই ছিল। তারপর অনুসন্ধান চালিয়েছি স্টেবলে, কোরালে। এমনকী বেড়ার ওপাশের খোলা মাঠটাতেও। চষে বেড়িয়েছি পিছন দিককার সবক'টা ঝোপঝাড়। যদি কোনও গুপ্ত পথের সন্ধান মেলে, এই আশায়। ট্র্যাক খুঁজতে গিয়ে শহরের প্রান্তসীমায় গিয়েও থামিনি আমি, চলে গিয়েছিলাম একেবারে গিরিপথের মুখটা পর্যন্ত। কিন্তু কোথাও কোনও ক্লু খুঁজে পাইনি আমি। নাল পরানো ঘোড়াগুলোর ট্র্যাক, ইণ্ডিয়ান লোকটার নালবিহীন ঘোড়াটার পায়ের ছাপ, নিদেনপক্ষে একটুখানি তাজা ঘোড়ার নাদি, কী না খুঁজেছি আমি সারাটিদিন! কিন্তু সবটুকু পরিশ্রমই জলে গেছে, বিফল হয়েছে আমার সবরকমের খোঁজাখুঁজি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আচমকা সবক'টা ঘোড়ার ডানা গজিয়েছিল। তারপর পক্ষিরাজ হয়ে উড়ে চলে গেছে ওগুলো রাতের অন্ধকারে!'

'ওয়াগনে করে নিয়ে যায়নি তো?' মুচি ছেলেটা বলে উঠল।

'না, সেটা সম্ভব নয়। অতগুলো ঘোড়া নিতে হলে রীতিমত ওয়াগন ট্রেনের বহর লাগবে। মাটিতে ওয়াগনের ভারী চাকার গভীর দাগ বসে যাওয়ার কথা। যদি কেউ সেগুলো মুছে দেয়ার চেষ্টাও করত, তা হলেও প্রচুর চিহ্ন রয়ে যেত, যা থেকে তাদের গমনপথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত। তা ছাড়া প্রচুর শব্দ হবে কাজটা করতে গেলে। কেউ না কেউ অবশ্যই সেটা শুনতে পেত। গোটা শহরের সবক'টা লোক একসাথে মরণ ঘুম ঘুমিয়েছে, এটা রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এল পুরো স্যালুনে। সবার মদের ঘোর কেটে গেছে অনেক আগেই। এতক্ষণে মাথাটাকে পুরোপুরি খাটানোর সুযোগ পেয়েছে সবাই। সারাদিন প্রচণ্ড উত্তেজিত থাকায়, ঠিকঠাক মত ভাবতে পারেনি কেউই।

ঘোড়া নেই, তা হলে নির্ঘাত চুরি হয়েছে ওগুলো, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তরটাকে দিব্যজ্ঞান করে নিজেদের কপাল চাপড়ানো আর

চোরের দলকে অভিসম্পাত করতেই ব্যস্ত ছিল সবাই। তাই যুক্তিগুলো নেড়েচেড়ে দেখার ফুরসত মেলেনি আর।

এখন যতই ভাবছে, ততই নিশ্চিত হচ্ছে, চুরি হয়নি ঘোড়াগুলো। পশ্চিমের পোড় খাওয়া এতগুলো চোখ-কানকে ফাঁকি দেয়া সত্যিই অসম্ভব।

'বিগ ব্ল্যাক! এটাই একমাত্র জবাব,' নীরবতা ভাঙল এড স্টার্ক।

দুই

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, এড। বিগ ব্ল্যাকের ব্যাপারটা খোলসা করে বলো। কীসের কথা যে বলছ, বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই আমাদের,' করুণ গলায় বলে উঠল বারটেণ্ডার, বিলি। বারের কোনায় কনুই রেখে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। স্যালুনের সবাই মদ খাওয়ায় সাময়িক বিরতি টেনেছে, তাই আপাতত কোনও তাড়া নেই তার।

'বলছি, বিলি। তবে কারোরই কোনও ধারণা নেই, কথাটা সত্যি নয়। আমার মত জীবনের বেশিরভাগ বসন্ত পার করে দেয়া বুড়ো কুগারেরা ঠিকই শুনেছে বিগ ব্ল্যাকের কথা। আমি ঠিক বলছি তো?' বলতে-বলতেই ঘরের অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের দিকে তাকাল এড স্টার্ক।

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল প্রায় সবক'জন। খানিকক্ষণ আগের হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলো হাঁড়ির তলার মতই কালো হয়ে আছে এখন। মদের আচ্ছন্নতাকে হটিয়ে দিয়ে এখন সেখানে জায়গা করে নিয়েছে নগ্ন আতঙ্ক। প্রত্যেকেই শুনেছে ওরা বিগ ব্ল্যাকের রোমহর্ষক গল্প। তবে সেটা যে সত্যি হতে পারে, তা কোনওদিন কল্পনাও করেনি কেউ। ঘুমোবার আগে দাদী-নানীদের কাছে শোনা কিস্‌সা কারই বা সকাল বেলা জাগার পর মনে থাকে?

কিংবা বিগত যৌবনের ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে শোনা কাহিনিগুলো?

গরুর শুকনো জার্কির সঙ্গে তেতো কফি, গলা দিয়ে নামতে যা দেরি, গল্পগুলোও ঠিক সেভাবেই বেমালুম গিলে নেয় সবাই। বড়জোর অন্য কোনও ক্যাম্পে অলস সময় কাটানোর জন্য সেগুলো জাবর কাটে। কিন্তু নিজে বিশ্বাস করার ঝামেলায় যায় না কেউ।

আর আজ কি না ভাগ্যের ফেরে তেমনই এক আষাঢ়ে গল্প তাদের সবার জীবনে নিদারুণ বাস্তব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে!

শান্ত গলায় আবার কথা বলতে শুরু করল এড স্টার্ক। বলা বাহুল্য, ঘরের সবক'টা চোখ একযোগে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, সবক'টা কান পূর্ণ সজাগ। একটি শব্দ থেকেও বঞ্চিত হতে চায় না কেউ।

'বিগ ব্ল্যাকের কথা আমি প্রথম জানতে পারি আমার দাদার কাছে। তবে তিনি আমার আপন দাদা নন, বাবার চাচা। যৌবনে যিনি গোটা পশ্চিম টহল দিয়ে

বেড়িয়েছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে টুইন ফলসে একখানা বাথান গড়ে থিতু হয়েছিলেন। ভাল মানুষ ছিলেন, সহজেই সবার সাথে মিশে যেতে পারতেন। তাই স্বভাবতই তাঁর গল্পের ঝুলিটাও ছিল অনেক বিশাল। আর সেই ঝুলির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গল্পটাই ছিল বিগ ব্ল্যাকের। তবে এখন আমি জানি, ওটা নিছক কোনও গল্প ছিল না।

'শত বছরের পুরনো এই আতঙ্কের শুরুটা হয়েছিল পাইন ল্যাণ্ডের গোল্ডেন ক্রীকে। সেখানেই এক বক্স ক্যানিয়নে বসবাস করত একজন সাদাসিধে লোক। জীবন-জীবিকার তাগিদে যে গড়ে তুলেছিল ছোট্ট একটা ঘোড়ার খামার।

'বুনো ঘোড়া ধরে এনে পোষ মানিয়ে বিক্রি করত লোকটা। ভালই চলছিল দিনকাল। তবে আচমকা এক দুর্ঘটনায় ডান পায়ে আঘাত পায় সে।

'আধা-পঙ্গু হয়ে যাবার পর বুনো ঘোড়ার পিছু ধাওয়া করাটা তার জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। হুমকির মুখে পড়ে তার পরিবারের অন্ন-বস্ত্রের জোগান। কিন্তু জীবনে ঘোড়ার কাজ ছাড়া আর কিছু শেখেনি সে, তা ছাড়া একজন পঙ্গু লোককে কাজই বা দেবে কে?

'তাই ঘোড়া ধরার বদলে ব্রিডিং করে বিক্রির কথা ভাবে সে। ব্রিডিং-এর জন্য বহুকষ্টে ধারদেনা করে টাকা-পয়সা জোগাড় করে। তারপর কিনে আনে বিশালাকার এক স্ট্যালিয়ন! তার জীবদ্দশায় এত বিশাল আর শক্তিশালী ঘোড়া সে দেখেনি আর। কালো রঙের সেই ঘোড়াটাকেই আদর করে নাম দিয়েছিল সে, বিগ ব্ল্যাক!

'বিগকে নিজের সন্তানের মতই ভালবেসেছিল লোকটা। আর সেটা বুঝতে বিগেরও খুব একটা সময় লাগেনি। মালিককে সেই ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়েছিল সে বহুগুণে। মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়, পশু-পাখিরা নয়।

'এক পড়ন্ত বিকেলে মরুঝড়ের মতই খামারে হানা দেয় আউট-ল বেলিশ আর তার দলবল। বিগের চোখের সামনেই ওরা খুন করে তার মালিককে। উপর্যুপরি ধর্ষণের পর ঘরের বউটাকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় তার স্বামীর কাছে, পরপারে।

'লুণ্ঠনের পর জ্বালিয়ে দেয়া হয় গোটা খামার। খামারে থাকা সবগুলো ঘোড়াকেই তস্করের দল দখল করে নিয়েছিল। শুধু একটা ঘোড়াকে কিছুতেই বাগে আনতে পারেনি ওরা, বিগ ব্ল্যাক।

'কাউকেই সেই বিকেলে তার পিঠে চড়তে দেয়নি বিগ। জোর করে চড়তে গিয়ে তৎক্ষণাৎ অক্কা পায় বেলিশের দুই স্যাঙাৎ। একজনকে পিঠ থেকে আছড়ে মারে বিগ, আরেকজন মারা যায় পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে। স্বভাবতই বিগের উপর প্রচণ্ড রেগে যায় বেলিশ।

'সবাই মিলে ল্যাসোর ফাঁসে কাবু করে ফেলে তাকে। তারপর চার পা বেঁধে মাটিতে ফেলে দেয়া হয় তাকে। জীবন্তই ছিলে নেয়া হয় বিগের গায়ের চামড়া!

'ছাল ছাড়ানো বিগের তীব্র আর্তনাদও এতটুকু মন গলাতে পারেনি

বেলিশের। উল্টো তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে বিগের সারা শরীরে। জীবন্ত দগ্ধ হতে-হতে সীমাহীন কষ্ট পেয়ে মারা যায় বিগ ব্ল্যাক।

'জ্বলন্ত খামারটাকে ঠিক সেভাবেই ফেলে রেখে দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ে বেলিশের দলবল। কাছের পাইন ল্যাণ্ড শহরের স্যালুনটা হাতছানি দিয়ে ডাকছিল ওদের। এত পরিশ্রমের একটা অভিযান শেষে খানিকটা গলা না ভেজালে চলবে কেন!

'বেলিশের দলের সাথে তখন একজন বন্দি ছিল। যাকে মোটা মুক্তিপণের বিনিময়ে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। খামারের কাহিনিটা পরবর্তীতে ওই লোকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিল সবাই।

'এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় মারা যায় বেলিশ এবং তার দলের বাকি সবাই। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ওরা। পকেটের মালপানি ফুরিয়ে আসায় নতুন ধান্ধার ফিকিরে শহর ছাড়ছিল ওরা সেদিন।

'শহরের সীমান্ত পেরোবার পরপরই বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছিল গোটা দলটা! আর কোনওদিন কেউ তাদেরকে খুঁজে পায়নি।

'শহরের এক ভবঘুরে সেদিন দাবি করেছিল, পর্বতের মত বিশাল এক ঘোড়াকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছে সে! ভয়ঙ্কর গর্জন করে চোখের পলকে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বেলিশের দলের উপর। তারপরই ধুলোয় মিশে গিয়েছিল দলের সবক'টা মানুষ, সবক'টা ঘোড়া!

'অবশ্য সেই ভবঘুরের কথা সেদিন কেউ বিশ্বাস করেনি। উল্টো মাত্রাতিরিক্ত মদ গেলার জন্য অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছে তাকে। খড়ের গাদায় শুয়েও যে লোক মদের বোতল আঁকড়ে ধরে রাখে, তার কথা কে বিশ্বাস করবে?

'তবে তারপর থেকেই শুরু হয় বিগ ব্ল্যাকের একের পর এক হামলা। কিংবা বলা ভাল, প্রতিশোধ।

'তার আক্রমণের প্যাটার্নটা অদ্ভুত। প্রথমেই সে শহরের সমস্ত ঘোড়া গায়েব করে দেয়, যেমনটা আমাদের এখানে ঘটেছে। এটা সে করে শহরের বাসিন্দাদেরকে আটকে ফেলার জন্য, নাকি মানুষের কবল থেকে ঘোড়াদের মুক্তি দেয়ার জন্য, এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

'তবে বেশিরভাগ সময়ই সে হামলার জন্য বেছে নেয় এমন কোনও শহর, যেখানে ঢুকবার কিংবা যেখান থেকে বেরোবার পথ কেবল একটাই! সম্ভবত লোকজনের পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতেই তার এহেন আয়োজন।

'ঘোড়া গায়েব করে দেয়ার পর থেকেই শুরু হয় মূল হামলা। শহরের সবক'টা জীবন্ত প্রাণীকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত সে কোনওক্রমেই শান্ত হয় না। তার অভিযান শেষে, শহরের ইট-পাথরের ইমারতগুলোই কেবল দাঁড়িয়ে থাকে বোবা সাক্ষী হয়ে। সীমান্তের বেশ কয়েকটা শহর ঠিক এভাবেই রাতারাতি ফাঁকা হয়ে গেছে। কয়েক দশক আগে, গোটা পশ্চিমে এটাই ছিল সবচেয়ে মুখরোচক কাহিনি। কালের আবর্তে ফিকে হয়ে যাওয়া বিগ ব্ল্যাক আবার ফিরে এসেছে তার উপস্থিতি জানান দিতে। আর সেজন্য সে বেছে নিয়েছে

আমাদের শহর ফগসিটিকে!'

এডের কথা থামতেই নিজেদের আসনে নড়েচড়ে বসল শ্রোতারা। শুরু হলো মৃদু গুঞ্জন। বিগ ব্ল্যাকের কাহিনি যাদের জানা ছিল না, ভুতুড়ে শহরের ব্যাপারে তারাও ওয়াকিবহাল। বেশ কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শহর গত শতাব্দীতে রাতারাতি জনশূন্য হয়ে গেছে। আজতক এই রহস্যের কোনও কূলকিনারা করতে পারেনি কেউ। সত্যি কি বিগ ব্ল্যাকই এর জন্য দায়ী?

'আমার কিছু বলার ছিল, এড,' বলতে-বলতে অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল এক তরুণ।

বিনু।

গাত্রবর্ণ, চেহারা, কথাবার্তা ইণ্ডিয়ানদের মত, তবে পোশাক-আশাকে পুরোদস্তুর শ্বেতাঙ্গ সে।

আদতে সে একজন ইণ্ডিয়ানই। তবে তুচ্ছ কারণে নিজের দল থেকে বিতাড়িত হবার পর আর কখনও বুনো জীবনে ফিরে যায়নি ও। ফগসিটিকে আপন করে নিয়েছে। তাই তার আচরণ এখন পুরোপুরি দো-আঁশলাদের মত।

'তোমার প্রতিটি কথা অক্ষরে-অক্ষরে ঠিক, সিনর। দেবতা আনুমার কসম, তোমার পক্ষে নিজের স্যাডলটা পর্যন্ত বাজি ধরতে প্রস্তুত আমি। তবে আমরা তোমাদের এই বিগ ব্ল্যাককে ডাকি "মাকানো" নামে।'

'মাকানো?'

'হ্যাঁ, সিনর। অন্ধকার জগতের উড়ুক্কু প্রেত। আমাদের সবচেয়ে সেরা পনিটার দু'পাশে পাহাড়ের সবচেয়ে বড় বাদুড়টার ডানা লাগালে যেমন লাগবে, মাকানো দেখতে অবিকল সেরকম। ডানাগুলো এত বড় যে, দিনের বেলায় অনায়াসে সূর্য দেবতাকে ঢেকে দিতে পারে। রাতের বেলায় চন্দ্র দেবতাও তার পাখার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

'মাকানোর গর্জন এত ভয়ঙ্কর যে, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ক্রীকের সমস্ত জল সে ফাটল দিয়ে পাতালে নেমে যায়, সিনর। বাচ্চারা সে গর্জন শুনতে পেলে বধির হয়ে যায় পুরোপুরি।

'মাকানোর নিঃশ্বাসের সাথে লাল আগুন বেরোয়। পুড়িয়ে দেয় ওক-পাইনের বন, সেজব্রাশের ঝোপ, এমনকী পাথুরে বোল্ডার পর্যন্ত।

'রেগে গেলে গোটা পাহাড়ও জ্বালিয়ে দিতে পারে মাকানো। এমনই লেখা আছে আমাদের পুঁথিতে। চাঁদনী রাতে সুর করে এই কাহিনি পড়তে পারে বড় ওঝা, জিবালো।

'প্রতিটা পনির মালিকানা বদলের সময় মাকানোর নামে পুজো দেয় সে। মাকানোর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। বন থেকে ঘোড়া ধরে আনলেও তার বদলে বলি দেয়া হয় সেজ মুরগি। নয়তো রেগে যেতে পারে মাকানো।'

একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল বিনু, 'পাহাড়ের ভিতরকার গুহাগুলোতে কখনও গিয়েছ, সিনর?'

না বোধক মাথা নাড়ল এড স্টার্ক।

তবে এক বুড়ো নেকড়ে শিকারি জানাল সে গেছে। নেকড়ের চামড়ার জন্য দিনের পর দিন ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। সে সময়টায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই গুহাগুলোতেই আশ্রয় নিতে হত তাকে।

'দেয়ালে আঁকা ছবিগুলো দেখেছ, সিনর?' তাকে জিজ্ঞেস করল বিনু।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে, মাথা দোলাল সে, দেখেছে। 'ওগুলো চিরকালই আমাকে অবাক করেছে, বিনু। এত অদ্ভুত। এত ভয়ঙ্কর!'

'হুম। আমাদের পূর্বপুরুষেরাই এঁকেছে ওগুলো।

'ডানাওয়ালা মাকানোর চারপাশে আগুনের বৃত্তের ছবি।

'একপাল উড়ুক্কু ঘোড়াকে মাকানোর নেতৃত্ব দেয়ার ছবি।

'মাকানোর নিঃশ্বাসের আগুনের হল্কায় পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া প্রাচীন শহরের ছবি।

'ঘোড়ার পালের পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়া মানুষের ছবি।

'সবই প্রমাণ করে, মাকানো শাশ্বত। শতভাগ বাস্তব!'

বক্তব্য শেষে আবারও নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল বিনু। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে সে।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বিনু। তবে আমি নিশ্চিত নই, মাকানো এবং আমাদের বিগ ব্ল্যাক আদতে একই প্রেত কি না। যেহেতু মাকানোর ব্যাপারে তুমি ছাড়া আমাদের আর কারও কিছুই জানা নেই। তবে আমরা যে ভীষণ রকমের ফ্যাসাদে পড়েছি, এতে কোনও সন্দেহই নেই।

'যা হোক, বিগ ব্ল্যাকের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সেটা হলো, অকারণে কোনও শহর আক্রমণ করেছে বিগ, এমন কোনও নজির নেই। সে অতীতে শুধু তখনই কোনও শহরে হামলা করেছে, যখন সে শহরের কোনও বাসিন্দা তার ঘোড়াকে ভয়ানক কষ্ট দিয়েছে!

'আমি জানতে চাই, তোমাদের মধ্যে কেউ কি সেটা করেছ? যদি সত্যি স্বীকার করে নাও, তা হলে তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কারোরই কোনও অভিযোগ থাকবে না।' কথা শেষ করল এড।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শুধু নীরবে একে অপরের চেহারার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আচমকা রঙজ্বলা কোট পরা একজন পাঞ্চার উঠে দাঁড়াল! তার সারা শরীরে আধ-ইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ। নিজেকে সাফসুতরো করার ফুরসত পায়নি সে, কিংবা করার প্রয়োজন বোধ করেনি।

'আমি। আমিই সেই অপরাধী, এড,' কম্পিত গলায় শুরু করল পাঞ্চার। 'উপত্যকাটা পেরিয়ে আসার পরপরই আমার ঘোড়াটা হঠাৎ খোঁড়া হয়ে গেল। তুমি জানো, জায়গাটা শহর থেকে আধ-মাইলের মতন দূরে।

'খোঁড়া হবার পরও আমি ওটাকে জোর করে হাঁটতে বাধ্য করছিলাম। মুখে ফেনা চলে এসেছিল ওটার। আমি দিব্যি বুঝতে পারছিলাম, আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই ওটার। তারপরও আমি হাল ছাড়িনি। সত্যি বলতে হেঁটে শহরে আসার

এতটুকু ইচ্ছেও ছিল না আমার।

'কিছুক্ষণ পর ঘোড়াটা হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যেহেতু তখনও আমি ওটার পিঠেই বসে ছিলাম, তাই মাটিতে আছড়ে পড়ে খানিকটা ব্যথা পাই আমি।

'প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলাম ওটার উপরে। মাথার ঠিক ছিল না আমার। স্পার পরা পা দিয়েই কষে দুটো লাথি বসিয়ে দিয়েছিলাম ওটার পাঁজরে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠেছিল ওটা, কারণ তখনও পুরোপুরি মরেনি।

'আরও বেশি কষ্ট পেয়ে মরার জন্য ওটাকে রোদের মধ্যে সেখানেই ফেলে এসেছি আমি। অথচ চাইলেই একটা গুলি করে ওটার মরণ যন্ত্রণা কিছুটা কমাতে পারতাম। তা না করে, ধুঁকে-ধুঁকে মরার জন্য ফেলে এসেছি ওটাকে।

'আমিই সেই পাষণ্ড, যে তোমাদের সবার সর্বনাশ ডেকে এনেছে,' বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল লোকটা।

কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল স্যালুনের ভিতরে। যেন কোনও জাদুমন্ত্রবলে সহসা ঘরের প্রতিটি মানুষ পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

আচমকা জানালায় কীসের গাঢ় ছায়া নড়তে দেখে সশব্দে আঁতকে উঠল বারটেণ্ডার বিলি। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গোটা স্যালুনে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেউ-কেউ।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, পুরানো জাম গাছটার একটা ঝুপড়ি ডালের ছায়া ছিল ওটা। জোর বাতাস পেয়ে নড়ে উঠেছে।

তবুও লোকজনের ভয় গেল না। একাকী বাইরে বেরুনোর সাহস হলো না আর কারও। কয়েকজনের ছোট-ছোট দল করে সে রাতে ঘরে ফিরল সবাই।

তিন

পরবর্তী দুঃসংবাদটা এল পরদিন প্রত্যূষে। শহরের শেষপ্রান্তের প্লেজার হাউসের মেয়েগুলো উধাও হয়ে গেছে! জামা, জুতো, আলতা, চুড়ি সবই আছে বহাল তবিয়তে, শুধু মেয়েরা নেই।

রোজকার রুটিন মোতাবেক ভোর-বেলাতেই নাস্তা সারতে আসার কথা তাদের। শহরের একমাত্র ক্যাফে, ম্যাক হল-এই খাবার খায় সবাই। সারারাতের ধকল শেষে সকাল-সকাল আহার সেরেই সাধারণত ঘুমোতে যায় ওরা। কিন্তু আজ ওদের রোজকার রুটিনের ব্যত্যয় ঘটেছে। সূর্যের প্রথম কিরণের সঙ্গী হয়ে ক্যাফে হলে যায়নি ওরা। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ নিতে গিয়েছিল ক্যাফে মালিক, রবার্ট গ্রিন। তখনই নিদারুণ সত্যটা আবিষ্কার করে সে। চিৎকার-চেঁচামেচি করে গোটা শহরের সবার ঘুম ভাঙাতে খুব একটা বেশি সময় নেয়নি সে। যদিও অন্যান্য রাতের চেয়ে খানিকটা দেরি করেই ঘুমোতে গিয়েছিল শহরবাসী, তবুও

রবার্টের প্রথম চিৎকার কানে যেতেই ধড়মড় করে বিছানা ছেড়েছে সবাই। নতুন বিপদ হাজির হয়েছে, এটা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি কাউকে। কিছু পাওয়া যাবে না, জানা থাকা সত্ত্বেও প্লেজার হাউসের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন-তন্ন করে খুঁজল সবাই। কাজের কাজ অবশ্য হলো না কিছুই। হতভাগা মেয়েগুলোর ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছে, সেটা বুঝতে পারার মত কোনও ক্লু-ই মিলল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খোঁজাখুঁজির পর্ব সাঙ্গ হলো। ঘটনার নেপথ্যের কারণটা প্রায় সবার জানা থাকা সত্ত্বেও, কেউ এ নিয়ে একটা কথাও বলল না।

ফগসিটির অন্য যে কারও চেয়ে বেশি মন খারাপ হলো এড স্টার্কের। প্লেজার হাউসের মালিক, মাদাম কুরির সঙ্গে তার সম্পর্কটা অন্যরকম ছিল। অনেক গভীর।

শহরের সবাই জানে, এড স্টার্ক কখনও বেশ্যাদেরকে ছুঁয়েও দেখে না, তবুও রোজ সন্ধ্যায় নিয়ম করে ঠিকই প্লেজার হাউসে যায়!

কীসের জন্য?

এক পেগ হুইস্কি গিলতে-গিলতে মাদাম কুরির সঙ্গে খানিকটা সময় কাটানোর জন্য।

জীবনে চলার পথে কখনও কোনও ঘাটে নোঙর ফেলেনি এড স্টার্ক। তাই একেই ভালবাসা বলে কি না, সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি সে। তবে মাদাম কুরির প্রতি সে যা অনুভব করত, সেটা এযাবৎকালে অন্য কোনও মেয়ের প্রতি অনুভব করেনি। এটা বুকে হাত রেখেই বলতে পারবে এড।

তাকে এক সন্ধ্যায় না দেখলে দিনটাই বৃথা লাগত এডের কাছে। মনটা অকারণেই ভার হয়ে থাকত।

সেই মানুষটাকে আর কক্ষণো চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পারবে না সে, এটা ভাবতেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল এড স্টার্কের। অন্য কেউ শুনতে না পেলেও, প্লেজার হাউসের প্রতিটি বোবা দেয়াল ঠিক-ঠিক শুনতে পেল তার হৃদয়ের আহাজারি।

সবার অলক্ষে মাদাম কুরির একখানা রুমাল তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিল সে। ওতে লেগে আছে তার প্রেয়সীর গন্ধ। প্রাপ্তির খাতায় আপাতত না হয় এটুকুই তোলা থাকুক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, কেবল প্লেজার হাউসের দেহপসারিণীরাই নয়, হারিয়ে গেছে দু'জন খদ্দেরও! দুই যুবা পুরুষ।

যারা গতকাল রাতে বিগ ব্ল্যাকের কাহিনিটাকে গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। বাকি সবাই আতঙ্কে জবুথুবু হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেও, এ দু'জন যায়নি। বরঞ্চ অন্যান্য দিনের মতই খানিকটা মনোরঞ্জনের লোভে রওনা দিয়েছিল প্লেজার হাউসের উদ্দেশে। তাদের শিরায়-শিরায় তারুণ্যের উষ্ণ রক্তের অবাধ বিচরণ। ভয়-ডরকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিতে আর কী চাই?

ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল শহরের বাতাস। মৃত্যুভয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিমতম আতঙ্কের নাম। বজ্রকঠিন মানুষকেও নিমিষেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সেটাই এখন তাড়া করে ফিরছে ফগসিটিবাসীকে।

স্যালুনের পোর্চেই জটলা করছে শহরের বেশিরভাগ বাসিন্দা। বাকিদের কেউ-কেউ হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে রাস্তার ধারের বোর্ডওয়কে। কেউ বা আবার হিচিং রেইলের খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখেই শূন্য দৃষ্টি। চরম অসহায় লাগছে একগাদা শক্ত-সমর্থ মানুষকে।

আস্তাবলের সামনের ওয়টর বাকেটগুলো খালি। আজ তাতে জল ভরার কথা বেমালুম ভুলে গেছে হসলার। কী-ই বা হবে নিত্যদিনকার মত কাজকর্ম করে? তাদের আয়ু আর কতটুকুই বা বাকি আছে? গোটা শহরটাই তাই আজ স্থবির হয়ে আছে। কেউই যায়নি নিজের কাজে।

কয়েকজন অবশ্য ক্যাফেতে গিয়েছিল পেটপুজো করতে। তাদের ভাগ্যে জুটেছে গতকালের বেঁচে যাওয়া বাসি খাবার। নতুন খাবার রাঁধবে কে?

বেশিরভাগই অবশ্য ক্যাফের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি। মাথার উপর মরণ-সমন নিয়ে খাবারের রুচি থাকে? অনাগত পরিণতির আশংকা তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে। প্রতিটি করুণ মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছায়া।

ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠল সমবেত জনতা। নিজের মৃত্যুর জন্য নির্বিকারচিত্তে অপেক্ষা করাটা অন্তত পশ্চিমের মানুষের ধাতে নেই। তাই কিছু একটা করার জন্য রীতিমত মরিয়া হয়ে উঠল সবাই।

নিজের অজান্তেই এড স্টার্ককে ঘিরে ধরল সবাই। সে তখন বড় একখানা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একের পর এক সিগারেট ফুঁকে চলেছে।

'আমাদের বাঁচার কি কোনও আশাই নেই, এড?' সবার মনের কথাটা সর্বপ্রথম বেনের মুখ দিয়েই বেরোল। বেন জিগার, শহরের একমাত্র জেনারেল স্টোরটার মালিক।

অন্যান্য দিন এ সময়টায় বিকিকিনি নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। আজ দোকানের ঝাঁপ তোলারও প্রয়োজন বোধ করেনি সে।

জবাব দেবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষমাণ মুখগুলো ভাল করে দেখল এড স্টার্ক। প্রত্যেকেরই প্রত্যাশা, কিছু আশার বাণী হয়তো শোনাতে পারবে সে।

কিন্তু ওদের জানা নেই, এড স্টার্ক নিজে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে নিয়তির কাছে। কারণ তার জানা আছে, পালাবার সত্যিই কোনও পথ নেই।

তবে এতগুলো মানুষকে এখনই পুরোপুরি নিরাশ করতে মন সায় দিল না তার। কে জানে, পাগলামি করতে-করতে হয়তো নিজেরাই দাঙ্গা বাধিয়ে বসবে আহাম্মকগুলো!

'একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের বাঁচাতে পারেন, বেন,' নাটকীয় গলায় বলল সে।

'হায়, ঈশ্বর,' আক্ষেপ ঝরে পড়ল টরিসের কণ্ঠে। 'তিনি কেন আমাদেরকে বাঁচাতে যাবেন!'

'একথা কেন বলছ, টরিস?'

'এতগুলো বছর আমরা কেউ তাঁকে ডেকেছি কখনও? তোমাদের খবর জানি

না, তবে আমি নিজে কোনওদিন চার্চের চৌকাঠও মাড়াইনি। আজ আচমকা তাঁকে ডাকতে গেলে, তিনি কেন শুনবেন আমাদের ডাক, এড?'

'হয়তো শুনবেন। হয়তো শুনবেন না। আমাদের অন্তত চেষ্টা করে দেখা উচিত। কোনও দৈববলের সাহায্য চাওয়া ছাড়া আমাদের জন্য আর কোনও পথ খোলা নেই, টরিস। এখন একমাত্র কায়মনোবাক্যের প্রার্থনাই পারে আমাদেরকে মুক্তি দিতে, অবশ্য যদি ঈশ্বর আমাদের ডাকে সাড়া দেন আরকী।'

অপ্রকৃতিস্থের মত খানিকক্ষণ হাসল টরিস। 'তোমার কথা যদি মেনেও নিই, প্রার্থনাটা করবে কোথায় শুনি? এই হতচ্ছাড়া শহরে কোনও গির্জা আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।'

চমকে উঠল এড স্টার্ক। ঠিকই বলেছে টরিস। চার্চ তো দূরের কথা, ছোট্ট একখানা প্রার্থনার ঘর পর্যন্ত নেই এখানে। কেউ বানাবার প্রয়োজনই বোধ করেনি।

প্রতিটা মুহূর্ত জীবনকে উপভোগ করায় মত্ত ছিল এখানকার লোকজন, ঈশ্বরকে স্মরণ করার সুযোগ কোথায়? আজ ভয়ানক অতিপ্রাকৃত শক্তির মুখোমুখি হতে হবে বলেই কেবল ইষ্টনাম জপ করতে রাজি হয়েছে ওরা। ডুয়েল লড়ার সুযোগ থাকলে, প্রার্থনার বদলে পিস্তলে কার্তুজ ভরতেই যে ব্যস্ত থাকত বেশিরভাগ লোক, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

'স্যালুনে,' আচমকা বলে উঠল এড স্টার্ক। 'স্যালুনেই করব আমরা প্রার্থনা! যে জায়গাটা এতদিন পাপাচারের জন্য ব্যবহার করেছি, সেখানেই না হয় খোলা হোক পুণ্যের খাতাটা।'

হো-হো করে হেসে উঠল বেশ কয়েকজন লোক। অন্যরাও নড়েচড়ে দাঁড়াল।

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু পাদ্রী পাব কোথায় আমরা? প্রথম জীবনে রেভারেণ্ড ছিলে, এটা আবার দাবি করে বোসো না যেন, বাপু। বিশ্বাস করব না।' টমের একথায় না হেসে পারল না কেউ। এড নিজেও হাসল। নিমিষেই কেটে গেল পরিস্থিতির গুমট ভাবটা।

'যার-যার প্রার্থনা সে নিজেই করবে, টিম। কোনও ফাদার লাগবে না আমাদের। নিজের মনের খবর নিজের চেয়ে বেশি আর কে-ই বা জানে, শুনি?'

এডের এই কথার প্রতিবাদ করল না কেউ। কয়েকজন কেবল পায়ের ভার বদল করে দাঁড়াল।

'চলো তা হলে। কাজটা এখনই সেরে ফেলি। শুভ কাজে দেরি করতে নেই,' তাড়া দিল এড স্টার্ক।

সবাইকে একরকম রাখালের মত খেদিয়েই স্যালুনে ঢোকাল সে। জনাকয়েক ঘড়েল লোক খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করলেও শেষতক পেরে উঠল না এডের সঙ্গে। সবশেষে যখন ব্যাটউইং ডোর ঠেলে স্যালুনে ঢুকল এড, শহরের সবক'টা লোককেই দেখতে পেল সে আবছা অন্ধকারে।

চেয়ার-টেবিলগুলো একধারে সরিয়ে রেখে, মাঝখানটায় গাদাগাদি করে দাঁড়াল সবাই। মেহগনি বারের উপর ঘরের একমাত্র লণ্ঠনটা ঢিমেতালে জ্বলছে তখন। স্যালুনের দুটো জানালাই বন্ধ থাকায়, পুরো ঘরটা আলোকিত করার দায়িত্বটা লণ্ঠনটার উপরই বর্তেছে। এবং কাজটায় শতভাগ ব্যর্থ হয়েছে ওটা!

স্যালুন মালিক টিম, প্রার্থনা বিষয়ক ছোট একটা বক্তৃতা দিল সবার উদ্দেশে শৈশবে মায়ের হাত আঁকড়ে বারদুয়েক চার্চে পা রেখেছে সে। নিয়ম-কানুনগুলো আবছা-আবছা এখনও কিছুটা মনে আছে তার। সেই আলোকেই যতটা সম্ভব উপস্থিত জনতাকে বুঝিয়ে বলল সে।

বয়ান শেষে তার ইঙ্গিত পেতেই একযোগে চোখ মুদল ফগসিটিবাসী। এই অপয়া শহরে প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের আরাধনা হচ্ছে!

স্যালুনকে প্রার্থনাকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করার নজিরও সেটাই প্রথম। পশ্চিমে এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি।

সবক'জনার চোখ বন্ধ থাকায় ওরা কেউ জানতে পারল না, স্যালুনের পিছন দিককার জানালাটা আচমকা খানিকটা খুলে গেছে! আর সেখান দিয়ে ওদেরকে লক্ষ করছে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই গনগনে কয়েক জোড়া চোখ!

চার

'ওরা চলে যাচ্ছে, এড,' হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে-আসতে বলল বিলি।

'কারা?'

'গর্ডন ব্রাদার্স। ওরা বলছে, এখানে থেকে মরতে চায় না। পায়ে হেঁটেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায় ওরা।'

'কিন্তু গিরিপথটা ওরা পেরোতে পারবে না কিছুতেই। ওদেরকে পেরোতে দেবে না বিগ ব্ল্যাক।'

'আমার মাথা কাজ করছে না, এড। তুমি চলো। দেখো, ওদেরকে ফেরানো যায় কি না।'

'চলো তা হলে। কথা বলে দেখি।'

বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এড। পিস্তল দুটো টেবিল থেকে তুলে কোমরের খাপে ভরে নিল। বিলি আসার আগে হোটেলের লবিতে বসে ওগুলোই পরিষ্কার করছিল সে।

স্যালুনের চত্বরে ততক্ষণে বহু লোকজন জমে গেছে। বলা বাহুল্য, ভিড়ের মধ্যমণি হয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে গর্ডন ব্রাদার্স।

ন্যাট গর্ডন এবং প্যাট গর্ডন, দুই ভাই। এখানে আসার আগে আরভিনের ডাকাত দলের সদস্য ছিল দু'জনেই। বয়সে ছোট ভাইয়ের চেয়ে বছর চারেকের

বড় ন্যাট।

দু'জনের কাঁধেই বেডরোল দেখতে পেল এড স্টার্ক। ঠাট্টা করেনি ছেলে দুটো, সত্যিই শহর ছাড়তে চলেছে।

'কেন পাগলামি করছ, বাছা?' দু'হাতে ভিড় ঠেলে এগোতে-এগোতে বলল সে।

আরেকটু এগোতেই ঘুরে তার মুখোমুখি হলো দু'ভাই। ন্যাটই প্রথম মুখ খুলল, 'আমাদের বাধা দেয়ার বৃথা চেষ্টা কোরো না, এড। এখানে আটকে থেকে খাঁচার ইঁদুর হবার ইচ্ছে নেই আমাদের মোটেও। ঘোড়া ছাড়াই পাহাড় ডিঙাতে পারব আমরা। দু'জনেই মনেপ্রাণে সেটা বিশ্বাস করি।'

মাথা নেড়ে ভাইয়ের কথায় সমর্থন জানাল প্যাট গর্ডন। সবাই জানে, একান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলে না সে। বেশিরভাগ সময় একা থাকতেই পছন্দ করে।

'তোমাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, ঠিক এই মুহূর্তে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছনো সত্যিই অসম্ভব। বিগ কিছুতেই গিরিপথটা পেরোতে দেবে না তোমাদেরকে। তারচেয়ে বরঞ্চ আমাদের সাথেই থেকে যাও, বাছা। মরি কিংবা বাঁচি, একসাথেই না হয় থাকলাম শেষ অবধি।'

'তুমি বুড়িয়ে গেছ, এড। সাহস কাকে বলে ভুলেই গেছ তুমি, আদৌ যদি কোনওকালে ওটা থেকে থাকে তোমার,' তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বলল ন্যাট গর্ডন। 'কিন্তু আমাদের সেটা যথেষ্টই আছে। চাইলে সবাইকে খানিকটা করে ধারও দিতে পারি। তোমাদের মত অথর্ব হয়ে যাইনি এখনও, যে অযথাই প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলব।'

'তাই বুঝি?' নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞেস করল এড স্টার্ক।

'ঠিক তাই,' দাঁত কেলিয়ে জবাব দিল ন্যাট। 'তুমি বরং স্যালুনে গিয়ে বোতল-বোতল মদ গেলো আর বোকার দলকে আরও গোটা কয়েক রূপকথা শোনাও। সত্যি বলছি, তোমার গল্পের জবাব নেই।'

দু'ভাই গলা মিলিয়ে হেসে উঠল। উপস্থিত আর কেউ অবশ্য তাদের হাসিতে যোগ দিল না।

নিজের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এড স্টার্ক। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না তার।

এডের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া না পেয়ে খানিকটা হতাশই হলো গর্ডন ভাইয়েরা। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে জনতার দিকে ফিরল ওরা।

আবার যখন মুখ খুলল ন্যাট গর্ডন, তার কণ্ঠের উপহাসের সুরটা আরও খানিকটা চড়ে গেছে তখন। 'ফিরছি আমরা খুব তাড়াতাড়িই। খালি হাতে নয়, তোমাদের জন্য ঘোড়ার পাল নিয়ে। তবে সেগুলো কেনার জন্য চড়া দাম চুকাতে হবে তোমাদের। এ কয়দিনে মদ গিলে সব পয়সা উড়িয়ে ফেললে আমাদের কিছুটি করার থাকবে না বলে দিলাম। নগদ পয়সা ছাড়া আমাদের সামনে হাজির হলে, ঘোড়া দূরে থাক, ঘোড়ার নাদিও জুটবে না কারও কপালে। অবশ্য

আমাদের পা ধরে কান্নাকাটি করলে ভিন্ন কথা।'

পাগলের মত আবারও খানিকক্ষণ হাসল দু'ভাই। তারপর দৃঢ়পায়ে শহ থেকে বেরোবার রাস্তাটা ধরতে হাঁটতে শুরু করল।

শান্ত গলায় ওদেরকে শুভ কামনা জানাল এড স্টার্ক।

এর জবাবও নোংরা হাসি দিয়েই দিল গর্ডন ব্রাদার্স।

যে যার জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে রইল শহরবাসী। দুই ভাইয়ের পিঠের উপ সেঁটে রয়েছে সবার দৃষ্টি।

দেখতে-দেখতে গিরিপথের মুখটাতে পৌঁছে গেল ওরা। তারপর চট ক পিছন ফিরে বারদুয়েক চোখ টিপে দিল ন্যাট! তারপর সবার চোখের সামনে ধীরে-সুস্থে কালো গহ্বরটাতে ঢুকে পড়ল গর্ডন ব্রাদার্স। এক চিলতে অন্ধকা যেন হাঁ করে গিলে নিল দুই ভাইকে।

বেশ কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না।

শহরবাসী যখন সবে ভাবতে শুরু করেছে, নিরাপদেই হয়তো পথটা পেরি যেতে পারবে ওরা, ঠিক তখনই দূরাগত মেঘের গর্জনের মত অদ্ভুত একটা শ কানে এল সবার। পরক্ষণেই ভেসে এল দুটো রোমহর্ষক আর্তচিৎকার!

কাদের বুক চিরে বেরোচ্ছে এই অন্তিম আর্তনাদ, সেটা বুঝতে বাকি রইল ন কারও। নিজের অজান্তেই পড়িমরি করে ছুট লাগাল সবাই। এক মুহূর্ত আ ওখানটায় দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না ওদের। কে কার আগে ঘরে পৌঁছ তারই প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন সবাই।

চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা।

ততক্ষণে অবশ্য থেমে গেছে গর্ডন ভাইদের গগনবিদারী আহাজারি।

পাঁচ

ফগসিটিতে সন্ধ্যা নামল মৃত্যুর গন্ধ সঙ্গে নিয়ে। বড্ড নিরানন্দ সে সন্ধ্যা, বড গুমট।

প্রাণোচ্ছল এক দঙ্গল মানুষ একদিনের ব্যবধানে জিন্দালাশের দলে পরিণ হয়েছে যেন! প্রত্যেকেই বিমর্ষ, হতাশ। পারতপক্ষে কেউ কারও সঙ্গে তেম একটা কথাও বলছে না। কী বলবে?

যে যেখানে জায়গা পেয়েছে, সেখানেই একখানা বোতল আঁকড়ে ব পড়েছে।

সবার জন্য আজ নিজের বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে টিম। বেঁচেই যদি থাকে, কী হবে টাকা-পয়সা দিয়ে? তবে বিনে পয়সায় মদ গিলবার আনন্দ কারও চেহারাতেই দেখা যাচ্ছে না। সবাই আপনমনে স্মৃতিচারণ করছে, ভাব নিজেদের কৃতকর্মের কথা।

প্রায় সবারই পাপকর্মের তালিকাটা এতটাই বিশাল যে, সত্যি বলতে সেটা নিয়ে ভাববার জন্য একটা সন্ধ্যা মোটেও যথেষ্ট নয়।

স্যালুনের সবচেয়ে পিছনের টুলটাতে বসে আছে এড স্টার্ক। আবছা অন্ধকারে তার মুখের রেখাগুলো ঠিকঠাক পড়ার উপায় নেই। তবে ভাবছে সে-ও।

তার মনের পর্দায় একের পর এক ভেসে উঠছে চেনা-অচেনা কিছু মানুষের মুখ। যাদেরকে সে এ জীবনে নানা কারণে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। তালিকাটা নেহায়েত ছোট নয়।

মৃত্যুর সময় কেমন অনুভূতি হয় মানুষের? খুব কি কষ্ট হয়? আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়? আত্মা বলতে সত্যিই কি কিছু আছে? সত্যিই আছে পরকাল?

আগে কখনও এসব প্রশ্ন উঁকি দেয়নি এডের মনে। অথচ আজ নিজের বিদায় বেলায়, এসব অবান্তর প্রশ্নগুলোই তার ভিতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছে।

মণ্টানায় একবার একটা কমবয়সী ছেলে মারা পড়েছিল তার হাতে। গানফাইটে বুকের মধ্যখানে গুলি খেয়েছিল ছেলেটা। ঠিক মরার আগমুহূর্তে বলেছিল, এডের জন্য একটা ভয়াবহ মৃত্যু কামনা করে সে। কোনও বুলেট যেন এডের মৃত্যুর কারণ না হয়। এত সহজ মৃত্যু নাকি প্রাপ্য নয় তার!

শুনে কোনও জবাব দেয়নি এড, চুপ করে ছিল।

আসলে কি ছেলেটার অভিশাপই লেগে গেল শেষ পর্যন্ত? ভয়ানক কষ্টের মৃত্যুই কি অপেক্ষা করছে তার জন্য?

আইডাহোর আরেক গানফাইটারের স্যাডলব্যাগ তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিল সে। ডুয়েলে তার সামনে টিকতে পারেনি লোকটা।

তার সদ্য বিবাহিত বউ, এডের হাত থেকে স্যাডলব্যাগটা নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিনিময়ে তাকে কোনও ধন্যবাদ দেয়নি। দিয়েছিল অভিশাপ, এডের মৃত্যুটা যেন হয় আপনজনহীন অবস্থায়!

তার কথারও কোনও প্রতিবাদ করেনি এড স্টার্ক। কারণ আপনজন বলতে এ পৃথিবীতে কেউই নেই তার!

তার চোখের সামনেই তার পুরো পরিবারকে খুন করে মাথার চামড়া ছিলে নিয়েছিল ইণ্ডিয়ান স্কাল্প হান্টারের দল। কোরালের খড়ের গাদায় লুকিয়ে থেকে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল পাঁচ বছর বয়সের ছোট্ট এড। আপনজন হারানোর বেদনা তার চেয়ে কে আর বেশি জানে?

তবে খুনিদের উপর চরম প্রতিশোধই নিয়েছিল সে। খুঁজে বের করেছিল সেই স্কাল্প হান্টারের দলটাকে। চিফ ওল্ড বুলের দল ছিল ওটা।

প্রায় মাসখানেক সময় নিয়ে একের পর এক চোরাগোপ্তা হামলায় দলটাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল এড। একজন পুরুষকেও বাঁচতে দেয়নি সে, তবে মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের কোনও ক্ষতি করেনি। অল্প ক'দিন পরেই অন্য ইণ্ডিয়ান দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ওল্ড বুলের মেয়েরা।

এড স্টার্ককে কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল স্যালুন মালিক টিম। একটা নড়বড়ে টুল টেনে নিয়ে এডের টেবিলে এসে বসেছে সে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে পুরানো একখানা বাফেলো গান। দেখতে ভয়ঙ্কর। এর মুখোমুখি হতে হলে যে কোনও শত্রুরই পিলে চমকে উঠবে।

'বোতলে একটা চুমুকও দাওনি তুমি, এড। আমার স্যালুনের মদ খারাপ, এমন অভিযোগ কখনও করেনি কেউ।'

'তোমার হাতেও সন্ধ্যা থেকে গ্লাস দেখিনি আমি। নিজের মদে নিজেরই অরুচি ধরে গেছে বলতে চাও?'

কয়েক মুহূর্ত একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল দুই বৃদ্ধ। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল দু'জনেই।

'মৃত্যুর আগমুহূর্তগুলো পূর্ণ সচেতন থাকতে চাই। জীবনটা সত্যিই আনন্দের ছিল, এড,' বলল টিম।

'বিয়ানার স্বামীর জীবন আনন্দের হবে, এতে আর অবাক হবার কী আছে!'

আবারও হাসল ওরা।

'বিয়ানা তোমাকেই পছন্দ করত, এড। তুমি পাত্তা দিলে না, তাতেই তো আমার কপালে শিকেটা ছিঁড়ল।'

'আমার ভাগ্যে সংসার ছিল না, টিম। সারাটা জীবন পথের ধুলোতেই তো কাটিয়ে দিলাম। পথেই হয়তো মরে পড়ে থাকব শেষ পর্যন্ত।'

'আমাদের সবাইকেই আজ মরতে হবে, এড। বাঁচতে পারব না কেউই। অন্য সবার চেয়ে তুমিই সেটা ভাল জানো।'

'কী করবে ওটা দিয়ে?' টিমের হাতের বাফেলা গানটার দিকে ইঙ্গিত করল এড।

'দেখতে চাই, হাতের নিশানা এখনও ঠিকঠাক আছে কি না।'

'বুলেট ঢোকার জন্য সামনে একটা রক্তমাংসের দেহ থাকতে হয়, টিম। বিগ ব্ল্যাকের সেটা নেই। সে জীবিত নয়।'

'তা জানি। তবে কেন যেন খালি হাতে মরতে মনটা সায় দিচ্ছিল না। আমি জানি, অন্তিম মুহূর্তে তোমার পিস্তল দুটোও হোলস্টারে থাকবে না।'

'তা থাকবে না। মরার আগে বারোটা গুলিই ছুঁড়ব আমি।'

ঠিক তখনই আবারও শোনা গেল দূরাগত মেঘের ভারী গর্জন!

চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল দু'বন্ধুতে। এসে গেছে বিগ ব্ল্যাক। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ফগসিটিবাসীর জন্য মৃত্যু পরোয়ানা।

টিমকে নিয়ে ধীর পায়ে স্যালুনের বাইরে এসে দাঁড়াল এড স্টার্ক। স্যালুনের বেশিরভাগ লোকই তাদেরকে অনুসরণ করল। বাকিরা এখানে-ওখানে লুকানোর বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত তখন। যদি আরও কয়েকটা মুহূর্ত বেশি বেঁচে থাকা যায়!

এই প্রথম বিগ ব্ল্যাককে স্বচক্ষে দেখতে পেল এড স্টার্ক। বিনু মিথ্যে বলেনি। সত্যিই ওটার দু'ডানায় গোটা আকাশটাই ঢেকে গেছে।

তবে একা আসেনি আজ বিগ! পিছনে গোটা দলবল অনুসরণ করছে তাকে।

একপাল উড়ুক্কু কালো ঘোড়া! চোখের সামনে দেখেও কেন যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

সবক'টা ছুটে আসছে রাস্তার হাত দশেক উপর দিয়ে। তবে শব্দটা শোনাচ্ছে মাটির বুকে খুরের আঘাতের মতই!

বিগ ব্ল্যাকের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এড স্টার্ক।

এখনও মুখ খোলেনি ওটা।

সত্যিই কি ওটার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুনের হল্কা বেরোয়?

অনেকটা অবচেতন মনেই হাতে পিস্তল তুলে নিল এড। আরও কাছে চলে এসেছে বিগ ব্ল্যাকের দলটা।

গোটা জীবনের সবক'টা পাপকর্ম আবারও এডের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মরণের পর যে নরকেই স্থান হবে, এতে তার নিজের অন্তত কোনও সন্দেহ নেই।

আচ্ছা, নরকে কি ঘোড়ারা মানুষের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়?

ঠিক তখনই ফগসিটিতে প্রথমবারের মত মুখ খুলল বিগ ব্ল্যাক।

সবচেয়ে সামনে দাঁড়ানো এড স্টার্ক অনুধাবন করল, ইণ্ডিয়ান ছোকরা বিনু প্রতিটা শব্দ সত্যি বলেছিল সেদিন!

এক

হোটেলের চত্বরে নেতিয়ে পড়া শুকনো পাতার দল আর আধ ইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ বেশ শান্তিতেই ছিল। কিন্তু তাদের সেই শান্তিভঙ্গের কারণ হলো একজন বয়স্কা মহিলা, জ্যোতির মা। কারণ, নিজের মতই জরাজীর্ণ একখানা শলার ঝাড়ু দিয়ে চত্বরটা ঝাঁট দিতে শুরু করেছে সে। এটাই তার রোজকার রুটিন।

জীবনের প্রতি ভয়াবহ রকমের অপ্রসন্ন জ্যোতির মা। তাই আজকাল সকাল বেলাতে কোনও কারণ ছাড়াই তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে থাকে। খোদাকে ডাকায় ক্ষান্ত দিয়েছে সে বহুকাল আগেই। যখন ডাকত, তখনও খোদা দু'দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেয়নি তাকে। এখন ডাকে না, শান্তি এখনও নেই। তবে অহেতুক প্রার্থনার সময়টুকু বেঁচে গেছে বলেই ধারণা তার।

অবিবেচক ঈশ্বরের প্রতি তার কতটা ক্ষোভ, সেটা রোজ সকালে বুঝতে পারে তার ঝাঁটাপেটা খাওয়া চত্বরের প্রতিটি ধূলিকণা, আর বুঝতে পারে হোটেলের ম্যানেজার, বুলবুল মিয়া।

ঘুণে খাওয়া ডেস্কে বসে একদৃষ্টিতে জ্যোতির মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে এখন। একগালে পান চিবুচ্ছে আর আপনমনে পুরানো রেজিস্টার খাতাটার পাতা উল্টাচ্ছে।

জ্যোতির মা তাকে ছেলেবেলার গল্পের ডাইনী বুড়ির কথা মনে করিয়ে দেয় রোজ, যে তার জাদুর ঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে সবার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিতে পারত। শৈশবের কত শত রাত যে সেই ডাইনীর দেখা পাবার স্বপ্ন দেখে কেটে গেছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

শেষতক খোদা অবশ্য তার স্বপ্ন ঠিকই পূরণ করেছিলেন! তার জীবনে সত্যিই এসেছিল এক ডাইনী—তার বউ!

তবে দুঃখ দূর করার বদলে যেটুকু সুখ ছিল, সেটুকুও চুরি করে তারই এক বন্ধুর হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

তারপর থেকে জগৎ-সংসারের উপর রীতিমত ঘেন্না ধরে গেছে বুলবুল মিয়ার। আপন কেউ না থাকায় সবকিছু ছেড়েছুড়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল সে বেশ কয়েকবারই। কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি একবারও। উল্টো দালালদের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে কপর্দকহীন হতে হয়েছে।

তাই একান্ত বাধ্য হয়েই এই অখ্যাত হোটেলে ম্যানেজারের দায়িত্ব নিতে হয়েছে তাকে। তার বিদ্যের যা জোর, তাতে এর চেয়ে ভাল চাকরি আর জোটানো সম্ভব হয়নি।

রেজিস্টার খাতার সর্বশেষ এন্ট্রিটা দিন চারেকের পুরানো। এরপর আর নতুন

কোনও খদ্দের এমুখো হয়নি। এমনিতেই পর্যটন মৌসুম না হওয়ায়, লোকজন তেমন একটা আসছে না এখন। আর যে ক'জন আসে, তারাও নতুন গড়ে ওঠা বিলাসবহুল হোটেলগুলোতে থাকতেই পছন্দ করে, পুরানো কোনও হোটেলে নয়। অফ-সিজনের বিশাল ছাড়ের কারণে প্রায় সবগুলো হোটেলের ভাড়াই এখন সবার সাধ্যের মধ্যে। তা হলে আদিমকালের ভগ্নপ্রায় হোটেলে থাকার কারই বা ঠেকা পড়েছে?

জং ধরা ফটকের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল বুলবুল মিয়া। লম্বামতন একজন লোক হেঁটে আসছে, হাতে একখানা সোনালি রঙের ব্রিফকেস। জ্যোতির মায়ের ছায়াও নেই চত্বরে, কোন্ ফাঁকে কেটে পড়েছে, কে জানে। তবে কাজে কোনও খুঁত রাখেনি সে, রীতিমত চকচক করছে গোটা আঙিনা। ধুলোর আস্তরণ আর শুকনো পাতার দঙ্গলের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই কোথাও।

লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রথমেই যে কথাটা মনে এল বুলবুল মিয়ার, ব্রিফকেসের রঙটা এমন অদ্ভুত কেন?

রোদের ছটায় রীতিমত জ্বলজ্বল করছে ওটা। সরাসরি বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। তবে প্রশ্নটা আপাতত একপাশে সরিয়ে রেখে মুখে একটা তেলতেলে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। অকালের খদ্দের, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

'স্বাগতম, স্যর। এই তল্লাটের সেরা হোটেলটি বেছে নেয়ায় আপনাকে অভিনন্দন,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল বুলবুল মিয়া।

স্মিত হাসল লোকটা। সামনে রাখা সোফাটায় আয়েশ করে বসল। ব্রিফকেসটা স্থান পেয়েছে ডান পাশের টি-টেবিলের উপর। তারপর পকেট থেকে একখানা অদ্ভুতদর্শন লাইটার বের করে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, 'আমি আগেও এখানে থেকে গেছি বার কয়েক। কখনও এখানকার সার্ভিসকে আহামরি কিছু মনে হয়নি আমার কাছে। অবশ্য এখন যদি আপনারা সবকিছু আমূল বদলে ফেলে থাকেন, তা হলে ভিন্ন কথা।'

কথাটা শুনে রীতিমত চুপসে গেল বুলবুল মিয়া। মুখের এলাচি ভেটকি কখন যে মিলিয়ে গেছে, সেটা সে নিজেও জানে না।

খোদার কাঁটা তা হলে নতুন কোনও অতিথি নয়, পুরানো পাপী। সর্বনিম্ন ভাড়ার ফিকিরেই হয়তো এখানে এসেছে সে আবার। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার কাছ থেকে শ'দুয়েক টাকা বেশি ভাড়া বাগানোর যে ধান্দাটা তার মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল, সেটাকে এখন অলীক কল্পনা বলেই মনে হচ্ছে।

পরাজিত হয়েছে জেনেও একবার শেষ চেষ্টা করল বুলবুল মিয়া। 'আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এখন সার্ভিস, স্যর। প্রচুর মেরামতও করা হয়েছে দালানটা।'

তার কথার প্রেক্ষিতে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা। সংস্কারের বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখতে পেল না কোথাও। হেসে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। ভাল হলে তো ভালই।'

উৎসাহিত হলো বুলবুল মিয়া। এগিয়ে গিয়ে লোকটার বিপরীত দিককার

সোফাটায় শিরদাঁড়া সোজা করে বসল সে।

'আপনি কত তলায় উঠতে চান, স্যর?'

'আপনি কত তলায় থাকেন?'

মনটা বিষিয়ে উঠল বুলবুল মিয়ার। সে যে এই হোটেলেই থাকে, সেটা বুঝে ফেলেছে ঘাগু লোকটা। আর কোথাও যাবার জায়গা না থাকায়, তিনতলার স্টোররুমের পাশের একটা ছোট্ট ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে সে। ম্যানেজার হিসেবে যে বেতন পায়, তা দিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকা ঠিক পোষায় না।

মালিককে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে সে, হোটেলে থাকলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তার সার্ভিস পাবে হোটেল। দূরে থাকলে সেটা সম্ভব হবে না।

তিনতলার রুমগুলো এমনিতে খালিই পড়ে থাকে। তাই মালিকও আর আপত্তি করেননি। সেই থেকে ৩৬ নাম্বার রুমটাই তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গেছে।

কিন্তু লোকটা এত জলদি এটা আন্দাজ করল কী করে? তার চেহারায় কি একটা হতদরিদ্র ভাব চলে এসেছে? যে কেউ একবার তাকালেই কি বুঝতে পারে যে, তার কোনও আশ্রয় নেই?

'আমি থাকি, স্যর, তিনতলায়। ৩৬ নাম্বার রুমে।'

'আচ্ছা। তা হলে আমাকে ৩৭ নাম্বার রুমটাই দিন।'

সহসা বিচলিত হয়ে উঠল বুলবুল মিয়া। এখানে আসার পর থেকে ওই রুমটা তালাবদ্ধই দেখে এসেছে সে। ভিতরের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কি না, আল্লাহ মালুম। থাকলেও নিশ্চয়ই কয়েক ইঞ্চি পুরু ধুলোর প্রলেপে ঢেকে আছে সবকিছু। পরিষ্কার করতে জান বেরিয়ে যাবে। কিছুতেই ভাড়া দেয়া উচিত হবে না ওটা।

'আসলে, স্যর, তিনতলার ঘরগুলো তেমন একটা ভাল নয়। আপনি বরং দোতলায় উঠুন। দখিনা বারান্দাসহ বেশ কিছু চমৎকার ঘর খালি আছে এখন।' পরিস্থিতি সামাল দেয়ার একটা চেষ্টা করল বুলবুল মিয়া।

'না, আমি ওটাতেই উঠতে চাই। ওটা কি খালি নেই এখন? অন্য কেউ আছে ওখানে?'

মনে-মনে খুব একচোট হেসে নিল বুলবুল মিয়া। খালি নেই আবার! পুরো হোটেলই তো বলতে গেলে খালি পড়ে আছে।

শুধু নীচতলার কোনার দিকের কয়েকটা ঘরে কিছু খদ্দের আছে। এলাকার কয়েকজন বদমায়েশ শ্রেণীর লোক মাসকাবারি হিসেবে ভাড়া নিয়েছে ওগুলো। একেকটা ঘর অসামাজিক যত কার্যকলাপের আড্ডাখানা। বুলবুল মিয়া সবই জানে। তবুও ওদেরকে বাধ্য হয়েই ভাড়া দিতে হয়। তা না হলে অফ-সিজনে হোটেলের খরচ তোলাটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে মালিকের পক্ষে।

'আসলে, স্যর, ঘরটা অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাই ধুলোবালুতে একেবারে ভরে আছে। তা ছাড়া ওটা তেমন ভালও নয়। এজন্যই আপনাকে অন্য কোনও ভাল ঘরে থাকতে বলছিলাম আরকী,' মিন-মিন করে বলল বুলবুল মিয়া।

'আপনাদের সার্ভিস যেহেতু এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে, ঘণ্টাখানেক সময় পেলে ঘরটা বসবাসের উপযুক্ত করে তুলতে পারবেন না?' মৃদু হেসে বলল লোকটা।

'জি, স্যর। অবশ্যই পারব।'

মনে-মনে অশ্রাব্য কয়েকটা খিস্তি করলেও, মুখে জোরপূর্বক হাসি ফুটিয়ে তুলল বুলবুল মিয়া। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে কোনওমতেই চটাতে চায় না সে। জ্যোতির মাকে জলদি কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে বেলবয় বেলালকেও জুড়ে দিতে হবে তার সঙ্গে। জ্যোতির মায়ের হাতে জাদু আছে। আশা করা যায়, এক ঘণ্টার আগেই ঘরটার চেহারা পাল্টে দেবে ওই মহিলা।

'তা হলে তো হয়েই গেল। ঘণ্টাখানেক বাদেই না হয় রুমে উঠব আমি।' মুখে এখনও হাসি ধরে রেখেছে লোকটা। 'আচ্ছা, আপনি এখানে এসেছেন কতদিন হয়েছে? আগে তো মনে হয় বুড়োমতন একজন ম্যানেজার হিসেবে ছিলেন। তাই না?'

'জি, স্যর। জি, স্যর। আমিও সেরকমই শুনেছি। হঠাৎই নাকি একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন উনি। কোথায় গেছেন, কেউ জানে না। মালিক বলেছেন, পাওনা বেতনও নাকি নিয়ে যাননি যাবার সময়। ওনার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করার পরই আমাকে নিয়োগ দিয়েছেন উনি। এই মাস তিনেকের মত হবে এখানে এসেছি আমি।'

'কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন! ওনার স্বজনেরা কী বলেছেন এ ব্যাপারে?'

'ওনার কোনও আত্মীয়স্বজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি, স্যর।'

'তাই নাকি! আচ্ছা, আপনারও বোধহয় নিকটাত্মীয় কেউ বেঁচে নেই, তাই না?'

চমকে উঠল বুলবুল মিয়া। সত্যিই আপন বলতে তেমন কেউ নেই তার। কিন্তু এই লোকটা এটা জানল কীভাবে?

'নেই, স্যর। কিন্তু আপনি এটা কীভাবে বুঝলেন?'

'নিশ্চিত হয়ে বলিনি। এমনিই মনে হলো কথাটা। আচ্ছা, আপনাদের মালিকের সাথে দেখা করা যাবে? উনি থাকেন কোথায়? একটা বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার ছিল ওনার সাথে।'

'আসলে সত্যি বলতে ওনার সাথে আমার নিজেরই কখনও দেখা হয়নি, স্যর। সবসময় ফোনেই কথা হয়। উনি নিজেই ফোন করেন প্রয়োজন মনে করলে। মাস শেষে সব হিসাব-কিতাব বুঝে নিতে একজন লোক পাঠান। পয়সাকড়ির হিসেবটা তাকেই বুঝিয়ে দিতে হয়।'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে 'যাদেরকে পাঠান, তারা সবসময় লাল রঙের পোশাক পরে আসে, তাতে থাকে সোনালি সুতোর কারুকাজ। তাই না?'

আবারও চমৎকৃত হলো বুলবুল মিয়া। 'আপনি এটা কী করে জানলেন,

স্যর?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল লোকটা।

'জানেন, আমি এর আগে এখানে যতবারই এসেছি, আপনাদের মালিকের সাথে দেখা করতে চেয়েছি, কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু একবারও সফল হইনি। তবে সম্ভবত এবার আমি তাঁর দেখা পেতে চলেছি।'

'আপনি যখন দেখা করতে যাবেন, আমাকেও সঙ্গে নেবেন, স্যর? যাঁর কাজ করছি, তাঁকে না দেখলে মনটা কেমন যেন খচ-খচ করে।'

'তাঁর সাথে আপনার দেখা না হওয়াই বোধহয় ভাল, ভাই। আচ্ছা, আপনি যে তিনতলায় একা-একা থাকেন, আপনার ভয় লাগে না?'

সে যে তিনতলায় একা থাকে, একথা লোকটা জানল কী করে? সে তো একবারও বলেনি এই কথাটা! আজব তো! রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেল বুলবুল মিয়া। মুখে বলল, 'কীসের ভয়, স্যর?'

কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে এল লোকটা। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বুলবুল মিয়ার চোখের দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন, কীসের ভয়।'

পলকের জন্য বুলবুল মিয়ার দু'চোখে আতঙ্কের রেশ দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, সে ভাল করেই জানে, কীসের ভয়। এ তল্লাটের প্রায় সবাই-ই জানে।

'ওরা আছে তো এখনও এখানে?' আবারও বলে উঠল লোকটা।

প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল বুলবুল মিয়া। শুনতে বেশ বেগ পেতে হলো সামনে বসা অতিথির।

'আছে, স্যর।'

তিনটে ছায়ামূর্তি। রাত-দুপুরে ঘুরে বেড়ায় পুরো হোটেলে। হোটেলের ছাদে, চত্বরের আমতলায়। কখনও ওরা কাঁদে, কখনও-বা আবার গোঙায়। কখনও আবার তিনতলার কোনও একটা ঘরের দরজায় আলতো করে কড়া নাড়ে। দরজা খুললে ওদেরকে আর দেখা যায় না, তবে অপার্থিব এক ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত অনেকেই দূর থেকে দেখেছে ওদেরকে। সবসময় একসঙ্গে থাকে ওরা। পায়ে পা মিলিয়ে সৈন্যদের মত মার্চ করে পথ চলে। কান্না কিংবা গোঙানিতেও তৈরি করে অপ্রাকৃত এক অনুনাদ। তবে আজ অবধি কারও কোনও ক্ষতি করেনি ওরা। তবুও ওদেরকে ভয় পাবার একশো একটা কারণ রয়েছে।

বুলবুল মিয়া এখানে আসার দু'দিনের মাথায়ই ওদের উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেছিল। প্রথমটায় ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল সে। তবে আস্তে-আস্তে ভীতিটা খানিকটা কমেছে। তবে এখনও বিশেষ দরকার ছাড়া রাতে ঘর থেকে বেরোয় না সে। গভীর রাতে টয়লেটে যাওয়াও পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। আচমকা ওরা সামনে এসে দাঁড়ালে, হার্ট অ্যাটাকেই মরে যাবে সে, ওদেরকে আর কষ্ট করে কিছু করতে হবে না।

'কয়জন ওরা এখন?' শীতল স্বরে জানতে চাইল লোকটা।

'তিনজন, স্যর।'

'হুম। যা ভেবেছিলাম, মনে হচ্ছে সেটাই ঠিক। আচ্ছা, আপনি বরং ৩৭ নাম্বার রুমটাকে মানুষ করার চেষ্টা করুন। আমি এদিক-ওদিক খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসি। আশা করি, কিছুক্ষণ পর এসে ঘরটা তৈরিই পাব।'

বলতে-বলতেই উঠে দাঁড়াল লোকটা। ইতোমধ্যেই ব্রিফকেসটা হাতে তুলে নিয়েছে সে।

বুলবুল মিয়াও চট করে উঠে দাঁড়াল। 'আপনি আসলে কে, স্যর?'

দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে চলল লোকটা। দরজার চৌকাঠের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে স্তম্ভিত বুলবুল মিয়ার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল।

'সবই বলব আপনাকে। আর অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।'

লোকটা চলে যাবার পরও আরও কিছুটা সময় সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বুলবুল মিয়া। আকাশ-কুসুম নানা রকম কল্পনা ভর করেছে তার মাথায়। কে এই লোকটা? কী চায় সে?

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে জ্যোতির মাকে খুঁজতে চলল বুলবুল মিয়া। বেলালকেও খুঁজে বের করা দরকার। লোকটা ফেরার আগেই রুমটা ভদ্রস্থ করতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।

দুই

যতটা ভাবা হয়েছিল, ঘরটা পরিষ্কার করতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগল। কারণ, মালসামানের ছিটেফোঁটাও ছিল না ঘরটায়, পুরোপুরি ফাঁকা! থাকার মধ্যে ছিল কেবল মেঝের ধুলো আর জানালার ঝুল।

অন্য একটা ঘর থেকে আসবাবপত্র এনে ঘরটা সাজানোর ব্যবস্থা করেছে বুলবুল মিয়া। তারপরও ঘরের অনেকটা জায়গা ফাঁকাই রয়ে গেল। সব কাজ শেষ হবার পর আচমকাই আবিষ্কার করল বুলবুল মিয়া, এই ঘরটা হোটেলের অন্য যে কোনও ঘরের চেয়ে আকারে অনেক বড়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফেরার কথা থাকলেও রহস্যময় লোকটা ফিরল সন্ধ্যা ঘনিয়ে। হাতের ব্রিফকেসের সঙ্গে ছোট একটা চটের থলেও যোগ হয়েছে এখন।

বুলবুল মিয়া নিজেই লোকটাকে তার কাঙ্ক্ষিত ঘরটায় নিয়ে গেল। তার হাবভাবে বুলবুল মিয়ার মনে হলো, ঘরটা তার বিশেষ পছন্দ হয়েছে। মনে-মনে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল বুলবুল মিয়া।

ইশারায় তাকে চেয়ারে বসতে বলে নিজে খাটের এক কোনায় গিয়ে বসল লোকটা। 'আমি বুঝতে পারছি, আমার পরিচয় জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে আপনার। আচ্ছা, আন্দাজ করুন তো, কে হতে পারি আমি?'

'আপনি, স্যর, ডিবির লোক। অথবা সিআইডির,' জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি করল না বুলবুল মিয়া।

সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আকাশ-পাতাল ভেবে সবচেয়ে জুতসই জবাব এটাই খুঁজে পেয়েছে সে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছাড়া এত-এত গোপন খবর জানবে কী করে কেউ? সে শুনেছে, গোয়েন্দারা নাকি সবার হাঁড়ির খবর জানে!

ঘর কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল লোকটা। 'আপনি তো, ভাই, বেশ মজার লোক! কেন এই কথা মনে হলো আপনার?'

'আপনি এমন অনেক কথা জানেন, স্যর, যা সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার জানার কথা না। গোয়েন্দা বিভাগের লোক হলেই কেবল এসব জানা সম্ভব।'

'আপনার কথা অগ্রাহ্য করার মত নয়। তবে আদতে আমি কোনও গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নই। আমাকে আপনি একজন তান্ত্রিক বলতে পারেন। পৃথিবীর সব ধরনের তন্ত্র-মন্ত্রে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে।'

অবাক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল বুলবুল মিয়া। আর যা-ই হোক, এই পরিচয় অন্তত আশা করেনি সে।

'আপনাকে তান্ত্রিকের মত লাগে না, স্যর।'

'কেন? তান্ত্রিকদের মত ভোজপুরী গোঁফ, কালো রঙের আলখাল্লা আর পিঠে ইয়া বড় কোনও ঝোলা নেই বলে?'

সায় জানিয়ে মাথা নাড়ল বুলবুল মিয়া।

'আমি, ভাই, আধুনিক তান্ত্রিক। তাই অমন বেশভূষার প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ অতিপ্রাকৃত সব বিষয়-আশয়ে। পৃথিবীতে যত রকমের শুভ এবং অশুভ শক্তির কথা শোনা যায়, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভীষণ ভাল লাগে আমার। সত্যি বলতে, আমার এখানে আসার পিছনের কারণও কিন্তু সেটাই।'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যর।'

'বেশ কয়েক বছর আগে আমার কানে আসে, আপনাদের হোটেলের মালিক, শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তান্ত্রিকতা চর্চায় বেশ উপরের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তিনি নাকি আত্মাদের জগতে সহজে যাওয়ার একটা শর্টকাট পথেরও সন্ধান পেয়েছেন। আর যেখানেই মধু, সেখানেই পিঁপড়ের আনাগোনা। তাই অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর বেশ কিছু শিষ্য জুটে যায়, যারা তাঁকে দেবতা জ্ঞান করতে শুরু করে তাঁর ক্ষমতার জন্য। আপনার কাছে লাল কুর্তায় সোনালি সুতোর কাজ করা পোশাক পরে যে লোকগুলো আসে, তারা আপনার মালিকেরই শিষ্য।

'আধিভৌতিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তাদেরকে এই বিশেষ পোশাকগুলো পরতে হয়। ওগুলো খুলে ফেললে ক্ষমতা চলে যাবার আশঙ্কা তৈরি হয়।

'স্বভাবতই আপনার মালিকের সম্পর্কে জানার পর তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। আমি ছুটে আসি তাঁর সাথে দেখা করতে। কিন্তু কপাল মন্দ আমার। পথে খানিকটা দেরি করে ফেলি। এসে দেখি কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছেন উনি। বেশ কিছুদিন অপেক্ষার পরও সেবার তাঁর দেখা পাইনি আমি। বিফল হয়েই

ফিরে যেতে হয় আমাকে।

'পরবর্তী বছর আবার আসি আমি এখানে। তার পরের বছর আবার। কিন্তু একবারও তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ হয়নি আমার। তবে ততদিনে আমার নিজেরও কিছুটা ক্ষমতা জন্মেছে। তাই গলদটা ঠিক কোথায়, সেটা ধরতে পারি আমি। তবে শতভাগ নিশ্চিত হবার সুযোগ ছিল না তখন।

'তাই এ বছর আবার আসতে হলো আমাকে এখানে। সকালে আপনার সাথে কথা বলা এবং তারপর সারাদিনের খোঁজ-খবর, সব মিলিয়ে নিশ্চিত হলাম, আমার ধারণাটাই সঠিক ছিল।'

'সেটা কী, স্যর?' অধৈর্য ভঙ্গিতে তাড়া দিল বুলবুল মিয়া।

'শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর আবিষ্কৃত শর্টকাট ধরে নিয়মিতই আত্মাদের জগতে যেতেন। সেখান থেকে মর্ত্যের মানুষজনের ভূতভবিষ্যৎ জেনে আসতেন তিনি। সবার মাথার উপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য এ ক্ষমতাটা তাঁর দরকার ছিল। কিন্তু কোনও এক যাত্রায়, তিনি সম্ভবত ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলেন। যে কারণে তিনি আটকে গেছেন কায়া এবং আত্মাদের মধ্যখানের ছায়াদের রাজ্যে! ওখান থেকে তিনি না পারছেন আত্মাদের জগতে যেতে, না পারছেন আমাদের জগতে ফিরতে। বাইরের কারও সাহায্য না পেলে, তিনি সম্ভবত আর কোনওদিনও আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবেন না। তাঁকে ওখানে আটকে রাখার পিছনে এমনকী তাঁর শিষ্যদেরও হাত থাকতে পারে! জানেন তো, কারণে-অকারণে যে আপনার পায়ে হাত দেয়, পায়ের তলার মাটি সরিয়ে ফেলার সুযোগ তারই সবচেয়ে বেশি থাকে!'

'ইয়া মাবুদ! কী কইতাছেন এগুলা আপনে, স্যর!' হতবাক বুলবুল মিয়ার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই আঞ্চলিক ভাষা বেরিয়ে আসে।

'যা বলছি, সত্যিই বলছি। তবে মজার ব্যাপার হলো, আপনাদের মালিক ভদ্রলোকের সাথে এখন ওখানে আটকে আছেন আরও দু'জন মানুষ।'

'ওরা কারা, স্যর?'

'এই হোটেলের আগের দু'জন ম্যানেজার।'

'ইয়া মাবুদ! ইয়া মাবুদ!' সভয়ে বিড়বিড় করতে লাগল বুলবুল মিয়া।

'তাঁরা সম্ভবত শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বাবুর খুলে রেখে যাওয়া পথটাতে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলেন। তিনি যেহেতু আর ফিরে আসেননি, তাই ওই পথটা বন্ধ করার মতও কেউ ছিল না। আবার এমনও হতে পারে, তাঁরা তাঁদের মালিককে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরাও আটকে পড়েছেন ওখানে। এজন্যই গত কয়েক বছরে ছায়ার সংখ্যা এক থেকে বেড়ে তিনটে হয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যর। একদম ঠিক। আমি শুনেছি, গত বছরও ছায়া কেবল দুটো ছিল,' গলা চড়িয়ে বলল বুলবুল মিয়া।

সায় জানিয়ে মাথা দোলাল লোকটা। 'এজন্যই এখানে এসেছি আমি। তাঁদেরকে ওই বলয় থেকে মুক্ত করে আনতে চাই। যেতে চাই ওই শর্টকাট ধরে। এজন্যই আপনাকে সবকিছু জানিয়ে রাখলাম। যেন আমিও ওখানে আটকা পড়লে

আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। তা হলে মুক্তির অন্তত একটি পথ খোলা থাকল।'

'কিন্তু, স্যর, আপনি এটা কীভাবে করবেন?'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমার নিজেরও খানিকটা ক্ষমতা জন্মেছে এখন। সেই ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই এই কাজটায় ব্যবহার করতে হবে আমাকে। তাতেও কুলোবে না। তাই দুটো দেবশক্তির সাহায্য নেব আমি। দেবী কালরাত্রি এবং দেবতা অলুরাং।'

'এঁদের সম্পর্কে কিছু জানা নেই আমার, স্যর। দুঃখিত।'

'দেবী কালরাত্রি, হিন্দু দেবী। নবদুর্গার অন্যতম একজন এবং দেবী দুর্গার সপ্তম শক্তি। তাঁর আরাধনাও করা হয় দুর্গা পূজার সপ্তম দিনে। দেখতে ভীষণ ভয়ঙ্কর। গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, মাথা ভর্তি এলোচুল। তাঁর গলায় শোভা পায় বজ্রের মালা। চোখ তিনটে, সেগুলো দেখতে ব্রহ্মাণ্ডের মতই গোলাকার। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আগুনের হলকা বেরোয়। অনেকটা পৌরাণিক কাহিনির ড্রাগনদের মত। তাঁর প্রিয় বাহন গাধার পিঠে চড়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। তাঁর চারটে হাতের একটাতে আছে বর, আরেকটাতে অভয়মুদ্রা। অন্য দু'হাতে আছে খড়্গ এবং লোহার কাঁটা। যদিও তিনি দেখতে ভয়ঙ্কর, তবুও তিনি শুভফলের দেবী। এজন্য তাঁর অপর নাম, শুভঙ্করী। আপনাদের শুভঙ্কর বাবুর নামকরণও কিন্তু এই দেবীর নামেই করেছেন তাঁর পিতামহ। দৈত্য, দানব, রাক্ষস, খোক্কস, ভূত, প্রেত এসবের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দেবী কালরাত্রির উপাসনা জরুরি। আর উপজাতিদের আলোর দেবতা অলুরাং আমাকে সাহায্য করবেন ছায়াদেরকে স্পর্শ করতে।'

'আলোর দেবতা আবার কেমন করে ছায়া ধরতে সাহায্য করবেন, স্যর?'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, ছায়া তৈরিই হয় আলোর উপস্থিতিতে। আলো নেই তো ছায়াও নেই। অন্ধকারের সাথেই বরঞ্চ ছায়ার শত্রুতা বেশি। তাই অলুরাং-এর বিজলীবাণ ছাড়া ওদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কোনওমতেই।'

আর কোনও প্রশ্ন করল না বুলবুল মিয়া। সবকিছু মিলিয়ে তার মাথায় কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজের চেয়ারে চুপটি করে বসে রইল সে।

কথা চালিয়ে গেল লোকটা। 'সবকিছু বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে এই ৩৭ নাম্বার ঘরেই আছে সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি। আপনি জানেন কি না জানি না, এর আগের দু'জন ম্যানেজারও কিন্তু এই রুমেই থাকতেন। এমনকী শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় যখন হোটেলে আসতেন, তিনিও কিন্তু এই ঘরেই উঠতেন। তাই আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, শর্টকাটটা এই রুমেই কোথাও আছে। শুধু কিছু যত্ন করে লুকানো মুখটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।'

বিস্ময়ে চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল বুলবুল মিয়ার। বলাই বাহুল্য, এসব তথ্য একদমই জানা ছিল না তার।

নিজের কথার খেই ধরল লোকটা। 'আজ রাতে এই ঘরে আমি কিছু আচার-অনুষ্ঠান করব। তারপর ওই পথটা খুঁজে পেলে ছায়ারাজ্যে যাব। যথাসাধ্য চেষ্টা

করব ওঁদেরকে ফিরিয়ে আনতে। যজ্ঞ করার সময় অনেক রকমের প্রেত আমার উপর ভর করতে পারে। আমি এমনকী চিৎকার-চেঁচামেচিও করতে পারি। তবে আপনার প্রতি অনুরোধ রইল, আপনি নিজের কানে যা-ই শুনে থাকুন না কেন, কোনওভাবেই সকালের আগে আমাকে বিরক্ত করবেন না। সূর্যোদয়ের পরও যদি আমি ঘর থেকে না বেরোই তা হলেই কেবল এই ঘরে আসবেন। টেবিলের উপর ঠিকানা লেখা একটা কাগজ রেখে যাব, ওখানে যোগাযোগ করবেন। ওঁরা অবশ্যই আমাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। তবে আপনি নিজে আর কখনওই রাতের বেলা আর এই ঘরে আসবেন না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যর,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল বুলবুল মিয়া। এতক্ষণ ধরে যা-যা শুনল, কিছুতেই সেগুলো হজম করতে পারছে না সে।

যেন অনেকটা ঘুমের ঘোরেই বার দুয়েক বিড়বিড় করল সে, 'ইয়া মাবুদ! ইয়া মাবুদ!'

তিন

নৈঃশব্দের ডানায় চেপে একরাশ অস্থিরতা এসে ভর করেছে বুলবুল মিয়ার উপর। রাতের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। কিছুতেই বিছানায় স্থির থাকতে পারছে না সে। ঘুমানো তো দূরের কথা, যেন শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে আর।

কী হচ্ছে তার পাশের ঘরে? তান্ত্রিক লোকটা করছেটা কী এখন?

ওঘর থেকে ভেসে আসা মৃদু খুটখাট শব্দে তার উত্তেজনা বাড়ছে বৈ কমছে না।

কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় এহেন জ্বালাতন?

তাই শেষমেশ আর সইতে না পেরে বিছানা ছাড়তে বাধ্য হলো সে। কৌতূহলের কাছে আরও একবার পরাজিত হলো অচেনা ভয়।

ঘরের আলো জ্বালেনি বুলবুল মিয়া। লোকটাকে বুঝতে দিতে চায় না যে, এখন অবধি জেগে আছে সে।

বিড়ালের মতই পা টিপে-টিপে, দু'ঘরের মাঝ-দেয়ালের জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। জানালার কবাটগুলো খোলার উপায় নেই, বহু আগেই সিলগালা করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে উপরের কবাটের কোনার দিকে ছোট একটা ফুটো আছে। হালকা আলোর একটা সরু রেখা দেখা যাচ্ছে সেখানে। আপাতত সেখানেই চোখ রাখার ইচ্ছে বুলবুল মিয়ার। যদি কিছু দেখতে পাওয়া যায়!

ফুটোটায় চোখ রাখতেই ভয়ানক চমকে উঠল সে। তান্ত্রিক লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফুটোটার দিকেই!

বুলবুল মিয়ার মনে হলো, লোকটা সরাসরি তার চোখের দিকেই তাকিয়ে

আছে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে! অথচ ফুটোটার কথা কোনওভাবেই জানার কথা নয় লোকটার। আর অত দূর থেকে এতটা ছোট একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বুলবুল মিয়াকে দেখতে পাবার তো প্রশ্নই আসে না!

তবুও বিচলিত হয়ে উঠল বুলবুল মিয়া। তার দিকে তাকিয়ে লোকটা কি মৃদু একটা হাসি দিল? ব্যাপারটা সত্যি ছিল নাকি পুরোটাই তার চোখের ভুল?

ভাবনা-চিন্তা করার জন্য খুব একটা অবকাশ পেল না সে। কারণ ওঘরে ততক্ষণে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে লোকটা।

ঘরের মধ্যখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। সেখানে সাদা চক দিয়ে একখানা বৃত্তমতন আঁকা।

বুলবুল মিয়ার মনে হলো, বৃত্তটা ঠিকঠাক করে আঁকতে পারেনি লোকটা। দুটো দিক সামান্য চেপে গেছে। দেখতে লাগছে অনেকটা কমলার মত। নাকি পৃথিবীর মত?

বৃত্তের ভিতরের দিকটায় অদ্ভুতদর্শন কিছু আঁকিবুঁকি। দেখতে লাগছে অনেকটা প্রাচীনকালের সৈন্যদের যুদ্ধে ব্যবহার্য ঢালের মত।

পরক্ষণেই নিচু স্বরে কী যেন মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল লোকটা। চোখজোড়া বন্ধ করে রেখেছে। ঘরে হালকা ধোঁয়ার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারল বুলবুল মিয়া। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও ধোঁয়ার উৎসটা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো সে।

খানিক বাদেই চোখ মেলল লোকটা। স্থির পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলে রাখা ব্রিফকেসটার দিকে। ওটার ডালাটা যে আগে থেকেই খোলা ছিল, সেটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি বুলবুল মিয়া। দ্রুত হাতে একে-একে ভিতরের জিনিসপত্রগুলো বের করতে লাগল লোকটা।

'ইয়া মাবুদ! এগুলো দেখি সব হাড্ডিগুড্ডি!' আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল বুলবুল মিয়া।

সে বোকা হতে পারে, তবে এতটাও আহাম্মক নয় যে ওগুলো কীসের হাড় সেটা বুঝতে পারবে না!

সবগুলো নামানো শেষে ব্রিফকেসটা বন্ধ করে দিল লোকটা। তারপর আলগোছে বাম হাত দিয়ে নিজের ডান হাতটা চেপে ধরল সে। বুলবুল মিয়াকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে খুলে চলে এল হাতটা!

যেন ওটা মানুষের নয়, প্লাস্টিকের কোনও এক পুতুলের হাত। একফোঁটা রক্তপাত হলো না। ব্যথা-বেদনার সামান্যতম চিহ্নও ফুটল না লোকটার মুখমণ্ডলে!

নিজের ডান হাতের জায়গায় ব্রিফকেস থেকে নেয়া একটা কঙ্কালের হাত জুড়ে দিল সে। খুব সহজেই খাপে-খাপে লেগে গেল ওটা!

একজোড়া রসগোল্লার মত বড়-বড় চোখ নিয়ে এই অপার্থিব দৃশ্যটা দেখল বুলবুল মিয়া। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে সে।

এরপর একে-একে নিজের সব ক'টা হাত-পা-ই কঙ্কালের হাত-পা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করল লোকটা। শেষতক বুলবুল মিয়াকে বিস্ময়ের শেষ সীমানায়

পৌঁছে দিয়ে নিজের মাথাটাও একটানে খুলে নিল সে! সেই জায়গায় স্থান পেল কঙ্কালের খুলি। সদ্যছেঁড়া মুণ্ডটা স্থান পেল টেবিলে রাখা ব্রিফকেসের উপর। জীবন্ত, অমলিন।

অবশেষে যখন বুলবুল মিয়ার দিকে তাকিয়ে বিকৃত একটা হাসি দিল ওটা, আর সহ্য করতে পারল না সে! তৎক্ষণাৎ নিজের পা জোড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল। ধপাস করে বসে পড়ল সেখানেই। হড়হড় করে বমি করে মেঝের অনেকটা অংশ ভাসিয়ে দিল। রাতের খাবার আর একরত্তিও অবশিষ্ট রইল না উদরে।

এর পরপরই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বুলবুল মিয়া।

চার

বুলবুল মিয়ার জ্ঞান ফিরল প্রচণ্ড একটা শোঁ-শোঁ শব্দে। কাছেপিঠেই কোথাও প্রচণ্ড জোরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার ধাতস্থ হতে। তারপরেই বুঝতে পারল সে, ঝড়টা বাইরে কোথাও নয়, হচ্ছে তার পাশের ঘরে!

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল সে। নিজের উপর জোর খাটিয়ে আবারও চোখ রাখল ফুটোটায়।

বুলবুল মিয়া ভেবেছিল, এতকিছুর পর আর কোনওদিন কোনওকিছুই তাকে বিস্মিত করতে পারবে না। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাকে আরও একবার বিস্মিত হতে হলো!

ওঘরের পিছনের দিকের দেয়ালটা আর চোখে পড়ছে না এখন। দেয়ালে ঝুলানো তেলরঙে আঁকা ছবিটাও গায়েব। সে জায়গায় তৈরি হয়েছে মস্ত এক বাতাসের সুড়ঙ্গ!

ঝোড়ো হাওয়া ক্রমাগত পাক খাচ্ছে সেখানে। একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রচণ্ড আক্রোশে। শোঁ-শোঁ শব্দটা সেখান থেকেই আসছে।

তান্ত্রিক লোকটা মেঝের উপর পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। পেশীবিহীন হাত-পা দিয়ে মেঝেটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে বারংবার। তবে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। বাতাসের টানে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে।

আচমকা বুলবুল মিয়ার দিকে পিছন ফিরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'আমাকে বাঁচান, ভাই। আমাকে বাঁচান।'

পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল বুলবুল মিয়া। কী করবে সে এখন?

স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে, লোকটা নিজের চেষ্টায় কোনওমতেই এই মাতাল হাওয়ার খপ্পর থেকে বাঁচতে পারবে না। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে হারিয়ে যেতে হবে সুড়ঙ্গের অতলে। সে কি পারবে লোকটাকে বাঁচাতে? তার কি

আছে সে ক্ষমতা?

আবারও লোকটার আর্তনাদে সংবিৎ ফিরে পেল সে। 'দোহাই লাগে, ভাই। আমাকে বাঁচান।'

আর কিছু ভাবতে পারল না বুলবুল মিয়া। চোখের সামনে একজন মানুষকে কিছুতেই এভাবে মরতে দেয়া যায় না।

পড়িমরি করে ছুট লাগাল সে পাশের ঘরের দিকে। তার বলিষ্ঠ কাঁধের জোরাল ধাক্কায় ভেঙে গেল দরজার পুরানো কাঠ। ঘরে ঢুকেই ছুটে গেল সে লোকটাকে সাহায্য করতে।

কাছে গিয়ে যেই না লোকটাকে ধরতে যাবে, অমনি তাকে হতবাক করে দিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল লোকটা। পরক্ষণেই দেহের সর্বশক্তি দিয়ে বুলবুল মিয়াকে ভয়ানক একটা ধাক্কা দিল সে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বুলবুল মিয়ার পক্ষে সে ধাক্কা সামলানো তখন অসম্ভব ছিল। রীতিমত উড়ে গিয়ে পড়ল সে সুড়ঙ্গের ভিতরে। দেখতে-দেখতেই তাকে আপাদমস্তক গিলে নিল ওটা। পরক্ষণে স্রেফ ভোজবাজির মত বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

কোথায় সুড়ঙ্গ? ওই তো দাঁড়িয়ে আছে ঘরের দেয়াল আর তাতে শোভা পাচ্ছে অচেনা এক শিল্পীর আঁকা অসম্ভব সুন্দর একখানা তৈলচিত্র।

পাঁচ

চোখ মেলতেই জনাতিনেক লোককে নিজের মুখের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখল বুলবুল মিয়া। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। চোখ পিট-পিট করে বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরিস্থিতি আঁচ করার বৃথা চেষ্টা করল। বুঝতে পারছে না, কোথায় আছে সে, এই লোকগুলোই বা কারা?

থুত্থুড়ে বুড়ো লোকটাই সর্বপ্রথম মুখ খুলল, 'তোমাকেও তা হলে ফাঁদে ফেলেছে পিশাচটা?'

'কে আপনি? আর কার কথাই বা বলছেন?'

'তুমি যে হোটেলের ম্যানেজার ছিলে, আমি এককালে তার আসল মালিক ছিলাম। ওই পিশাচটা তখন ম্যানেজার ছিল। তারপর আমাকে ফাঁদে ফেলল সে, আর এখন সে-ই হোটেলটার মালিক বনে গেছে। আর এই বাকি দু'জন যাদেরকে দেখছ, এরা তুমি আসার আগে ম্যানেজার হিসেবে ছিল।'

'দুঃখিত। হোটেলের মালিকের সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি।'

'দেখা অবশ্যই হয়েছে। তা না হলে তোমাকে এখানে আসতে হত না কখনওই। তান্ত্রিকের বেশে যে লোকটা তোমার কাছে গিয়েছিল, সে-ই হোটেলের বর্তমান মালিক।'

'ইয়া মাবুদ,' সজোরে চেঁচিয়ে উঠল বুলবুল মিয়া। 'আমি এখন কোথায়?'

জবাব এল, 'ছায়ারাজ্যে।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বুলবুল মিয়া। মুখে কোনও কথা ফুটল না তার।

'লোকটা আদতে শয়তানের উপাসক। তার কার্যসিদ্ধির জন্য আমাদেরকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করেছে সে। পাঠিয়ে দিয়েছে এই ছায়ারাজ্যে।

'কাউকে জোর করে পাঠানো যাবে না, এটাই ছিল একমাত্র নিয়ম। তাই সবকিছু করেছে সে প্রচণ্ড রকমের ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে। কাউকে জোর করে আনেনি, কোনও নিয়ম ভাঙেনি। কিন্তু এমন ফাঁদ পেতেছিল, যেন আমরা নিজের অজান্তেই তার ফাঁদে পা দিই। তার মানা সত্ত্বেও আমরা সবাই তাই তাকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলাম। আর নিজেদেরকে ফেলেছি চরম বিপদে।

'প্রতিবার একই চিত্রনাট্যে একই নাটক মঞ্চায়ন করেছে সে। বারবার কেবল কুশীলবই পরিবর্তন করা হয়েছে।'

'এখন আমরা কী করব?'

'ঘুরে বেড়ানো ছাড়া বিশেষ কিছু করার নেই এখানে। আমাদের আত্মা নেই, তাই আমাদের মরণ নেই। আমাদের দেহ নেই, তাই আমাদের জীবনও নেই। শুধুই অশরীরী একটা অবয়ব এখন আমরা পৃথিবীর মানুষজনের কাছে। নিজেদের কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে আমাদের?'

'কতদিন পর্যন্ত চলবে আমাদের এই জীবন?'

'যতদিন পর্যন্ত না কেউ আমাদেরকে উদ্ধার করে। আর যদি সেটা না হয়, সম্ভবত মহাপ্রলয় পর্যন্ত এভাবেই কাটবে আমাদের জীবন নামের বিভীষিকা।'

ডুকরে কেঁদে উঠল বুলবুল মিয়া।

'আহা! একা-একাই কাঁদতে শুরু করে দিলে যে, বাপু! এখানে একা-একা কিছু করার নিয়ম নেই তো।'

সবাইকে তার সঙ্গে কাঁদতে দেখে কান্না থামাল বুলবুল মিয়া।

উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করল, তার পা জোড়া মাটি স্পর্শ করছে না! খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে অন্যদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে শিখে গেল। বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে বেড়ানোকে যদি হাঁটা বলা যায় আরকী!

ছয়

রেজিস্টার ডেস্কে বসা নতুন ম্যানেজার রতন দেখল, সোনালি রঙের একটা ব্রিফকেস হাতে দীর্ঘদেহী একজন লোক এগিয়ে আসছে।

ভূতপূর্ব পকেটমার রতনের মাথার বেয়ারিংগুলো হিসেবনিকেশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। ব্রিফকেসটা কি সোনার? কী আছে এর ভিতরে? খুব দামি কিছু?

বেচলে কত পাওয়া যাবে?

লোকটার সঙ্গে খাতির করে দিন দুয়েক পর ওটা নিয়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়?

তিনকুলে আপন বলতে তেমন কেউ নেই তার। একবার পালাতে পারলে তার টিকিটাও ছুঁতে পারবে না কেউ।

মনে-মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে-করতে লোকটাকে হাস্যোজ্জ্বল অভ্যর্থনা জানাল রতন।

